

① 38,139

মাষের কাল—কত কাল ?

অরবোধ, কালিদাস, ভাববি প্রভৃতি মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের জায় মহাকাব্য
নাথের স্থানও যে সংদ্বত-সাহিত্যে উচ্চ, তাহাতে কাহাবও সন্দেহ নাই।
“শিশুপাল-বধ” ব্যতীত কবির রচিত অন্ত কোনও গ্রন্থের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় নাই। মাধবের জায় মনীষা-সম্পন্ন মহাকবি যে অন্ত কোনও গ্রন্থাবিধ গ্রন্থ
কবেন নাই, তাহাও বলা কঠিন। মাধবের রচিত বলিয়া ব্রহ্মভট্টদেব ও হেমচ-
ন্দ্রের কবিতা প্রায় উদ্ধৃত কবিগণের; কিন্তু এই প্রোবাক্তি “শিশুপাল-বধ”
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতে পণ্ডিতগণের মধ্যে কেত প্রভৃতি বাক্যের

যে, প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবি মাধব “শিশুপাল-বধ” ব্যতীত অল্প গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। সে বাহা হউক, “শিশুপাল-বধে”র অনেক টীকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথের বচিত সর্বস্বনা নারী ব্যাখ্যাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ভারতের সর্বত্রই এই মহাকাব্যের পঠন-পাঠন চলিতেছে। মাধবের কাল-নির্ণয়-করে যে সকল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিত যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ণাব অধ্যাপক পাঠক ও সর্বদেয়-বিস্তৃত মনীষী কিলহর্নের নাম প্রধানভাবে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। অধ্যাপক পাঠক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে “Bombay Branch of the Royal Asiatic Society”র এক অধিবেশনে (১) মাধবের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে এক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন, এবং মনীষী কিলহর্ন “Journal of the Royal Asiatic Society”-টীতে এই সম্বন্ধে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ (২) লিখিয়াছিলেন।

মাধব গ্রন্থাবসানে শ্লোক-পঞ্চকে ভাস্কর-পরিচয় প্রদান করিতে বাইয়া, সে কালেব এক নরপতিব নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই নৃপতির নাম ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আখ্যাত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্রা নামটির আকার যে বিরূপ ছিল, তাহা সম্প্রতি ধার্য করা কঠিন। গ্রন্থ-প্রতিলিপি-লেখকগণের দোষেই রাজ-নামটির আদি রূপটি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাধবের পিতামহ [দত্তক-পিতা] সুপ্রভদেব যে নৃপতিব “রক্ষাধিকারী” মন্ত্রী ছিলেন, তাহান নাম “শ্রীবর্মানাথ্যন্ত”, “শ্রীবর্মানাত্ত” ও “শ্রীবর্মানাত্ত” এই তিন আকারে বিভিন্ন সংস্করণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রাচীন লেখের মধ্যে কোনও স্থানেই এইরূপ নামে পরিচিত কোনও নৃপতির অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মনীষী কিলহর্ন J. R. A. S. (p. 728) পত্রিকায় মাধবের কাল সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, মিঃ জি. এইচ. ওয়া অধ্যাপক কিলহর্নের নিকট রাজপুতানার প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন লিপিব যে প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন, তাহাতে ৬৮২

(১) Proceedings of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society—1897-1898—pp. 303-307—উষ্টবা।

(২) J. R. A. S.—1906, p. 728, 3, J. R. A. S.—1878, pp. 499-502

বিশ্বনাথ (—৬২১—৬৩ খৃষ্টাব্দে) বর্ষলীল নামক এক বাঙ্গা ভাষ্যবর্ণের সেই
 অক্ষর বান্ধ কবিতেন বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। এই লিপি হইতে অধ্যাপক
 কিলহর্ণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, কবির আত্ম-পরিচয়-বিজ্ঞাপক ন্যে যে
 "বর্ষলীল"-নামক নবপতি উল্লেখ আছে, সেই নবপতি ও রাজপুতানায় প্রাপ্ত
 প্রাচীন লিপিতে উল্লিখিত বর্ষলীল নামক নবপতি অভিন্ন ব্যক্তি। অতএব,
 অধ্যাপক কিলহর্ণ মনে করেন যে, সুপ্রভদেবের পৌত্র ও তাঁতকের পুত্র মহাকবি
 মাঘ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে [৬৫০-৭০০ খৃঃ] লোক ছিলেন। (৩)
 বর্ষলীলের বাজ্ঞ-সময়ের উল্লেখ হইতে এরূপ বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হইবে
 যে, মাঘ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই লোক ছিলেন; অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে
 বা প্রথম পাদের লোক ছিলেন না। তবে মাঘকে ধাহারা দশম বা দ্বাদশ
 শতাব্দীর কবি বলিয়া ধাৰ্য্য কবিয়াছিলেন, তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা
 বলা আর অসম্ভব হইবে না। কোনও কোনও পণ্ডিত "ভোজপ্রবন্ধ", "প্রবন্ধ-
 চিন্তামণি", "প্রভাবক-চবিত" প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আখ্যানমালা হইতে অল্পমান
 কবিয়া থাকেন যে, মাঘ বাবাব ভোজপ্রবন্ধে [১০১৮-৬০ খৃঃ] সম-সাময়িক
 কবি ছিলেন। কিন্তু এই সকল আখ্যানে বর্ণিত বিষয় যে ঐতিহাসিক নহে
 নহে, এবং মাঘ যে ভোজপ্রবন্ধের বহু পূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহাও প্রমাণ্য
 এইমাত্র বলা হইতে পারে যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে আশ্চর্য্য
 আনন্দবর্দনও মাঘের কাব্য হইতে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি,
 বাজা ভোজপ্রবন্ধে তাহাও "সবস্বতীকর্ত্তাভরণ" নামক স্নেহকার গ্রন্থে "শিউরা
 বধ" হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সোনদেবের "হস্তলিখন" গ্রন্থ ৮৮
 শকাব্দার সমাপ্ত হইয়াছিল; এই গ্রন্থেও মাঘের উল্লেখ আছে। মাঘ যে ধার্য্য
 ভোজপ্রবন্ধের সম-সাময়িক নহেন, শেষোক্ত প্রমাণই তদ্বিষয়ে সথেষ্ট প্রমাণ।
 কিন্তু অধ্যাপক পাঠক তাহাও পূর্বোক্তিগত প্রবন্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ
 করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মাঘ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বেই বর্তমান ছিলেন-
 তবে কখনই নহে। প্রমাণটি এই,—৮১৪ খৃষ্টাব্দে নৃপতুঙ্গ নামক এক গুণমান
 নবপতি সিংহাসন প্রাপ্ত হন; সিংহাসনলাভের কিছু কাল পরে তিনি "কবিরাজ
 মার্গ" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; সেই গ্রন্থে তিনি মহাকবি মাঘেরও
 উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ অল্পমান বোধ হয় অ-যুক্তিসহ হইবে।
 সে, নৃপতুঙ্গের সমসাময়িক লোক-সমাজে, অর্থাৎ নবম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে,
 মহাকবি মাঘের বয়ঃ ও প্রতিপত্তি বিদ্বজ্জনগণে একরূপ সংস্থাপিত হই

পিয়াছিল; কারণ, উক্ত 'কবিরাজমার্গ' নামক গ্রন্থে শকুন্তলা-বচনিতা ববিয়া
সহিত মাঘেব স্থান নিবন্ধ হইয়াছে। অতএব, তৃত্বম শতাব্দীর শেষার্দ্ধকে
আমরা মাঘেব অভ্যুদয়কালের উক্ত-সীমা বলিয়া ধাৰ্য্য কবিতা লইতে পারি।

কবি-কালের পূর্বসীমা সম্বন্ধে এখন একটু আলোচনা কবা বাউক।
পূৰ্বেই বলা হইয়াছে যে, অধ্যাপক কিলহর্নের মতে, মাঘের অভ্যুদয়-কাল সপ্তম
শতাব্দীর শেষার্দ্ধেব [৬৫০-৭০০ খৃষ্টাব্দের] মধ্যে ধাৰ্য্য কবা যাইতে পাবে।
আমরা বলিব যে, তৃত্বম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মাঘের কাল নিরূপিত হইলে কোনও
কুতি নাই। মাঘেব পিতামহ সুপ্রভদেব যে বর্ম্মলাত-নৃপতিব মন্ত্রী ছিলেন, তিনি
সৌগতধর্ম্মাছুবাগী ছিলেন, এক্রপ অনুমান কবা কঠিন নহে। কবির অভ্যুদয়-
কালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাবও যে বহুপভাবে বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রমাণ
কবিত্ত তৎকর্ম্মের নানা ভঙ্গীতে উল্লেখ। বর্ম্মলাত স্বমন্ত্রী সুপ্রভদেবেব
হিতোপদেশ-কিরূপ অনুবাগেব সহিত প্রবণ করিতেন, তাহার বর্ণনায় মাঘ
বিস্মিতাছেন—

"কালে মিত্তি বাক্যমুদূৰ্দ্ধপাং তথাগতস্তেব মনঃ যুচেতাঃ।

বিনামুরোধাং স্বহিতৈচ্ছয়াং মহীপতির্ধৃত বচনকারঃ"—২০।৮১

"সুচেতা ব্যক্তি যেমন বিনা অনুবোধে, আত্মহিতকাম্যনার, বুদ্ধদেবেব যথাকালে
প্রযুক্ত, পরিণাম-হিতকব বাক্য মান্ত কবিতেন, সেইরূপ মহীপতি [বর্ম্মলাতও]
তাহার [সুপ্রভদেবেব] যথাকালে প্রযুক্ত পরিণাম-হিতকর উপদেশ-বাক্য
বিনা অনুবোধে, আত্মহিতৈচ্ছাং, মানিয়া চলিতেন।" অন্ততঃ [১৫।৫৮
শ্লোকে] মাঘ শিশুপাল-পক্ষান্তিত বাহ্যমণ্ডলকে "দ্বার-বলে"র সহিত তুলনা
কবিতা, "হরি"কে [কুম্ভকে] "বোধিসত্ত্ব"র সহিত তুলনা করিতা উপমা-
অলঙ্কারেব প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা,

"ইতি তত্ত্বদা বিকৃতগপমম্ভটত্ত্বভিত্তিচেষ্টম্।

মারগলমিব ভরতবতাং হরি-বোধিসত্ত্বমভি রাহ্মণ্ডলম্।"

"এই ভাবে, সেই সময়, সেই বাহ্যমণ্ডল মন-সৈন্তেব দ্বায় [ক্রোধে] বিকৃত
আকার ধারণ করিয়া, অবিকৃত-চিন্ত বোধিসত্ত্বকপী হরির সমীপে ভবতব রূপ
মার-কবিতেন।" হয় ত শাক্যসিংহেব ধর্ম্মে, অনুরক্ত পৃষ্ঠপোষক নবপতি
বর্ম্মলাতকে সন্তুষ্ট বোধিবার ভ্রমই কবি এইরূপ বর্ণনার অবতারণা করিতা
পাকিবেন। মাঘ নিজ মহাকাব্যে নৌদ্ধ বৈরাগবর্ণগণের প্রণীত গ্রন্থেবও
উল্লেখ কবিতাছেন। তবে সর্বশাস্ত্র-পাবীণ মহাকবি সৌগত-শাস্ত্রেও অধীত-

বিবেচনা, হইতে হইয়া হইতে তাহাও প্রাপ্ত করা যায় না। তাহা হইতে বোধ-রচিত কোনও কোনও ব্যাকরণ গ্রন্থ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহা হইতে কবি কাল-নিবন্ধে কোনও হায়তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাৰ আদোচনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে কোনও কোনও বৌদ্ধরূপ ব্যাকরণ গ্রন্থের নূতনতা কবির জীবনসময়েও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারিবে। শিশুপালবধের দ্বিতীয় সর্গের ১১২নং শ্লোকে কবি—রাজাব চার-প্রবেণ কার্য অতীব প্রয়োজনীয়—এই কথার বর্ণনায় শ্লেষ-অলঙ্কারের প্রয়োগ কবির ভগবান্ পিতৃঞ্জলির প্রণীত ব্যাকরণ-সংগ্রহের ও সেই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পম্পশ-নামক প্রথম অঙ্কিক, কাশিকা বৃত্তি ও কাশিকা-বিবরণ-পঞ্চিকা বা [বৃত্তি-ব্যাখ্যান গ্রন্থ] ছায়া-নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

“যদুৎসাহ-পদছায়া সমৃদ্ধিঃ সঙ্গবন্ধনা।

শব্দবিজ্ঞানো নো ভাতি রাজনীতিরপম্পশা ॥”

“শব্দবিজ্ঞানে হ্রস্ব-প্রযুক্ত-পদ ব্যতীত অল্প পদের ব্যবহার-বিহীন ছায়া গ্রন্থের, [কাশিকা]-বৃত্তির ও ভাষ্যগ্রন্থের সংপরিচয় থাকা সত্ত্বেও, যেমন সেই বিজ্ঞান-পম্পশ-নামক [ভাষ্য-সন্দর্ভের] জ্ঞান না থাকিলে [পাঠকের পক্ষে] শোভা হয় না, সেইরূপ রাজনীতিতে এক পদবিষেপও শাস্ত্র-বিকল্প না হইলে, এক [অমাত্যাদির] বৃত্তিব ও [অমুজীব্যগণের] পাবিতোষিকারি ব্যবহার থাকিলেও, তাহা চারগণের [স্পর্শের] অপ-ব্যবহার গোভন হয় না।”

টীকাকার মল্লিনাথ স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, এই শ্লোকে শব্দবিজ্ঞাপকে “ছায়া”-শব্দে বৃত্তিব্যাক্ষ্যান গ্রন্থনিশেষকে, “বৃত্তি”-শব্দে কাশিকা, হ্রস্ব-ব্যাখ্যান গ্রন্থনিশেষকে ও “নিবন্ধন”-শব্দে ভাষ্যগ্রন্থকে বুঝাইতেছে, এক “পম্পশ”-শব্দ শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থক উপোদ্ভাব-সন্দর্ভ গ্রন্থকে বিজ্ঞাপিত করিতেছে বলা বাহুল্য যে, পাণিনি ব্যাকরণের “কাশিকা-বৃত্তি” জ্ঞানদিত্য ও বামন নামক দুই জন বৌদ্ধ আচার্যের সহযোগে রচিত হইয়াছিল। এই কাশিক বৃত্তি ছায়া-গ্রন্থ নামক ব্যাখ্যা বোধিসত্ত-দেশীয় আচার্য জিনেন্দ্র-বুদ্ধির বাবটন জ্ঞানদিত্য সম্বন্ধে চীন-দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হই-সিংগ লিখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যু খৃষ্টীয় ৬৬১-৬৬২ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। জিনেন্দ্র-বুদ্ধি ছায়া-গ্রন্থ জ্ঞানদিত্য-প্রণীত বৃত্তিবই ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। তিনি জ্ঞানদিত্যের সম্বন্ধে কিছু কাল পূর্বেই বর্তমান ছিলেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দেখা হউক

এক উচ্চ ব্যাকবর্ণ প্রদত্ত অক্ষরগুলি বোঝাই থাকিবে। বোধ হয় বিশেষ পক্ষ বিশেষ প্রাচ্যের সমাদর করা হইয়াছিল। তদন্ত তিনি বাসিলাফাণের উল্লেখ করিয়াছেন। এসব ব্যতীত ই.স. পনের মাইনে ১২ ইটা হইতে ইয়াসম নামে করা যাইতে পারে যে, গোঁ-বাবা, যোগাযোগের হাসম [৬৬১-৬২ খৃঃ] হইতে পরিব্রাজকের ভাবনায় হইতে প্রত্যাবর্তনসময় প্যাতি [১০৫ খৃঃ], হয় ত হাস-কান ভিনে বর্ণিত হাসমের হয় নাট। এটি এসময় আমাদেশ আরও একটি বর্ণা মনে রাখা চাইবে যে, মৌর্যবংশের উপর যে যে প্রভাব বা যে যে বৃত্তান্তের কথাই এখন বর্ণিত হইতে, তাহার সংগ্রহের জন্যই নৌক [১০৫ খৃঃ], ইউরান তোমাত্ত প্রদত্ত বৈদিক পরিব্রাজকগণ চারিদিকে সমসংগত হইতেন। স্মরণ্য ঠিক-দিক বর্ণনা [৬৭১-১০৫ খৃঃ] মিনেন্দ্রবুদ্ধি বা তর্কিত হাসগ্রহের অন্তর্গত হইতে এসব বর্ণনা হইতে পাৰ্বে যে, হাসগ্রহ ঐষ্টম শতাব্দীর পৌনঃপুন্য সময়ে বর্ণিত হইয়া থাকিবে, এবং সপ্তম শতাব্দীর পূর্বাঙ্গের নবপনি বাসিলাফেব মন্তা প্রভৃতিদের পৌত্র হাস গ্রহের উল্লেখকারী মাদকবিত্তক [১০০-১২০ খৃঃ] নৌক বর্ণিত অন্যান্য বর্ণনা হইতে পারি। হয় তা, হখন মিনেন্দ্রবুদ্ধি-বিবর্তিত হাস-গ্রহও নৃত্য হইয়াই লোকসমাজে প্যাতি লায় করিবার থাকিবে। সুর্গেও প্রদর্শিত হইবে যে, মাথের অধ্যায়কাগের উত্তর-সীমা নবম-শতাব্দীর পূর্বেই দাখ্য হইতে হইবে।

এ স্থলে কাব্যে একটি প্রয়োজ্য বর্ণনা উল্লেখ করা গাইয়েছে। অগাধ কলমের মতে উপবি-উবিধিত শ্লোকটর মস্তিষ্ক-কৃত বাখ্যা সম্পূর্ণভাবে কবিতার অনিচ্ছুর হাঙ্গা বহিষ্কারের যে, সেই শ্লোকে কেবল 'সদা' শব্দের প্রয়োজন দেখা, তাহা উল্লেখ গ্রন্থবিশেষের নান বাক্য দ্বারা হয় না। তাহার মতে, 'পাশ্চিম-প্রসিদ্ধ কবীগণ' বিবরণম্'-এ বৃত্তি আদ্যাত হয়, এবং বাখ্যিক কাব্য জাদ্যিগ যেমন প্রাস্তাবিক শ্লোকে 'সদা' ও 'বৃত্তি'র উত্তে বহিষ্কারের ক্ষমতা মাও এই শ্লোকে তাহাট প্রমাণিত। "বৃত্তি" শব্দে মাও কাশিকা বহিষ্কার হয়, কুণি প্রভৃতি আচার্য-প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিতে, এবং কুণি [ব. ব. ব.], ভক্তি, নন্দ প্রভৃতির বৃত্তিকেও উল্লেখ পাশ্চিক শ্লোকে 'সদা'র। হবন্ত ও ছাসকাব দিনেহবন্তি এই বৃত্তি কাবের নামোত্তর কবিতা বাগ্ম্যর, বাখ্যিক-কাব্য প্রভৃতি উল্লেখের উল্লেখ সাধ্যা গাইয়েছেন। হবন্ত, নও গ্রন্থবিশেষের নান বাক্য কবিতা

ছেন বলিয়া অধ্যাপক কিলহর্ণ স্বীকার করেন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যার কোনও “পদের গ্রাস উৎস্রুত [স্বত্রবিশিষ্ট]” হইবে না—তাহা অতি প্রাচীন মহাভাষ্য গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে; যথা, ‘নো হি উৎস্রুতঃ কথং যেনাদো গৃহ্যেত’। তিনি আরও বলেন যে, “সূত্রেণৈব হি উৎস্রুতঃ যদবুত্তো যত্ বাৰ্ত্তিকে”—এই বাস্ক্য পৰবর্তী বৈয়াকরণদের কথা। এই বিষয়টির সম্বন্ধে-উজ্জ্বলেনব জ্ঞাত আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীবল্লভ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী শাস্ত্রি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি সংপ্রতি ববেস্ত্র-অমুসন্ধান-সমিতির ব্যয়ে জিনেন্দ্র-বুদ্ধি-কৃত গ্রাসগ্রন্থেব এক সংস্করণ করিয়া, অগতে সর্বপ্রথম সেই সমূল্য গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত কবিত্তেছেন। তিনিও বলিলেন যে, মাঘ এই শ্লোকে গ্রাস-গ্রন্থেবই উল্লেখ কবিত্তাছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, বাস্তবিকই এই “গ্রাস” “অনুৎস্রুতপদ” গ্রন্থ; অর্থাৎ, গ্রাসকার সূত্রাক্ষর অবলম্বন করিয়াই বাস্ক্য-বৃত্তিব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রতিপদে কাব্যায়ন-প্রণীত বাৰ্ত্তিকসূত্রের খণ্ডন করিত্তাছেন। অধ্যাপক কিলহর্ণ আরও একটি কথা লিখিত্তাছিলেন যে, গ্রাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি নবম-শতাব্দীর পৰবর্তী কালের লোক; কারণ, তাঁহাব মতে জিনেন্দ্রবুদ্ধি হবদন্তেব পদমঞ্জরী হইতেই যদৃচ্ছাক্রমে নিজগ্রন্থেব উপাদান সংগ্রহ কবিত্তাছেন, এবং পদমঞ্জরী-কার একাধিকবাব মাঘের নাগোলেখপূর্বক যাবগ্রন্থ হইতে উদ্যোগ প্রয়োগ কবিত্তাছেন; অর্থাৎ, কিলহর্ণের মতে, কালসম্বন্ধে মাঘ, হবদন্ত ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির ক্রম পব পব ধরিত্তে হইবে। কাবেই তাঁহাব মতে, গ্রাসকার মাঘের অনেক পৰবর্তী। কিন্তু আমার অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং পদমঞ্জরী-গ্রন্থ হইতে আমাকে দেখাইয়া দিত্তাছেন যে, তদগ্রন্থকার হবদন্ত বহুবলে “গ্রাসকারক” বলিয়া গ্রাস গ্রন্থ হইতে বাস্ক্য উদ্ধৃত কবিত্তাছেন, এবং অন্তান্ত স্থানেও “কেচেতু” —“অন্তে চ” ইত্যাদি নির্দেশপূর্বক গ্রাসকারের মতেব সমালোচনা করিত্তাছেন। অতএব, গ্রাসকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি যে পদমঞ্জরী-কার হবদন্তেব পূর্ববর্তী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং তিনি যে মাঘেবও পূর্ববর্তী নহেন, তাহাও বলা কঠিন। সে যাহা হউক, পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতেও গ্রাস-গ্রন্থ অষ্টম শতাব্দীতে রচিত্ত হইবাত্তিল। স্তত্রং পূর্ব-প্রদর্শন-ক্রমে আমরা মহাকবি মাঘেব কাল অষ্টম শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে ধার্য কৰিত্ত পারি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণবিন্দ বসাক।

ত্যাগকেশ্বর ।

(৩২২)

ত্যাগক অথবা ত্যাগকেশ্বর নাদিক হইতে প্রায় দশ ক্রোশ । ১৯১৪, ২৭শে
 ফাল্গুন, মঙ্গলবার প্রত্যুষে টপালে অর্থাৎ ডাক-টানায় আরোহণ করিয়া
 ত্যাগক তীর্থাভিমুখে যাত্রা কবিরাম । প্রথমে কতকগুলি সাহেবদিগের বাসলো
 গায়েবিরাম । তাব পর দুই মাইল ধরিয়া পথের দু'ধারে বড় বড় আশ্রয়দার
 গায়ে সুন্দর বিতান-পথের সৃষ্টি করিয়া পথটিকে ছায়ায় করিয়া রাখিয়াছে ।
 প্রায় তখন—কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে ; দুই দিকেই প্রায় উন্মুক্ত ভূতল
 প্রান্তর প্রান্তর ধু-ধু কবিতেছে । উত্তরের শ্রামশোভাশূন্য কালো কালো পাহাড়
 দেখা বাইতে লাগিল । গুনলাস, বর্ষায় এই শৈলমালা ভূগপত্রোদগমে শ্রামাভি
 হইয়া অপূর্ণ-শ্রী ধারণ কবে । টপাল-চালক থাকিয়া থাকিয়া ঝিমাইতেছে ।
 আমি তাহাকে সিজ্ঞাসা কবিরাম, 'ভোম্‌ ঝিম্‌তা কাহে ?' সে মুসলমান, উত্তর
 দিল, —'বাবু সাহেব, কাল রাত্রে নাটক দেখনে গেয়েয়ে, নিদ্‌ নেই হয় ।'
 আসিকে একটি নাট্যশালা আছে । সেখানে এই টাঙ্গা-চালক সমস্ত রাত ধরিয়া
 নাটক দেখিয়াছে । তাই চলিতেছে । আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে রাত
 জাগিয়া থিয়েটার দেখাব বাই চুকিয়াছে, কিন্তু এ দেশের দরিদ্র টাঙ্গা-চালকও
 থিয়েটার দেখিতে ছাড়ে না ! যাহা হউক, প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম
 কবিরাম এক স্থানে সে অশ্ব দুইটি বদলাইয়া লইল ।

বেলা প্রায় দশটার সময় ত্যাগকেশ্বর নিকটবর্তী হইলাম । প্রকৃতিদেবী
 একটি সুবন্দ্য স্বভাব-স্বর্গের তোষণ উদ্ঘাটন করিয়া পথিকের অভ্যর্থনা
 করিলেন । কি অপূর্ণ শোভা ! কি সুন্দর দৃশ্যাবলী ! বড় বড় হ্রদের স্থায়
 অগ্নিপূর্ণ সরোবরসমূহ দৃষ্ট হইতে লাগিল । সুন্দর প্রস্তররচিত ঘাট, চাদনী
 প্রভৃতি সবসীর শোভা সম্পাদন কবিতেছে । অদূরে গগনস্পর্শী প্রাচীরের
 প্রায় প্রায়গি গগন-চূষন কবিরাম আদিত্যরথের গতিবোধ করিতেছে । যেন
 বিশ্বকর্মা রচিত কৃষ্ণপ্রস্তরের বহুদূরব্যাপী দেড় হাজার ফিট উচ্চ সুদীর্ঘ প্রাচীর
 ভগ্নাঙ্গ ত্যাগকেশ্বর চিত্রপ্রতিম বম্বাকুঞ্জ প্রদর্শন করিতেছে । সেই পর্বতপ্রাচীর
 দেখিতে বিচित्र—সুন্দর—অদ্ভুত । না দেখিলে উহা আকৃতি লিখিয়া বুঝান
 যায় না । ত্যাগকেশ্বরের কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত অপূর্ণ-সুন্দর তুঙ্গ মন্দির নেত্রপথে
 উপনীত হইলে আমি একটি

কুমারগণিবে বাসা লইলাম। দীর্ঘাকৃতি পাণ্ডাপ্রবর গঙ্গাবাস-গণেশ বাস ঘাট
দেওবুট মন্দিরকে সন্ধান করিয়া আনাইলাম। ইহাব নাম নাসিক হইতেই সং
করিয়া আনিয়াছিলাম।

পাণ্ডাট দেশ ভদ্র—ভাল লোক। পত্নী ও দুইটি শিশুসন্তান আছে।
ত্র্যম্বকেই একখানি পাথরের বাটা করিয়াছেন; সেইখানেই সুপরিবারে বাস
কবেন। আমাকে তাঁহার বাড়িতে থাকিতে অনুবোধ করিলেন, কি
কৃষ্ণভবনের দ্বিত্তে একটি ক্ষুদ্র কুঠারী পাইয়া আমি সেইখানেই অবস্থান
করিলাম।

সহবেব মধ্য দিয়া গোদাবরী নদীর নানা গিয়াছে। ইহাব এই দিকে
অবতরণের জন্য সোপান আছে। শীতকাল; নানার জল শুকাইয়া গিয়াছে।
বর্ষার জলপূর্ণ হয়। কিন্তু একটি ব্রাহ্মণ বলিল, গোদাবরী এখানে শুষ্ক
হইয়াছেন। সহবের উত্তর-পশ্চিমাংশে কুশাবর্ত কুণ্ড। জল গাঢ় সবুজ বর্ণ
কুণ্ডটি চতুর্দশ; দ্বানের জন্ত চারি দিকে সোপানাবলী; এবং উপরে চারি দিকে
প্রভুনির্মিত স্তম্ভশ্রেণী-শোভিত অগ্নিশ্রেণী। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে
অগ্নিদেব নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্তি একটির পর একটি করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে
সাজান আছে। আমি কুশাবর্ত কুণ্ডের হরিদ্বর্ণ জলে স্নান করিয়া পিতৃকর্তৃ
সম্পন্ন করিলাম।

কুশাবর্ত কুণ্ডের অগ্নিদেব দেব দেবীর মধ্যে শেষশায়ী বিষ্ণু, পার্শ্ব
নহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, গণেশ, অহল্যাগোতন প্রভৃতির মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য।
কুশাবর্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রচলিত।—

“গঙ্গাধারে, কুশাবর্তে, বিষ্ণু, নীলপর্জতে,
স্নাতো কণপলে তীর্থে পুনর্মমো ন বিত্ততে।”

আমি উপর্যুক্ত বিব্রক ব্যতীত সকল তাঁর্থেই স্নান করিয়াছি; আশীংগত পুনর্মমো
হইবাব কথা নহে; তবে একটির জন্য যদি ক্ষম্ভায় ত নাচার।

অগ্নিবাস চারিটাব সময় গঙ্গাধার দেখিতে যাত্রা করিলাম। একটি মহাবাস
বালক আনাব পথ-প্রদর্শক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সহবের পশ্চিমপ্রান্ত
অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিদূর বাইতে না বাইতে একটি কৃষ্ণগণিবে উপনীত
হইলাম। গুপ্তমর্থনির্মিত এমন সুন্দর দীর্ঘ ত্রীকৃষ্ণ রাধিকার মূর্তি গোপাল
দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। কিয়ৎকাল পূর্নকিতচিত্তে দর্শন করিলাম।
তৎপরে নাটমন্দির (ইহা মন্দিরনংলয় একটি বড় চতুর্দশ গৃহ) দেয়ালের
পায়ে নানা মনোমুগ্ধকর চিত্রাবলী নানা রঙ্গে চিত্রিত দেখিলাম। চিত্রদর্শন

বৃন্দাকার; অতীব নয়ন-রঞ্জন। বর্ষসমস্ত নয়নধানি চিত্র আছে। প্রথম-
 ষানিতে শ্রীকৃষ্ণ একটি রমণীর কয়কমল ধৃত করিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন !
 দ্বিতীয়ে, একটি রমণী দুইটি শিশুকে আদর করিতেছেন; তৃতীয়ে, তিনটি রূপসী
 শিশুনা কুসুম-কিশলয়-পবিবেষ্টিত কুঞ্জবনে বসিয়া আছেন; চতুর্থে, অম্বাবোহী
 শিবালী দুইটি অম্লচর সহ একটি গিরিজুর্গের নিকট দিয়া যাইতেছেন; পঞ্চমে,
 ত্রয়ঙ্গটা হইতে গঙ্গা উৎসিয়া অবতরণ করিতেছেন—সম্মুখে পার্বতী বসিয়া
 আছেন; ষষ্ঠে, স্নানভা, কৃষ্ণ ও বলরাম; সপ্তমে, ত্রিমুণ্ড দস্তাদ্রোহী; অষ্টমে,
 শ্রীকৃষ্ণ কংসবিনাশ করিতেছেন; নবমে, শ্রীকৃষ্ণ দুইটি গোপবালার কলসী
 ভাসিতেছেন। চিত্রগুলি কতদিন হইল চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তেমনই
 নূতন বহিয়াছে।

কৃষ্ণমন্দিরের পশ্চাদ্ভাগেই গণেশের মন্দির। গম্ভীর-দর্শন মন্দিরের মধ্যে
 নিবিড় অন্ধকারে গণপতি বিরাজিত। গণেশ-মন্দিরের নিকটে গঙ্গাতলাও
 নামক হ্রদবৎ স্রবহৎ পুষ্করিণী—চারি দিক পাথর দিয়া বাধান। মধ্যে মধ্যে স্নান
 করিবার ও জল লইবার ক্ষুদ্র ঘাট আছে। গঙ্গাতলাও হইতে কিছু দূর যাইতে
 যাইতে ব্রহ্মগিরি আরোহণ করিবার পর্বতগাত্রবাহী সোপানাবলী দৃষ্ট হইল।
 সোপানসম্মিলিত উপনীত হইয়া পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম।
 সোপান এমনই স্তম্ভরূপে নির্মিত যে, অধিরোহণকালে কোনরূপ ক্লেশ বা
 অসুবিধা হয় না। তাহাতে আবার অপরাহ্নের হিমশীতল সমীর লগাট স্পর্শ
 করিয়া বহিতেছে। মধ্যে মধ্যে বনফুলের নৌরভ, বনবিহগের গীতি। নিম্নে
 ব্রহ্মসহব। মন্দির, সরোবর, কানন ও কুঞ্জভূমির চিত্রপ্রতিম দৃষ্টাবলী। সমস্ত
 একত্রীভূত হইয়া ফলসে কি এক অব্যক্ত স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চারণ করিতে
 লাগিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। উঠিতে উঠিতে সোপানপার্শ্বে
 এক একটি ছোট ছোট দেবমন্দিরের পুঞ্জক পর্বতারোহীদিগের নিকট হইতে
 পানীয় চাহিতে লাগিল। ভিক্ষুরাও দিড়ি ভাজিয়া, পাহাড়ে উঠিয়া, সোপান-
 পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। তীর্থস্থানে ত ভিক্ষুক আছেই, কিন্তু পাহাড়ে
 উঠিয়াও তাহাদের হস্ত হইতে পরিভ্রাণলাভের উপায় নাই। আমার বোধ
 হইল, ধর্মার্থী সাংসারিকগণের চিন্তাপরীক্ষার নিমিত্তই ভগবান ত্র্যম্বক আতুর,
 অন্ধ, মূক, অন্ধ, খঞ্জ, পশুদিগকে পাহাড়ে উঠাইয়া দিয়াছেন। অর্দ্ধ
 পর্বতগাত্রে গিয়া সোপান শেষ হইয়াছে। ৭৫০টি সোপান অতিক্রম করিয়া
 সোপানারে উপনীত হইলাম। ইহাই পুণ্য গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মগিবি খাড়া সোজাশ্রদ্ধি ভাবে প্রায় দেড় হাজার ফিট উচ্চে আকাশে উঠিয়াছে। অর্দ্ধ পর্বতগাত্রে গিয়া সোপান শেষ হইল; আর সেইখানেই গঙ্গাদ্বার। সেখান হইতে আব উপরে উঠিবার উপায় নাই; যতটা অংশ একটু ঢালু ছিল, ততটাতেই সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে; তাব পৰ একেবারে খাড়া সমুচ্চ পর্বত-প্রাচীর। আরোহণ ত দূরেব কথা, দেখিয়াই আত্মপ্রাণ যতটুকু হইয়া যায়। আর যেখানে সোপান শেষ হইল, সেখানেও এমন বিস্তৃত সমভূমি নাই যে, একটু সচ্ছন্দে বিচরণ করা যায়। অতি সঙ্কীর্ণ একটা পাদপথ আড়াআড়ি ভাবে রচিত। কেবল তাহারই সাহায্যে পর্বত-অঙ্গ কোদিত গুহামধ্যে স্থানে স্থানে যে কয়টি দেবদেবী আছেন, তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে হয়। নিম্ন দিকে চাহিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে; যদি কোনও প্রকারে পাদপথ হইতে পদস্থলন হয় ত চির-তরে নিশ্চিত।

গঙ্গাদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, পর্বতের এক ফাটালের নিকট একটি বেদীর উপর গঙ্গাদেবীর মূর্তি বিরাজিত। বেদিকার গাত্রে একটি বৃষভেব মূণ্ড সংলগ্ন। বৃষভ ধাতুনির্মিত; অতি সূক্ষ্ম জিহ্বা বিলম্বিত করিয়া মুখবাদান করিয়া রহিয়াছে। সেই সূক্ষ্ম জিহ্বা বাহিয়া কোঁটা কোঁটা জল নিঃসৃত একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ কুণ্ডে পতিত হইতেছে। ইহাই সেই বিশাল গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থল,—যে মহানদী তরঙ্গারিত বিস্তৃত জলপ্রবাহে বহু পর্বত, কানন, কান্তার ভেদ করিয়া বঙ্গোপসাগরের শ্রায় ভাবতভূমির পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সহস্রাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া সিদ্ধ সহ মিলিত হইয়াছে।

গঙ্গাদ্বারের পার্শ্বে শৈলকন্দরে দুইটি চৌবাচ্চার শ্রায় কুণ্ড জলপূর্ণ রহিয়াছে। শৈলারোহণে ক্লান্ত তৃষিত পথিক ও যাত্রীরা এই জলে তৃষ্ণা দূর করেন। এতস্তিন্ন গঙ্গাদ্বারে একটি পার্বতী-মূর্তি বিরাজিত।

পার্বতীৰ মূর্তি হইতে একটু দূরে পর্বতগাত্রে একটি বড় কুলঙ্গী কাটিয়া এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। শুনিলাম, গৌতম মুনি এখানে তপশ্শা কবিভেন। তৎপন্নী অহল্যার প্রতিমূর্তি সেইখানে সংস্থাপিত। ইহাব কিছু দূরে শৈলাদে দুইটি মহাদেব অবস্থিত। তাহার নিকটে একটি গুহায় গোরক্ষনাথের মূর্তি। ভিতরে আরও একটি গুহার মধ্যে মহাদেব আছেন। সেই গুহাব মধ্যে দুল-কলেবর নরনারীর পক্ষে প্রবিষ্ট হওয়া কঠকর ব্যাপার।

উপর্যুক্ত দেবদেবীর মূর্তি, যাহা বর্ণিত হইয়াছে সমস্তই নিকট

স্ববস্থিত। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, তাব পর পর্বত সোজাসুজি উর্ধ্বে উঠিয়া পশ্চিম দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! গঙ্গাদ্বাব হইতে আবও আড়াই ক্রোশ উর্ধ্বে জটাভটকা। এখানে একটি বৃহৎ পাষণথণ্ডে মহাদেবের জটাব ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক বনেন, সেই স্থানই গোদাবরী নদীর মূল উৎপত্তিস্থল। জটাভটকা হইতে গোদাবরীধারা নিঃসৃত হইয়া, আবার গুপ্তা হইয়া, গঙ্গাদ্বাবে প্রকট হইয়াছেন। সেখান হইতে আবার গুপ্তা হইয়া কুশাবর্তে শেষশায়ী বিষ্ণুর চরণতলে প্রকট, এবং তথা হইতে আবার গুপ্তা হইয়া ভগবান ত্র্যম্বকেশ্বরের দেবদেবে আবির্ভূতা হইয়াছেন। এইরূপে ক্রমাগত প্রকট ও গুপ্ত হইতে হইতে পবিশেষে বরূপ প্রকাশ করিয়া নাসিকেব মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া প্রপবা স্বচ্ছযোরা নদীর মুর্ত্তি ধাবণ করিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী, বুধবার ১৯১৪।—ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব ত্র্যম্বক ভাবতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অত্যন্তম। এই তীর্থই তাঁহার অধিষ্ঠান-ভূমি। এই সুরম্য-প্রকৃতি-কুঞ্জ তাঁহারই উপবৃত্ত বাসভূমি। মহাদেবের মন্দিরও তেমনই মনোহর। ইংরেজী ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ ১৮৬ বৎসব হইল, বাঙ্গালীরাও পেশওষে, ত্রিশ বৎসব সময়ে, একত্রিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই কক্ষপ্রস্তব-নির্মিত অনিন্দ্য-সুন্দর উত্তম মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির ও প্রাঙ্গণ ব্যতী হইয়া অধিকার কবিয়া বহিয়াছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীর। তিনটি প্রবেশদ্বার। সিংহদ্বার উত্তরমুখী। দক্ষিণমুখ হইয়া প্রবেশ কবিতে হয়। দ্বারের কামদ্বার্ষে দেবাদিদেবের রথ রক্ষিত। ব্রহ্মরূপী দারভি চালাইয়া থাকেন।

আমি সিংহদ্বার অতিক্রম কবিয়া প্রস্তর-মণ্ডিত বিশাল প্রাঙ্গণে উপনীত হইলাম। মন্দির দেখিয়া, চক্ষু জুড়াইয়া গেল। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা কক্ষ-প্রস্তবে নির্মিত। মন্দিরের কারকাধ্য অতি নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথমে জগনোহন প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, গৃহতলেব মধ্যস্থলে শ্বেত-প্রস্তর-রচিত কুম্ভাবয়বসংলিিত কুম্ভাসন। তৎপরে ত্র্যম্বক-মন্দিরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেবদর্শন কবিলাম। ত্র্যম্বকেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি নহেন। গোবীপট্টের মধ্যস্থলে বৃত্তাকার দিবর। বিবরের অভ্যন্তরে তিন দিকে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত তিনটি প্রস্তব আছে। তলদেশ হইতে জল নিঃসারিত হইয়া বিবরটি সতত জলপূর্ণ বাধিতেছে। আমি দ্বারদেশ হইতে মহাদেবকে বিধদল গুপ্ত প্রভৃতিব দ্বারা পূজা করিলাম। কি কায়স্থ, কি ব্রাহ্মণ, মন্দিরের ভিতরে কাহারও প্রবেশ-

ধিকার নাই। কেবল পূজক ব্রাহ্মণেবাই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যার সময় ভগবান দ্রাব্যক্ষেত্রের পুষ্পশয্যা দেখিয়াছি। গৌরীপট্ট নানা গোলানী পুষ্প ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে। পুষ্পসমূহের বিজ্ঞাস-নৈপুণ্য ঢেকে দেখিবাব, লিপিরা বুঝাইবাব নহে। মধ্যস্থলে দ্রাব্যক্ষেত্রের বৌদ্যানির্মিত সর্গ-ছাটা-তিলক-ভূষিত মন্তক বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পূণ্য ছবিতে দেখা শিবমন্তক অঙ্কিত আছে, এই মন্তক দেখিতে ঠিক তদ্রূপ। মন্দিরমধ্যে স্বত-কপূর্ববাসিত উজ্জ্বল দীপাবলী জলিতেছে। ধূপগন্ধে চতুর্দিক আনন্দিত হইতেছে। প্রকৃতই সেই হেমন্ত-সন্ধ্যায় এই দ্ব্যতীর্থের দেবায়তনের দাব-প্রান্তে বসিয়া আমার মনে হইল, আমি যেন স্বপ্নোক্তের কোনও দেবমন্দিরে উপনীত হইয়াছি।

উক্ত বৌদ্যানির্মিত মন্তক ব্যতীত ভগবান্ দ্রাব্যক্ষেত্রের স্বর্ণনির্মিত ত্রি বদন-সংবলিত সূদীর্ঘ টোপবভূষিত মন্তক আছে। প্রতি সোমবারে কুশাবর্ত কুণ্ডে মন-সমারোহে দ্রাব্যক-মন্তক স্নাত হইয়া থাকেন, এবং সোমবার সন্ধ্যার সময়ে নানা পুষ্প ও মাণ্যচন্দনে সেই স্বর্ণনির্মিত মন্তকের শিখার বেশ হইয়া থাকে। সে দৃশ্য অপূর্ণ-দর্শন। আমি সোমবারে সেখানে না থাকার, আমার ভাগ্যে সে দৃশ্য দেখা ঘটে নাই। আর কি এমন দিন আসিবে, যখন আমার দ্রাব্যক্ষেত্র উপনীত হইয়া দ্রাব্যক্ষেত্রকে দর্শন করিব?

মন্দিরের দক্ষিণ দিকে গায়ত্রীদেবীর মন্দির আছে। দ্রাব্যক্ষেত্র অবসর-কালে দ্রাব্যক মন্দিরে সন্ধ্যা-বাগনের স্মৃতি আমার জীবন-কালে কখনই ভাঙিত হইবে না। দ্রাব্যক্ষেত্র রূপায় যেন এ জীবনে আর একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। দ্রাব্যক-তীর্থে আরও অনেক শিব আছেন; তন্মধ্যে ত্রিভুবনেশ্বর, ত্রিসঙ্ক্বেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, গৌতমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর প্রসিদ্ধ।

২৯শে জ্যৈষ্ঠারী, ১৯১৪।—অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সহরের উত্তর দিকে নীলপর্বতে যাত্রা করিলাম। নীলায়ুধি দেবী এই পর্বতচূড়ে বিরাজ করিতেছেন। পর্বতে উঠিবাব আড়াই শত পাষেবী অর্থাৎ সিঁড়ি আছে। বাপ গুলি একটু উঁচু উঁচু। প্রভাত-বায়ুতে মস্তক শীতল করিতে কবিতে পড়ছি, উঠিতে লাগিলাম। সহসা ব্রহ্মগিবির পশ্চাদ্ভাগ রক্তাভায় উদ্ভাসিত হইল, অনিমেঘনে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপর্বতের পশ্চাদ্ভাগ হইতে রক্তবর্ণ ভাস্কর উদ্ভূত হইয়া ভুবন আশোকময় করিলেন। সূর্য্যোদয়ের একরূপ অপূর্ণ দৃশ্য আমি ভারতবর্ষের কোথাও দেখি নাই। আমি পঞ্চদর্শক বাগকের সহিত

পাহাড়ের শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া দেবীমণ্ডপে উপনীত হইলাম । ইহা একটি বাবানা-সম্বিত, করোগেটের ছাদযুক্ত চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠমাত্র । নীলাশুকি দেবী রক্তবর্ণা—ভীষণদর্শনা ! প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল । লোলজিহ্ব নহেন ; বিচित्र মূর্তি । প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে চারিখানি চিত্র অঙ্কিত । সেইগুলি এইরূপ ;—
 (১) বীণাবাদিনী সরস্বতী, (২) অষ্টভুজা দুর্গা মহিষাসুর বধ করিতেছেন,
 (৩) দশভুজা পঞ্চমুখী দেবী, (৪) চতুর্ভুজা কমলা প্রফুল্লনলিনীবহুল সরোবরে কমলোপরি দুই ভুজের দ্বীপাকমল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা ।

দেবীমণ্ডপের নিকটে দত্তাত্রেয়ীর মন্দিরগঠিত ত্রিমূর্তি । আব একটি বেদিকার চব্বচিহ্নের উপর ফণী ধরা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । মণ্ডপসম্মুখে উড়ু স্বর বৃক্ষে গুচ্ছে গুচ্ছে উড়ু স্বর ফলিয়াছে । এই পর্বতেব উপর হইতে চারি দিকের পাহাড়ের শোভা অতীব মনোহর । কিম্বৎকাল বিশ্রামের পর আমবা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম ।

ত্র্যম্বকতীর্থে অনেক মিষ্টানের দোকান আছে । বরফী, মিঠাই, পেঁড়া, মন্দেশ প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন পাওয়া যায় । নিমকী কচুরীরও অভাব নাই । আমি সহরের ইতস্ততঃ ভ্রমণ কবিত্তে লাগিলাম ।

ইহা প্রকৃতই শোভাভীর্থ ! সহরের তিন দিক বৃহৎ বৃহৎ সরোবরে পরিবেষ্টিত । চারি দিক প্রস্তরচিত্ত সোপান-সম্বিত । পশ্চিমভাগে এই সকল বিশাল হ্রদপ্রতিম সরোবর বা তলাও-তে পাণ্ডাদিগের একতল, দ্বিতল পাথরের বাটীগুলি ছবির স্থায় দেখাইতেছে । চারি দিকেই পাহাড় । এ সকল পাহাড়ে উদ্ভিদ ও বন্যেব শোভা শ্রামল, নয়নাভিবাস ! কোনও কোনও সর্বোবরের জল গাঢ় সবুজবর্ণ—স্বর্ধ্যাকিবর্ণে যিক্মিক করিতেছে । তাহাব উপর কালো পাহাড়ের প্রতিবিম্ব অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি কবিয়াছে । সর্বোবরগুলির মধ্যে, অমৃততীর্থ, কুশাবর্ত, গৌতমতলাও, ইন্দ্রতলাও, গঙ্গাতলাও, অজিতলাও, মুকুন্দতলাও, বিশ্বনাথতলাও ও প্রয়াগ-তলাও প্রসিদ্ধ । গঙ্গাতলাওয়ে নিবৃত্তিনাথের সমাধি আছে ।

ত্র্যম্বকে কৃষ্ণমন্দিরে অবস্থান এবং পাণ্ডামহাশয়েরই বাটীতেই আহার হইত । তাহাব বাটী একটা বাপীতটে বিরাজিত । তাহাব পত্নী আশার তদ্বাবধান করিতেন । কতক হিন্দী ও কতক মারাঠী ভাষায় কথা কহিতেন । আহার নাসিকের অল্পরূপ ; কোনও প্রভেদ নাই । অপরাহ্নে পাণ্ডামহাশয়কে তিনটা টাকা দিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলাম । তিনি উছাতেই পরিতুষ্ট হইলেন ।

গঙ্গাবান-গণেশবান এত ভাল লোক যে, তুলানবা সে দেশীর পা ধোয়াত লদা
অলষ্টার পরিয়া, আমার বিছানা মাথায় করিলেন। আমি নিষেধ কয়্যতে বগলে
লইয়া টাকায় তুলিয়া দিলেন। আমি রাজি ৮ ঘটিকায় নাসিকে পহঁছিলাম।
পব দিন ৩০শে আশ্বয়ারী, নাসিক হইতে বিদায় লইলাম। পাণ্ডা বালকৃষ্ণ
মুহাদেওকে ৬ টাকা দিলাম। ছুটি বধু আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদিগকেও
১১ দিলাম। তাহাবা অনেক যত্ন করিয়াছিল। বালকৃষ্ণ টাকায় চড়িয়া আমাকে
নাসিক বেলওয়াে ষ্টেশনে পহঁছাইয়া দিল। আমি বেলা তিনটার ট্রেনে
বোম্বাই অভিমুখে বাঁচা করিলাম। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম।

আলোচনা।

বঙ্গালীর আত্মঘাত।

পত আশ্বিন সংখ্যার 'প্রবাসী'র 'বিবিধ এসঙ্গে'র অন্ততম প্রদত্ত—বঙ্গে আত্মহত্যা।
এ সংক্ষেপে পূর্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্ট দেখিয়া ১৩২৫
সালের পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী' বঙ্গে ও অন্তান্ত প্রদেশে নারীজীবন শীর্ণক বো প্রদত্ত উপাশ্রম
করিয়াছিলেন, আমরা ১৩২৩ সালের মাঘ সংখ্যার 'উপাসনা'য় তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম।
'ভারতী'র অন্ততম লেখক, শ্রীযুক্ত অমিতকুমার চক্রবর্তী মহাশয়েব সে আলোচনা মনোহর
হব নাই; কাজেই তিনি ১৩২৩ সালের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে তাহার প্রতিবান করিয়া
ছিলেন। তাহার পর ১৩২৪ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'উপাসনা'য় আমরা সেই প্রতিবাদের
মুখোব উত্তর দিয়াছি। এখন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট বাহিব হওয়ায় 'প্রবাসী' আবার সেই
পুরাতন কথাই আত্ম করিয়াছেন। সেই অন্ত আমাদিগকেও এ বিষয়ের পুনরাবলোচনা করিতে
হইতেছে। আবশ্যকবোধে নিয়ে আত্মহত্যার বিষয় নিতেছি।—

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের আত্মহত্যার সংখ্যা।

অধিবাসীর সংখ্যা

আত্মহত্যাকারী

পুরুষ

নারী

বঙ্গালী—৪৫৩২২৪৭

১০০০

২০০৭

আগ্রা-অযোধ্যা—৪৬৮২০৪৬৬

৫২৩

১৬২৬

বিহার-উড়িষ্যা—৩৪৪৮২৮৬

৫৭১

১১২১

আত্মহত্যাতী নারীর সংখ্যার গড়।

১৯১৬

বঙ্গালী—১০ জন।

আগ্রা-অযোধ্যা—৭২ জন।

বিহার-উড়িষ্যা—৬৩ জন।

বঙ্গালায় এতি এক হাজার পুস্তক নারীর সংখ্যা ১৩৫। কলিকাতা সহরে প্রতি এক হাজার পুস্তকে নারীর সংখ্যা ৪৭৫। কলিকাতার নারীর আয়ত্বতার হার পুস্তকের চারি গুণেরও অধিক। বঙ্গালায় অন্যান্য সহরের নারীর আয়ত্বতার হার পল্লীগামগুলির নারীর আয়ত্বতার হারের অপেক্ষা অধিক। সমগ্র বঙ্গালায় নারীর আয়ত্বতার হার পুস্তকের প্রায় দেড় গুণ।

২

বাঙ্গালী নারীর আয়ত্বতার কাণ্ডগুলির নির্দেশ করিতে শিখা আমরা বলিমাচলিলাম,—
 এখনকার অধিকাংশ উপন্যাসই বিলাতী ছাঁচে ঢালা—উৎকট বিলাতী গণ্ডে ভরপূব। সাধারণ নারীর মনস্তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব বুঝে না, দার্শনিক তত্ত্বও বুঝে না; তাহারা সাধারণ উপন্যাসের নারক-
 নাসিকার চলা ফেরা, হাব-ভাব, আবহ-কার্যই বুঝিবার চেষ্টা করে, তাহাই ফলে বাঙ্গালীর
 সাহিত্যের দুটিরে অসামান্য হ্রস্ট করে। * * * বাঙ্গালীর মেয়েরা উপন্যাস পড়ুক, যাহা পড়ি।
 পুস্তকপুত্র পাইব লাভ করিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থায়ীমকে তাহারা পূর্বের মতই লোভনীয় কবিত্তে
 পারে, সেইরূপ উপন্যাস তাহারা গড়ুক। ইহা পড়িয়াই অস্তিত্বদ্বার বাবু সিদ্ধান্ত করিয়া-
 ছিলেন, আমরা না কি নারীর হাতে কোনও উপন্যাসই বিবার গন্ধপাতী নহি। ‘চোখের বালি’র
 মত অস্বাভাবিক উপন্যাস সাধারণ অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত মেয়েদের হাতে দেওয়া বাইতে পারে
 কি না, তাহার তিনি বিচার করেন নাই, অথচ আত্ম পর্য্যন্ত বুঝিতে চাহেন, উপন্যাস
 পড়িলে নারীদের মানসিক অবনতি হয় না। ‘প্রবাসী’র প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়েরও
 মতকুমার বাবুর মতের মত। বিলাতের লোকের আদর্শের সহিত বাঙ্গালীর আদর্শের
 তুলনা না করিয়াও তিনি গত বৎসর বলিয়াছিলেন,—‘কেহ কেহ মনে করেন, বাঙালীর
 [বাঙ্গালীর] মেয়েরা উপন্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা
 যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পড়ে’ এত আশ্চর্য ও আশোচর্য পরেও আবার তিনি
 বলিতেছেন,—‘আমাদের দেশের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশ সকলে লেগপড়া-ভানা মেয়ে বুল
 বেশী, এবং তাহারা উপন্যাস পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারাও আমাদের দেশের
 মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে না’ অর্থাৎ ‘প্রবাসী’র সম্পাদক মহাশয়ে
 এখনও যত্ন—‘চোখের বালি’ ও ‘ঘরে-বাইরে’র মত কুচিৎসর কোনও উপন্যাস-
 পাঠ নারীর আত্মহত্যার কারণ নহে। এ খাবণী ভুল। বিলাতী মেয়েরা যে শ্রেণীর উপন্যাস
 পড়িয়া সহজেই হতম করিতে পারেন, বাঙ্গালী মেয়েরাও তাহাই পড়িবে, না’ পারিলেও
 পারিতে হইবে, এ আশা দুর্ভাগ্য। উভয় কালের সামাজিক ক্রটি ও আদর্শ একই প্রকারের
 নহে, যতঃ উভয় ঐতিহ্যে একই নাপকগীতে যাপিতে যাওয়াই ভুল। চীনের সাধারণ
 লোক যে পদমিষ্ট অহিফেন সেবন করিয়া অতি সহজে হতম করিতে পারেন, বাঙ্গালীর
 সাধারণ লোক নেট পদমিষ্ট বা বিছু কম অহিফেন সেবন করিলে কপালে চক্ষু উন্মিষ
 আশঙ্কা আছে কি না, সহজেই অসুমেঘ। এক দেশের সহিত অন্য দেশের তুলনা না করিয়া,
 যে কোনও একই দেশের অবস্থা দেখিলেও বিষয়ট পরিষ্কৃত হইতে পারে। দেশের ‘ভয়ঙ্কক’রা
 অর্থাৎ ধনীরা যে শৈত্য ও উচ্চতা সহ্য করিতে পারেন না, তথাবধিত ‘ছোটলোক’রা অর্থাৎ
 দরিদ্ররা তাহা অনায়াসেই সহ্য করে। আল কণা অভ্যাস। যে বাহাতে অভ্যস্ত নহে, তাহাকে

তাহাই করিতে বাধ্য করা, আর তাহার মৃত্যু কামনা করা একই কথা। বাঙ্গালী নারী সে দিন 'বিস্মাখন্দন' ও 'চোখের বাজি' ছদ্ম করিতে পাবিবে, যখন সে পাক্ষাত্য নারীজীবনে বার্ষিক অনুষ্ঠিতে 'যবে-বাইরে'র ব বিমলার ন্যায় 'আদর্শসতী' হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব বাঙ্গালীর মাটি ও বাঙ্গালাব মূল সাধারণ বাঙ্গালীকে তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ পথে চলিতে প্ররোচনা পদে বাধ্য দিবে। বিদ্রোহীদের কথা সত্যতঃ। তাহাদের গণিধাম ও ভীষণ। আনন্দ কথা এই,—গল্প হটক, উপন্যাস হটক, নাটক হটক, কাব্য হটক, যে গ্রন্থ অসংখ্য চরিত্রের প্রশংসা দেয়, তাহা নাবীনের ত কথাই নাই, যুবকদেরও হাতে দেওয়া উচিত নহে। যে শ্রেণীর গ্রন্থ পুস্তক বা নারীর মনে মানসিক বিকারের সৃষ্টি করে, বাহ্যিক তাহা পড়িতে উৎসাহ দেন, তাহার পুস্তক ও নারীর আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করেন। মানসিক বিকারই আত্মহত্যার মূল কারণ। মানসিক বিকারই জীবন দুর্ভাগ্য বলিয়া বোধ হয়, আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জন্মে।

কর্মজ্য ভাবের উপগ্রাসাদি মেয়েদের হাতে না দিলেই তাহাদের আত্মহত্যার সকল কারণ দূর হইবে, এমন কথা আমরা অবশ্যই বলি না। আত্মহত্যার আরও অনেক কারণ আছে। যে যে কারণে মানসিক বিকার জন্মে, তাহা দূর করিতে পাবিলে পুস্তক ও নারীর আত্মহত্যার পথ রুদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিদেবী মানুষের আত্মপ্রয়োজনে চালিত হয়েন না। প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রকমের দুঃখের প্রতীকার করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বড়ই উন্নত হউক, রোগ, শোক ও পরিভ্রাণের কারণেও লিঙ্গ মূল উৎপাতন করিতে পারে না। এই স্বর্গেই প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি আছে। এই যে সর্বজননিষিদ্ধ প্রবৃত্তি, ইহার মধ্যেও ভাল ও মন্দ দুটো দৃষ্টি আছে। পতিবিরোধে পতিপ্রাণা নারীর আত্মহত্যা, প্রাণাধিক প্রিয়সন্তানের যুগে প্রাণধারণ অন্ন দিতে না পারিয়া মাতাপিতার আত্মঘাত,—সমর্থনযোগ্য না হইলেও সহানুভূতি আকর্ষণ করে। কিন্তু মনের মত পতি জুটিল না, অতএব মরিতে হইবে; মাতাপিতা শত্রুশাস্ত্রাণ্ডী, বা স্বামী তিরস্কার করিল, অতএব মরিতে হইবে; হইল বা স্বামী দরিদ্র, প্রতিবেশিনী ধনিপত্নীর দ্বারা ঘামাকে আমার স্বামী গহনায় ঢাকিয়া দিল না, অতএব মরিতে হইবে;—ইহা অতীব নিষিদ্ধ, অতীব পবিত্র; ইহা অপরের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না। এ যুগের বঙ্গনারীসেই এই দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মহত্যা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে।

কিন্তু বেহার-উড়িষ্যা ও আগ্রা-অযোধ্যাবাসীদের তুলনায় বাঙ্গালীর নরনারীর আত্মহত্যার হার অধিক কেন? বাঙ্গালী ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে উন্নত হই প্রাদেশবাসীর অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন নহে। সামাজিক কঠোরতায় বাঙ্গালীর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ, বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর—সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও নবলোকেরই সমান অধিকার। তবে বাঙ্গালীর আত্মহত্যা হার অধিক হয় কেন? আমরা দেখিতেছি,—

(১) বাঙ্গালীদের পরম্পরের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার বড়ই অভাব। বিশেষতঃ—হিন্দু বাঙ্গালী

দেব মনে সহানুভূতি নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না। হিন্দু বাঙ্গালী আনন্দোৎসবের বাধ্য

কবিতা পারে, হিতোপদেশের শ্লোক আওড়াইতে পারে, কর্মবোধের কথা শুনিয়া বাঙ্গালীর মুখে মুখে ; কিন্তু প্রকৃত কর্মী কোথায় ? বাঙ্গালার রামকৃষ্ণ মিশন আছে, হিতসাধন-মণ্ডলী আছে, ব্রাহ্মসমাজ আছে, মোসলেম লীগ আছে, কংগ্রেস-কনফারেন্স আছে, সকলই আছে ; কিন্তু আসল মিনিস্টারি নাই—একপ্রাণতা নাই, একাগ্রতা নাই, সংঘম নাই। বাঙ্গালার ধর্মীদের দানের খাতা আছে, কিন্তু যে দানে নাম নাই, সংবাদপত্রে নাম উঠে না, ‘রাজ-রায়-বাহাদুর’ উপাধি ছুটে না, এমন দান কয় জন বাঙ্গালী করেন ? বেশের মধ্যে বাঁহা বা দাতাকর্ণ নামে খ্যাত, এমন অনেক ধর্মীর সংবাদ আমরা রাখি ; আমরা জানি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা অসম্মানে মুক্তহস্ত, দানের পাত্রাপাত্র বিচাষ করেন না। প্রকৃত দুঃখী গলা-খাতা কাঁইচা কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়, ফিরিয়া গিয়া আত্মহত্যা করে ; ও দিকে গহরজান টাকার তোড়া লইয়া গিয়া নতুন লোহাব সিন্দুক পূর্ণ করে। অর্থের অভাবে, স্থপারিসের অভাবে অনেক মেধাবী ছাত্র উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, কিন্তু অর্থসাহায্য না পাইলেও যাহার ক্ষতি নাই, এমন ছাত্রও অর্থসাহায্য পায়। হিন্দু বাঙ্গালী নীতির পথ ছাড়িয়া পরস্পরের সহায়ত্বিত হারাইয়াছে। ইহাতে সে কালের তুলনায় এ কালে হিন্দু বাঙ্গালীর দুঃখের মাত্রা বাড়িয়াছে। দুঃখাতিশয্যে আত্মহত্যার হাবও বাড়িয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, এই বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে যেটুকু শ্রীতির বন্ধন আছে, হিন্দুদের মধ্যে তাহাও নাই।

(২) বাঙ্গালার লোক আগ্রা-অযোধ্যা বা বিহার-উড়িষ্যার লোকের অপেক্ষা অধিকতর চরিত্রাগ্রস্ত নহে, কিন্তু বাঙ্গালীর আত্মঘাতের হার ঐ দুই প্রদেশের আত্মঘাতের হারের চেয়ে অধিক। কারণ, ঐ দুই প্রদেশের থাকেব হায বাঙ্গালীর লোকেরও অভাববোধ আছে, কিন্তু অভাবপূরণের চেষ্টা নাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীরা—অভাবপূরণের চেষ্টাকে অপমানের বিষয় মনে করে। তাঁতীর ছেলে দুই পাতা ইংরাজী পড়িলে আন তাহাকে পাষ কে ? তখন তাহার ধারণা—তাহার তাঁতীজ ঘুচিয়া গিয়াছে। সুতরাং পিতৃপিতামহের তাঁতগাড়াষ বসিতে তাহার লজ্জা হয়। হইবেই ত, সে যে এ যুগের এক জন ‘শিক্ষিত’ হইল। সুতরাং ‘দেশে গুণের আদর নাই’, এই ভাব সধল করিয়া সে অর্ধ-অনশনে দিন কাটাইতে প্রস্তুত। সুতরাং গ্রীপূত্রের ‘ধাই ধাই’ রব শুনিলে সে বিজ্ঞের মতই বলিবে, ‘আমি ত তার চুরী করিতে পারি না।’ অথচ আমরা দেখিতেছি, আগ্রা-অযোধ্যার, বা বেহার-উড়িষ্যার অশিক্ষিত ব্রাহ্মণরাও—আমরা যাহাকে হীনকর্ম বলি—তাঁহা করিতে পবাঘুর নহেন। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের আশ্রয় আগ্রা-অযোধ্যার ও বেহার-উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণরাও কোঁচাষ পত্তনে অভ্যস্ত হইলে, তাহাদের আত্মহত্যার হার, যে বাঙ্গালীর মতই বাড়িয়া উঠিত, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

(৩) বিলাসবাসন বাঙ্গালীর আত্মঘাতের পথ সম্ভারিত করিয়াছে। দেশের ধনীরা ইচ্ছাঃসম্মত পথভলে অল্প অর্থ ঢালিয়া দিউন, আর বোটারগাড়ীর হাওয়া বাঁচিয়াই বেড়ান, তাহাদের পক্ষে সকলই শোভা পায় ; কিন্তু দরিদ্র বাঙ্গালী সে পথে চলে কেন ? ‘কোনও বার্ষিক, অপরিপক্কবৃদ্ধ ধর্মীর সহবাসে দরিদ্র বাঙ্গালীর মনে বিলাসবাসনার উদ্ভবে যে নৈনাড়ের সঞ্চার হয়, তাহার প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়,—তাঁহার সংস্রব ভাগ্য কবিতা সংপথে

ধাক্কিরা কোন উপায়ে তাহাদের অভাবমোচন হইতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা করা ও সেইকণ কর্ষ করা। কোনও ধর্মী সর্বদা পয়েটন সাথিয়া দ্যাভেত্তারের জলে শান করেন বসিবেই তোমাকে ও আমাকে তাহাই করিতে হইবে? কোনও কোনও স্বার্থপর ধর্মীর অমুতরণে সাধারণ দরিদ্র বাঙ্গালী আত্মহুখে বিভোর হইয়াছে; পরিবারস্থ সকলের সুখস্বাস্থ্যের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে না। বাঙ্গালী শু দলে দলে আত্মঘাতী হইবই।

এই যে অভাব, অসংঘম, বিলাসিতা—ইহা কি শুধু বাঙ্গালী দেশেই আছে, আর কোনও দেশে নাই? আছে। কিন্তু ইহা বাঙ্গালীর ধাতুতে সহিতেছে না। যে দেশের হিন্দু মুসলমান নিজে অভুক্ত থাকিয়াও মুন্সের এদ সানরে অভিবির মুখে তুনিয়া নিতে এত কাণ ধুপিত হয় নাই, আজ তাহাদের সে ভাবের একান্তই অভাব। ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালী তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধা নোষণা করিয়াছে। পরিবার ও সমাজের সর্ববিধ কল্যাণের মুখে যে দেশে ধর্মমূলক শিক্ষা এত কাল আদৃত হইয়াছে, আজ জড়বাদী পশ্চিমের নানোয় তেঁরাগলে সে শিক্ষার আদর্শ পরিবর্তিত হইতেছে। বাঙ্গালী বাহিলে সামোয় অন্ন খোষণা করিতেছে ঘরে কিরিয়া সামোয় কুসল দেখিয়া আত্মঘাতী হইতেছে। পুণ্য নুতন ভাবে নারীর মান বাড়াইতে গিয়া নারীর অপমান করিতেছে। পুণ্যের কাছে ব্যক্তিগতভাববুদ্ধির সঙ্গে দাঁকি হইয়া নারী যখন প্রকৃতির মার্গে নানিয়া পড়িতেছে, তখন অমুতাপে অমুশোচনার পুরুষও আত্মঘাতী হইতেছে। এ দুগে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বাঙ্গালীর দুর্দৃষ্টিসম্পন্ন নেতার অভাব হইয়াছে। যে কোনও উপায়ে একটা দল গঠন করিতে পারিলেই তিনি নেতা হইলেন। পূর্বে এরূপ হইত না। সে দিন যখন হেহলভার স্বদেশে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া পুড়িয়া বরিস, তখন দেখিলাম, দেশের নেতার 'হা হ'হ'হ'হ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বিবিধ সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকাতে হেহলভার কটী উঠিল। পণপ্রচার ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া কত নুতন গল্পের হাট হইল; কত পুস্তক পত্র পুনর্মুদ্রিত হইল; কত নুতন কবিতা রচিত হইল। অনেক বাঙ্গালী সম্পাদক গোলাক হুবে ত্রিমাণ হইলেন। ব্রাহ্মণরা ভানাতুলনী ও ব্রহ্মচাল স্পর্শ করিয়া 'অকাত' প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর বরপণ লই ত আমরা চণাল। আর হেহলভার পিতার গলা যে তখন কঁড়, তাহা গণ্ডো-প্রকাশ করা যায় না। আত্মঘাতিনী হেহলভার এই 'সম্ভাব্য কিত্তিমা' দেখিয়া অনেক নতেনলপড়া হেহলভার হরিবার জন্ত ব্যগ্র হইল। এই ফাসান-চোস্ত' আত্মঘাতের মেঘ এবংও মিটে নাই। সত্য কথাই ত—মরিয়া যখন এত বাহাদুরী, বাঁচিয়া তখন কি লাভ? তাহা কি হইল? তাহার পর সেই হেহলভার পিতা দেশের নেতাদের গালে চুপকালি দিয়া পুড়ে বিবাহে ঘোটা রকনের বরপণ লইলেন। অচ্ছের কথা আর বলিয়া' কাম নাই। কিন্তু দেশের স্বরসিক নেতারা এখনও তাহারের জুল বুঝিতে পারেন নাই, যখনও ভাদ্রা গণ্ডার হিন্দুসমাজকে গালি দিতেছেন। বাহাদুর 'কর্তার ইচ্ছায় কথ' বলিয়া হিন্দু ধর্মসংস্কারকে শিক্ষা করিতেছেন, দেখিতেছি, তাহানাই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের পতাকা উড়াইতেছেন। ইহা কি বুঝা যায় না, বাঙ্গালী সংস্কার সঙ্গে শান্তিতেও বিসম্মত দিয়াছেন—একদোষের পুড়িয়া বরবার তত দৃষ্টিগত?

বাহ্যাত্মক সমাজবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতেছে। সেই সঙ্গে পরিবার-প্রথাও আদর্শ ধর্ম হইতেছে। বাঙ্গালী মানসিক বিকারে ক্রমেই দিক্‌বিদিক্‌সঙ্গ্রাসমুখ হইতেছে। সাম্রাজ্যী ও আত্মবাহী হইতেছে। এই আত্মবাহীত্ব মূল উৎপাটন করিতে হইলে সমাজের শিথিল পাণকে সন্দেহ করিতে হইবে; যুগধর্মের হজুগে মাতিয়া কালের প্রোতে ভাসিয়া গেল চলিবে না। আবাত্ত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী হইতে হইবে। যে সংস্কার, যে রীতিনীতি, যে আচার-অনুষ্ঠান-বস্তু বলে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের সম্ভ্রান্তর ভ্রমবিক্ষণ হইতেছিল, আবাত্ত বাঙ্গালীকে সেই পথে দ্বিগিত হইবে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাতব হইলে চলিবে না;—অতীতে আমরা কি, হিংসার, বর্জনে আমাদের কিসের অভাব, তাহাই চিন্তা করিতে হইবে।

৩

বাঙ্গালীর পুরুষের অপেক্ষা নারীর আত্মহত্যার হার অধিক কেন, দেখা যাউক। ‘প্রবাসী’ বলেন,—

(১) ‘আমাদের দেশে নারীদের চেয়ে অনেক বেশী পুরুষ উপস্থান পড়ে। কিন্তু তজ্জন্ত তাহারাও আত্মহত্যা করে না। পাশ্চাত্য দেশ সকলে লেখাপড়া-জানা মেয়ে পুরুষের বেশী, এবং তাহাদের উপস্থান পড়ে অত্যধিক মাত্রায়; কিন্তু তাহারাও আমাদের দেশের মেয়েদের মত এত বেশী আত্মহত্যা করে না? সুতরাং জীলোকের আত্মহত্যার অন্ত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।’

(২) ‘পুরুষদের চেয়ে তাহাদের (নারীদের) মনে নৈবাশ্রয় আসিবার অধিকতর সম্ভাবনা আমাদের দেশের সামাজিক ও পারিবারিক কতকগুলি ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।’

পূর্বেই আভাস দিরাছি, আত্মহত্যাবিষয়ে কোনও পাশ্চাত্য দেশের সহিত বাঙ্গালার তুলনা করা সমীচীন নহে। আমাদেরই দেশের কথা আমাদেরই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালীর সহর ও পল্লীগ్రামেব আত্মহত্যার হারের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সহরে মেয়েদেরই আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি প্রবলতর। যদি সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থাই আত্মহত্যার মূল কারণ হইত, তাহা হইলে, পল্লীগ్రামেই আত্মহত্যার হার অধিক হওয়া উচিত ছিল; কারণ, পল্লীগ్రামে সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার যতটা কঠোর আছে, সহরে তাহা নাই। সুতরাং সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার কঠোরতার জন্তই নারীদের আত্মহত্যার হার অধিক হয় না। অপিচ, দেখা যায়, গ্রীষ্মকাল ব্যবস্থা সহরে যেরূপ আছে, পল্লীগ్రামে তাহার শতাব্ধির একাংশ আছে কি না সন্দেহ। সুতরাং গ্রীষ্মকাল বিস্তার যদি নারীর আত্মহত্যার অন্তরায় হইত, তবে সহরের নারীর পল্লীগ్రামের নারীদের চেয়ে অধিক সংখ্যায় আত্মহত্যা করিত না। আত্মহত্যার বিষয় এই, যে কলিকাতায় মেয়েদের স্কুল-কলেজ আছে, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেইখানেই নারীর আত্মহত্যার হার পুরুষের চতুর্গুণ! অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুরুষের চেয়ে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা নারীর সংখ্যা কম হইলেও, ইহা স্থির যে, কলিকাতায় বা অন্য সহরে নগর-পড়া মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ‘প্রবাসী’র সম্পাদক মহাশয় এ দিকে লক্ষ্য করিলে সহজেই বুঝিতেন, নগর-পড়ার মধ্যেই নারীদের আত্মহত্যা-প্রবৃত্তির বীজ বপ্তপরিমাণে সংকীর্ণ আছে। কলিকাতা বা বাঙ্গালার অন্যান্য সহরে উচ্চশিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা উচ্চ-

শিক্ষিতা নারীর চেয়ে অবশ্যই অধিক; কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। নারীর পড়িতে পারে, এমন মেয়ের সংখ্যা কলিকাতায় যে খুব বেশী, এ কথা কলিকাতার অনেক অধিবাসী স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থই আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 'সাধারণ বাঙ্গালী বন্দী মনস্তত্ত্ব বুঝে না, দার্শনিক তত্ত্বও বুঝে না। তাহারা সাধারণ উপস্থানের নান্যকমাত্রি, বাস্তবতা কেবল, হাব-ভাব ও আদব-কায়দাই বুঝিবার চেষ্টা করে; তাহারই ফলে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে অশান্তির সৃষ্টি করে।' 'প্রবাসী' হয় ত বলিবেন,—'নারীর উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত, কালে তাহারা আর সাধারণ থাকিবে না, তখন তাহারা রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-দুপুরে' না 'চোখের বাসিন্দা'র মনস্তত্ত্ব তথা দার্শনিক তত্ত্ব সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এবং এমন তাহাদের নৈতিক পড়িয়া মানসিক বিকারের কোনও আশঙ্কাই থাকিবে না।' যুগ্মত্ব ইহাও দেখা যাইতেছে যে, এস্তাবটির কিছু মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু যে দেশের সাধারণ গৃহস্থ পুরুষেরই উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ভার সহজে বহন করিতে পারে না, সে দেশের লোক আপাততঃ নারীর উচ্চশিক্ষার তত্ত্ব পক্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। অধিকন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক শ্রী-শিক্ষার বিস্তার যেখানে ঘটে, নারীর আত্মহত্যাশ্রুতি সেখানে ততই। বিশেষতঃ, যে শিক্ষার ব্যক্তিগত প্রভাবশ্রুতি আগে, তাহা বাঙ্গালীর আদর্শের প্রতিফল। সে শিক্ষার নারীর আত্মহত্যাশ্রুতি ক্রমেই বর্ধিত হইবে, ইহা অসম্ভব করিবার কারণ আছে। কারণ, বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ হিন্দু বাঙ্গালীর—সমাজ পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদর্শে নারীর খণ্ডেছ আহার-বিহারে প্রায় দিবে না, ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় সংস্কার। এ সংস্কার বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাগত। এ সংস্কার উৎকট সাম্যবাদীর চক্ষে বিদূষণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে সমাজের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, এ কথা এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান বুঝেন। যে কোনও সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা যে দেশের সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির মনে আশার সঞ্চার করিবে, এমন কোনও নিয়ম নাই; স্বতন্ত্র সামাজিক কোনও ব্যবস্থার ফলে যদি কোনও নারী নৈরাশ্রে আত্মহত্যা করে, তবে তাহার সমগ্র সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইতে পারে না। একটা ব্যবস্থাই দেখা যাউক। পতি-নির্বাসনে নারীর স্বাধীনতা দিলে হিন্দু ও মুসলমানের জাতিগত ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে না। যেহেতু বাহ্যকে ধর্মী পতিদের বরণ করিয়া, আবার তাহাকে ছাড়িয়া, অপর পুরুষের অনুগামিনী হইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধ করিবার শক্তি যে সাধারণ বা অসাধারণ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকল নারীর নাই, ইহা আব বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই জগতই বলি, নারীদের মনে নৈরাশ্রের সঞ্চার হইলেই একটা সামাজিক ব্যবহার মূল উপাধি পরিহার্য্য কেলিতে হইবে, ইহা দুঃসমস্যা ও বুদ্ধিমানের কথা নহে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের মনে অধিকতর নৈরাশ্রসংস্কারের কারণ থাকিলে সে কারণ নূতন নহে, তাহা বহু কাল হইতেই আছে। তবে পূর্বেই বা নারীর দমন দমন মর্মে না কেন, আর এখনই বা মরে কেন? এ যুগের সাম্যবাদী সমাজসংস্কারকগণের ভুল এইখানেই ধরা পড়িলে। আলোচনা করিলে তাহারা সহজেই বুঝিবেন, শ্রীশিক্ষার বর্তমান আদর্শ কত দুঃসমস্যা। তাহারা বুঝিবেন, যে শিক্ষা নারীজাতিকে গার্হস্থ্য স্বর্গে অবস্থিত করিতে চায়, সে,

মাকাজীর পক্ষে তাহা অস্বত্ব নহে—তাহা গবস। যে শিক্ষা নারীর মনের কুঠী ঘুচাইয়া
নিষ্কলুষ অধিকারসভার আকাঙ্ক্ষা জাগায়, বাদ্জালার তাহার পরিণাম আশ্চর্য্য। দুঃখ। যে
সেবায়ের সঞ্চার করে, তাহার ফল কদাচ স্তম্ভ হয় না।

যাহা হউক, যে ব্যবহার পরিবর্তনে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হইতে পারে না, অথচ নারীদের
দূর হয়, সে ব্যবস্থার পরিবর্তনই আবশ্যিক। কিন্তু কোনও সামাজিক ব্যবহার পরিবর্তন
করিয়াও নরনারীর আত্মহত্যার পথ সঙ্কুচিত করা যায় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখা
যাইতে। সর্ববিধ চিন্তাচাক্ষুণ্য কারণ নির্ণয় করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে আশ্চ-
র্য্যতর পথে সহজেই কাটা পড়ে। চিন্তাচাক্ষুণ্য দূর করিবার একমাত্র উপায়—বেশে নীতি
ন্যবনের চাষ। এই ব্রহ্ম বেগে আমরা সেইরূপ শিক্ষাবই প্রচলন চাহি, যাহাতে দেশের
সরসাবী সংযমী ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ শিক্ষার দিকে বেশের নেতাদের
কণ্ঠে কী দৃষ্টি আছে? যাহাবা ব্যবহৃত শাসন লইয়া ঘরামারি, কাটাকাটি করিতেছেন, তাহার।
একবার নিজের নিজের খবর রিকে ফিরিয়া চাহিবেন না? বিদেশিনী বেসাণের দুর্দশা
বিধিমা বাঁহাদের চক্ষু ফাটিয়া ফল বাহির হইতেছে, স্নাতা ভগিনীর দুঃখে কি তাঁহাদের প্রাণ
কঁদে না? কাদে না বলিয়াই ত বঙ্গের এই অস্বাভাবিত আশ্চর্য্য।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা।

৩

“ইউরোপের বর্তমান মহাসমর শেষ হওয়ার পর” যে সময় “ভারতীয়
শাসন-ব্যাপারের পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক” হইবে, সে সময় “যে কোনও একটি
দেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হইবে”, এই আশায়, উর্দু-ভাষা-
ভাষা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ভারতীয় ও বঙ্গীয় উর্দু সাহিত্য-সভা স্থাপন করিয়া-
ছেন। উর্দু-ভাষাভাষীদের এরাপ চেষ্টা অত্যন্ত ও অস্বাভাবিক না হইলেও,
আমরা তাহাদের এইরূপ চিন্তার কোনও যুক্তি-যুক্ত কারণ দেখিতে পাউতেছি
না। কর্তৃপক্ষ যদি বাস্তবিকই যুদ্ধের পর কোনও ভারতীয় ভাষাকে ভারতবর্ষে
প্রাধান্য দান করেন, তাহা হইলে উর্দু যে সেই স্থান লাভ কবিতে পারিবে,
তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে। কারণ, বর্তমান সময় যে যে স্থানের মুসলমানদিগের
মাতৃভাষা উর্দু, ইতিপূর্বে গবর্মেণ্ট সেই সেই স্থানের আফিস-আদালতে হিন্দী
ব্যবহার প্রচলন কবিয়াছেন। কোন যুক্তি বলি এখন গবর্মেণ্ট সে ব্যবস্থা
উল্টাইয়া দিবে? হিন্দী-ভাষাভাষী অপেক্ষা উর্দু-ভাষাভাষীর সংখ্যা কি
অধিক? পরন্তু কলিকাতা লোক—বঙ্গদেশের উর্দু সাহিত্য-সভার যাহাবা

কবি, আবার তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় কবিও চাহি যে, তাঁহাদের কি বক্তব্যের? আফিস-আদালতেও উদ্ভাষা-প্রচলনের আশা কবিভেদে?

কারণ উদ্ভাষার ব্যাকরণ নাই। যে ভাষার ব্যাকরণ নাই, সে ভাষা কি প্রকারে হিন্দী অথবা বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রাধান্য দাত কবিতে পারিবে? বাঁহা বা বৃটম ভাবতে উদ্ভাষার প্রাদিক্ত স্থাপন কবিতে চাহেন, তাঁহারা সর্বপ্রথমে—বদি সম্ভব হয়—উদ্ভাষার ব্যাকরণের স্থাপন করুক। শত বৎসর অতীত হইল, উদ্ভাষার স্থাপিত হয় নাই। এও বড় বড় পণ্ডিত বড় বড় গ্রন্থ ও কাব্য রচনা করিয়া উদ্ভাষা সাহিত্যভাণ্ডারের সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই তা ব্যাকরণ গঢ়েন। কাব্য নাই? ব্যাকরণ ভাষার জীবন। উদ্ভাষার ব্যাকরণ না গঢ়িল, অতীত বিশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক যুগে, উহা মৃতভাষা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত।

দ্বিতীয়ে ভাবটাম উদ্ভাষা-সভা স্থাপিত হইয়াছে,—বোলা কথা। সে স্থানের মুন্সলমানদিগের অধিকাংশের মাতৃভাষা উদ্ভাষা। বর্তমান সময়ে ভাষাতত্ত্বের বাস্তবশীল দ্বিতীয়ে। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব উদ্ভাষা-সভা স্থাপনের লক্ষ্য যে সেই ভাষার উপযুক্ত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই নাই। কিন্তু ভাষা-বিশাখী উদ্ভাষা সাহিত্য-বিদগণের মধ্যে কোন দলের মতামতের এই সভা চলিবে? (২০) প্রথমে দ্বাব দাম্বাইয়া পরে বাহির দাম্বাইয়াব চেষ্টা কবিতে শোভনীয় হয়।

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দ্বন্দ্বকে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কারণ, উদ্ভাষা-বিশাখী মাতৃভাষা, তাঁহা বা যদি দ্বীয় মাতৃভাষার সেবা না করেন, তবে কে কবিবে? তাঁহা বাই মাতের স্ব-সন্তান, মাতা বা মাতের সন্তান মুখ উজ্জ্বল কবিবার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। যিনি গর্ভে দাবণ কবিয়া দশ মাস দশ দিন গর্ভ-যাত্রা সহ্য ক'রিতেছেন,—কেবল সন্তানের চন্দ্রবদন চর্চনা, আশায়,

(২০) ভারতবর্ষে উদ্ভাষা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে দুইটি দল আছে। একটি ভাষাবাদী, অপরটি লক্ষ্য-প্রাণী। আমাদের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে বর্তমানাবস্থা পরিচিত কবির ববীভ্রান্তের মতের যে রকম গঢ় করিলে এসব ভাষা-সাহিত্য-আদিত্তে, সে কথা—দ্বিতীয়-দ্বন্দ্ব-প্রাণী সাহিত্যিকদিগের বাঙ্গালার ভাষার প্রতিষ্ঠা করা। বাঙ্গালা দেশ-প্রাণী বিবর্তন-প্রাণী আছেন, তাঁহারাও ভাবেন যে, সে ভাষা-সাহিত্য-প্রাণী দেশ-কর্মসম্পাদক-প্রাণী ব'লিয়া থাকেন। কিন্তু দ্বিতীয় দল কর্মসম্পাদক বলেন,—‘মাতৃ’। এই ব্যাপার লইয়া প্রায় দুই শত বৎসর হতে প্রাণী চলিয়া আনিতেছে। কিন্তু ভাষার বাঙ্গালাইতেছে না।

এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর, যিনি সেই সন্তানকে শবীরের রক্তধিনু পান-
করাইয়া তাহার বহুব পুষ্টসাধন করিয়াছেন, তিনি যেমন মা, মানবে-
সেই প্রকার আত্মও জুইটী না আছেন। গর্ভধারিণী মাতাব প্রতি অবজ্ঞা
প্রদর্শন করিলে যেন সন্তানো মহাপাশ হয়, সেইরূপ অপর জুই মাতাব
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেও জুঃপ দুর্দশাব অবশি থাকে না।

মানবেব দ্বিতীয় মা, জনমভূমি মা। গর্ভধারিণী মাতার গর্ভে যখন সন্তানের
সম্মুখ হান হয় ন, তখন যিনি আপন প্রশান্ত বক্ষে স্থান দান করেন, শৈশব-
কালে যাহাব প্রশান্ত বক্ষে উপর দুনা-খেলা করিয়া কাল কাটে, যাহার বুখ-
চেহা—বক্ত-দেওয়া শাস্ত্র ও জনসাধারণ সাহায্যে মানবেব দেহ ও মস্তিষ্ক বর্ধিত
করিতিনিও মা। এই মা, মানবেব নিকট স্বর্গাদপি-গরীয়সী। ইহা-
কবিতা কবিতো আশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

মানবেব তৃতীয় মা, ভাষা-জননী বাক্‌দেবী। যিনি গর্ভধারিণী মাতাব নিকট
প্রথমিনু স্তনদুগ্ধেব জন্তু প্রাণনা জানাইবার সুর শিক্ষা দেন; ক্রন্দন করিবার
কর্ত্তি যাহাব বিকাশের প্রথম হুচনা; যাহাব দ্বাৰা মানবেব মস্তিষ্কেব বিকাশ
হয়; যিনি মানবেকে পশু হইতে পৃথক করেন; মানব যাহাব আশ্রয় লাভ
করিয়া পৃথিবীৰ ময়ল ও শাস্তিব জন্ত লাগাদিত হয়; যাহাব সাহায্য ব্যতীত
মানব পোতাভ্যাসাব পথ হইতে দূরে গিয়া পড়ে; অর্থাৎ, যে ভাষা-জননী
স্বভাবের গতিব দতিত আপনা হইতেই মানবেকে আশ্রয় করেন; তিনিই মানবেব
তৃতীয় মা। জানাদেব বোধ হয়, ইনিই মানবেব শ্রেষ্ঠ মা। কারণ, সন্তান
সময় গর্ভধারিণী মাতাব প্রতি যথার্থ ভক্তিপরায়ণ হয়, যে সময় সে ভাষা-
জননীৰ আশ্রয় লাভ করে। সন্তান বতদন পর্যন্ত ভাষা-জননীৰ শাস্তিমা
কোড়ে উপবেশন করিতে না পারে, ততক্ষণ সে স্বীয় কর্তব্য উপবন্ধ
করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের
উৎপত্তি উদ্ভূত ও উর্দ্ধ সাহিত্যেব সেরা এবং তাহার শ্রীকবিসাধনেব জন্তও
এক দল লেখক প্রয়োজন। কিন্তু সে লোক—সে মেবক, বাঙ্গালা দেশেব—
বাঙ্গালী সমসাময়িকের মধ্য হইতে গ্রহণেব চেষ্টা বুখা।

ভাষাতত্ত্বের সকল প্রদেশে। এসময়ানেবাটী যাহাত উর্দ্ধ ভাষাকে কথিত
ও লিখিত ভাষাতত্ত্বে গ্রহণ করেন, তাহাব চেষ্টা” কবিতা রচনাকার্য্য হইবার
আশা করাও বুখা। কারণ, দেশেব স্বভাবের উপবেই ভাবাব ভিত্তি স্থাপিত
হইয়া থাকে। তাই ভিত্তি-সিমা দেশে সিমা ভিন্ন ভাষাব সৃষ্টি পোদ হয়

খোদাতায়ালাব অতিশ্রেষ্ঠ। তাহা না হইলে হয় ত পৃথিবী অচল হইত।
মুই কারণেই বোধ হয় সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা
কবিতা দিয়াছেন। খাহাবা ঈশ্বরবিশ্বাসী, তাহারা নিশ্চয়ই এ কথা
স্বীকার করিবেন যে, খোদাতায়ালাব বিনামূল্যে পৃথিবীতে কোনও মঙ্গল
হইয়াছে না। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, সেই
খোদাতায়ালাব বিনামূল্যেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি। এমন অবস্থায় যদি বা
কিছু উর্দু ভাষা-প্রচলনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে দাবার বিরুদ্ধে
স্বীকার কবিতা হইবে। আব স্বভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবিতা হইলে, যিনি
স্বভাবের সৃষ্টি, তাহার বিরুদ্ধে হস্তান্তোগন করা হইবে না কি? কিন্তু তাহা কি
সম্ভব? খোদা-বিশ্বাসী মানবের কি ওতা করা উচিত? যিনি সৃষ্টি, স্থিতি
প্রত্যয়ের কর্তা; গড়া, বাধা ও ভাঙ্গা কাঁচের কার্য; যিনি বহমান, 'ঘব্বাব'
'কাহ'হার', তাহাব শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য কবিবার মত শক্তি
কাহাব আছে? কে এমন শক্তিমান পুরুষ, যিনি সেই সর্বশক্তিমান
খোদাতায়ালাব মহাশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ কবিতা
পাবেন (২১)?

“তারতর্বেব সকলপ্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক না হইলে,
আহাদেব মাধ্য একতার ভিত্তি সূচুত হইবে না”, খাহাবা একাধ বসেন, বা
কবেন, কোনও মতেই তাহাদের মতের সমর্থন করিতে পারি না। কাবণ,
খোদাতায়ালাব উপর আহাদেব ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, তাহারা কখনই এক
ভুক্তি করিতে সাহসী হইতে পারেন না। কোবাণ শবীফেব জায় মহাগ্রন্থ খাহাব
ই-পবকালের মাঝ সম্বল, হাদিসের জায় মহান উপদেশ ও ব্যবস্থা-পুস্তক
খাহাদেব পথপ্রদর্শক, তাহারা যদি উর্দু ভাষার সাহায্য ব্যতীত ভাষা
মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সূচুত করিবাব উপায় খুঁজিয়া না পান, তবে আহাদ
খাহা মুসলমানের হুজুর্গ্য বলিয়া মনে করিব।

‘কল্মাব-তৈয়ব’, ‘কল্মাব-শাহাদাৎ’, ‘কল্মাব-তওহিদ’, ‘কল্মাব-তদ্দ্বি’

(২১) বেহার ও উড়িষ্যা বহুকাল বাংলা দেশের সহিত একই ভাগ্য-বৃত্তে গ্রথিত ছিল।
এখনও বেহার ও উড়িষ্যা এক শাসনাধীন রহিয়াছে, এবং একই প্রদেশ বলিয়া পরিচিত।
আসামও পূর্বে ও উত্তর বাংলাব সহিত যুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু কে, রাজশক্তি ত এই দেশকে
মাতৃভাষা হইতে এক চুলও ইটাইতে পারে নাই? বেহারীরা পূর্বাংশ হিন্দুই।
করিয়া আসিতেছেন, এবং উড়িষ্যার উড়িয়াও আসামের ভাষা-ব্রহ্মবীর মর্জনা
এবং করিতেছেন।

ও 'বল্মার-বন্দোবস্ত' এই পাঁচ কল্মকে ঘাঁহা একতার ভিত্তি হৃদয়
করিবার পক্ষে যথেষ্ট মনে কবেন না, 'ঈমান-মোজমল' ও 'ঈমান-মোফাস্দান'কে
একতা হৃদয় করিবার পক্ষে ঘাঁহারা অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন, পবিত্র ও স্বপূর্ণ
গ্রন্থ কোরাণ মজিদকে ঘাঁহা একতা হৃদয় করিবার পক্ষে প্রধান সহায় বানান
মনে কবেন না, হজবত মোহাম্মদ মোস্তাফাব (দং) পবিত্র উপদেশবাণী
ঘাঁহাদের মধ্যে একতা হৃদয় করিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা কি প্রকারে
ইন্দ্রান-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।
যে ক্ষেত্রে কোবাণ, হাদিস, কেকা, এজমা,—কেয়াস ও কল্মা, এবং ঈমান
যথেষ্ট হইল না, সে ক্ষেত্রে যে উর্দুভাষা গ্রন্থ কবিত্তে কি প্রকারে একতা হৃদয়
কিতে পারিবে, তাহাও আমরা বুঝিতে অক্ষম। কি প্রমাণেব বলে যে তাঁহারা
শ্রবণেব মুসলমানদিগেব মধ্যে একতা হৃদয় করিবার জন্য বাঙ্গালার বাঙ্গালী
মুসলমানদিগকে উর্দুভাষাকে মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করিবার জন্য অতীব
কবিত্তেছেন, তাহা আমরা তাহাদের যুক্তির ভিত্তি বুঝিয়া পাইতেছি না।
কোরাণ, হাদিস, ঈমান, কল্মা ও কেকাএজমা—কেয়াস প্রভৃতির উপর
ঘাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা মুসলমানদিগেব মধ্যে একতা হৃদয় করিবার
পক্ষে তাহাকেই যথেষ্ট বলিয়া গণে কবেন। ঘাঁহারা তাহা কবেন না, ঘাঁহাদের
পক্ষে বিশ্বাস নাই, মসজিদ, মেশাব ও মিমার আত্মান একতা হৃদয় করিবার
পক্ষে ঘাঁহাদের নিকট প্রশস্ত ও পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাঁহাদের
যুক্তির সমর্থন কবিত্তে পারি না। মুসলমানদিগেব মধ্যে একতা হৃদয় করিবার
জন্য এ হেন সহপায়গুলিকে ঘাঁহারা উপেক্ষা কবিত্তে উর্দুভাষাব সাহায্য
গ্রহণ কবিত্তে চান, তাঁহাদিগকে আমি জ্ঞানী বলিতে প্রস্তুত নহি।

যে সকল বদ-সন্তান সমুদায় ভাবতবর্ষের মুসলমানদিগেব মধ্যে উর্দুভাষার
প্রচলন কবিত্তে একতা হৃদয় করিবার প্রয়াসী, তাঁহারা চিন্তা কবিত্তে
কেন না যে, এক দিকে একতা হৃদয় কবিত্তে গিবা, অপব দিকে তাঁহাদের সাধারণ
একতা ভাঙ্গিয়া 'চুর-না' হইয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে উর্দুভাষা
শেখাইয়া, তাঁহাদের সহিত বঙ্গের বাহিবেব মুসলমানদিগেব সৌহার্দ্য বন্ধিত
কবিত্তে যাইয়া যে তাঁহাদের গৃহ-প্রাপ্তকে কলহের সূত্রপাত হইতেছে, তাইয়ে
তাইয়ে, চাচা-ভাইপোয়, মামা-ভাগিনেয়ে, স্বপুত্র-জামাতার, আত্মীয়-প্রতিবেদিত
এই উপলক্ষে মাঝমাঝি ও কাটাকাটি আবস্ত হইবার সম্ভাবনা বাটতেছে,
তাহা লক্ষ্য কবিত্তে নষ্ট শক্তি, সমর্থ ও বুদ্ধি তাঁহাদের কোথায়?

আমর পূর্বেই বলিয়াছি, পবিত্র ও শুভীয় গ্রন্থ কোরাণ, অবত পদগণ্যোব
 শাস্ত্রের উপদেশ-বাণী হাদিস, এবং ফেকা,—এছমা-কেশাসই মুসলমানদিগের
 সাধন-সম্বল। কল্মা ও স্ফমানগুলিই মুসলমানদিগের প্রধান অবলম্বন। ফিও
 উরু সাহিত্য-সভার কর্তৃপক্ষের উরু-গ্রহণেব এই যুক্তিটী উহাব কোন্টী
 হইত? মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মকাব্যাবলী মধ্যে ‘হজ্জ’ ব্যবস্থা অত্যন্ত
 পবিত্র ভূমি মক্কা-মোয়াজ্জমা-হিত কাবা মন্দির ও আবাকাং-প্রান্তর প্রভৃতি
 গুলি ‘হজ্জ’ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু ঐ সকল স্থানের
 মুসলমানদিগের মাতৃভাষা আরবী, এবং কোরাণ-হাদিস প্রভৃতিতে ভাষা
 আরবী। যে স্থানের পবিত্র ধূলিকণা শিরে ধারণ কবিত্তে পাবিলে পৃথিবী
 তৎক্ষণে স্থানের মুসলমানেরা নিজেহে ধন ও কৃতার্থ জ্ঞান কবিত্তা থাকেন, এবং
 নিজেহে স্নানোত্তম মনে করেন, উরু অথবা বঙ্গভাষাভাষী মুসলমানেরা সেই
 পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলে, যথাক্রমে হিন্দী অথবা বাঙ্গালী নামে অভিহিত
 হইয়া থাকেন। হিন্দু শব্দ হইতে যে ‘হিন্দুস্থান’ নামের সৃষ্টি, এবং হিন্দুস্থানের
 বাসিন্দা বলিয়াই যে হিন্দী নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।
 ‘দাদাগানী’ নিজেব স্বাভাব্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এমন অবস্থায় হিন্দী
 হইল অপেক্ষা কি বাঙ্গালী হওয়া বাঙ্গালীর নহে?

শুন। যার, প্রত্যেক বৎসব পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্নজাত
 ১৯২০ জন মুসলমান ‘হজ্জ’ ব্রত পালন কবিত্তার জন্য মক্কাধানে উপস্থিত
 হইয়া থাকেন। পক্ষের হিসাবে ও স্থানমাহাত্ম্যে আমবা যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ,
 বরুণ্য ও সম্মানার্থ বলিয়া মনে কবিত্তা থাকি, এবং সর্বদাই যাহাদের উদ্দেশ্য
 ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দান কবিত্তা থাকি, সেই আববীয় মুসলমান ভ্রাতারা
 যাহাদের মাতৃভাষা আরবী হইলেও, রুস, তুর্কী, ইংবেজ, আফগানী, পাশী,
 চীনা, জাপানী, হিন্দী ও বাঙ্গালী প্রভৃতি মুসলমান হাজীদিগকে ভ্রাতৃত্ব
 মিলিসন দান করিতে ও তাহাদের সহিত আশ্রয় আশ্রয় এক হইয়া
 মিলানামায়েমোদিত প্রেম বিতরণ কবিত্তে কি কখনও কুঠিত হয়েন? তাহান
 ত ভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষা-ভাষী মুসলমানদিগকে আপন সহোদর ভ্রাতা
 অপেক্ষাও আপনাব জন ভাবিয়া, সেইরূপ সেই-ভক্তির চক্ষে দর্শন কবিত্তা
 থাকেন? কোরাণ ও হাদিসাদিতে ত মাতৃভাষা সম্বন্ধে কোনও কথাই
 লিখিত হয় নাই? যাহাদের ধর্ম-সম্বন্ধ এক, তাহাবা পবম্পব ভাই ভাই
 যে-দেশবাসী ও যে-ভাষাভাষীই হউক না কেন—সে আপন অপেক্ষাও
 পব জন, ইহাই হইল কোরাণ ও হাদিসের শিক্ষা।

একপ আদর্শ উপদেশ ও আদর্শ শিক্ষা সমুখে থাকিতে, যাহাবা ভাষা এক না করিয়া কোবাণ-বিশ্বাসী 'কল্যাণ-গো' ভ্রাতাদিগের সহিত একতঃ স্থাপন করিয়া তাহাদের স্মৃতি স্মৃতি ও হৃদয়ে হৃদয়ে হইতে সমর্থ নহেন, তাঁহাবা ইসলামের দাবী কবেন,—মুসলমান বলিয়া শ্লাঘা করেন কোন সাহসে? ভাষা-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমানদিগকে ভ্রাতৃত্বাবে আলিঙ্গন দান কবিবার জন্য যাহাদিগকে ভাষা বদলাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাবা কি প্রকারে পৃথিবীর অপবাপব স্থানের মুসলমানদিগের সহিত কোরাণের আদেশানুসারে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন কবিত্তে সমর্থ হইবেন? যাহাবা ভাষা এক না করিয়া, কোরাণ ও হাদিসের আদেশ মাত্র করিয়া চলিতে অক্ষম, আদি ভ্রাতাদিগকে কোনও ক্রমেই বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না।

যে সকল বাঙ্গালী-সন্তান প্রায় পোনে চারি কোটি মুসলমানের স্বার্থে এইরূপে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন, কোনও জ্ঞানী মহাজনই বোধ হয় তাহাদের বুদ্ধিব প্রশংসা কবিবেন না। যে কয় জন বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা দেশে উর্দু-মত প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, উর্দু-ভাষাভাবীদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কবিয়া নিজের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত কবিত্তে বসিয়াছেন, আমবা যাহাদিগকে ইহার পবিণাম চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য সনির্ভর অনুরোধ কবিত্তেছি। যে দেশের মহিলাদিগের মধ্যে—

“নাসী বল, পিনী বল, মাতের সমান নয়।

ভাজা বল, ভুজা বল, ভাতের সমান নয় ॥”

এইরূপ প্রবচন প্রচলিত আছে, সে দেশে চাউলের পবিবর্ত্তে যব ও গম চালাইবার চেষ্টা যেমন অস্বাভাবিক, বাঙ্গালা ভাষার পবিবর্ত্তে উর্দু ভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টাও সে দেশে সেই প্রকার অস্বাভাবিক।

যাহাবা বাঙ্গালা দেশে, বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে, স্বভাবের গতির বিকলে দণ্ডায়মান হইয়া, একতা-বুদ্ধিব দোহাই দিয়া উর্দু ভাষার প্রবর্ত্তন কবিত্তে চাহেন, তাহাদের নিকট আমাদের নব্বুত এই যে, একরূপে ‘পীষ-পয়গম্বর’ বনিদাষ চেষ্টা না করিয়া, ভারতের যে যে প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে উর্দু ভাষার প্রচলন আছে, সেই সেই প্রদেশে উর্দু সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা কর, সকলতা লাভ করিতে পারিবে। বাঙ্গালা মুসলকে উর্দু চালাইবার জন্য এক পাও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না; ফল নষ্ট হইবে। সেকপ চেষ্টা কবিত্তে

পৌষমাসে উৎসাহ, উদ্যম ও অধ্যবসায় বজ্রাব জল-স্রোতে তৃণবৎ হইবে।

সাহিত্য

ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে বাঙ্গলা-সন্তান হইয়া, আজি বাঁহা বা ঝুঁহা মাংস ভাষা জননীকে মাতৃসম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। জাতিগত স্বার্থবক্ষার্থ আমরাও তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। বাঙ্গলাব মুসলমানেরা বাঙ্গালী, কেবল এই ওজুহাতে তাঁহারা প্রায় পোনে চারি কোটি মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, ইসলাম ধর্মের সার সঞ্চল মহাগ্রন্থ কোরাণ কি তাঁহাদের এই কার্যের সমর্থন করেন? দিল্লী, আগ্রা, লক্ষৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানের মুসলমানদিগের কথা বলিব না। বেহার এত কাল বাঙ্গলার অঙ্গীভূত ছিল, যে বেহার বাঙ্গলার—বাঙ্গালী বাইরা পরিয়া মাঘুব, সেই বেহারী মুসলমান ভ্রাতা বা বাঙ্গলাব বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আস্তবিক ঘৃণা করিয়া থাকেন কোন্ ওজুহাতে? কেবলমাত্র বাঙ্গলার—বাঙ্গালী হইবার অপরাধে বাঁহারা পোনে চারি কোটি বাঙ্গালী মুসলমানকে গুলি, বিড়াল অপেক্ষাও হেম ও ঘৃণা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত একত্রে ও সৌন্দর্য-বুদ্ধির আশার, বাঙ্গালী মুসলমান কখনই স্বীকৃত ভাষা ক্রিয়া, উর্দু ভাষার সেবায় অগ্রসর হইবেন না—হইতে পারেন না।

বেহার প্রভৃতি স্থানের সাধারণ মুসলমানেরাও ত উর্দু সেবা করেন না। তাহারাও ত হিন্দী ভাষাকেই মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করে। হুতরাং বাঙ্গালী মুসলমান দেশভাষা—বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা না বলিয়া, দুব দেশের উর্দু ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার কবিত্তে পারেন না। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে, এবং বাঙ্গালী মুসলমান একরূপ কার্যকে গর্হিত, অন্যায় ও পাপকার্য বলিয়া মনে কবিত্তা থাকেন।

ইসলামের একতা ও ভ্রাতৃত্ব কোনও ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ নহে। বাঙ্গালী মুসলমান আজিও কোবাণের শিক্ষা ভুলিয়া যান নাই। ধর্মের আশান মানা কবিত্তা চলিবার মত শক্তি আজিও তাঁহারা হাবান নাই। বাঙ্গালী মুসলমানের হৃদয় এত ক্ষুদ্র, এবং অন্তঃকরণ এত নীচ নহে যে, কোবাণের মৌদিত একতা, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম ভাবতবর্ষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ রাখিবে। পৃথিবীর তাবৎ মুসলমানই আমাদের ভাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ নছয়ই আমাদের আপনাব জন;—আমাদের প্রেমাস্পদ। কোবাণের নাম মহাগ্রন্থ ইহ-পরকালের সার সঞ্চল থাকিতে আমরা আমাদের মাতৃভাষা ছাড়িয়া উর্দু ভাষাকে মাতৃভাষা আসন দিব কেন?

“ভাবতবর্ষ হিন্দুপ্রধান”—প্রায় বিশ কোটি হিন্দু ভারতবর্ষের অধিবাসী।

আব “হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায্য অন্ন”—প্রায় সাত কোটি। তাহাতে ভয়ে কি কাবল আছে? যাহাদের কোবাণ বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিতেছেন, যাহাদের পুণ্যঘর বিশ্বনীতির আদর্শ শিক্ষক, তাঁহাবা যদি সামান্য বিশ কোটি হিন্দুব উপর ভীত ও সন্ত্রস্ত হন, তাহা হইলে তাহাদের লজ্জা বাখিলাব স্থান কোথায়? “আশরাফুল মখলুকাত” (২২) হইরা, ইসলাম-বিশ্বাসী হইরা, যাহাবা শত্ৰুকেও বিনয় কবিবার সুপদা হারাইয়াছেন, তাঁহাবা নিশ্চয়ই মানব-নামের—মুসলমান-নামের অযোগ্য। ধর্মের বন্দী মহাবল। তুমি পার্থক্য হও, তুমি প্রেমিক হও, তোমাব হৃদয়কে প্রকৃত মানব-হৃদয়ে উন্নীত কর, তুমি কোরাণের আজ্ঞা ও হাদিসের উপদেশের অনুসরণ কর, তোমাব শত্রু থাকিবে না। তুমি মস্তিমেয় হইলেও, বিশ কোটি হিন্দু আপনাব জন হইতে পারিবে। বিশ কোটি হিন্দু তোমার বন্ধু হইবে—তোমাব জ্বলাভ হইবে।

মুসলিম তর্কস্থলে যদি উক্ত অমূলক আশঙ্কাকে সত্য বলিয়া স্বীকার কবিয়া লয়, তাহা হইলে কেবল ভাবতবর্ষের মুসলমানদিগের জ্ঞান চিন্তা না করিয়া, পৃথিবীর মুসলমানদিগের জ্ঞান চিন্তা করা উচিত। সংখ্যায় অধিক হইলেই ভয় কাবল কারণ হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীতে খৃষ্টান, সিহদী, বৌদ্ধ, হিন্দু, ইত্যাদি ধর্মাবলম্বী ত অধিক। তাহাদের মত অনুসারে কেহই ত আপনাব নয়—কেহই ত নিজ নয়? মুসলমানদিগের সংখ্যান্নতার জ্ঞান যদি তাঁহাদের প্রতি অধিকসংখ্যক অ-মুসলমানের অত্যাচারের মাত্রা বর্ধিত হয়, এবং মাতৃভাষা এক কবিলেই যদি সে আশঙ্কা দূর হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীর সকল মানব মুসলমানদিগের মাতৃভাষা এক হওয়া উচিত নহে কি? মুসলমান, স্ততরাং তাহাদের মাতৃভাষা এক করিতে হইবে, এই যুক্তি যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানদিগের মাতৃভাষা আবশ্যী হওয়া উচিত নহে কি? যেহেতু তাঁহাদের কোবাণ, তাঁহাদের হাদিস, তাঁহাদের কেবা-এলমা-কেয়াস-এই প্রভৃতি মূল ধর্মগ্রন্থগুলি যখন আবশ্যী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-দিগের মাথার মুকুট-মণি হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) মাতৃভাষা ধ্বন আবশ্যী ছিল, সেই হেতু পৃথিবীর তাবৎ স্থানের মুসলমানদিগের—ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রত্যেক মানবের মাতৃভাষা আবশ্যী না হইবে কেন? কিন্তু তাহা কি সম্ভব?

(২২) ঈযবের কষ্টির মধ্যে বারোটা নকশাশ্রেষ্ঠ, তাহাদিগকেই “আশরাফুল মখলুকাত” বলে।

১৯৪৬ খ্রিঃ, ১ম সংখ্যা, ১৮৬ নং পৃষ্ঠায় “তাই মানবের আর এটি না” শাণ্ডারদ মখলুকাত।

তাহাৰ পৰা হিন্দু আচাৰ্যৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষৰ মুসলমান অধিবাসীদিগেৰে সহিত যে হিন্দুধৰ্ম্মাবলম্বী দ্বাতাদিগেৰে মধো মধো গৰু খোৱাবাদী বাপাৰ লইয়া বিৰোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে কথা আমি অস্বীকাৰ কৰিতে চাহি না। কিন্তু প্রকৃতপ্ৰকাৰে সে বিৰোধ যে চিৰস্থায়ী নহে, সে কথা আমি যোৰ-কৰিয়া বলিবই।

ভাৰতৰ ভাষাসমূহেৰে মধো উৰ্দু ভাষাই বে একমাত্ৰ ইস্লাম-ধৰ্ম্মানুশাসিত ভাষা, এ কথাৰও কোনও মূল্য নাই। কাৰণ, বিদেশী আৰবী, পাৰ্শী, এবং ভাৰতীয় হিন্দী, নাগৰী, প্রাকৃত, সংস্কৃত, মাৰহাঠী, নাজাজী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাৰ সংমিশ্ৰণে কয়েক শত বৎসৰ হইল, উৰ্দু ভাষাৰ সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু বৰ্ত্তমান সময়ে ভাৰতবৰ্ষে যে সকল মুসলমান বাস কৰিতেছেন, তাহারা সকলেই আৰব ও পাৰস্ত দেশ হইতে আৱিহেন নাই। বৰ্ত্তমান সময়ে আমবা “ভাৰতেৰ মুসলমান” নামক একখানি পুস্তক-প্ৰণয়নে ব্যাপ্ত আছি। প্রায় ছয় বৎসৰ ধৰিরা এই পুস্তকেৰে স্ত্ৰ উপকৰণ সংগ্ৰহ কৰিয়াছি। সেই উপকৰণ হইতে আমবা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পামিয়াছি, নিম্নে তাহা বিবৃত কৰিতেছি। যাহাৰা বলেন, এ দেশ মুসলমানদিগেৰে মাতৃভূমি নহ— উপনিদেশ, তাহাৰা নিম্নেৰে তালিকা সৃষ্টে ব্যাখ্যাত পাৰিয়েন যে, অধিকাংশ মুসলমানই এই দেশেৰে হিন্দুদিগেৰে বংশধৰ। ভাৰতবৰ্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান বাস কৰেন, যাহাদেৰে পূৰ্বপুৰুষ আৰব অথবা পাৰস্ত দেশ হইতে আসিয়া এ দেশে বাস কৰিয়াছিলেন। সৰ্ব্বসময়ে মোট একাদশ শ্ৰেণীৰ মুসলমান এখন এ দেশে বাস কৰিতেছেন। যথা—

(১) ভাৰতবৰ্ষ মুসলমানাধিকৃত হইবাৰ পূৰ্বে যখন হিন্দুবা স্বাধীন ছিলেন, কিংবা মুসলমানাধিকৃত হইবাৰ পর, আৰব ও পাৰস্ত দেশ হইতে, যেন সকল মুসলমান সওদাগৰ, পৰিব্ৰাজক ও দৰবেশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং এই দেশে বাস কৰিয়াছিলেন, এবং তাহাদেৰে সহিত স্ত্ৰী-পুৰুষ-নিৰ্ব্বিশেষে, যে সকল অল্পচৰ, সহচৰ ও শিষ্য-শাগ্ৰবেদ আসিয়াছিলেন, এই দেশেই স্থায়ীভাবে বাস কৰিয়াছিলেন, এবং তাহাদেৰে মধো যাহাৰা সংসাৰ-আশ্ৰমেৰে মধো থাকিৰা ধৰ্ম্মালোচনা কৰিয়াছিলেন, তাহাদেৰে যে সকল বংশধৰেবা আজিও এ দেশে বাস কৰিতেছেন।

(২) ভাৰতবৰ্ষ মুসলমানাধিকৃত হইয়াৰ পূৰ্বে ও পৰে আৰব ও পাৰস্ত-দেশবাসী যে সকল পৰিব্ৰাজক ও দৰবেশ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং

তাহাদের মধ্যে গাছানা স্থানিতানে বাস করিয়াছিলেন। এই সকল পবিত্রাজক ও দববেশদিগের অনেকেই বংশধরেবা আজিও ভারতবর্ষে অথবা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৩) আবব ও পাবস্ত্র দেশবাসী যে সকল মুসলমান, ভারতসম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর বাজকার্য্য উপলক্ষে, বঙ্গদেশাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, এবং তাহাদের বংশধর বংশাবলী আজিও এ দেশে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৪) ভারতবর্ষে ইনলান ধর্ম্মেব নিম্নল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবার পর, বঙ্গদেশে উচ্চ শ্রেণীর যে সকল হিন্দু স্বৈচ্ছায় ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের যে সকল বংশাবলী আজিও এ দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন।

(৫) ভারতসম্রাজ্য মুসলমানাধিকৃত হইবার পর যে সকল হিন্দু কঠোর-মুসলমানদিগেব সংশ্রবে আসিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্ত হিন্দুসমাজ সেই সকল হিন্দুদিগেব মধ্যে গাছানার সহিত সকল প্রকার সদ্ভাব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদেব বাদ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(৬) ভারতবর্ষে ও বঙ্গদেশে 'পীব-আলী' বংশের যে সকল বংশধর আজিও মুসলমানরূপে বাস করিতেছেন।

(৭) ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের উচ্চ শ্রেণীর যে সকল হিন্দু সতীক ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদেব যে সকল পুত্র-কন্তাব সহিত আবব, পাবস্ত্র, অথবা আফগান দেশ হইতে সমাগত যে সকল মুসলমানদিগের পুত্র-কন্তাব বলাই হইয়াছিল, এবং তাহাদেব যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন।

(৮) ভারতবর্ষেব কতক অংশ মুসলমানাধিকৃত হইবার পর, যে সকল অনধিকৃত অংশে স্বাধীন হিন্দুবাজা ছিল, মুসলমান বাদশাহেব। সেই সকল হিন্দুবাজা অধিকাংশবিত্তাবেষ ধাত অনেক সময় সৈন্ত-সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থ আগমন হইতেন। যে যে স্থানের এধ্য শিলা বাদশাহেব 'লঙ্কর' গমন করিত, সেই সেই স্থানে নিম্ন শ্রেণীর যে সকল হিন্দুব বাস ছিল, তাহাদের অনেকেই বাদশাহেব সেনাব আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া, অনর্থক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত—কল্মা পড়িত—মাগার টুপী দিত। কিন্তু বাদশাহ-সৈন্ত চলিয়া যাইবার

পর কেহ কেহ পুনর্বার পূর্ণ ধর্ম গ্রহণ করিত ; আব কেহ কেহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেই থাকিত । সেই শ্রেণীর হিন্দু অথবা হিন্দু হইতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানেরা কেহই ধর্ম বুঝিত না । হিন্দুধর্মের অল্পশাসনও জানিত না— জানিত না ; ইসলাম ধর্মের আদেশ ও বিধিসমূহও তাহারা 'ওরফে-বাস' ছিল না । যাহারা ইসলাম ধর্মের গভীর ভিত্তি থাকিত, তাহাদের বংশধর আজিও মুসলমান নামে খ্যাত ।

(৯) ভারতসম্রাজ্য মুসলমানদিগকে হইবার পর, উচ্চ বাজকায়ে অধিকাংশভাগের আশায়, এক দল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও ভাবতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেছেন— অথবা বৈরি-দমন জন্য যে সকল হিন্দু মুসলমান সম্রাট বাজপুরুষদিগের সহায়ত্ব-প্রাপ্তির আশায় হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের যে সকল বংশধর আজিও ভাবতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেছেন ।

(১০) ভারতসম্রাজ্য মুসলমানদিগকে হইবার পর যে সকল উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থপর হিন্দু, মুসলমান বাদশাহ অথবা আনীর-ওমরাহদিগের সহিত কুটুম্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুসম্রাজ্য সেই সকল হিন্দুদিগের মধ্যে বাহাদিরের আতি-চ্যুত করিয়াছিলেন, তাহারাই পবে প্রকাণ্ডভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এই শ্রেণীর মুসলমানদিগের যে সকল বংশধর আজিও এ দেশে বাস করিতেছেন ।

(১১) ভারতসম্রাজ্য মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হইবার অব্যবহিত পূর্বে এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে-যে সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খৃষ্টান ব্যবসায় উপায়ে অথবা অপরা কোনও নীচ-কার্যে লিপ্ত হইয়া এ দেশে আসিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে ক্রমশাশীল ও চরিত্রহীন-যে সকল খৃষ্টান এতদেবীর ছই চারি জন তিন অথবা মুসলমান স্ত্রীলোককে ছলে, বলে ও কোঁশলে ভূলাইয়া উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল । এই শ্রেণীর হতভাগিনীদিগের মধ্যে বাহাদিরের গর্ভে সন্তানসম্ভূতি করিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এখন যাহারা নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতেছে, এবং এই দেশেই বাস করিতেছে । কিংবা যে সকল চরিত্রহীন মুসলমান ও হিন্দু, খৃষ্টান ও বিহীন নারীদিগকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের গর্ভে যে সকল সন্তানসম্ভূতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং ভ্রমগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এখন যাহারা নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিতেছে, এবং এই দেশেই বাস করিতেছে । চরিত্রহীন নারী

মুসলমান স্বীলোকদিগের গর্ভজাত যে সকল সন্তান এ দেশে মুসলমানরূপে বাস করিতেছে। বাববিলাসিনীদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগের মধ্যে যাহাবা মুসলমানরূপে এ দেশে বাস করিতেছে।

বর্তমান সময়ে ভাবতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উল্লিখিত একাদশ শ্রেণীর মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় আট জন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় তিন জন। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় পনব জন। চতুর্থ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় পাঁচ জন। পঞ্চম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় আট জন। ষষ্ঠ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় এক জন। সপ্তম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় বিশ জন। অষ্টম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় ত্রিশ জন। নবম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় আট জন। দশম শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় চারি জন। একাদশ শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় শতকরা প্রায় দুই জন। এই তালিকা হইতে বুঝাইতেছে যে, বাঙ্গালা দেশের আদিম অধিবাসী-(হিন্দু)-দিগের যে সকল বংশধর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাই বাঙ্গালা দেশে অধিক। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দোহে বলা বাইতে পারে যে, বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উপনিবেশ নহে। বাহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল ধর্মপরিবর্তনই করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ভাষা পরিবর্তন করেন নাই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেই যদি ভাষা পরিবর্তন আবশ্যক হয়, এবং এই যুক্তির যদি কোনও মূল্য থাকে, তবে আমরা দুঃস্বপ্ন সহিত এ কথা বলিব যে, তাহা উর্দু ভাষা নহে; সে ভাষা আরবী ভাষা। উর্দু ভাষা যে ইসলাম-ধর্মগুরুমোক্ত ভাষা নহে, তাহা আমবা পূর্বেই ব্যাখ্যা করিয়াছি। একমাত্র আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোনও ভাষাকেই ইসলাম-ধর্মগুরুমোক্ত ভাষা বলা বাইতে পারে না, সে কথাও পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

ধর্মের সহিত মাতৃভাষার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর না হইলে যে সমান ভাবে ধর্ম ও মাতৃভাষার সম্মান বন্ধায় বাধা-সম্ভব নহে, এ কথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, মাতৃভাষার সহিত যে ধর্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে মাতৃভাষার সহায়তায় ধর্মের বিধি-

ব্যবস্থা, আদেশ-নিষেধগুলি বুঝিয়া সেই মত কার্য করিবার প্রয়োজন হয়। যেমন ব্রিটিশ-রাজ এখন ভারতবর্ষের সম্রাট। তাহার আইনগুলি ইং-বাজী ভাষায় রচিত। আমরা সেই আইনের মর্ম বের বাস্তবায়ন, কেহ চিন্তিত, কেহ উদ্ধৃতে বুলিয়া লইয়া সেই মত কার্য করিবার শক্তি বিস্তৃত আইনের ভাষা ইং-বাজী বলিয়া, কেহেই তা আপনাপন মাতৃভাষা, বাঙ্গালী, হিন্দী, অথবা উর্দু ভাষাকে ভাগ করিয়া, ইং-বাজী ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া করিবার আশঙ্কতা স্বীকার করিতে পারি না? ত্রিষ্ট মনে প্রকাশ্য পোষণ আইনের মর্ম মাতৃভাষায় বুঝিয়া লইয়া, সেই অনুসারে কার্য করাই আবশ্যিক। মাতৃভাষা ভাগ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে ভাষা যাহার মাতৃভাষা, সেই ভাষার সাহায্যে সে কোবাং, হাদিস, বেদ ও পুৰাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের অর্থ বিধি ও নিষেধ বুঝিয়া লইবে, এবং সেই অনুসারে কার্য করিবে।

লগুনের মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষার সংগতি (ইং-বাজী তাঁহাদের মাতৃভাষা) ধর্মপালন করিতে পারেন, পারিলেই মনোমানসে যদি তাঁহাদের মাতৃভাষা ফার্সীর সাহায্যে ধর্মকার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেন, আফগানের মুসলমানেরা যদি তাঁহাদের মাতৃভাষা পোস্তোব সাহায্যে ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থা চালু করিয়া চলিতে অক্ষম না হইলেন, চীনের মুসলমানেরা যদি চীনাভাষার সাহায্যে ইসলাম ধর্মের আস্থাবান থাকিতে পারেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালার মুসলমানেরা বাঙ্গালী ভাষার সাহায্যে ধর্মপালন করিতে অক্ষম হইবেন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবেন না কেন? উর্দু ভাষাই যে মুসলমানের জাতীয়তার আদর্শ বলা করিতে সমর্থ, এবং উর্দু ব্যতীত বাঙ্গালীভাষা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে বাঙ্গালার মুসলমানদিগের জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইয়া যাইবে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই বিংশ শতাব্দীতে প্রমাণ ব্যতীত কোনও কথাই গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু জাতীয়তার আদর্শ নষ্ট হইবার প্রমাণ আশঙ্ক্য প্রমাণাত্মক। তাহা পব জাতির কথা। জাতি না হইলে জাতীয়তা হয় না? পবস্ত জাতির সহিত ধর্মের আকাশ পাতাল প্রেমের এক, জাতি আব। ব্যক্তির জন্মভূমি এবং মাতৃভাষা ধর্মবিশ্বাসের জাতি নির্ণায়ক হয়। যেমন আবব জাতি, লক্ষণ জাতি, তুর্কী জাতি, ইংরেজ জাতি, ফরাসী জাতি, সেইরূপ বাঙালার অধিবাসীবাও বাঙ্গালী জাতিবিশ্বাস। যেমন বোম্বাইবাসীদিগকে বোম্বাইয়া, মাদ্রাজব অধিবাসীদিগকে মাদ্রাজী, কটকের অধিবাসীদিগকে কটকী, উড়িষ্যার অধিবাসীদিগকে উড়িয়া, এবং

বেহারের অধিবাসীদিগকে বেতাবী বলা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম, এবং আন্তিক ও নাতিক সবাই আছেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, মোট নয়টা উদ্দেশ্য লইয়া, বাঙ্গালা দেশের মুসলমানদিগের জন্য উর্দু সাহিত্য-সভাব স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উপরে পর পর

আটটা উদ্দেশ্যের আলোচনা কবিয়াছি। এইবার নবম উদ্দেশ্যের আলোচনা করিব। নবম উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালী মুসলমানেরা অপদার্থের একশেষ।

তাহারা প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা কবিবারও অযোগ্য! তাহারা হিন্দুশিক্ষকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারেন না।

কিন্তু বাঙ্গালী নামে শ্রাব্য বোধ কবেন, বাঙ্গালা দেশের এমন কোনও মুসলমানই এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা বাঙ্গালা দেশের

যতটা দাবাদ বাধি, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা দেশে এখন যতগুলি উচ্চ ও নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, এবং সেই সকল

বিদ্যালয়ে তাহারা শিক্ষকতা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে হিন্দু-শিক্ষক অপেক্ষা মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা অধিক না হইলেও (২৩) অল্প নহে।

বাঙ্গালার মুসলমান-ছাত্র-দত্ত অর্থ-যে কেবল হিন্দু শিক্ষকদিগেরই উদয় পূর্ণ করিতেছে, এ কথাও সত্য নহে। এক দল মুসলমান ছাত্র-যেহন হিন্দু শিক্ষককে

অর্থ দান করিতেছে, সেই প্রকার আর এক দল হিন্দুছাত্র মুসলমান শিক্ষককেও অর্থ দান করিতেছে।

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের অন্তঃকরণ এত নীচ নহে যে, তাহারা গুরু শিক্ষককে যে অর্থ দিতেছেন, তাহার জন্য অনুতাপ

করেন? বাহারা একপ কথা বলিতেছেন, তাহারা কি হিন্দু শিক্ষকের সংস্রব করিয়া কবিত্তে পারিয়াছেন? বাঙ্গালী মুসলমান এ সম্বন্ধে কোনও প্রকার

নিষেধ কবা অন্তায় কার্য্য বলিয়া মনে কবেন। প্রাইমারী-বিদ্যালয়সমূহে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাব অবিসংশয় যে হিন্দু লেখা, সে সম্বন্ধে

কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাব জন্য দায়ী কে? হিন্দু, না মুসলমান? মুসলমানদিগকে উপযুক্ত পুস্তক প্রণয়ন করিতে কে নিষেধ করিয়াছিল?

সে সকল হিন্দু বিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারা বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী—মুসলমানদিগের প্রতিবেশী। প্রতিবেশী ভিন্নধর্মাবলম্বীর নিকট যদি আমার সম্বন্ধিত অর্থের কতক পরিমাণ চলিয়া যায়, তাহাতে আমার ক্ষতি

(২৩) কেহ কেহ বলেন, প্রাইমারী বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা শতকরা আশ

কি? সে অর্থ ত আবার ঘুবিয়া আমার নিকট আসিতেও পারে? কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে 'আঞ্জুমেন-ই-হেমায়েৎ ইসলামের' কর্তৃপক্ষের, অথবা অপব কাহারও হস্তগত হইলে, আমাব, এবং আমার দেশের ও সমাজের কি লাভ হইল? তাহা ছাড়া বর্তমান সময়ে বাদ্দালী মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিভাজন সমূহের পাঠ্যপুস্তক লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। একেই যে ইচ্ছাধর্ম-সংখ্যা বাড়িবে, সে সম্বন্ধেও কোনও সন্দেহ নাই। তখন ঘরের পয়সা বস্ত্রই থাকিবে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের বে পরিমাণ অর্থ এখন মৌলভী আবুল কবির সাহেব বি. এ. ও মুনশী মোজাম্মেল হক কাব্যকর্ত সাহেব প্রভৃতির নিকট বাইতেছে, সে পরিমাণ অর্থ লাহোরের মুসলমানদিগের হস্তে দিব কেন?

এ সম্বন্ধে বলিবার ও লিখিবার এখনও অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া বাওরায়, ইহার উপসংহার করিতেছি। যদি আবশ্যক হয়, সনদ ও স্মরণাগতসারে সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলিব। বাঙ্গালার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানকে এই ভাবে বাঁহাবা বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত হইবার জন্ত অনুরোধ করিতেছি। কনিষ্ঠ মুসলমান জ্যেষ্ঠের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সংসারের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসব হউক, এবং বাঙ্গালী দেশে শান্তি বিদ্যাজ করুক।

আবুল গফুর সিদ্দিকী।

রত্ন-প্রসঙ্গ।

বঙ্গীয় ১৩২১ সালের ৩০শে কালিকট বঙ্গের গৌরব মহাগোপালদাস ৬ রাখালদাস ত্রায়বদ্র মহাশয় কালীলাভ করেন। দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর পূর্ণ হইল। এই পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের বিরোধে দেখেব যে ক্ষতি হইয়াছে, কত দিনে তাহার পূরণ হইবে, জানি না। একমাত্র নব্যত্বায়ের জন্ত বঙ্গদেশের প্রাধান্য মিতিলার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অন্তর্মিত হইবাব পব বাদালীরাই নৈয়ায়িকী প্রতিভা পূর্ণাধিকারী হইয়া সর্বদেশের বিদ্বয়গুলীর উপর আধিপত্য করিয়া আসিতে ছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, ত্রায়বদ্র মহাশয়ের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর এই পাণ্ডিত্য-গৌরব তিবোহিত হইয়াছে।

ষড়দর্শনের মধ্যে ভাদ্র-বৈশ্বিক, চিত্তাব শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের স্বাক্ষর-শীলনের প্রত্যেক দীর্ঘ স্বাক্ষর

চিন্তাশীল দার্শনিকেবা ছাত্র-বৈশেষিকের অবলম্বনে নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া বিধ্বংসমাজে চিবস্ববলীয় হইয়া গিয়াছেন। দর্শনমাত্রই যুক্তিশাস্ত্র। দার্শনিক ক্ষেত্রে অগৌলিক কোনও সিদ্ধান্ত স্বীকার্য্য হয় না। যে পক্ষের দৃষ্টির সমীচীনতা থাকে, সেই পক্ষই বলবৎ হয়। গোতম, কণাদ, কপিল প্রভৃতি দর্শনপ্রণেতা ঋষিবৃন্দ, যোগর্দ্ধিব প্রভাবের সর্ব্বস্ত্র হইলেও, স্ব-স্ব লৌকিক মনীষার অনুসাবেই সূত্রাত্মক দার্শনিক সন্দর্ভেব বচনা করিয়াছেন,—এ ক্ষেত্রে তাহাবা সর্ব্বভ্রাতার প্রভাব নিরোজিত করেন নাই। দার্শনিক সন্দর্ভে ঋষিদের সর্ব্বস্ত্রতা অনুসৃত থাকিলে পরস্পর মতভেদ হইত না। প্রত্যেক দর্শনেই স্বীয় সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিতর্ক প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যুক্তিতর্কের আধিকা ও বিস্তৃততায় ছাত্র-বৈশেষিক শাস্ত্রই “বর্কস্তি সর্ব্বোপরি।”

দার্শনিক সন্দর্ভ, “অহরহঃ সন্ধ্যানুপাসীত” ইত্যাদি বাক্যের ছাত্র আজ্ঞাশাস্ত্র নহে বলিয়াই প্রতিভার অবতাব গাঘনাথ শিরোমণি আর্ধমত-বিশ্বাসী ভাস্তিক হইয়াও মহর্ষি কণাদেব ব্যবস্থাপিত “বিশেষ” পদার্থের-খণ্ডনে অণুমাত্র ভীত হন নাই। ছাত্র-বৈশেষিক শাস্ত্রের স্বপ্নানুশীলনের ফলেই এইরূপ স্বপ্নন-মণ্ডনেব শক্তি লাভ করা যায়। নব্যছাত্রের অন্তর্গত অনুমান-খণ্ডে যে স্বপ্ন বিচার-পদ্ধতি প্রিপিবদ্ধ হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাব আলোচনা করিলে প্রকৃত প্রতিভা-শালী পণ্ডিত অনেক নূতন বহস্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারেন। বাসুদেব মার্কভোম হইতে আরম্ভ কবির বাখালদাস ছাত্ররত্ন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বিদ্বান্‌ওলী বুদ্ধি-প্রতিভাব অসাধারণা প্রদর্শন কবির ‘নৈমায়িক’ আখ্যায় সাংখ্যকতা সিদ্ধপাদন করিয়াছেন। এই বুদ্ধি-প্রতিভাব অসাধারণের অন্তই তাত্ত্বিক-প্রদর্শন নাস্তিককূলের মতবাদেব নিরাস করিতে পাবিয়াছিলেন। নাস্তিকেবা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার কবে না, সূত্রবাঃ ষ্টপনিষদাদিকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত কবির নাস্তিকের সহিত বিচার করা চলে না। যুক্তিতর্কে সমীচীন অভিজ্ঞতা থাকিলেই নাস্তিকের আক্রমণ হইতে আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্যাদা রক্ষা করা যায়। ছাত্র-বৈশেষিক শাস্ত্র, ঈদৃশ যুক্তিতর্ক-উদ্ভাবনের পথ দেখাইয়া দিয়া মানব-সমাজের পবম কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ছাত্রশাস্ত্রের স্বপ্ন আলোচনায় মার্জিত হয়, ও বিবিধ উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ হয় বলিয়া, ছাত্রভাষ্যাকাব্য বাংছাত্রন ছাত্রবিজ্ঞার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তম-কালে বলিয়াছেন,—

ভাববহু মহাশয় পর্য্যন্ত নৈয়ামিকমণ্ডলী ঘেরপ নিপুণ ভাবে ছায়শাস্ত্রের অমূল্য কবিরাছেন, সেই অমূল্যলনের ফলে সত্যই তাঁহার সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কবিরাজ শক্তিশালী হইয়াছিলেন,—নূতন নূতন তথ্যের উদ্ভাবন কবিরাজ লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে ভাবে ছায়শাস্ত্রের পঠন-পাঠনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইতেছে, তাহাতে আর সে সমস্ত অমূল্যলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। নূতন উদ্ভাবন ত দূরের কথা, বর্তমান সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্তমান কালের অধিকাংশ নৈয়ামিক ছায়শাস্ত্রের সকল গ্রন্থের জসদতরুপে অধ্যাপনা করিতে পারেন না। ছায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্র-সম্প্রদায় অনেক বিদ্বৎসভার ছায়শাস্ত্রের গ্রন্থসংক্রান্ত ছায়বত্ত মহাশয়ের নবোদ্ভাবিত পূর্বপক্ষের অবতারণা কবিরাজ দেখিয়াছেন, কোনও সম্ভব হয় নাই। নব্যজ্ঞানের অন্তর্গত “ব্যবিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভার” গ্রন্থে বধূনাথ শিরোমণির ও “মৎপ্রতিপক্ষ” গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্যের ভ্রান্তি দেখাইয়া “দীধিতিকল্পনতাবাদ” ও “গদাধরনূনতাবাদ” নামে ছায়রত্ন মহাশয় যে সন্দর্ভদ্বয় প্রকাশ করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত কোনও নৈয়ামিকই তাহার উত্তর করিতে পারেন নাই।

ছায়রত্ন মহাশয় যে কেবল খণ্ডনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা নহে; মণ্ডনেও তাঁহার লোকোত্তর পাণ্ডিত্য ছিল। পূর্ববর্তী দার্শনিকগণ ছায়শাস্ত্রে স্বীকৃত যে সকল পদার্থের খণ্ডন করিয়াছেন, “বিবিধবিচার” গ্রন্থে ছায়রত্ন মহাশয় নানা যুক্তি দেখাইয়া সেই সকল পদার্থের স্থাপন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বধূনাথ শিরোমণির খণ্ডিত “বিশেষ” পদার্থ মানিবার অভিনব যুক্তি দেখাইয়াছেন। দার্শনিক ক্ষেত্রে এ প্রতিভা আর কি দেখিতে পাষ্টব?

ছায়রত্ন মহাশয়ের দার্শনিক প্রতিভার আর অধিক আলোচনা করিয়া না— ভাবতের সর্বত্রই তাঁহার তাত্ত্বিকতার প্রভূত কীর্তি সমুজ্জলভাবে বিদ্যমান করিতেছে। এই প্রবন্ধে ছায়রত্ন মহাশয়ের জীবননির্ভরতা কবিরাজ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ছায়রত্ন মহাশয় এতদূর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সায়ংসন্ধ্যার অবসানে মহিমময় পদক্ষেপের নানা নাম উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিতেন। গদগদ হয়ে এই নামগুলি কীর্তন কবিতা করিতে অবিশ্রান্ত অপ্রকারীয় তাঁহার পুলকোচ্ছ্বাসিত বসন্তস্থল প্রাবিত হইত। তিনি যেন ভাবাবিষ্টই ছায় হইয়া পড়িতেন। ছায়রত্ন মহাশয়ের তাত্ত্বালিক অবস্থা দেখিলে নাশ্তকেবল হৃদয়ও ভক্তিরসের স্রোত

হইত। তিনি যখন চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ভক্তিভাবে স্তোত্র পাঠ করিতেন, তখন উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর হৃদয়-ভরী এক অপূৰ্ব ভাবে আহত হইবা উঠিত। ভক্তি আবশ্যক কার্য্য থাকিলেও সে সময়ে তাঁহাকে ডাকিতে কাহারও সাহস হইত না। “সাহিত্য”-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় লিখিয়াছেন,—“এক দিন প্রাতঃকালে আমি কাশীতে ছায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যাই। তাঁহার বাড়ী গিয়া শুনিলাম, তিনি উপরে পূজা করিতে বসিয়াছেন। আমি ছায়রত্ন মহাশয়ের পূজাস্থানে বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার দোহিত্র আমাকে সেখানে লইয়া গেল। দেখিলাম, সেই কাস্তিমান মহাপুরুষ ভক্তিগদ্যগদ্য কণ্ঠে সাশ্রুনেত্রে ‘শিব’ ‘শিব’ করিতেছেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভক্তের মুখোচ্চারিত সেই ঘঘুর নাম শ্রবণ করিলাম। তাঁহার সহিত কথা-কহিতে সাহস হইল না,—দূর হইতে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলাম।”

ছায়রত্ন মহাশয়, আন্তরিক দৃঢ় ভক্তি ও একাগ্রতা সহকায়ে ভগবানের অর্চনা, স্তোত্রপাঠ ও নামোচ্চারণ করিতেন, তাই তিনি সাহস করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন,—

“উচ্চারয়াম্যদ্বিনিঃ শিবশব্দয়েতি

পৌরীষয়েতি ভবভীতিহর্য হরতি।

অর্চামি নোমি চ শিবং প্রণমামি বিভাং

ভীতির্মমাপ্তি শমনাম মনাপপীতি ॥”

“আমি প্রতিদিন ‘শিব’ ‘শব্দ’ প্রভৃতি ভগবানের ভবভীতিহারী নাম সকল উচ্চারণ করি, ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা, তাঁহার স্তোত্রপাঠ এবং তাঁহার চরণোদ্দেশ্যে প্রণিপাত করি, শমনকে আমার ভয় কি ?”

দীক্ষাবের নিকটে স্বার্থ-প্রত্যাশার—স্বর্গাপবর্গের কামনায় ছায়রত্ন মহাশয়-যে ভগবদারাধনা করিতেন, তাহা নহে ;—ভগবানের প্রতি তাঁহার অহেতুকী ভক্তি ছিল। এই অহেতুকী ভক্তি বা নিরাম প্রেমের-প্রভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি

পরমেশ্বরের-মূর্ত্তি সকলের ধ্যান করিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

“জীবাঃ সন্ত ন সন্ত বা স্থিরত্বাৎ প্রকৃত্যবাদীন বা

ধর্ম্মাঃ সন্ত ন সন্ত বা স্বধর্ম্মকং স্থানান্তরং যান্ত বা।

আত্মীবাঃ তব মূর্ত্তয়ন্তদপি মে ঐত্যাশ্রয়ঃ হে শিব

প্রেমঃ ঐতিয়পেক্ষতে ন হি কলং ঐতিঃ স্তূতিদিবিব ॥”

“যদি দেহাত্মবাদী চার্বাকের “ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাবর্ত্তনং কৃতঃ” ইত্যাদি

ব্যবস্থানুসাবে শ্রুশানে চিত্তানির্বাণেণ সঙ্গ সঙ্গ ইহ আত্মাব অস্তিত্ব লুপ্ত হয়,

জন্মান্তরকে যদি কবির কল্পনাগ্রহিত বলিতে হয়, বল; পুণ্য বা সেই পুণ্যের
প্রভাবে স্বর্গতোগ যদি অলীক হয়, হউক; হে সত্য, হে হৃদয়, হে শিব, তবু

আনি তোমাকে ভালবাসি—তবু তোমার মূর্তি সফল আজীবন আমার নিকট
অতিমাত্র প্রীতিপ্রদ। তোমার পূজা কবির। আমার পুণ্যসঞ্চয় হইবে, সেই

পুঞ্জীকৃত পুণ্যের কলে জন্মান্তরে আমার অবিশ্রান্তী আত্মা অবিচ্ছিন্ন স্বর্গতোগ
করিবে,—এ প্রত্যাশায় আমি তোমাকে ভালবাসি না। ভালবাসা কখনও

ফলের মুখাপেক্ষা করে না। পশু-পক্ষীরা তাহাদের শিশু সন্তানগুলিকে কো-

প্রত্যাশায় নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও বাৎসল্যভাবে লালন পালন করে?

ভক্ত সাধক জায়রত মহাশয়, ভগবানের ধ্যান করিয়া; এবং তাঁহাকে প্রাণ
ভরিয়া ডাকিয়া যে অনাবিল আনন্দ লাভ করেন, তাহা তিনি চাটুকালের মতন
ভগবানকে জানাইতে চাহিতেন না। তিনি নিখিয়াছেন,—

‘হাণো বিষ্টি ন বা ভবান্তিতত্ত্বগৈঃ স্বামনসজ্ঞানৈ-

ত্বদ্যদৈশ্চ মুদৈশ্চৈত্যৈঃ সনয়ঃ সংযাপয়ামো বরম্।

ঐখণ্ডচলচকচন্দনতরোর্মদানিলৈঃ সৌরভঃ

জিহ্বা নোদন্তঃ বিভক্তিঃ কিমিদং বিদ্যাদয়ঃ পাদপঃ?’

“হে শিব, তুমি সেই দুব কৈলাস-পর্বতে স্থানুক্ষেণে বিরাজ করিতেছ,

জুতরাং তোমার ধ্যান ও নামোচ্চারণে পরম আনন্দ লাভ করিয়া আমরা যে
সময় অতিবাহিত কবি, তাহা তুমি জান, আর না-ই জান। এই আনন্দের

কথা তোমার গোচর করিবার জন্ত আমাদের ব্যস্ততা নাই। মনানিলেন
সহায়তায় বলয়মহী-বরজাত চন্দনতরুর সুরভি আদ্রাণ করিয়া লোকে যে প্রীতি

লাভ করে, তাহা কি সেই চন্দনবৃক্ষকে জানাইবার জন্ত কে-বাস্তব হয়?”

জায়রত মহাশয় সাকার ঈশ্বরের উপাসনাবই পক্ষপাতী ছিলেন। সাকার-
উপাসনাই যে মুক্তির সাক্ষাৎ উপযোগিনী, ইহা তিনি খবরিত “অদ্বৈতবাদগুণে”

গ্রন্থে উপসংহারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাই ভক্ত কবি জায়রত মহাশয়
শ্লোকাকারে ভগবানকে বলিয়াছেন,—

‘অষ্টং ত্বং জগদ্বিষ্টদেব সবিশেষে দাস্যস্তিগ্রাহ্যমিত।

দুঃখং স্বজন্মমর্যদা নয়নঃ ধস্তানি মজ্জনমহে।

মূর্তিঃ নাক্ষরীঃ তবানুকরণং শৈলীকৃতং পুণ্ড্রীঃ

নিহোশ্চিত্রপটং নিরীক্য।

ভক্তঃ প্রসংগঃ প্রভেদঃ’

হে জগদিষ্টদেব, এ দাসেরা হৃদয়ের নিভৃত-কোণে চিরদিন এই আশা পোষণ করিয়া আসিয়াছে যে, তোমার সেই কেয়রশোভিত, কনককুণ্ডল-মঞ্জিত, কিরীটভূষিত, বা চাক্ৰচক্রাবতংসে, পরভৃগুবরাদয়হস্ত, রজতগিরিনিভ, অথবা সিংহরুদ্ধাধিকৃত, তপ্তকাকনবর্ণাভ, দশপ্রহরণসনাথ মূর্ত্তি সম্মুখে নিবাসমান দেখিয়া কৃতকৃত্য হইবে। কিন্তু আমাদের এ জন্মে সে সৌভাগ্য হইল না। তথাপি তোমার সেই সকল মূর্ত্তিব অল্পকরণে গঠিত মৃন্ময়ী, শিলাময়ী, বা দারুণময়ী প্রতিমা নশন কবিতা নয়ন মনকে কৃতার্থ জ্ঞান করি,—জন্ম সফল বিবেচনা করি। যে কখনও নিজের পিতামাতাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ কবিত্তে পারে নাই, সে কি তাঁহাদের চিত্রপট নিবীক্ষণ কবিতা আনন্ডিত হয় না?”

নহাপুরুষ জায়রঙ্গ মহাশয় ভগবানে এত দৃঢ় আসক্ত ছিলেন যে, শোক ছাড়া কিছুই তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তি হইতে বিচ্যুত করিতে পারিত না। ভগবদ-বিশ্বাসেব প্রভাবে তিনি দারুণ দুঃখের সময়েও “নিবাতনিকম্প ইব প্রদীপঃ” হির থাকিতেন। জায়রঙ্গ মহাশয়, তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র, পণ্ডিত ও হরকুমার শাস্ত্রীর অস্তিমসময়ে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরঘরে পূজা কবিত্তে গিয়াছিলেন। পাছে পুত্রের মৃত্যু হইলে অশৌচনিবন্ধন ঠাকুরপূজার কোনও বাধা হইবে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি পূজাকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলেন। এত দৈর্ঘ্য—এত বিশ্বাস বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায় কি? এই পুত্রবিশোগ-রূপ দারুণ অনিষ্টপাতেও ভগবানের প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র বীতশ্রদ্ধ হন নাই। এই দুঃস্থ শোকে ভগবানের প্রতি তাঁহার একটু অভিমানেমাত্র হইয়াছিল। পুত্রবিশোগের পর জায়রঙ্গ মহাশয় নূতন জ্যৈষ্ঠ বাসিতে ‘কুমারহর’ নামক শিবস্থাপন করিয়া প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ পশ্চাৎস্থিত শ্লোকে স্বীয় মানসিক অবস্থার পরিচয় নিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।—

“গঙ্গা হরকুমারায়ত্নং শিবসেবয়।

হাস্তামি ন কদা দান্তঃ তত্র দত্তাপহায়িণঃ ॥”

“শিবের আরাধনা করিয়া ‘হরকুমার’ নামক পুত্ররঙ্গ পাইয়াছিলাম, তিনি তাহা হরণ কবিতা এইদা এখন দত্তাপহাবী হইয়াছেন। আমি কিন্তু কখনও তাঁহার দাসত্ব পরির্ত্যাগ করিব না।”

দারুণ শোকাগ্নি ভগবচ্ছিত্তার পরিপন্থিতা কবে বলিয়া পুত্রবিশোগেব পব জায়রঙ্গ মহাশয় অতি হাতরভাবে কাশীপতি শঙ্করেশ চরণোপান্তে নিবেদন কবিতাছিলেন,—

“অথঃ পৌৰ্ব্বিকৃত্যনন্তিম। তৎসাধকানাং তপো-
ব্যাপ্তাঃ বিতীর্ণিকা তু বিবিধা নিম্নায়তাং নন্দ্যতাম্।
কর্ণণাং শিবতর্পণেষুপি ম চ তে কীটেহপি কাশীপতে
অচ্ছিত্তাপরিপন্নিশোকবহনৈঃ সঃ কথং বহতে ?”

“সাধক উগ্র তপস্তা করিয়া পাছে স্বর্গরাজ্যাদি স্ব য ঐশ্বর্য প্রার্থনা কবে,
এই ভয়ে অস্ত দেবতারা সেই তপোব্যাপ্তাতের নিমিত্ত বিবিধ বিতীর্ণিকার
নিম্মাণ করিয়া নিজেবা নিরাপদ হইতে পারেন। কিন্তু হে কাশীশ্বর, সামান্য
কীটকেও ‘শিব’ অর্পণ করিতে- তোমার ত কার্পণ্য নাই,—তবে কেন
এ দাসকে প্রবল শোকাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তোমার ধ্যানরূপ তপস্তা হইতে
বিচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ ?”

দৃঢ়ভক্ত শ্রায়রত্ন মহাশয় ভীষণ শোক-বস্ত্রে আহত হইয়াও ভগবানকে
বলিয়াছেন,—

“পাতনীধ পিতঃ পতেৎ যদি শতঃ শোকাননেঃ সমুত্তং
বহুঃ স্তাৎ-বদি নানিশঙ্ক সবলৈব দ্বিত্বাদ্যাবাননৈঃ।
অচ্ছিত্তাঃ ন মহামাহঃ তদপি ভোঃ শক্তো কৃপাভানিধে-
প্রয়োহপায়জশোকবস্ত্রপতনঃ দাসে কিমর্থঃ কৃতম্ ?”

“হে নাথ, যদি সত্য শত শত শোকাননি দাসের উপর নিপাতিত কব,
মদি প্রবল দাবিত্র্যাদ্যাবানলে আমার চিন্তা দগ্ধ কবিতা ফেল, তথাপি আমি
তোমার চিন্তা পরিত্যাগ করিব না। বজ্র—বল দয়াময়, তবে কেন এ দাসের
উপর প্রিয়বিয়োগরূপ শোকবস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ?”

একান্ত ভগবৎপবানর শ্রায়রত্ন মহাশয় পুত্রবিয়োগরূপ অনিষ্টপাতেও ভগ-
বানের দয়াময়তারই-পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

“দ্যুতিতো সতি পার্কতীপ্রিয় প্রয়াঃ প্রাপ্তানপি ত্বংপুত্রাঃ
স্পৃষ্টা তান্নমন্ত্রমন্ত্রময়য়ে কর্ণে শ্রদ্ধা নার্পয়েঃ।
তন্নাৎ কিং বিদদাসি মরণতমহাপাপত্ন-নাশেচ্ছমা
ভোগঃ যোগবিবৃদ্ধদানম্বয়য়ে প্রয়োবিদ্যোবোদ্ধত্যম্ ?”

“হে পার্কতীপ্রিয়, তুমি যে আমাকে শোকগ্রস্ত করিয়াছ, এতকনে তাহা
কারণ বুঝিতে- পারিমান। কাশীতে লোকের মৃত্যু-দয়য়ে তুমি তাহা
কর্ণে তারক-মন্ত্র উপদেশ কব। আমি মহাপাপী,—পাপ থাকিলে তুমি
আমাকে স্পর্শ করিবে না, তাই কি আমাব-পাপক্ষয়ের দ্রুত পুত্রবিয়োগ-দঃখভোগ

করা হইতে চ ৷ আমার ক সোজনমুক্তি নাই যে, তাহাব প্রভাবে পাপের দূচবান
হইতে মুক্তিস্বাভ কবিব ?”

ঈশ্বরনির্ভরশীল ভক্ত অনঙ্গলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলময়তা লক্ষ্য
করিলেন।

ভক্ত ভাববদ্ধ মহাশয় ভগবানের সকল মূর্তিকেই সমানভাবে শ্রদ্ধা
করিতেন। তিনি “শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পবমাত্মনি। অভেদবুদ্ধ্যা
বর্ত্তেতে ভেদকৃৎসরকং ব্রজং।”—ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের কখনও অমর্যাদা করিতেন
না। একই ব্রহ্ম শক্তি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি নানারূপে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলাভ
কার্য সম্পন্ন কবিত্তেছেন। ব্রহ্মের এক মূর্তিকে বিবেচ্য করিয়া অল্প মূর্তির
আবাধনা কবিলে শাস্ত্র-মতে ঘোব অপরাধ হয়। এইরূপ কার্য্য করিলে যে
মূর্তির উপাসনা করা হয়, তিনিও কদাপি গ্রীত হইতে প্রাপ্তেন না। তাই
স্মারক মহাশয় বলিয়াছেন,—

“বিকোরচরনমাত্রতাপি চিরং বিবিধা বিবেচ্যবং।

ঘো দ্বিঃপি চ হুইচেতনদ্রাচারো মগ্নমাত্মনঃ।

শস্ত্রাভ্যাসতঃ বিধায় বহনৈবদ্ধ। পুনঃস্মরণ-

রালেণ্যাসিকতুল্যমন্ত কিমু তদ্ব্যবধানাধনম্।”

“শিবেই বিবেচ্য ক’বে,—ঐষ ক’রে কালিকার,

অবিবেকী যে পামর বিষ্ণু আরাধিতে চায়,-

নরাধম সে মানব, অভিণয় দ্রাচার,

আরাধনা বৈধ নয় শাস্ত্রমতে কুত্ তা’র।

হরি হর শক্তি কিবা কিছুই বিভিন্ন নয়,

এক সে ব্রহ্মের মূর্তি, সব(ই) বপুঃ ব্রহ্মময়।

শত শত অর হেনে, দহনে জ্বালায়ে কার,

চন্দনের আলগুন-বতনে করিলে ডাঘ,

যেই শ্রীতি হ’তে পারে, সেই শ্রীতি ভগবান্,

শক্তি শিবে ঘেব করি’ বিষ্ণু আরাধিয়ে পান।”

—চন্দ্রকুমার পাণ্ডিত্য-কৃত অনুবাদ।

পুঙ্জনীয়চরিত ভাস্কর মহাশয়ের ভগবদাসক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশে
যে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিলে তাহার
যে অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল; তাহা সহজেই অল্পভূত হয়। ত্রিবেণীর জগন্নাথ
তর্কপঞ্চাননের পর ভাস্কর মহাশয়ই একাধারে এইরূপ কবিত্ব ও তর্কিকত্ব
প্রাপ্ত কবিগণ কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

জায়রত্ন মহাশয়ের কবিত্ব, তাত্ত্বিক ও ভগবান্ধিত প্রভৃতি গুণপৰ্যায়
অমূল্য করিলে সন্মুখ শিরোমণির সেই গর্বোজ্জ্বল মনে পড়ে,—

“কাবোহপি কৌশলধিরো বয়মেব নাহুঃ

তর্কেহপি করুশধিরো বয়মেব নাহুঃ ।

তস্মেহপি যদ্বিতধিরো বয়মেব নাহুঃ

কুক্ষেহপি সংযতধিরো বয়মেব নাহুঃ ॥”

বাস্তবিক সৌভাগ্যবশতঃ এমন সর্বভাবিসারিপ্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ
বঙ্গদেশে অল্পগ্রহণ করিয়াছিলেন । জায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে ভারতীয় দার্শনিক
ক্ষেত্রের পাণ্ডিত্য-গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল । “বসন্তমতী” নভাই (১১ই পৌঃ
১৩২১) লিখিয়াছিলেন,—

“পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস জায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে
বঙ্গালী যে পণ্ডিতবর হাবাইয়াছে,—তাহা আর পূর্ণ হইবার নহে । বঙ্গদেশ
এক পণ্ডিত আর নাই,—আর হইবার সম্ভাবনাও নাই । প্রতিভাশক্তি
প্রাচীন কোনও মনসী অপেক্ষা হীন ছিলেন না । বাস্তবিকই সর্বজনীন
পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার পাণ্ডিত্যেব নিকট নতমতক ছিলেন । সে পণ্ডিত
মুষ্টি বঙ্গালী আর দেখিতে পাইবে না । এই প্ৰলয়প্রাণিতাব দিনে বঙ্গদেশে
কেবল বাঙ্গালীর কেন, ভারতবাসীর এই পাণ্ডিত্যেব বৈভব বৃদ্ধিবাব আর
আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।”

মহামহোপাধ্যায় কবিসম্রাট পণ্ডিতরায় শ্রীযুক্ত বাদবেধর তর্কবর মহাশয়
এই মনীষি-শ্রেষ্ঠের বিবোধে যে শোক-শ্লোকাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে
জায়রত্ন মহাশয়েব নিকীর্ণ-মুক্তির কথা অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে ।
সেই শ্লোক তিনটি উদ্ধৃত হইল,—

“স্বরপুরবরধ্বজঃ পুষ্পমালা দধত্যো বিমলধবলচক্ৰভ্রামাণ্যমুদ্রানি ।

নির্মিশতকৃতরীপান্ হেমপাত্রে দধানা দামমধুমুতদুর্ধ্বাধাচ্ছলাভ্রাশ্রলিঙ্গ ॥

দিবমিষ নবলোকং নেতুতামা ভবন্ত্য তডিহুদুভ্রাভিতৈস্তৈর্নাকলোভাদ বিস্ময়ঃ ॥

ভক্ভূষমবতরধর্মকৃচ্ছ্রাশ্রুতিভাঃ বৃহদ্রপলম্বাভিনির্দ্রিতে গায়ত্রী ॥

অণবচিহ্নপূর্বকং দেবদেহে লয়ন্তে ন বলুঃ স্বরযুগলো লোকিতং বাঃ সমর্থান্ ।

ন চ নৃপবর লজ্জা দ্রাস্তা তা দেববাহোহস্তমতিনমুখপদ্মঃ স্বদসদ্রানি কথ্যঃ ॥”

শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, হে বৃধবর, স্বরবধূর স্বরতিসুন্দর পুষ্পমালা,
যেতচামব, পদ্ম, দধি, মধু, স্বত, দুর্ধ্ব ও বহুদীপ প্রমুখ মাহাত্মিক দ্রব্যপত্র

স্বপ্নাত্ত হতে করিয়া অমরাবতীতে তোমাকে সাদবে লইয়া যাইবার জন্ত
যায়ানদীর গঙ্গাতীরে বিজ্ঞ ও নক্ষত্রধতিত ব্যোমঘান হইতে অবতরণ করিলেন ।
কিন্তু নচিবকালপূর্বে দেবদেবে তোমার লগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাই দেববালাবা
তোমাকে দেখিতেও পাইলেন না ! সেই স্তবসীমন্তিনীগণ তোমাকে না পাইয়া
অশনিগনিযুগে হতাশহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন ।

শ্রীহরিহব শাস্ত্রী ।

নাস্তিকের বন্দাবন ।

পিতৃহীন ব্রাহ্মপুত্রের প্রতি জ্যোতামহাশয়ের স্নেহের অভাব ছিল, এমন কথা
বলিলে প্রত্যব্যগ্রস্ত হইব । আনার শৈশবে আমার পিতার মৃত্যুর পর ধনবান
জ্যোতামহ তাঁহার কন্তাদৌহিত্রকে তাঁহার গৃহে রাখিবার প্রস্তাব করিলে জ্যোতা-
মহাশয় কাদিয়া ফেলিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন, “আপনি মনে করিতেছেন,
আমার বাড়ীতে আপনার কন্তাদৌহিত্রের অর্থ হইবে ; যদি কখন তাহা হয়
আপনি আসিয়া আমাকে জুতা মারিবেন । আনার ভাই গিয়াছে, কিন্তু
কর্তব্য ত যায় নাই । আমার মা আর ভাই বাড়ীর ‘কর্তা’ ছিলেন, এখন
মা আর বোমা ‘কর্তা’ থাকিবেন ।” বাস্তবিক তদবধি কোনও দিন মা বা আমি
এখন কোনরূপ অর্থ বা আনন্দ অশ্রুভব করিতে পারি নাই । জ্যোতামহাশয়
স্বাক্ষরের একটা বড় জিলার উকীল-সরকারের কাজ করিয়া অর্থার্জন
করিতেন ; জ্যোতামহ তাঁহার কাছে থাকিতেন । কলিকাতার বাড়ীতে
থাকিতেন—পিতামহী, মা, আমি, আর জ্যোতা মহাশয়ের দশ বৎসরের অধিক
বয়স ছেলেরা—ইত্যাদি । আমার আদরের মাত্রা যেন অধিক ছিল ।
জ্যোতামহাশয় বৈদ্য ছিলেন ; কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক ছিলেন—বর্তমানেই
কিছু নিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ধ হইয়া তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেন
না । তাই তাঁহার ছোট ছেলোটোও অগ্রজদিগের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হওয়া অনাবশ্যক বিবেচনা না করা পর্য্যন্ত তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা
ছিল—ছেলেদের এক জনকে আপনার ব্যবসার ক্ষেত্রে বসাইয়া তাহার পশার
কমাইয়া দিয়া বাইবেন । সেই জন্ত আমি উকীল হইয়া তথায় যাইবার ইচ্ছা

প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “বলি কি বে ? এম. এ. পরীক্ষার নব্বোচ স্থান অধিকৃত করিয়া, উকীল হইয়া, তুই বিহায়ের জঙ্গলে ঘাইত। তোব কিসের অভাব ? তুই হাইকোর্টে কলকতা কর—কানে বংশে মুখ উজ্জল করবি।” আমাকে হাইকোর্টের দ্বিতীয়তীর হুবাশা-মামলু মিষ্টি ভুলাইয়া তিনি নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে যখন তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রও অগ্রজদিগের অনুশ্রুত পথ অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পর্যায় আসিয়াই ফিরিয়া গেল এবং আমারও অতীততীর সন্নিহিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই দৃষ্টিগোচর হইল না, তখন জ্যোতিষহাশয় আমাকে বলিলেন, “সেখ, বংশের মধ্যে আব কেহ ত ‘মামুষ’ হইল না। বিশেষে আমি যে পঞ্চাশ জমাইয়াছি তাহাতে তথায় তোর কিছু না হইলেও মাসে হাজার বাব শত টাকা কেহ শাসিলে না—তুই সেখানেই চল।” একটা পুজার ছুটিতে জ্যোতিষহাশয় এই কথা বলিলেন—ছুটির পর আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কর্মস্থানে গেলাম। আনাকে দুই বৎসর কাজে বসাইবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু আমার মধ্যেই তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ও আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবে না।

তথায় আসিয়া আমি আমার এক জন পুরাণিন পরিচিত শাক্তকে পাইলাম—স্বধীরচন্দ্র তথায় ভক্তিরী করিত। কিন্তু তখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কোনও সুযোগ হইল না। কারণ, তখনও বৃহৎ কালী ডাক্তারই চলিয়া বৎসরের বাধা ব্যবস্থায়—বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা শ্রমিকের চুক্তিতে প্রতিদিন প্রাতে পেন্টু লেন কোট পরিয়া মাথায় ক্যাপ চড়াইয়া একবাব করিয়া আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। ডাক্তার বাবু “নেটিব ডাক্তার” হইলেও তাঁহার অভিজ্ঞতা বিজ্ঞতার কারণ হইয়াছিল—তাঁহার “হাত-ফাও” ছিল। আবাব বৎসর দুইবাবের গুণে বাড়ীতে পীড়ারও বড় গর্তায়ত ছিল না। সুতরাং কালী বাবুকে দিয়াই আমাদের কাজ বেশ চলিয়া যাইত। কিন্তু জ্যোতিষহাশয়ের শেষ অন্তিমের সময় তাঁহার ডাক্তার যখন তাঁহার পূর্বেই পবপার যাত্রা করিলেন তখন আমি স্বধীরকেই ডাকিয়া আসিলাম। সে রাজ্য জ্যোতিষহাশয় গিয়া পাইলেন না বটে, কিন্তু স্বধীর যে স্ত্রীচিকিৎসক সে বিষয়ে আমার আর সন্দেহ বহিল না। সেই দিন হইতে স্বধীর আমার বাড়ীর চিকিৎসক হইল এবং তাহার সঙ্গে আমার অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠতার অবসরও ঘটিল।

এ কথা বলিবার একটু বিশেষ কারণ আছে। ইহা যেমন জনে বিচরণ করিলেও তাহার দেহে জন “যে” না, স্বধীরের প্রকৃতিতে না ব্যবহারেও যেমনই একটা কি ছিল, যাহাতে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় পবিত্র হইত না। সে যেন কেমন, একটু স্বতন্ত্রই থাকিত। একটা বড় বাগানবাড়ীতে সে বাস করিত—বাড়ীতে সে একা। তাহার সখের অভাব ছিল না; ফুল, প্রাণী, হরিণ সবই ছিল, কিন্তু কোনটির প্রতিই তাহার আন্তরিক আত্মবিশ্বাসের পরিচয় সপ্রকাশ হইত না। একটা গাছ শুকাইলে সে তাহার স্থানে আর একটা গাছ পুতিত, একটা পাখী মরিলে সে খাঁচায় আর একটাকে স্থানান্তরিত; কিন্তু কোনটির অভাব যে সে কখন অনুভব করিত, এমন বুঝা যায় না। সে চিকিৎসক ছিল; কিন্তু রোগীর প্রতি তাহার নমতার কোনও পরিচয় কখন তাহার মুখভাবে বা ব্যবহারে সপ্রকাশ হইত না। সর্বোপরি সে মোর নাস্তিক। আমার বাড়ীতে সে-ই চিকিৎসা করিত; কিন্তু তাহার ব্যবহারে এমন একটা কঠোরতাব পবিচয় ছিল যে, সেই জন্ত তাহাকে কোনও দিন আত্মীয় ভাবে-রোগসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে শুনি নাই। তাহার এই তাবড় জন্তই আমার দ্বারা তাহার প্রতি বিরক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, যে চিকিৎসকের হৃদয় নাই, সে কখন ভাল চিকিৎসক হয় না। আমি বলিতাম, শোকটির যে হৃদয় নাই—এমন কোনও প্রমাণেব অভাব; বরং আমার বোধ হয় উহা বর্জিততার আবরণের মধ্যে কোমল হৃদয় প্রচ্ছন্ন আছে। আমার স্ত্রী বলিতেন, কে কি রকম? আমি হাসিয়া বলিতাম, “ধব না যেমন পেস্তা বা সাদাম।” তিনি বলিতেন, “যদি ফলের কথাই বলিলে, তবে আমি বলি, তোমার বড়টি বাঙ্গালার খেজুর; সবটাই শক্ত আঁটি, উপরে কেবল একটু মিষ্টার ও শিষ্টাচারের পাতলা শাঁস। তত্ত্বাবাসে দেখানাই ভাল, ধর-ব্যবহারের কিছু নহে!” আমি বলিতাম, “তা’ ধবব্যবহারেব ভাবনা ত তোমার আমার নাই; যে রূপ ভাব তাহাতে বেধি হয় কাহারও নাই।” গৃহিণী বলিতেন, “সেই ত কথা। যদি কাহাবও সে ভাবনার কারণ না থাকে, তবেই ভাল; নহিলে যদি কাহাবও জীবন হর্ষহ করিয়া থাকেন তবেই ত সর্বনাশ!” আমি ভাবিতাম, তাহাই কি? শোকটি ত একাই থাকে—সঙ্গে কেহ নাই; সত্যই কি বাঙ্গালীর ছেলে বিবাহ করে নাই; পবিবাবেও আর কেহ নাই? কিন্তু কোনও দিন স্বধীরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইতাম না।

সে ঘনিষ্ঠতায় অকারণ কৌতুহল নিবৃত্ত কবিবার অমিকার লাভ করা যায়, সে

ঘনিষ্ঠতার অবকাশ যে কখনই কাহাকেও দিত না। আমিও মনে কবিতাম, হুব হউক—ছাই—আমার সে কথায় কাজ কি? মানুষের জীবনের রহস্য ভেদ করিবার প্রয়াস কেন করিব?

এমনই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল—সুধীর আমার কাছে তেমনই রহস্যের আবরণে আপনাকে আবৃত করিয় রাখিল। সে আমার কাছে আপনাকে যে রহস্তে আবৃত রাখিল, আপনার কাছে অবশ্যই তাহাতে আবৃত রাখিতে পারিল না। তাহার মনের চাঞ্চল্য তাহার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ না করিলেও—আত্মেগিরির গলিত ধাতুধারা যেমন এক দিকে বাহির হইবার পথ না পাইলে আর এক দিকে বাহির হয়, তেমনই ভাবে তাহার মেহে আত্মপ্রকাশ করিল। যৌবনের শেষ হইতে না হইতেই জরাম পূর্ণ অধিকার তাহাব মেহে দেয়া দিল; তাহার কেশ স্বেত হইয়া গেল—তারার শরীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

৩

সে বার পূজার ছুটির পূর্বেই মা ‘মোটশ’ দিয়াছিলেন, তিনি আমার কর্মস্থানে আসিবেন, এবং আমাকেই তাঁহাকে লইয়া তীর্থভ্রমণ করাইয়া আনিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমার গৃহিণীরও উৎসাহের অভাব ছিল না। কাব্য, আমরা যতই কেন ‘কালাপাহাড়’ হই না, আমাদের অবিবাহেব প্রবাহ আমাদের অন্তঃপুরের প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বৈঠকখানাতে বা ডয়িংরুমের ছড়াইয়া পড়ে—“পদীর” পশাতে আমাদের-গৃহ সত্য সত্যই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের হৃদে হৃদে দুর্গ।

মাকে ও গৃহিণীকে লইয়া আমি তীর্থভ্রমণে বাহিষ হইলাম—আমার পক্ষে সে বেগারের দৌলতে গঙ্গানান। না যে স্থানেই যাইতেন, সেই স্থানে ‘ত্রিরাত্রি’ বাস করিতেন, কাজেই যখন আমরা কতকগুলি তীর্থ ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসিলাম, তখন আমি ফিরিবার জন্ত স্তম্ভ হইয়াছি। আমার প্রবন্ধ দেখিয়া মাও বলিতেছিলেন, “তোরা বড় কষ্ট হইতেছে; আর কাজ নাই, এইবার বাড়ী চল; ‘জগবন্ধ’ যদি ডাকেন, তবে বখের সময় প্রীক্ষেত্রে বাইব—এখন আর নহে।” আমার গৃহিণী কিছু বলিতেছিলেন, “তা হইবে না; একবার যেন বাহির হইয়াছি, তখন সব সারিয়া যাইব; আবার কি শীঘ্র বাহির হওয়া হইবে? বিশেষ, কবে কাহাব কি হয়, বলা যায় না।” কষ্টই বা কি? মস্তকের কান্দে টাকার লোভে যদি দিল্লী দিল্লী যাওয়া যায়, তবে আর আমাদের জন্ত ধর্ম্মের কাজে একটু কষ্ট সহ্য কবা যায় না?” শুনিয়া মা হাসিয়া বলিতেন, “তা দেখগড়া

তোমরা মীমাংসা কর।” কাছেই আমাকে একটা রফা বন্দোবস্ত করিতে হইল—বুন্দাবন হইতে, সকলকে মথুরা, গোবর্দ্ধন, গোকুল ও শ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দেখাইয়া আনিতে-হইবে। বুন্দাবনে থাকিবাবও সুবিধা ছিল। আমার মাতামহ-পরিবারেব, একটি “কুঞ্জ” ছিল। বাড়ীটি ভাল—যমুনার কূলেই অবস্থিত।

যে দিন আমরা বুন্দাবনে পৌঁছাইলাম, তাহার পবদিন প্রাতে গোবিন্দজীর ও গোপীনাথের মন্দির, সা’জীর ও লালা বাবুর মন্দির, সেবাকুঞ্জ বা নিকুঞ্জবন, এবং বংশীবট ঘুরিয়া আসিলাম; অপবাহে-বকবিহাবীর মন্দির দেখিয়া নন্দনমোহনের মন্দিরে দেবদর্শনান্তে ফিবিবার সময় পথিপার্শ্বে একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তথায় ঠাকুর দেখিয়া ফিরিবার সময় মন্দির-প্রাঙ্গণে একখানি শিলাফলকে কোদিঙ লিপিতে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল—

হংলী, কাঞ্চনপুৰ-নিবাসী

ক্ষেত্রনাথস্বয়ং শীতলাকান্ত রায়েব পুত্র

শ্রীস্বধীরচন্দ্র রায়েব সহধর্মিণী

নীলাভনয়নার-কল্যাণকামনায় ।

কাঞ্চনপুৰ-নিবাসী শীতলাকান্ত রায়েব পুত্র স্বধীরচন্দ্র ! এ ত আমাবই সতীর্থ স্বধীরচন্দ্র। তবে সে বিবাহিত? তাহাব পত্নী জীবিতা, না মৃত? জীবিতা হইলে কোথায়? এইরূপ নানা চিন্তায় যখন আমি ব্যাকুল, তখন মা ও গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস?” আমি পাথরখানা দেখাইয়া বলিলাম, “দেখিতেছি,—এ পাথরে আমাদের ডাক্তার স্বধীরের জীর নাম কোঁটা।” মা বলিলেন, “সে কি রে?” আমি বলিলাম, “তাই ত দেখিতেছি।” লোকটার জীবন যে রহস্তে আবৃত, মুষ্টি এইবার তাহা ভেদ করিতে পারিব।”

আমাদের ‘ব্রজবাসী’কে আমি লোকটির কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পুরোহিত বলিলেন, “দশ বার স্বন্দন-পূর্বে এই বুন্দাবনে আসিয়া এক জন যুবক বাঙ্গালী এই মন্দিরপ্রাঙ্গণ মন্দির প্রান্তরে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর একবার বা একাধিক বার বুন্দাবনে আসিয়া এই মন্দিরে পূজা দিয়া থাকেন।”

গৃহিণীর বিমিত দৃষ্টি আমার মুখে বদ্ধ হইয়াছিল। আমাব বিশ্বয় ক্রমেই—

বর্জিত হইতেছিল। নাস্তিক স্বধীর বৃন্দাবনে আসিয়া পূজা দেয়—যে বংশ ও জীব অস্তিত্বের কথা কাহাকেও অনুমান করিতে দেয় নাই, সে-ই জীব স্তুতিবাক্য বহুব্যয়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ মণ্ডরাস্তৃত-করিয়া দিয়াছে! এ কি রহস্য!

পুরোহিত বলিলেন, “আজ আমি সংবাদ পাইয়াছি, তিনি কাল বৃন্দাবনে আসিয়া কালই মন্দিরে পূজা দিবেন।”

পর দিন মথুরার বাইরা দেবদর্শনের পর সন্ধ্যাকালে বিশ্রামঘাটে আরতি দেখিব, স্থির করিয়াছিলাম। মা’কে বলিলাম, তাহা চুইবে না; পব দিলে আমি এই মন্দিরে আসিব, দেখিব—এ আমার স্বধীর কি না। মা বলিলেন, “ভাল; আমি কাল আর সব মন্দির দেখিতে যাইব।”

গৃহিণী বলিলেন, তিনি কিন্তু আমার সঙ্গে এই মন্দিরেই আসিবেন।

রাত্রিকালে উৎকণ্ঠায় আমার ভাল ঘুম হইল না।

পর দিন গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে যাইয়া দেখিলাম, তখনও স্বধীর আইসে নাই। পুরোহিত বলিলেন, সে অনতিবিলম্বে আসিবে! প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি তুলনীমঞ্চ—গৃহিণীকে তাহারই আড়ালে ছায়ায় এসে বসে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অল্পকণ পরেই স্বধীর আসিল। সে নম্রপদ—গাত্রে নামাবলী। সে আসিয়া সেই ক্ষোদিত প্রস্তরফলকের উপর উপবিষ্ট হইল। তখন তাহার দুই হাত আমার প্রতি পতিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি!”

আমি বলিলাম, “আমি মা’কে তীর্থ দর্শন করাইতে আনিয়াছি। কিন্তু তুমি—এখানে—এ বেশ—তুমি?”

“কেন; আমার কি এ স্থানে আসিতে নাই?”

“তুমি নাস্তিক—তোমার বিশ্বাসে ও তোমার ব্যবহারে সামঞ্জস্য কোথায়? তুমি এখানে কেন? তুমি কি বিবাহিত? তোমার জী কোথায়?”

স্বধীর কন মুহূর্ত নির্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, “তুমি? এ দগ্ধ জীবনের বেদনার বিবরণ শুনিবে?”

আমি কোনও উত্তর দিবার পূর্বেই সে যেন আপনাকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—

“আমি নাস্তিক। যদি সত্য সত্যই ঈশ্বর থাকেন, তবে কি তাহার বিধান সঙ্গেও মানুষ আমার মত ভুল কবিত্তে পাবে? পাবে না। তবে কি তিনি

পাইয়াছিল; সে গ্রহের প্রতি আমার আর বিন্দুমান আকর্ষণ ছিল না। আমি সঙ্গ করিয়াছিলাম, সে গ্রহে আর কিরিব না।

“মা পুনঃ পুনঃ বধুকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু আমার মত করাতে পারিলেন না। স্বস্তর-সহায়: পুনঃ পুনঃ আমাকে পত্র লিখিলেন, আমি উত্তর দিলাম না। মা আমাকে অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, যদি আমার স্বস্তরের কোনও অপরাধই হইরা থাকে, সেগুলি তাহার কঠোর দোষ দেওয়া যায় না। সে কঠোর ভরপূরণ করিতে আমি স্রোতঃ ধমকতঃ বন্দা। যদি আবার প্রাপ্তি থাকে, তিনি বধুকে একবার আনিয়া পাঠাইবেন না—কিন্তু আমি যেন তাহার বধুকে বরে আনি

তাহাতে নিন্দা তাহার, আর নিন্দা আমার। আমি বুঝি যে দেশে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে দেশের লোকনি আমার ব্যবহারে, মা মঙ্গীহতা হইলেন। তবুও আমার সঙ্গ এই সময় বড় আমার এক মেয়ের বিরোধে। মা পিতৃপিত্রালয় ও স্বস্তরালয় পাশাপাশি গ্রামে। তিনি ফিরি বলিলেন, তাহার বেহাইন তাহার সঙ্গে দেখা করিয়াছে কোনও অপরাধই হইরা থাকে, আমি কেন তাহা বন্দা করি বলিলেন; তিনি পিত্রালয়ে, জাহাজকালে বধুকে আনি এবং প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি বধুকে আনিবেন; তিনি সঙ্গ আনিবেন, কেবল ভান্ন মাস বলিয়া আনিতে পারেন নাই।

“মার দৃঢ় বিশ্বাস এই তাহার মেয়ের একমাত্র সমল পুত্র তাহার প্রতি প্রতির মর্যাদা রক্ষা করিবে। তাহাতে যে সে প্রাপ্তি করিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বিশ্বাসও আমি ভাবিয়া দিলাম। সবই আমার অদৃষ্ট বলিয়া। তাহাতে উঠিয়া গেলেন। তবুও আমার সঙ্গ চলিল না—আমি এমনই

এই বিশ্বাসভদের আঘাত মার পক্ষে কত বেদনার কারণ হইয়াছিল, তাহা অল্পভব করিবার যোগ্যতাও আমার ছিল না। যে শিক্ষার আমরা সে যোগ্যতাও অর্জন করিতে পারি না; আমরা আবার সেই শিক্ষার গুরু করি। আজ মনন সংসার মঙ্গলময় জীবন মানবদায় হইয়াছে, তখন বুঝিতেছি, আমি নন্দলবট অমঙ্গল পদাঘাতে হত করিয়াছি। কিন্তু আজ বুঝিয়া আর ফল কি?

“বেলা হইল। মা কিবিরে নাই। সংবাদ লইয়া ভৃত্য আসিল—মা আমাকে ঘাইতে বলিয়াছেন। পূর্বদিন মন্দির হইতে গৃহে কিবিয়া সকলে গোবন্ধনে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যাব পৰ যখন কিবিরেছেন, তখন আমার পত্নী অসুস্থ। রাত্রিতে রোগ বাড়িয়াছে—বিশুচিকা॥

“শুনিয়া মনে করিলাম; আজ প্রারম্ভিককাল সমাগত। আমি ব্যস্ত হইয়া ভৃত্যের সহগামী হইলাম।

“এক জন অনভিজ্ঞ অর্ধশিক্ষিত হোমিওপ্যাথকে ডাকিয়া চিকিৎসা করান হইতেছিল। আমি তাহাতে আপত্তি করিয়া দেহের শিবা কাটিয়া লবণাক্ত জল প্রবিষ্ট করাইয়া চিকিৎসার প্রত্যাব করিলাম। অস্ত্রপ্রয়োগে আমার হস্তের বড় ভয় ছিল; তিনি আপত্তি কবিয়া বলিলেন, বাহা হইবে, তাহা আমি বুঝিতেছি। এ সময় আর আনি কাটাছুটি করিতে দিব না।” আমি একটু ভ্রম করিতেই অভাগিনী হুহিতার প্রতি আমার দৃষ্টিবহারে তাহার সঙ্কিত অপমান ও অভিমান ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, বলে—জীয়েন্তে নয় ভাত কাপড়—মরে গেলে দানসাগর। আজ তুমি কেন মুখে আমার কন্ঠার চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার কথাব প্রতিবাদ করিতে আসিয়াছ? কথাটা অন্তঃস্ব সত্য—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যে আমার, আমি আপনার ব্যবহারে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিব। অধিকারও হাবাইয়াছি। আমি চিকিৎসক, আমাকে বসিয়া দেখিতে হইবে, কুচিকিৎসায় আমার সহস্রাঙ্গীর্ণ প্রণবিয়েগ হইতেছে। সে কি বাতনা।”

জীবনের হৃদয়ে সে দিনেব সেই বাতনা যেন আমার নূতন হইয়া উঠিল। সে সেই পামাথ্রাঙ্গণে বুটাইয়া কাঁদিল। তাহার পর সে একটু স্থির হইয়া বলিল—

“তাহার পর? সন্ধ্যা হইতে না হইতে সব ফুরাইল—সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সব সুখ—সব আশা, আমার পার্শ্বের জনলে পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল।

“বখন আশা, সুখ সব যায়, তখনও জীবন যায় না; তখনও দুর্বল জীবনভার বহন করিতে হয়। মা আর বৃন্দাবন হইতে ফিরিলেন না।—হুই—বৎসর পরে বৃন্দাবনেই দেহবক্ষা করিলেন।

“সে দিন—সেই দীর্ঘ দিন আমি মামুষের অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া যেমন

একান্তভাবে ভগবানকে ডাকিয়াছিলাম, সাবকও সমস্ত জীবনে তেমন করিয়া ডাকিতে পারেন না। কিন্তু কই—অন্ধকারে আলোককে কোনও চিহ্নই পাইলাম না—নিঃস্বপ্নতার কোনও শব্দই আমার শ্রবণগোচর হইল না। সেই দিন ভগবান আমার বিশ্বাস শেষ হইয়াছে।

“আমি নাস্তিক; কিন্তু ভক্ত যেমন মনে করে, সে এই দেবতার দর্শনেই সৰ্ব্বপাপমুক্ত—পূর্ণকাম হয়, তেমনই বাহার দর্শনে আমার মোহাফকাব বুচিয়া গিয়াছিল—আমি নূতন-জীবনে জাগিয়া মানুষের বাহা সত্য ও সুন্দর, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম, তাঁহার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করিবার যোগ্যতাও আমি সেই দিন এই দেবমন্দিরে পাঁড়াইয়া লাভ করিয়া গিয়াছি।”

পূজার সর আয়োজন হইয়াছে বলিতে আসিয়া ‘ব্রজবানী’ ও পূজাবী অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বধীর তাঁহাদের সঙ্গে দেউলে চলিয়া গেল।

আমার স্ত্রী তুলসীস্বকের অন্তরাল হইতে আসিলেন—দেখিলাম, তাঁহার চক্ষু ছট্টি-ক্রন্দনশীল। তিনি আসিয়া স্বধীরের পদীর নানাখিত প্রস্তুতের ধুনি শইরা মন্তকে দিলেন; বলিলেন, “জীবনে তুমি দুঃখ কষ্ট পাইয়াও অশ্রুতে পতিতপ্রেমে নারীর ধর্ম রক্ষা করিয়াছ; ধর্ম আত্ম তোমাকে এতাদৃশ পুণ্যবান দিরাছে; তাই মৃত্যুতে তুমি যে-পতিপ্রেম পাইয়াছ, তাহা অক্ষয় ও অমৃত্যু।”

ঐহেনেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আমার দুই দুঃখবতী গাভী।

[স্বর্গীর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিপিভ।]

সংসারে আমার আর কিছু থাকুক বা না থাকুক; দুইটী দুঃখবতী গাভী আছে। তাহাদের একটার নাম—

অহেভুকী হিংসা।

এক অপরিচীত নাম—

নিকাম নিলা।

আমার এই গাভীদ্বয় জ্বরভি-তুলা। অহরহ, অযাচিত ভাবে, ইহা আমাকে অতি-উপাদেয় গব্যরস-পান করায়। আমি স্বর্গীর গুণে পবিপূর্ণ হই।

বলে, সংসাবে সুখ নাই! সংসাবে আমি যথেষ্ট সুখী—মাহার-পব-নাই
নী! অহেতুকী হিংসা এবং নিকাম নিন্দা নারী চিরদুঃখবতী গবী ছুইটাই
আমাব অক্ষয় সুখ ও অনন্ত শান্তির নিদানীভূত হইয়া সংসারকে স্বর্গতুল্য
করিয়াছে।

শাস্ত্রকণ্ঠা বা সত্যই কহিয়াছেন,—নিকাম কর্মেই সুখ। আমি নিকাম
কর্মী। কেন না, কামনারহিত হইয়া, বিনা কারণে, আমি লোকের কুংসা
কবি—কলঙ্ক রটাই—‘অঘটন-পটীরসী’ প্রভায় পর-নিন্দা সংঘটন করিয়া, আমি
তাহার আলোচনা ও ঘোষণা কবি। পরন্তু, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-কাম হইয়া,
অহেতুক ভাবে, আমি পব-হিংসা রূপ পুণ্য-কাণ্ডে অষ্টপ্রহর রত থাকি।

অতএব, এই নিকাম কর্মজনিত আত্মপ্রসাদ রূপ পবমানন্দে আমি নিয়ন্ত
ভাসমান আছি। সংসারে আমি সুখী! সত্যই সুখী। সর্বদাই সুখী।
সর্বতোভাবে সুখী।

অহেতুকী হিংসা, আমার অতি রক্ষ হবিষ্যামকে ও দ্বিতান্ত পলান্দে ও স্থানিষ্ট
পায়সানে পবিত্র করে। অর্দ্ধাশনে ও অনশনে থাকিয়াও, আমি উহার
দেব-চরিত্র দুখে, পরিপুষ্ট হই। আমার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহাভ্যন্তরে দিবা
জ্যোতির্ময়, স্বকুমার, কনক-কাস্তি বিভাসিত হইয়া, হিংসা-রসের হেন-হিম্মোলে
তেনিয়া ছলিয়া ক্রীড়া কবে।

পরন্তু, অপরা পয়স্বিনী—নিকাম-নিন্দা, নিয়ত আমার নিকট নন্দনকানন
ফুটাইয়া রাখিয়াছে। আমি তাহার সুধাবিনিলী নির্মল গব্যামৃতের আশ্বাদে
অণুক্ষণই আনন্দ-কুণ্ডে নিমগ্ন রহিয়াছি। মরি! কি অনির্বচনীয় অমুগম
আরাম!

আমাব ছই গাভী একই বজ্জুতে আবদ্ধ। একটিকে স্ববণ কবিলে,
তাহাবা উভয়ই একত্র আনিয়া, আমাব সম্মুখে উপস্থিত হয়। স্বরণ না
করিলেও, ইহারা আপনা হইতেই আমার অমুগামিনী হইয়া থাকে। আমাব
শ্রীতি-বজ্জুতে ইহারা আবদ্ধ; আমাব পালনে, পবিচর্যায় ইহারা পরিতুষ্ট ও
সুস্তপুষ্ট; আমার সোহাগ-সন্তর্পণে ও আদরের অবিচলিত আকর্ষণে এই গাভীর
আমার একান্ত অমুগত।

বামে নিন্দা, দক্ষিণে হিংসা—কভু বা দক্ষিণে নিন্দা, বামে হিংসা; স্মরণ-
সুগল সর্বদাই সম্মুখে থাকিয়া আমাব সেবা করিতেছে। আমি সেবিত হইয়া
ইহাদের সেবা করিতেছি। যেন বিহু বৈক্য নধম!

আমার যুগ্ম গবী-বন্ধ, কভু উন্নত শৃঙ্গ উত্তোলন কবিয়া দণ্ডায়মান। হবি !

কি মন্থণ, কি তীক্ষ্ণ, কি সবল,—সবলে কিবা অল্পপম, অপক্লপ, বন্ধিম, স্বধাম-
স্বশ্রী, 'সেমিটি কাল' ও সমুন্নত—আহা!—ইহাদের শৃঙ্গ! অতুল্য

স্বতীক্ষ্ণ ও স্বচিক্ণ সূচ্যগ্রনর্ভ—সূচ-শরীরবিনিদী শৃঙ্গাভাগ! শৃঙ্গ দ্বারা

অম্মার এই সোহাগিনী সুরভিষয় গিরি-শরীর বিদীর্ণ—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কবে,

অতুল্য অভ্রদৌ গিরি-শ্রেষ্ঠ দ্বল গিরির শৃঙ্গকেও উৎপাটিত, অবনীত, ধূলায়

লুপ্তিত ও পদদলিত করে !

উন্নত শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, কভু ইহা বা দণ্ডায়মান ; কভু বা বিলাসানেশে

বিভোর হইয়া আমার দুই পাশ্বে ছ'টাতে শয়না ; আহা ! কভু বিচরণ

করিতেছে—কভু শয়নে থাকিরা চর্ষণ ও রোনহন করিতেছে। হবিন-ময়না

হিংসা ও নিরুপমা নিন্দার আহারোদগাব কবিয়া ধীরে ধীরে বোমহন

আহা ! এই বোমহনের 'বিটপ্পেক্টিপ' বল যে কি স্বধাসম স্বস্বাহ, তাহা কেবা

জানি ; আব সংসাবেব যে সাধু মহাশয়গণ এই নিদাম বন্ধের কমা,

জানেন !

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, সর্বত্রই আবাব এই গাভীদয় বিচরণ করে। ত্রিসংসারে

এমন স্থান বিবল, যে স্থানে ইহা বা চরে না। অমব-ভুবন হইতে নব-নিকেতন

তীহারও নিম্নতর, নিম্নতর তোরণ, তথা প্রাসাদচূড় হইতে পরঃপ্রাণীক

কর্মকুড় ও সত্রাটেব স্বর্ণমণিব হইতে কাঞ্চালের পর্নকুট্র, কোথায় আবাব

জ্বালী দুইটির গতিবিধি নাই ? গন্ধ-ভ্রাণেই, অম্মদীর গবীদয় দূরে নিকটে

সর্বদিকে গমন করে, এবং স্বখাণ্ডমাত্রেবই সব মন্থন ও সাব মল্লন কবিয়া

আমাকে দুঃখরূপে দান কবে। আমি সেই অমৃত পীযুষ দুই হস্তে দোহন কবি।

তাহার চর্ক্য চোষা লেখ পেয় প্রস্তুত করিরা, একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বাৰা এবে

একে ও একত্রে আশ্বাদ লই। আমাব কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি আঃ

এক অল্পপম স্বাদ-সাররে সম্ভরণ দিতে থাকে !

আমার গবীদয় জ্ঞাতব ও বনিস্ত, উদ্ভিদ চেতন ও অচেতন, আশ্বিন ও

নিরামিষ, আমায় ও সিদ্ধান্ত, সর্ববিধ বস্তুই সর্বপ্রকার অবস্থায়, আশ্বাদ ও

উন্নয়নাং, উদগার ও পোনাঃপোনিক চর্ষণ কবিত্তে পাবে। তবে ঐ সকল

পদার্থের মধ্যে যাহা স্বখাণ্ড ও স্বকুমাণ্ড খাণ্ড, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া ভক্ষণ ও

বোমহন কবে। আমাব হস্তমুখী হিংসা-নিন্দার 'দন্ত রুচিব' লোহ, প্রস্তুত,

কৃষ্ণ-পৃষ্ঠকেও পুণিপিষ্টবৎ বা নধর নব দূর্বাদলবৎ চর্ষণ কবিত্তে পাবে,—

চর্চা করে। ইহারা আমার সমস্তোষার্ধ-সর্ব ভূতেই চরে। আমি ইহাদের
শ্রম চুষন, গাভ কণ্ড রন ও শুল্ক লেহন করিয়া হৃষ্ট দোহন করি।

আমি সেবা ইহারাও সেবক। সুবত্তি গবীষয়কে আশ্রয় দিয়া ও উহাদের
শাস্ত্রে থাকিয়া অনবরত নিকাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি। কায়ধেহুধর
ক্রোণগতই আমার গাত্রে উপব নিকাম কর্ম আনিয়া দিতেছে। আমি কামনা
হইয়া তাহা সম্পূর্ণ করিতেছি।

কায়মনোবাক্যে, গমনে, উপবেশনে, কথোপকথনে, আগরণে, পরনে,
স্বপনে, সর্বত্র সকল অবস্থাতেই আমি নিকাম কর্মী। সর্বত্র সকল অবস্থাতেই
আমি হব্য গব্য দ্বারা হিংসাব সেবা করি। আমি নিদ্রাতেও নিকাম নিদ্রা
নিদ্রাধাসন করিয়া থাকি।

—অহো! নিকাম কর্ম আমার কোথায় নয়! স্নুমুখী সুরভির সেবা
কিসে নয়!

আচারে বিচারে, প্রচারে, ব্যবহারে, ধর্ম-সাধনে, নীতি-সঞ্চালনে, জ্ঞানে
বিজ্ঞানে, গ্রন্থে, মন্ত্রে, তন্ত্রে, গল্প-গাজায়, বক্তৃতা-মালায়, পুস্তক পুস্তিকায়, কাব্য,
উপন্যাস নাটকের পত্রে পত্রে, সংবাদ-পত্রের ছত্রে ছত্রে, আমি নিকাম কর্মের
অনুষ্ঠান করিয়া গাভীযুগলকে চরাই। আমার নিকাম ধর্মের এই সকল
কর্মক্ষেত্রে, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরে, চর্ষণ ও-রোমন্থন করে।
কতকালে, তাহাদের স্বত-বিগলিত অমৃতোপম অজস্র হৃষ্টধাবায়, আমার নিকাম-
কর্ম-নিচয় সিদ্ধ হইয়া এক অতি অপক্লপ শ্রী ও অপূর্ণ সৌভাগ্য বিস্তার করিতে
থাকে। আনন্দে আমি আনন্দহাবা হই; পৃথিবী পুলকিত হয়। গৃধ্রবীর
লোক পবিপুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইয়া, আমাকে 'পুণ্য-শ্লোক' বলিয়া সাধুবাদ করে।

সর্ব্বদেই আমার নিকাম কর্মক্ষেত্র; অতএব আমার গবীষয়ের চাবণ-
ভূমি। তবে এই স্নুমুখীতে সংবাদপত্রই আমার সবিশেষ নিকাম
কর্ম-ভূমি। অতএব আমার কামধেহুযুগলেরও চর্ষণ ও বিচরণের ক্ষেত্র।
তাহারা প্রতি দিন এবং প্রতি সপ্তাহে আমার নিকাম কর্মের সাহচর্যে সংবাদ-
পত্র রূপ পুণ্যক্ষেত্রে প্রাত্যহিক সাপ্তাহিকাদি বিপুল ও বিনোদ ক্ষেত্রে নব-
নব শ্রমণ শ্রমণ কোমল দুর্দাদল, তুণরাজি, কাঁচা পাকা শস্ত-শিয় ও ফুল মুকুল
খুটিয়া খুটিয়া ধায়, আব আমার হৃষ্ট দান করে। আমি এই পবিত্র হৃষ্টে
দেব-সেবা করি, দোল হুগোৎসব করি, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাই, মন্দির
প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপক বিদায় কবি; এক কথাই, ঐ হই গাভীর হৃষ্টেব দ্বার

আমি আনাব নিকান যন্ত্রের সাধন ও উদ্বাপন করিয়া কৃতার্থ হই, এবং সে অর্থ
তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করি।

যন্ত্র-ফল নিজে ভোগ করিবার জন্য আমি যন্ত্র কবি না। যন্ত্র-ফল 'সকল
যন্ত্রেশ্বর হবি'কে বিনা নোটসেই নিবেদন করিয়া দিই।

সংবাদপত্র আমার নিকাম ব্রত।

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃদভারঃ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সপ্তকামি-যুগে যুগে।

এ যুগে আমি সমাচারপত্রের সম্পাদক ও সত্বাধিকারিকণে জগতে অবতীর্ণ।
সমাচারপত্র আমার যন্ত্রক্ষেত্র—আমার উদ্ধার-ব্রতের বিরটি কর্ম ভূমি—
অহেতুকী হিংসা ও নিকাম নিন্দা নারী গোঁরবাঘিতা গবীঘ্ন সেই যন্ত্রের কাম-
ধেম্। এই ধেম্ভয়রের সাহচর্যে ও সহায়তায়—গব্যো ও হব্যো আমি নর-নারীর
সম্মান-মেধ-যজ্ঞাস্থান করি। যন্ত্রের জ্যোতি জগৎ আলোকিত ও চারুন-
পুলকিত করিয়াছে। পাপরাজ্য পবিত্রীকৃত হইতেছে; পৃথিবী পূর্ণাঙ্গ-
দ্রাবিতা হইয়া-পুণ্য-ক্ষেত্রে পবিণত হইতেছে। আমার সমাচারপত্র রূপ যন্ত্র-
কুণ্ড হইতে কৌস্তভ অমৃত ও উচ্চৈশ্রবাদি উৎসর্গ হইতেছে। আমি পুনঃ পুনঃ
কবিয়া সেই স্তমহান হোম-কুণ্ডে নরের নাক-কাণ ও নারীর সম্মান আত্ম-
দিত্তেছি। আবার পালে পাগে উচ্চৈশ্রবাদি আকাশে উড়িতেছে। 'শ্রী' স্বাক্ষর
কাকে বৃক্ষ-শাখে সমারোহণ করিয়া লম্প লম্প করিতেছে;—অহো! যন্ত্র-ক-
কলসে কলসে, কানেস্তাবে কানেস্তারে, পিপাস পিপাস অমৃত উদ্ধার কবিত্তেছে।
পাইপে পাইপে, (প্রেজেন্টেসনের প্রেসারে) জম্বুদ্বীপের আক্রমণ-
সেই স্তম্ভমূর্ত সঞ্চালিত হইতেছে। জম্বুদ্বীপী সে পীযুষ পান করিয়া পবন-
মূর্ত্য কবিত্তেছে।

এ যুগে সংবাদপত্রের পবিত্র যন্ত্রেব দ্বারা সাধুব পরিভ্রাণ ও হৃদভার দমন
করিয়া আমি ভূভার হরণ করিব।

ভবে, সিডিসন-সংহিতা সংশোধিত হইয়াছে, এবং লাইবেল 'ল' আছে
বটে। তা হউক। আমি নিকাম অবতার; উহার আমার ঈঙ্গিত ও উদ্ভার
উদ্ধারের অন্তরায় হইবে না। আমি উহাদের একের ধামা অবিবর্তই ধারণ করিয়া
আছি, এবং অবস্থা বুদ্ধিগ্ন অপরের পদলেহন ও পয়জার-ভক্ষণ বা শ্রীগুণে দমন
করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমার নিকাম কর্ম কোনও আইনেই
আটকাইয়া রাখিতে পারে না।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোন কোনটা আমার নিকাম কর্ম। উত্তর,
কোনটা আমার নিকাম কর্ম নয়? সকাম আমার কিছুই নাই। সবই দণ্ড
নিকান। পান-ভোজন হইতে *** প্রতারণা ও পবনভূতাপহরণ, এ সবই
আমার নিকাম কর্ম। কেন না, এ সবই আমি কামনা-বিবাহিত হইয়া করি।

দাতারামের ছগোৎসব ।

১

চাপচাপুসের দাতারাম সরকারের বাড়ীতে ছগোৎসব হইবে জনিয়া গ্রামের লোকেরা যেকপ বিষয় অল্পতব কবিল, পুর্নের স্বর্ঘ্য পশ্চিমে উদিত হইয়াছে দেখিলেও তাহাবা তরুণ বিষয় বোধ করিত কি না সন্দেহ । কেন না, গ্রামের সকলেই জানিত, দাতারামের না বাপ ভ্রমক্রমেই ছেলেব নাম দাতারাম রাখিয়া-
ছিল, তৎপরিবর্তে কল্পধরাম নাম রাখিলেই তাহার নামেব নহিত কার্যের ঠিক সাধিত থাকিত ।

গ্রামেব নখে দাতারাম সরকারেব প্রসিদ্ধ মহাজন ছিলেন । রাত্রি দ্বিপ্রহরে শ্রিয় হাত পাতিলে তিনি নগদ দশ হাজার টাকা গণিয়া দিতে পারিতেন । তিনি যে টাকা পয়সা একবাব সিন্দুকে তুলিতেন, খাতকের প্রয়োজন হইলে তাহা আর স্বর্ঘ্যালোক দেখিতে পাইত না । তবে তিনি পয়সা সিন্দুকে তুলিতেন না ; টাকা, সিকি, ছমানী, আধুলীবই সিন্দুকে উঠিবার অধিকার ছিল । এ জন্ম তিনি নিয়ম কবিয়াছিলেন, সাত পয়সার অধিক পাওনা হইলে তিনি কাহাবও নিকট খুচরা পয়সা লইবেন না । এই খুচরা পয়সাতেই গায় সংসার চলিত । যে দিন পয়সার আমদানী হইত না, সে দিন ধারকর্জ হাদিয়া সংসারেব দৈনিক খবচ চালাইতেন, তথাপি ছমানীর ধনীত হাত লইতেন না ।

সম্রাটে জাহার বিধবা ভগ্নী স্তম্ভজা ছাড়া আর কেহ ছিল না । স্ত্রী অনেক দিনেই গতাস্ব হইয়াছিলেন । তখনও দাতারামের বিবাহের বয়স যায় নাই ; পাড়ীবও অভাব ছিল না । অভাব ছিল শুধু দাতারামের বিবাহ করিবাব ইচ্ছার । পুনরায় দাবপরিগ্রহ করিয়া তিনি গলগ্রহ জুটাইতে এবং অনর্থক পোষ্যসংখ্যা বন্ধিত কবিত্তে বাঞ্জী ছিলেন না ।

ভগ্নী বিধবা, একাহাবী ; নিজেও পরম হিন্দু, মৎস্ত মাংস স্পর্শ কবিতেন না । স্তম্ভরায় সংসার অতি সহজেই চলিয়া যাইত । খাতকদের ফেলতর মাগ, বেগুন, কঁচু, কাঁচকলার কল্যাণে নিরামিমাশী দাতারামের আহাধোব চুচু কিছুমাত্র চিন্তা ছি না ।

পরম হিন্দু হইলেও দাতারাম কতকগুলো বিষয়ে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যগণের সমস্তর অনুসোদন করিতেন । যেমন, ভিধাবীকে মুষ্টি ভিক্ষা দিলে সমাজে অশ্রুসভাব প্রস্তর দেওরা হয় । দৈব বা পিতৃকার্যে অর্থব্যয় কেবল অলস স্বাপ্ন জাতিব উদরপূরণমাত্র, ইত্যাদি । এই হতে দৃঢ় আস্থা থাকিলেও

বিক্রমসুখে দাতারাম বলিলেন, "আব তোমার কথাটা এই বুঝি শুন
না হ'লো?"

হুতদ্রা বলিল, "আমি এমন কি মল কথা ব'লেছি? বছরে একটা দিন.

পুরুষকে একটু জলপিণ্ডী দেবে না?"

বিরক্তির নহিক দাতারাম বলিলেন, "এই যে পনবোটা দিন ধ'রে চোদ্দ

বকে আঁজলা আঁজলা লল দিলাম। এতেও কি তাঁদের পেট ভরে না?"

শিতপুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেও দাতারাম তর্পণটা

নিমিত্তরূপে কবিতেন। বিনা আয়াসে প্রাপ্ত দুই অঞ্জলি জল দিলে যদি

সমস্যাকর তৃপ্তি হয়, তবে তাহা দিতে ক্ষতি কি?

হুতদ্রা মুখ ভার কবিতা বলিল, "চোদ্দপুরুষের পেট ভরেছে কি না, তা

আমি জান। পুরুতঠাকুর ব'লে গেলেন, তাই বলছি।"

করুটা করিয়া দাতারাম বলিলেন, "ব'লে গেলেই ত হ'লো না। শ্রাদ্ধ

কবে কি ক'বে, আঁজ তো নিরামিয়া করা হয় নি?"

হুতদ্রা গালে হাত দিয়া বলিল, "ও না, তুমি আবার কবে মাছ খাও না না,

আলাশ নিরামিয়া করতে হবে?"

দাতারাম ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "মাছ খাই না ব'লে কি নিরামিয়া করতে

হবে না? শুধু মাছই খাট না, কলায়ের ডাল বাই, পুঁইশাক খাই, এগুলো তো

মানুষ? সেই হাঁড়ীতে ত খেয়েছি?"

হুতদ্রা বলিল, "তা প্রাতঃস্নান করলেই হবে।"

দাতারাম বলিলেন, "হাঁ, অল্প আমিষ খেয়ে কাল প্রাতঃস্নান কখনোই

হবে না। সব নাস্তিকের কথা, বাকিখ মতলব। আমার দ্বারা ও সব নাস্তিকের

স্বপ্ন হবে না।"

হুতদ্রা রাগিয়া মাথা দাড়িয়া বলিল, "নাস্তিকের কাছও হবে না, আন্তিকের

কাছও হবে না। আদম কথা, পয়সা খবচ কবতে পারবে না।"

ভয়ীর রাগ দেখিয়া দাতারাম একটু হাসিলেন; বলিলেন, "দুয় পোড়ান-

নি, পয়সা শ্রবচকে কি আমি ভয় কবি? কি জানি, ও সব কাঁকি

আমার মন খাঁর না। তা, তুই যখন বাগ করছিস, তখন একটা

কথা উদ্ধৃতা করা যাবে।"

হুতদ্রা নিভাসা কবিল, "বাত কি খাবে?"

দাতারাম বলিলেন, "শিউ না। ভূমি উদ্ভূতা, এও ত এক বকম জাদ।

এই সময় কিছুটা গা-না।"

সুভদ্রা বুলিল, দাদা এক বেলা উপবাস দিমা-তোষোৎসবের বতকটা নাশ্র-করিলেন। আর দাদার শরীফ এক সেব চাউল দিবে, কি আধ সেব চাউল দিবে, গমিছা একখানা কিনিলে-কি না, কিনিলেও তাহা দেড় হাতি কি দুই হাতি লওয়া হইবে, দক্ষিণা চার পয়সা কি দুই পয়সা দেওয়া উচিত, এই সকল ভাবিয়া একটা হিসাব নিকাশ করিতে লাগিলেন। হিন্দু যখন স্থির হইল, তখন রাজি প্রায়-তিন গ্রহণ। মুসলিম স্থির করিয়া শেষ-রাজিতে দাতারাম ঘুমাইয়া পড়িলেন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন পশ্চিমাসীমা আসিরা দরজার কোলাহল আরম্ভ করিয়াছে।

৩

দাতারামকে দেখিয়া, এবং তাঁহার ভীষণ ক্রুদ্ধ লক্ষ্য কবিতা প্রতীতিয়া যখন একে একে সরিয়া পড়িল, তখন দাতারাম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন “হুঁসি, হুঁসি!”

সুভদ্রা সম্মুখে আসিরা বলিল, “কেন দাদা?”

ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে ভয়ীক মুখের দিকে চাহিয়া দাতারাম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,

“এ সব কি কাণ্ড কারখানা?”

সুভদ্রা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, “কি জানি।”

দাতারাম দাঁত মুখ খিঁচাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “কি জানি?”

“জানি জান না, আমি জানি না, তবে জানবে কে? ও পাড়ার শব্দ?”

সুভদ্রা নিকন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ

করিয়া বলিলেন, “এখন এই নিয়ে কি করা যায়?”

সুভদ্রা বলিল, “ঠাকুর নিয়ে আবে কি করে? পূজো কববে?”

দাতারাম রাগিয়া বলিলেন, “পূজো? কে পূজো কববে?”

সুভদ্রা বলিল, “কে আবার? তুমি।”

দাতারাম বিস্ময়ে পহিত বলিয়া উঠিলেন, “আমি? হুঁসি বলিস কি হুঁসি,

আমি গোসাঁদের শিখি, আমি শক্তিপূজা করবো?”

সুভদ্রা চিবুকে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া বলিল, “ওমা, তুমি আবার গোসাঁদের

শিখি হ’লে কবে দাদা?”

দাতারাম বলিলেন, “কবে কি? আমার সাক্ষ পুরুষ গোসাঁদের শিখি।”

সুভদ্রা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম বলিলেন, “আব কবে

কি হবে, ভুই এক দিক পশু, আমি এক দিক ধরি! ধরে পুরুষের জলে
ফেলে দিয়ে আসি।”

হুতরা বিস্ময়ভরিতকণ্ঠে বলিল, “যা কি দাদা? যা ধরে এসেছেন, তাঁকে
জলে ফেলে দেবে?”

বুঝলী করিয়া দাতারাম বলিলেন, “তা নয় ত কি ধরে তুলে কৃষ্ণচন্দন
দিয়ে পূজা করবো?”

তীর্থধরে হুতরা বলিল, “তা কববে কেন, সিন্দূরের পূজো করবে।
গলায় দড়ি দাও দাদা।”

রাসে হুতরা ঠক ঠক করিয়া ভাঁপিতে লাগিল। দাতারাম মুদ্র হাসিলেন;
বলিলেন, “এই পোড়ারমুখী বেগে মরছে। আরে! এ কি তোর মনসা-পূজো,
সিন্দূর-পূজো, এ হুগোংসব। বাবা! তা ভুই না পারিস, আমি নিজেই ফেলে
দিবো আসছি।”

হুতরা বলিল, “তা দাও, কিন্তু লোকে একঘরে কববে, তা জেনো।”

দাতারাম বলিলেন, “তবে আমি ভরেই সারা হ'লাম। আমি কোনও
বেটা-বেটীকে ঘরে পাত পাড়তে চাই না, কোনও বেটা বেটীকে বাড়ীতে পাত
নাড়াতেও চাই না।”

হুতরা দাতার মুখের উপর তীর্থ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।
দাতারাম বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দাতারাম ঠাকুর ফেলিয়া দিব্য কণ্ঠ মুখে বলিলেন বটে, কিন্তু কারো
তাঁহা করিতে সাহসী হইলেন না। সমাজ-শাসনের ভয় আসিয়া বাধা দিল।
দেবতার এই অবমাননা হিন্দুসমাজ কখনই সহ করিবে না; সমাজ তাঁহাকে
ঈর্ষণ মতে দণ্ডিত করিবে। তাঁহাও হোপা, নাপিত, হাঁকা বন্ধ হইবে; নিমজ্জন
জামজম-রদ হইবে; সমাজ তাঁহার সহিত সর্বপ্রকার সংজব ত্যাগ করিবে।
তাঁহার পরমা থাকিলেও, গ্রামের অনেকের মহাজন হইলেও, সমাজ তাঁহাকে
ছাড়িয়া দিবে না। গ্রামে একজন হাড়ীও যে সম্মান পায়, সে সম্মান হইতেও
তিনি বঞ্চিত হইবেন।

দাতারাম ইহা জানিতেন; জানিতেন বলিয়াই তিনি ঠাকুর ফেলিয়া দিব্য
সম্মত ত্যাগ করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি পুরোহিতের সঙ্গে
পরামর্শ করিতে চলিলেন।

সম্মোহিত কিন্তু যে ফর্দ দিলেন, তাহা দেখিয়া দাতারামের চকুস্তির হইল।

সে যে প্রায় ছয় মাস টাকার ফের। কদেব অনেক কম করিলেও, বেশ হাসি-
হাপুড়কে ছয় হাতি করিলেও, দেড় মাস টাকার কমে কিছুতেই হইবে না।

দাতাবাম বাসিন্দা বলিলেন, “আমি এত টাকা খরচ কবতে পারব না।”

পুৰোহিত বলিলেন, “এব কমে চূর্ণোৎসব হয় না।”

দাতা। না হয়, আমি ঠাকুর জলে ফেসে দিব।

ঈশ্বর হাঙ্গিয়া পুৰোহিত বলিলেন, “দে উপায় থাকলে তুমি ঠাকুর কণ্ঠে
গাওতে না।”

দাতাবাম রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, “আমনি পুৰোহিত ক'লেই
আপনার কাছে এসেছি। বজ্রমানেব হিত করাই পুৰোহিতের কর্তব্য।”

পুৰোহিত বলিলেন, “আনি তোমায় অহিত চিন্তা করি নানি।”

দাতা। তাই বুঝি তুমি টাকার লক্ষ্য বদল দিলেন ?

পুৰো। চূর্ণোৎসব কলির অশ্রবণ, তুমি টাকা কি বেশী খরচ হ'লো ?

দাতা। আপনাদের গল্ফে বেশী নয়, কেন না, আপনাবা পাবেন -

শাফে দেখি, কেন না, আমার দিতে হবে।

পুৰোহিত চুপ করিয়া রহিলেন। দাতাবাম বলিলেন, “এত-তাল
কল মুদো—এ সব কি হবে ? না কি পাবেন ?”

পুৰোহিত ঈশ্বরকৃপাভাবে বলিলেন, “মাকে খাওয়াবার দোভাঙ্গা তোমার
আমার নাই দাতাবাম।”

দাতা। নাই ত এ সব কেন ?

পুৰো। শান্তে বিধান।

দাতা। হুই বিধান ! যাঁব এত টাকা নাই, দে কি মায়েব পুণ্য কবো -

পুৰো। অনন্যবৈব গল্ফে বিধান সচ্ছন্দ্রপ।

দাতাবাম অকুটী করিয়া বলিলেন, “আর আমিই বুঝি সনব ? কেন -

দাতে দাত দিয়ে কোনও বকমে ছ'টো পয়সা সফর ক'বেছি বলে
বুঝি ?”

দাতাবামেব সহিত তর্কবিতর্ক বুধা বিবেচনাম পুৰোহিত নিরস্তব বহিঃ -

দাতাবাম জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, “তা হবে না পুত্রে ত মনো -

শান্তর কেবল আপনারাই খে জানেন, তা নয় ; আমিও জানি। মায়েব পুণ্যের

ও সফলের কোনও দবকাব নাই। বামপেসারি কি বলে গেছেন, আমেন ক -

‘আপনার চাল মান শব্দ কেন কাল কি দে। হাব আত্মতান, তুমি ত -

হয়। পান করিয়ে তুষ্ট করা আপন মনে।' এ যে সে শোকের অঙ্গ, —

সাধক বামপ্রদ্রোহের তুলনায় নিলে ববি কেউ বঁধতেন।"

পুৰোহিত বলিলেন, "বায়ুপ্রসাদের সে ভক্তি ছিল, আনাদের তা নাই।"

দাতারাম বলিলেন, "ভতটা না থাকে, কিছুও ত আছে। বাসু, গাছের ফুল, বেলপাতা, গুরুবের ফল, আর মসেব ভক্তি, এই হ'লেই যথেষ্ট। এই দিয়েই আমি মাসেব পূজো করবো।"

দাতারাম সহবপদে বাড়ীতে ফিৰিলেন। স্বভদ্রাকে ডাকিয়া উৎফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "না সুবি, আর ভুলে ফেলে কাজ নাই। মা মণন এসেছেন, তখন দাতারাম পূজোটা করাই দরকার। অভাঙ্গী কপালে আব ত কিছু হ'লো।

না, হবেও না; ভাল, মাসেব পায়ে এক আঁজলা ফুল গদাজলই দেওয়া যাক।"

দাতারাম যতিপবিত্রদর্শনে স্বভদ্রাব বিশ্বেষের সীমা-বহির্ভূত না। তখন তাই ভদ্রীতে ধরাধরি করিয়া প্রতিনাকে চণ্ডীনুগুপে তোলা হইল।

স্বভদ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে দাদা, কিছু ঢাল ধান করতে হবে তো?"

হাত নাড়িয়া দাতারাম বলিলেন, "না না, সে সব কিছুই করতে হবে না।"

বিস্ময়ে সূহিত স্বভদ্রা বদিল, "তবে কিসে কি হবে?"

দাতারাম বলিলেন, "ফুল তুমি বেলপাতা, এই হ'লেই যথেষ্ট। তুই যেতে-মাসেব, কিছুই তো বসিস না। বামপেসাদের গান শুনি' নি?" বলিয়া দাতারাম ও ওন করিয়া গায়িতে লাগিলেন,—

"আলো ঢাল আর পাকা কলা কাট কি রে ভেঁদে আয়োজনে,

তুমি ভক্তিস্বধা—মন বে আমার—ভক্তিস্বধা পান করিয়ে

তুষ্ট কর আপন মনে।"

৪

দ্বিতীয় দিন সকালে পুৰোহিত কল্লারম্ভ কবিত্তে আসিয়া দেখিলেন, বাশীহুত ফুল বিবপত্র, আর এক ঘড়া গলাজল ছাড়া পূজার অস্ত কোনও উপকরণই নাই। পুৰোহিত স্বভদ্রাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ও স্বভদ্রা, পূজার নৈবেদ্য কোথায়?"

স্বভদ্রা মুখ দিরাইয়া বলিল, "আনি আনি না, দাদাকে জিজ্ঞাসা কর না।"

দাতারাম অনুরূপে বসিয়াছিলেন, স্বভদ্রা তাহাকে আব জিজ্ঞাসা করিবার আয়োজন হইল না। তিনি উদ্ভিন্ন আসিয়া বলিলেন, "নৈবেদ্য আনি কি হবে?"

পুরোহিত বলিলেন, “নৈবেদ্য না দিলে তি দিতে পুজা হয় না।”

দাতারাম উত্তর করিলেন, “ফুল, গন্ধাজল, আর তর্পিত।”

দাতারাম মুখে বাহা বলিয়াছিল, কাজও যে তাইই করিবে, পুরোহিত তাহা ভাবেন-নাহি। সুতরাং দাতারামের উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত কিছুকিছু ত্রাস দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাতারাম সহান্তে বলিলেন, “ভালো বাঁধা এ আর কারো পূজা নয়, দাতারামের পূজা। দাতারাম মাঝে মাঝে কখনো খেতে দেয় না। জানেন ভ, রামপেসাদি কি বলে গেছে—“জগৎ তে বাওয়ার রে মন মিছবী আদি—”

বাধা দিয়া পুরোহিত বলিলেন, “শ শতানকে বাই গেতে দিও, শতানের উচিত থাকে কিছু খেতে দেওয়া।”

দৃঢ়স্বরে দাতারাম বলিলেন, “নিশ্চয় দেব। যা যা ভালবাসেন, “মন তাই দেব।”

গম্ভীরকণ্ঠে পুরোহিত বলিলেন, “ভাই দিতে পারবেন দাতারাম?”

মাথা ঝুঁকু করিয়া গর্বকীর্তকণ্ঠে দাতারাম উত্তর করিলেন, “পারি কি না দেখে যাবেন।”

সুভদ্রা নিকট এক মুঠা আলো চাপ তাহিরা লইয়া পুরোহিতকে বলিলেন।

প্রতিমা গায়ে বস্ত্র পাড়াইয়াছিল, কিন্তু সাজ দেওয়া হয় নাই।

বলিল, “হাঁ দাদা, মাকে সাজাবে না?”

দাতারাম বলিলেন, “কি? ডাকের গয়না দিয়ে? হু, হু, রামপেসাদি কি বলেছে জানিন্?” বলিয়া দাতারাম গান ধরিলেন,—

“জগৎকে যে সাজায় বে মন। দিয়ে দীরে অহর মুকোদান।

তুই কোন্ প্রাণে সাজাবি মাকে দিয়ে ছান ডাকের গহনা।”

দাতারাম কতকগুলো স্থলপদ্ম, অনারাজিতা প্রভৃতি আনিয়া প্রতিমা সাজাইতে বসিলেন। সাজান শেষ হইলে দাতারাম গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন,—
“ও সুবি! মা কেমন সেজেছে—মেখে মা।”

সুভদ্রা দেখিল, ডাকের সাজ অপেক্ষা ফুলের সাজে মনোহর মত, এবং বেশ ভালই লাগিয়াছে। সে দাতারাম ব্যক্তিত্বটা নিশ্চয় চটকি ছাড়া কণ্ঠে বলিল, “বেশ সেজেছে দাদা।”

দাতারাম আপনার নৈশুণ্যে আপনি যুগে হইল প্রতিমার দিকে চাহিয়া
চাহিয়া বলিলেন, “সত্যি সুখি, ঠিক মনে মনেই দেখাচ্ছে।”

সন্ধ্যার দিন সকালে ঘুম ভাঙিতেই দাতারাম ভাড়াভাড়ি বাহিরে আসিয়া
বসিলেন, চতুর্থপেদের উঠানে এক পাল ছেনে আসিয়া জমিয়াছে, তাহানের
শরদ-কোলাহলে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে; শারদ-সপ্তমীর স্নিগ্ধ প্রভাতালোকে
যেন হাসিয়া উঠিয়াছে; ধবে বাহিবে, আকাশে বাতাসে, সর্বত্রই যেন
একটা আনন্দের ধাবা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; বাস্তা দিগা নিতাই বৈরাগী এক-
প্রকার সুখের সঙ্গে গাঙিতে গাঙিতে চলিয়াছে,

“উঠ উঠ গিরি, পোহালো শরুবা,
গোরা আমার আঙ্গি এসেছে।”

দাতারামের বৃকের ভিতরটা যেন কেমন কবিতা উঠিল।

পুরোহিত তখন পত্রিকা-প্রবেশ করাইয়া প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে

বসিলেন। দাতারাম প্রতিমার দিকে দিবিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, প্রতিমার
শরদ মধুর হাসির বেগা! মাটির পুকুলের মুখে এমন মিষ্ট হাসি,
যখন আনন্দের উজ্জ্বল্য কি থাকিতে পারে? তবে কি গোলা আত্ম সত্যই
দাতারামের বৃকের ভিতর হইতে কে যেন মুখবিস্কলভাবে
উঠিল, “সত্যি কি তুমি এসেছিস্ মা?” দাতারাম ভয়ে বিস্ময়ে নির্ঝাক!

পুরোহিত নগ্নমাপুঞ্জা শেষ করিলেন। পূজার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত
দাতারাম এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিতের গভীর-
সংস্কারিত মস্তগুলা তাহার কাণে যেন নূতন সুরে বাজিতে লাগিল। টাকার
বিন্দু-বিন্দু শব্দ অপেক্ষা জগতে মিষ্ট সুর আর কিছুই নাই; কিন্তু এই অপার্থিব
সুরের নিকট সে সুখও বৃথা প্রবাসিত হয়। দাতারাম প্রতিমার সুখের উপর
দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনমুগ্ধের ভাষা সেট স্বর্গীয় সুখ ভূমিতে লাগিলেন।

পূজা-পেয়ে দাতারাম অগ্রগতি দিতে বসিলেন। পুরোহিত উদাস্ত গম্ভীর
কণ্ঠে অঙ্গলিমানের মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন,—

“যতোহং কৃতকৃতোহং সফলং জীবনং মম।

আগতালি যতো হর্মে নাহেখবি সদাশ্রমম্।

মঙ্গলীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।

যৎ পুজিতং মম দেবি পবিত্রং তদস্তু মে॥”

পুৰোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রের আবৃত্তি করিতে কবিতে দাতারামের সর্বশরীর
কণ্টকিত, কণ্ঠ গদগদ হইয়া আসিল।

এক কক্ষকেশ মলিনবসন ভিখারিণী আসিয়া করুণকণ্ঠে ডাকিল, “জয়
হোক বাবা, কিছু খেতে দাও বাবা।”

পুৰোহিত ডাকিলেন, “দাতাবান!”

দাতারাম চমকিয়া উঠিলেন। পুৰোহিত বলিলেন, “মা খেতে চাইছেন
দাতারাম, মাকে খেতে দাও।”

দাতারাম বিশ্বম্পূর্ণ দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে ক্রমিতে বাত্রকণ্ঠে
বলিলেন, “এ্যা, মা খেতে চাইছেন? মা কৈ?”

পুৰোহিত উঠানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিলেন।

দাতারাম বলিলেন, “ও তে—ভিখারিণী।”

গম্ভীরকণ্ঠে পুৰোহিত বলিলেন, “মা আমার বিশ্বরূপিণী, বিশ্বই মাতার
রূপ দাতাবান। এ মাতার মৃন্ময়ী নৃতি, আব ই দেখে মায়ের চিন্ময়ী মৃন্ময়ী
মৃন্ময়ী মাকে কিছু খেতে দাও নাই, এবাব চিন্ময়ী মা এসেছেন, মাও খেতে
দাও দাতারাম।”

ভিখারিণী বলিল, “মা এসেছেন, কিছু খেতে দাও বাবা।”

দাতারামের সর্বশরীর ভয়ে বিষ্ময়ে-বোম্বাফিত হইল। তিনি কক্ষকেশ
একবার ভিখারিণীর দিকে, আর ঐকান্ত প্রতীক্ষার দিকে চাহিতে লাগিলেন।
দেখিলেন, অন্নপ্রার্থিনী ভিখারিণীর মুখে যে হাসি, ভক্তিপ্রার্থিনী মাতার মুখেও
সেই মৃদু মধুর হাসি! ভিখারিণী করুণকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছে, “মা এসেছেন,
কিছু খেতে দাও বাবা।” মাও যেন তেমনিই হাসিমুখে প্রার্থনান হইতে
বলিতেছেন, “আমি এসেছি দাতারাম, কিছু খেতে দাও।” দাও দাতারাম
মা খাইতে চাহিতেছেন, বিশ্বরূপিণী মাকে খাওয়া হৃষ্ট কর।

দাতারাম উন্মত্তের স্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “হুবি, হুবি!”

প্রায় শতাধিক ভিখারী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পশ্চাতে
তাহাদের প্রেরক সেই প্রত্যাখ্যাত ছোড়াব দল। ভিখারীরা উচকণ্ঠে
বলিল, “জয় হোক বাবা, কিছু খেতে পাই বাবা।” যেন বিশ্বের অনন্ত কণ্ঠ
হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল, “কিছু খেতে পাই বাবা।”

দাতাবান উচকণ্ঠে ডাকিলেন, “হুবি, হুবি!”

স্বভজা ছুটিয়া আসিল। দাতারাম কোমরের বুননী হইতে দিশেকের লম্বা

পুলিয়া ভাটার সম্মুখে ফেলিয়া দিগেন ; ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, “টাকা নিয়ে আস-
সবি, মাকে খেতে দিতে হবে।”

হতভায়া বিশ্বয়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাতারাম উচ্চকণ্ঠে
বলিলেন, “শীগগীর না, ভোড়া নিয়ে আসবি। একটা নয়, দু’টো। দু’টো
চাবটে না পাবিস্—নিয়ে আয়।”

হতভায়া চাবি কুড়াইয়া লইয়া ক্রতপদে চলিয়া গেল। ছোড়ার দল বিশ্বয়ে
নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুরোহিত প্রতিমার দিকে চাহিয়া যুক্তকরে
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—

“সর্বস্ত বুদ্ধিরূপেণ জনস্ত ছদি সংস্থিতে ।

স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥”

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ।

প্রবাসী । আশ্বিন ।—ঐসময়েকদশ বার শুণ্ডের ‘মধুসূদন’ নামক ছবিখানি স্থলর :

রঙ্গের ও রেখার কবিতা। ইহাতে ‘ভারতীয় চিত্রকলা’র অত্যুচ্চ ও উপহাস নাই।

শ্রীমদ্রামায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ‘ইতিহাসের ধারা’ নামক ছটিপিত্ত প্রবর্তিত পড়িয়া আনন্দ

উৎস হইয়াছে, অনেক শিখিয়াছি।—লেখক চিত্রাঙ্কিত, কৃতবিদ্যা, পরিভ্রমী। বাঙ্গালা সাহিত্যের

লেখায় তাঁহার আগ্রহ আছে। মাতৃভাষার পুন্ডর প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি যোগ্যতার পরিচয়

প্রদান করেন। তাঁহার সাধনা সফল হউক।—দুঃখের বিষয় এই যে, নব-ব্রতীদিগকে বাঙ্গালা

সাহিত্যে আগমনের পথ আপনি করিয়া লইতে হয়। এ দেশে সম্প্রদায় নাই, রচনার আচার্য্য

শিক্ষানবীরকে বাঙ্গালা ভাষার গাঢ় ও প্রকৃতির সহিত পরিচিত করিয়া দেন না। লিখিতে

লিখিতে লিখিতে হয়। এই অল্প শক্তিশালী নব-ব্রতীদের রচনাও বাঙ্গালা ভাষার রীতি হইতে

অত্যন্ত অন্তরিত হইয়া পড়ে। ‘ইতিহাসের ধারা’ প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়া উচিত। কিন্তু

এমন তথ্যপূর্ণ রচনাটি নবল বাঙ্গালী সমানভাবে উপভোগ্য করিতে পারিবেন না। ‘কোনও

দেশের প্রাচীন যুগের কথার বিষয় আলোচনা বা চর্চা করিতে হইলে সকলের চেয়ে বেশী

প্রাণীকরী ও উপযোগী উপাদান হইতেছে সামান্য নিজে ঘাঘা বলিয়া গিয়াছে’ *** ‘কিন্তু

এই উপাদান আমাদের পূর্ব প্রাচীন যুগে লইয়া যায় না।’ ইহা বাঙ্গালা রচনা-রীতির অনুরূপ

নহে। অতএব, ‘একো হি বোঝো জনসম্মিপাতে নিরক্ষরীমোঃ কিরণেধিবাকঃ’ কিন্তু এমন

অনুরূপের রচনার ক্ষমতাযে বেশি হইবে দুঃখ হয় না। শ্রীকৃষ্ণমোহন দেন ‘কলঙ্গী’ প্রবন্ধে হিন্দী

কবিগণ 'কবিতা' করিয়াছেন, এবং ইতিহাস দিয়াছেন। কাঙ্গালি সাহিত্যে

নাহি। দেহের পরিচয় পাইবার উপায় নাই। এই শব্দের প্রত্যেক স্তম্ভে পূর্ণ হইতে

ইনিও নৃত্য লেখক। বেশ শুধাইয়া লেখেন। 'ভিন্নকৃষ্টি' শোক' চারি চব্বিশের

একটি স্ববিতা ও প্রচীত-ছবি—স্বব উদ্ভব—পূর্ণ নিটোয় না হইলে ভাল লাগে না।

স্বকিণী স্বাধ, আমি পিয়ে লব' নিত্যন্ত গদ্য। 'দিয়ে লব' একবার লক্ষ্য! ইতিহাস

কৌশলীর 'ভাষ্যগান' চলনসই গদ্য। 'আলোকনয়' ক্রীড়ামেলন ব্যয় নিপুণভাবে

কালক্রীড়ার কবিতা—গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। যোগেশবাবুর মতে, 'ভ' কোনও

'ভ' হইতে অধিকার করিতে পারে না। 'তিনি বলিতেছেন—'আমি রেণু; আমি

কমিতে পাই। শান্তি মহাশয় গোড়ায়; গোড় মেলেও কি শু পুরণাছা প্রবল হইয়াও

ডি.এ.ই.রা ভাঙিয়া স্ব-বেচারাও প্রবল বি-ও-ডা-ই-রা পাইয়া ফেলিয়াছে।' ইতিহাস

কৌশলীর 'ভাষ্যগান' নামক গল্পে কালক্রীড়ার বিশেষত্ব নাই। 'কালক্রীড়ার

স্বকিণী-চরিত্র প্রবল উদ্ভব। ইনি ইংরেজ ও স্বতন্ত্র স্বকিণী-চরিত্র, দেহ

কাল হইতে বহুত্ব দিল্লীতে কবিগণ। যোগেশবাবুর মতে, 'ভ' কোনও

ছবি। 'স্বকিণীর ভীক কালক্রীড়ার ছোট্ট ছবি পাখাগুলি দেবদত্তগণে টানি

'বিদ্যেতে হার আপন-দুঃখনি খণ্ড খণ্ড ভুলে কুতায়।' কালক্রীড়ার

একাদশী-কবিতাও নয়, পাঁচালীও নয়, ছড়াও নয়। ইহা কি, তাহা

অগত্যা 'নেতি নেতি'র পথেই ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'অনুভব' না

করিলে ইহা দেখা হইত। 'কল' ও 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা পরিচয় দিয়াছে। 'কল'ইহা

দেখিতে—বাঁধি বাহা স্বত্বে দেখিয়াছি, বা স্বকর্মে শুনিয়াছি, তাহান বিপরীত কথা কেহ

করিলেই সে যে নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, এমন কথা বলা যাব না। কতক সর্ব জিনিস সকলের

ইচ্ছাপ্রবণতা হয় না, সকলে সব জিনিস একই ভাবে দেখে না বা শুনে না। আমবা উভয়

দলের কার্যের মধ্যেই চাতুরী, এবং ভাল ও মন্দ দুই দেখিতেছি।' চক্ষু ও কর্ণের দান্য

দারদার ফেলিয়া দিয়া, বাহা দেখিয়াছি, বা শুনিয়াছি, তাহাকে 'মিথ্যা' ভাবিব, এবং বাহা

দেখি নাই, বা শুনি নাই, তাহাকে 'সত্য' বলিয়া মানিবা লইব ? 'প্রব সত্য' সম্বন্ধে 'প্রবাসী'র

বিধান চলুক, তাহাতে আগতি করিব না ; কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে চোখে শাধা দেখিলে তাহাকে

কালো বলিব, এবং দেখের দোড়া জানিয়া শুনিয়া শুধু মলাফলির খাতিরে ডাঙা মিথ্যা কথা

বালিলে, এবং গলিতপ্রস্ত, চশমা-চক্ষু বর্ধধরজীরা গরজের খাতিরে তাহার সমর্থন করিলে,

কি নীতিব খাফিলে, সেই নির্জলা মিথ্যাকে 'সত্য' বলিবা মানিবা লইব, এবং শিরোধার্য

করিব ? আবার এই আত্মপ্রত্যাহার সমর্থনের ক্ষমতা মর্শন ও বিজ্ঞানের আমদানী করিবা

ভাবিতে বসিব,—'সব জিনিস সকলের ইচ্ছাপ্রবণতা হয় না ?' কারণ,—'সকলে এক জিনি

এক ভাবে দেখে না, বা শুনে না।' এরূপের খাতিরে ? অস্বাভাবিক অনুবোধ ? সোচ্চ

গাধা কথা দুই জনে দুই বদম তুলিবে ? 'অন্যহত ক্ষমি' সম্বন্ধে হয় ত এ কথা খাতিতে পারে

কিন্তু 'নির্জলা মিথ্যা' সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। কেবল মিথ্যা পদার্থাতের বোঝা আশ্রয়

এই যে, রামানন্দ বাবুর মত এক মন শিক্ষিত নীতিবাগীশের পক্ষেও মিথ্যার এমন ওকালতী

দেখিতে হইল। এমন 'monstrous' উপদেশ ও নিরাজ ওকালতী সাহিত্যে আর কখনও

দেখি নাই। রামানন্দ বাবু কংগ্রেসের বিরোধে 'ধরি শাহ, না ছুই পাকি' নীতির অনুসরণ

করিতেন। ইহা ম্ভবুতির কাছ হইতে পারে, কিন্তু নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের পক্ষে কোনও

মতেই শোভন নহে। শেষ সিদ্ধান্ত—উভয় দলের কার্যের মধ্যেই চাতুরী এবং ভাল ও মন্দ দুইই

দেখিতেছি।' এমন 'সাপটা' নির্দেশ না করিলেই ভাল হইত। 'উভয় দলের 'চাতুরী এবং ভাল

ও মন্দ' দেখাইয়া দিয়া উভয় পক্ষকেই আত্মপন-সমর্থনের অবকাশ দিলে, সত্যের ও সত্যের

সমাধা রক্ষিত হইত। নিত্যানন্দের ভাবটা—অর্থাৎ, 'মেয়েছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি

প্রেম দিব না' মন্দ নহে। কিন্তু তাহার খাতিরেও মিথ্যার—জালার—সংস্কার তপট্ভার—

অন্যদিক্ত ভীকতার সমর্থন করা য়া না ; কংগ্রেসের খাতিরেও নহে, স্বপ্নের তত্ত্বও নহে।

কারণ মিথ্যা বাহার ভিত্তি, তাহা কখনও সাক্ষ্যে চরিতার্থ হইতে পারে না। 'বিবিধ অঙ্গদে'

সত্য কথা বলিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। তাই তাহাতে সহসা এই মন-রাধা কথাও 'মু

কুম বলায় রাখিবার' চেষ্টা দেখিয়া ছুই একটা কথা বলিতে হইল। 'সাম্প্রদায়িক মনতা মন্দ

নহে ; কিন্তু তাহার ফলে যদি সত্যনির্দেশ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে 'সর্বসে ভাদা চুপ'

নীতির অনুসরণই কর্তব্য। 'সাপও মরিবে, লাজিও তাদিবে না', এমন ভাবে এ সকল কথা

বলিতে নাই। 'শান্ত মানুস চাই' প্রত্যেক বাঙ্গালীর পড়া উচিত। কিন্তু 'চোরগের' নীচেই

কি অস্ত্রকার থাকিবে ? শস্ত সম্প্রদায় কি আশ্রয়ের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক নহে ?

প্রতিজ্ঞা। আশ্রয়।—শ্রীঅনিবার্য সমুদায়ের 'দুইভেনের সাত্যকার' ওকাল

উল্লেখযোগ্য নিষেধ। হঠাৎই শ্রী ও বর্গ ও তাঁহার রচনা 'সংস্কৃত' নানা ভাষা জানা যায়। 'সংস্কৃত' নাট্যকাণ্ডের দৃষ্টকাব্যগুলির বিস্তৃত পরিচয় মিলে ভাল হয়। 'সীমন্তেন' অবধি 'শ্রী' যোগেশচন্দ্র বাবু সান্দি হইয়া যায় দিয়াছেন,—১। পুস্তকের নাম সীমন্তেন, বা পৌরুষ-বিজয়? আমার বোধ হয়, চুই-ই ঠিক। তবে বোধ হয়, আদি কবি গৌরকবির রচনা ছিলেন। পরে বিবধ অনুসারে সীমন্তেন নাম হইয়াছিল। রামায়ণ লঙ্কাবাণে (সেনন বলা যায়, রাবণ-বধও তেমন বলিতে পারা যায়। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে সীমন্তেনের যোগসংশোধন করা আছে। সেখানে আছে,

দরোজা সম্মুখে এক ঢোল বাজাইয়া।

চেৎ মহম্মদ পোখী আয়া ইহাই বলিয়া ॥

'চেৎ মহম্মদ' বলা যাই, 'সীমন্তেন' বলাও তাহা। ২। পুথীখানি চট্টগ্রামের কিং প্রতাপাভাট। বরং বোধ হয়, মূল পশ্চিমবঙ্গে রচিত হইয়া পূর্ণিগদ ও চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল। একখানি অন্তত ও গুণিত পুথী বেথিয়া পথনির্দেশে সোজা নহে। আশা করি, রাঢ়ের হিন্দু চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল। আমি ইতিহাসবেত্তা নই; তবে কবির দেওয়া এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে। এমনও হইতে পারে, মূল পুথী রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে গিয়া উত্তরে গিয়াছিল।

৩। বেচারি কবির ভগিনী পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারই মধ্যে কে অধি?—নিম্নে বর্ণনা করা যায়—
 'সীমন্তেন' যেমন ছাপা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট সংস্করণ গ্রহণ করিলে, কয়দুয়ার সংস্করণ বলিতে হয়। 'শ্রীমন্তেন' সেনগুপ্তের 'প্রাচীন ভারত ব্যাকরণ' নামক উপায়ে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধটির ভূতীয় প্রভাবে পূর্ণিগদ অঙ্কুর আছে। 'সংস্কৃত' কবিতা—সুতরাং ইহাতে কবির পিতামহ আবির্ভাব হইয়াছে।—'গভীর নীল বাস'—
 'হাসি যখন ফুটে উঠে ছায়াপথের প্রেমা।' ছায়াপথের হাসি নয়, তাহার তেজ হাসি, বাস্তবিক,—কবির বাস্তব মিথ্যা হইবার নহে।—বিজ্ঞানশালায় সেই গানটি গানে পড়ে—
 'হাসি চেপে রাখতে পারে কোম—' সীমন্তী ইন্দুবালা সেনের 'বিশ্বব্রহ্ম বিদ্যামঙ্গল' উপভোগ্য। দেশের নবোন্মত্ততার প্রাদেশিক রূপের পরিচয় এই ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া, সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপকরণ সাহিত্যে সঞ্চিত হইতে পারে। প্রাদেশিক মানস-তুলিক আয়তনের স্তূপে পরিণত না করিয়া এইরূপ তথ্য আধার করিলে সাহিত্যের বপ্তে শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। গদ্য লিপিকা মোপাসাঁর বীজিলোপ করিবার, বা 'কবিতা লিপিকা' রবীন্দ্রনাথ হইবার সৌভাগ্য বিধাতা সকলের লজাটে লিখিয়া দেন নাই। কিন্তু ভুল চেষ্টায় এরূপ ভাষা-সংগ্রহ সম্ভব। তাহাও আবশ্যিক। সাহিত্যে তাহার মুদ্রাও অল্প নহে। শ্রীঅধিনীকুমার সেন 'শাক্য' ভাষার প্রথম ব্যাকরণে লিখিয়াছেন,—'এই ব্যাকরণ রচনা করিতে হইলেই হইবে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুস্তকখানি পঠন করিলেই তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধ হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি কয়েকটি ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া—এই বাস্তব ব্যাকরণ রচনা করেন।' এই আদর্শ ববে আমরা গ্রহণ করিব? কবে আমরা প্রসঙ্গপ্রসিদ্ধ ছাড়াই সাহিত্যের হৃদ

কৃষ্ণের জন্ত পরিশ্রম করিতে লিখিব : কীৰ্ত্তনশেষের মুখোপাধায় 'বীরপুজা' কবিতা-
 'মুখোপাধায় পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ঈদোমেন্দ্রকুমার দত্তের 'মাতৃভূমি' কবিতার পদ্য
 কবিতায় নৈবভেদে—'উৎকলিনীপতি হর্ষ নিকাদিত্যের দেহতাপসংবাদে।—এ নংবার কি
 এক দিন পরে কবির কর্ণগোচর হইল ? কবির সন্দেহনা প্রশসনীয়। 'প্রবাসী'তে এক দস্ত
 'কবি' 'দোহোদো একাদশী' দেখিয়া চোখে লব। দিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী
 কবির এমনই কই-মাধের না, চক্ষু এমন শুক যে, এত চেষ্টা মধ্যেও সোরোখার একটা হুতাও
 দেখে নাই। আর এক দস্ত চট্টগ্রামে বসিয়া কান্নারের অতীত গোক 'স্বরণ করিয়া কাঁদিবার
 চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাও থিয়েটারের কাণায় পরিণত হইয়াছে।
 'স্বাধী পাঠক সম্প্রদায়কে বলি,—তেমিরেও 'কাঁদো কাঁদো,—জয়ভূমির সে এক দরিদ্র কবি।'
 দরিদ্র—ভাবদরিদ্র। ইতি মল্লিনাথ। ঈশভরচরণ চক্রবর্তী 'দোহোদো' সংস্কৃত-পাঠ্যের
 'কৌতূহল চরিতার্থ করিবে। সংস্কৃত ভাবার নহিত বীহাদের সামান্য পরিচয় আছে, মল্লিনাথ
 'কাঁদোদের সুপরিচিত—মল্লিনাথ শুধু ব্যাখ্যাকার নন, ভাবুক।—'মল্লিনাথ বালাচৌবনে
 নিরতিশয় দুর্ভ ছিলেন। তজ্জন্ত সকলই তাহাকে পোষ বলিয়া ভ্রান্তি। * * * * * বিশ বৎসর
 বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কানীধামে প্রস্থান করেন। * * * সেই মল্লিনাথই উত্তরকালে মানা বিধ
 'কাঁদো' সুপরিচিত হইয়া কাব্য শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার বলিয়া সর্বত্র হুশং লাভ করিয়া গিয়া-
 'হেন।—মল্লিনাথের নামের পূর্বে 'কোলাচল' নাম সংস্কৃত দেখা যায়। কোলাচল রাজ্যমাহেন্দ্রী
 'জিলায় একটা গ্রামের নাম। মল্লিনাথ উক্ত কোলাচলে প্রাক্রিয়াই টীকা-সমূহ প্রণয়ন করেন
 বলিয়া তিনি 'কোলাচল মল্লিনাথ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'অশোকের প্রতি কুণালে'
 কোনও বিশেষত্ব নাই। বার্থ রচনা। ঈদোমেন্দ্রকুমার দত্তের 'বীরপুজা'ও তথৈবচ। 'দেবল-ঈশ্রী' পতি
 'ঈদোমেন্দ্রকুমার' 'অতিথি' হইতে একটি বিশেষত্ব 'মিমা বাহির করিয়াছি—'তত্ত্ব অধরে ধরে
 'কব' ধরে 'অতিথি' হইয়া 'দস্ত'। 'নামে হয় না বটে, কিন্তু সজা হয়।—'হায়—নিমে দস্ত এমন
 কবিতা পড়িতে পাইল না। 'হায়' তিনটা ধরে 'কত' হইয়া, একবার কুৎ করিয়া দেখ।
 'ঈদোমেন্দ্রকুমার' 'প্রতিভা ও চারলনোতি' সারবান, দার্শনিক নিবন্ধ। উচ্চ হেট্টের
 রচনা।

বৈষ্ণব-কবিতা।

প্রত্যেক দেশে এরূপ কতকগুলি সামগ্রী থাকে, তাহা সেই দেশের স্বাভাবিক বস্তু। সেই দেশের বৃহৎ কোনও পাদপের আশ্রয় তাহা। দীর্ঘকাল দেশের আপামর সাধারণকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব শ্যায় তাহা রোপিত সাস্থনা, আনন্দের আসবে তাহা হাসি ও কৌতুকের নিকর, নৈরাশ্র তাহা আশা, এবং দুঃখের সময় তাহা নির্ভর। যদিও ধর্মের দ্বারা তাহা বহু ভক্ত, আর্জ ও হৃদয়বান লোকের অশ্রু দ্বারা পবিত্র।

প্রত্যেক দেশের ধর্ম তাহার পক্ষে সেইরূপ সামগ্রী। বহু যুগের কাব্য কথাও সেইরূপ আশ্রয় এক সামগ্রী। আমাদের দেশের ধর্ম, কাব্য ও সাহিত্য আমাদের নিকট এই হিসাবে পবিত্র, প্রাণপ্রিয়। আমরা যদি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস শোণ করিয়া ফেলিতে চাই, তবেই ইহাদের সর্বত্র সন্ধান বিচ্যুত হইতে চাহিব। যে দিন হইতে এসিয়ার পশ্চিমাংশ মুসলমান-দ্বারা দাস্তিত্ব হইয়াছে, সেই অবধি তাহার পূর্বের ইতিহাস মুছিয়া গিয়াছে। ইউরোপে গ্রীক ও রোম ছাড়া অপবাপর জাতিরা তাহাদের ইতিহাস শোণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। গীক ও রোমক জাতিও তাহাদের প্রাচীন ধর্ম ও কাব্যসাহিত্যকে দূর হইতে অপবিত্রিতের প্রদান করিয়াছে, তাহাদের সহিত যে আস্তবিক যোগ ছিল, তাহা আর তাহাদের নাই।

আমাদের ধর্ম, কাব্য ও সাহিত্য ঠিক খ্রীষ্টপূর্ব গ্রীক কি রোমক জাতির ধর্ম ও সাহিত্যের মত নহে। বেদের সঙ্গে উপনিষদের, উপনিষদের সঙ্গে পৌরাণিক ধর্মের, এবং পৌরাণিক ধর্মের সহিত আধুনিক ভাবশ্রোতের একটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রহিয়াছে। যদি এ সমস্ত বিদায় করিয়া নূতন 'মিশ্রমানব' পদবী গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই মানবক সভ্যতার হিসাবে নগণ্য শিল্প হইয়া দাঁড়াইবে; কাবণ, যাহার যত বড় প্রতিভাই থাকুক না কেন, বহুদূরব্যাপী জাতীয় প্রতিভার নিকট তাহা তুচ্ছ। বর্তমান প্রতিভা যদি যুগব্যাপিনী হইয়া তপস্তার ফলস্বরূপ না হয়, কিংবা যদি তাহা পূর্বতন জাতীয় তপস্তাকে অগ্রাহ্য করিয়া দাঁড়াইতে চাহে, তবে তাহা বিফল হইবে। বসোয়ার গোপালেশ্বর এ দেশে সেরূপ আশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করিতে পারিবে না। কেহ যদি

এ দেশের নিভূতে বসোবাব অল্পকরণে একটু জমী প্রস্তুত করিবা কৃত্রিম আলো ও বায়ুর সাহায্যে হৃদ-মুদ্র ছই একটা ফুল জন্মাইতে পারে, তবে বসোবাবানীরা সেই কলম ও তাহাব ফুল পরীক্ষাপূর্বক অবশ্যই সাক্ষ্য দিবেন যে, ইহা তাহাদের দেশের গোলাপের জাতীয় বটে, বহুদেশে সেই নমুনাব কিছু উৎপাদন করিবার তত্ত্ব মালীকে উৎসাহ, এমন কি, পুৰস্কারও তাঁহাব দিতে পারিবেন; কিন্তু সেই প্রশংসাব স্থায়ী মূল্য কি? গোলাপের সেই চাবাটা ঠিক কলসারারও নহে; এ দেশেরও নহে; উহা কোথাও চিন্তন প্রভিষ্ঠা পাইবে বলিয়া বোধ হয় না। যদি জাতীয় ভাবের রসে পুষ্ট না হইয়া প্রতিভা স্বাতন্ত্র্য বলপূৰ্ব্বক-করে, তবে তাহা পরালুকরণের শক্তি দাবা যতই কেন সাময়িক প্রশংসা লাভ করুক না, সে প্রতিষ্ঠা স্থায়ী না হইবাবই কথা।

যে সাহিত্য দেশের যুগযুগপিনী সাধনার ফলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে শ্রাবজ্ঞা করিয়া, বা তাহা পদলিখিত করিয়া, স্বীয় বিক্রম দেখাইবার চেষ্টা কবিত্তে পারে ছই শ্রেণীর লোক,—বাতুল ও বাগক—সেই সাধনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা হইতে জাতীয় মহত্বের বিশ্লেষণ করা তদপেক্ষা কঠিনতর ও প্রশংসার্হ জার্য। এই দেশের বৈষ্ণব-সাহিত্য হিমালয় অথবা বঙ্গোপসাগরের ত্রায়ুই নিরাচি। আমি এই দেশের অধিবাসী, এবং এই বসের মধ্যে চিরদিন অভিবিক্ত হইয়া আছি বলিয়াই আমি সেই বসের প্রকৃত বিচার করিবার অধিকারী, এমন স্পর্ধাব কোনও কারণ নাই। জন্মাবধি যে গিণ্ডিনিকা ত্রকটা শাল কি শাল্লীর শাখায় শাখায় বেড়াইতেছে, সে কি সেই তরুণের পবিমাণ জানে? জন্মাবধি যে শফরী হ্রদে কি তড়াগে সম্ভরণ করিতেছে, সে কি সেই জলবাসিব তরুণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে? আনবা বাহাব মধ্যে আছি, তাহা যে আনাদের অপেক্ষা কত বড়, তাহার ইয়ত্তা করা অনেক সময় সহজ হয় না। তরুকের ছটা চক্ষু যাহা দেখিতে পার, পৃথিবীটা তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, তরুণ সে যদি তাহার অগ্রমেয় দিশান মাতৃভূমিব এক পার্শ্বে পদাঘাত করিয়া মনে কবে, তাহাব পদভবে পৃথিবীটা কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবে তাহাকে কৌতুকের বিষয় ছাড়া অত কিছু মনে করা উচিত নহে।

কোনও কালে কোনও যুগে হয় ত সূর্য্যদেব ভাবতবর্ষের একমাত্র কিংবা প্রধান উপায় দেবতা ছিলেন। তখন তাঁহার কথা লইয়া লোকে উৎসব করিত। তাঁহার পূর্ব্বরাগ, তাঁহার নৌকাবিহার ও নিবাহ প্রভৃতি লইয়া লোকে গান গাধিত। দেবগ গান ও ছড়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন অধ্যায়ে অনেক

পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক সময়ে সম্ভবতঃ ‘বিষ্ণু’ শব্দে সূর্য্যকে বুঝাইত; এমন কি, বাল্মীকির সময়েও বোধ হয় ‘বিষ্ণুশা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ ত্রিধর্শনঃ’ ছত্রে ‘বিষ্ণু’ অর্থে সূর্য্য। বৈদিক কালে সূর্য্যদেব কংসনগুণ, কালীয়হননগুণ প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগুণীভব মধ্যে বিহার করিতেন কি না, এবং বাধা, অপবাধা, বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইতেন কি না, তাহা বৈদিক-রসজ্ঞ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন। উক্তবক্তার সম্ভবতঃ এই বিষ্ণু বা সূর্য্য কংস-সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছিলেন; কংসনগুণ ও কালীয়হননগুণ দৈতা ও সর্পে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, এবং বাধা অপবাধন নামক হইতে বিশেষতঃ কবিতা ক্রমেই প্রধান নায়িকা হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম যদি বৈদিক কাল হইতে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে লোকসংস্কার ও বিশ্বাসের উপর ইহা দাবী অতি প্রাচীন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে এই সংস্কার হইতে নানা গান ও কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। এত ধর্ম্ম কাব্যে উপগত হইয়া অশ্ব, আনন ও কারুণ্যের স্রোতে এ দেশের ভাসিয়া গিয়া লইয়া গিয়াছে। তাব পূর্ব যুগে যুগে সময়ের উপযোগী কবিতা এই সংস্কার নামক প্রকার ব্যাখ্যা হইয়াছে; সেই ব্যাখ্যা এখনও চলিতেছে। যদি জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? প্রেমভক্তি ও স্নেহস্নেহে প্রতিষ্ঠিত এই গৃহ রক্ষা কবিবার জন্য যে সংস্কারের প্রয়োজন, যুগে যুগে এই ব্যাখ্যার দ্বারা কেবল তাহাবই বোঝান দিতেছেন। ডক্টর মন্ডাকিনী ও প্রেমের অমৃত দ্বারা যে স্থান ভীর্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহাব ভীর্ষে দাঁড়াইয়া যে শুককর্ণে বহিল, যে হতভাগ্যের বিলাপ শুনিয়া লাভ কি? নারদের বীণাধ্বনি শুনিয়া যে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করে, এবং বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক মিষ্ট কথাব তত্ত্ব সে জানে, তাহাকে ‘নীলসতকরয়’ বলিয়া পরিত্যাগ কর।

এই বাধাকৃত-প্রেম-দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্রের নানা পদ পরিপুষ্ট হইয়া এক বিশাল ভাবকল্পতরুর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা এই দেশের ব্যথিত প্রাণের সাধনা, কত মাতা যশোদার কথা শ্রবণ করিয়া তাহা প্রাণের ছললদিগকে সাজাইয়াছেন, চুষন কবিয়াছেন, স্বপ্ন দেখিয়া কাদিয়াছেন; কত সখা শ্রীদাম-সুদামের ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়া বন্ধুর সৌহার্দ্যে ধস্ত হইয়াছেন; কত ভক্ত রাধার দ্বার কুল-জীল ও মান-বশ হিন্দুকহাবৎ ভাগ্য কবিতা ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইয়াছেন! এই পদাবলী চৈতন্যের মত প্রেমিক ও রত্ননাথ দাসের মত দাপকেশ জপের সামগ্রী হইয়াছিল। ইহাও বিশালত্ব, ইহাও বাৎসল্য,

যাংগা কবা অর্দ্ধশিত্ত সমালোচকের কাজ নহে। যুগের পর যুগ যে বস্তা গৃহস্থের গৃহ আনন্দেব কলবনে মুখরিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই তীরেব কাক হইয়া তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত হইবাব ভূভাগে বেন কাহারও না হয়।

হিমালয় হইতে একটি শুষ্ক পত্র বা ডগ্ন কঙ্কব লইয়া দাঁড়াইয়া যদি কেহ বলে, ইহা কিছুই নহে, এই দেখ, আমি দেশান্তর হইতে এই পাতাবাহার লইয়া আনিয়াছি, ইহা কত উৎকৃষ্ট! তাহাতে কি সেই পাতাবাহাবেব নিকট হিমালয় ছোট হইয়া যাইবে? বিরাট কোনও সামগ্রীর বস-বিলেবণের এই রীতি নহে।

কোন কালের কোন কবির হস্তে কুদশীলতাপিণী সর্বস্বনদর্পণকাবিণী রাধার স্থায় প্রেমের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে? যশোদাব মাতৃভাব বিহীনহিতো ত্রেরী ভিন্ন প্রথম কে আংশিক ভাবেও দেখাইতে পারিয়াছেন? আত্ম জীবনে প্রথম দিন স্নানদাম, যশোদা পুত্রবৎসলা নহেন, ভীদান-সুদানের মধ্যে সখ্য ভাব কোটে নাই,

এই প্রথম বাধিকার প্রেম ভদ্র-সাহিত্যে স্থান পাইবাব যোগ্য নহে! প্রেমের স্বনিকেতন বৃন্দাবনের স্থায় তীর্থ অপর কোন কাব্য-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? যে তীর্থ পূর্ববাগ নান অভিনাব নাথুবেব স্বপ্ন; যাহার নিবুজের তকলতা মণিমুক্তাকে অগ্রাহ্য কবিয়াও উজ্জলতর; যাহাব শুভ্রাফলেব হারটি রাজকুমারী হীবাব হাবের উপব ধারণ কবিয়া ধৃত হইয়াছেন; যাহার সম্পদ বাহ ঐখ্যা নহে, ভাবের অঙ্গ; যাহার সম্পদ বিভাবুদ্ধি নহে, বালকেব অকপটতা; যাহাব সম্পদ আত্মস্তরী দর্প নহে, প্রেমের নির্ভর; যাহাব সম্পদ বাজমুকুট নহে, বাশেব বাশী; যাহার সম্পদ বাজভাগ্য নহে,—মাহুমেহেব সুধা, সখ্যাব আত্মনদর্পণ, এবং প্রেমিকাব প্রেম; যে স্থানে বীবস্তের দর্প শতবাব ধূমির্দাং হইরাছে, শিশুরা কলকাকলী কবিবা স্বর্গবাজোর সখুখীন হইয়াছে;

যে স্থানে অসিব কনৎকারেব প্রতি জল্পেপ নাই, অশবিন্দুতে আতঙ্ক; যে হাটে বিনিদ্র নাই, আছে শুধু দান; এমন তীর্থ কোন কাব্যে কবে ফুটিয়া উঠিয়াছে? বৈক্য কবিতা এই অপূর্ণ তীর্থের সৃষ্টি কবিয়াছে—ইহা মানস ছবি। ইহা পদ বর্ষসংস্কার নহে। এই সংস্কার কবি ও প্রেমিকগণের বহুবুগ্যাপিণী পাখনায় সৃষ্ট হইয়াছে। কোনও ভাগ্যবান যদি পৃথিবীৰ সাহিত্যেব কটকাকীর্ণ পথ, রাজপ্রাসাদ ও সমুদ্র নগরী সকল ক্রমে ক্রমে পরিদর্শন করিয়া অবশেষে বৈক্য-পদ-রাজ্যের পথে এই বৃন্দাবনে একবার প্রবেশ কবেন, তবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। কীৰ্ত্তনীয়ারা কবির পদ বুঝাইয়া দিয়া থাকেন; বৈক্য পদের প্রবেশ শুধু পশ্চাতে যে তাবেব সাম্রাজ্য আছে, তাহা সাধাবণ

পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, এই জন্ত কীর্তনীয়াবা তাহা দুইই দেন। বৈষ্ণব কবিতাব শব্দগুলি মধ্যে ভাবের নির্দেশ আছে, তাহা উহা, সাধারণ পাঠকের নিকট তাহা আত্মগোপন করিয়া থাকে। কীর্তনীয়াবা তাহা প্রকাশ করেন। অদৃষ্ট প্রসন্ন হইলে বীরভূম কি বাঁকুড়া অঞ্চলের প্রধান কোনও কীর্তনীয়ার মুখে ‘গোষ্ঠ’, ‘পূর্ববাগ’ ও ‘মাথুবে’র পালা শুনিয়া সাধারণ পাঠকগণ এই কবিতার প্রকৃত মর্থ বুঝিতে পারিবেন।

বৈষ্ণব-কবিতাব জন্ম সাধনাব ক্ষেত্রে—এক দিকে চণ্ডীদাস বিজাপতি লিখিয়াছেন; আর এক দিকে মহাপ্রভু তমালকে আলিঙ্গন করিয়া, মেঘে কুমন্ত্রম করিয়া, সেই কবিতা যে সাধনার রসে পুষ্ট, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর যে সময় তাঁহার আরাধ্যের বংশীরব শুনিয়া উন্নতবৎ ছুটিয়া গেলেন, রাজ্যবশে তুচ্ছ করিয়া ছিন্নকস্থা বরণ করিয়া লইলেন, রাজপ্রাসাদে ধূলিধবংসে ছায় পবিত্রাগ কবিলেন, সেই সময় পুরুপল্লীর রাজা নৃসিংহদেব সেই ভিক্ষুবৎ রাজকুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী রাধাব কথায় গায়িলেন,—

“আমার বৈষ্ণবালা! হেমাগার,

শ্রবণের বংসর,

ধরম কপাট ছিল তার;

বংশীরব বজ্রাঘাত

পড়ে গেল অকস্মাৎ,

সমভূমি করল স্তম্ভায়।

আমার দম্ভশালে মস্ত হাতী

বাঁধা ছিল দিবারাত্রি,

কিন্তু কৈল কটাক্ষ-অঙ্কশে,

দন্তের শিকল কাট

আবেশে লুকাল ছুটি,

পলাইয়া গেল কোন দেশে।”

অতঃ কোনও কবি বজ্রাঘাতেই সহিত বংশীরবের তুলনা করিতে সাহসী হইতেন কি না, জানি না; কিন্তু যে বংশীধ্বনি প্রেমিক মানসকর্ণে ভাগ্যক্রমে শুনিতে পাইয়া থাকেন, তাহা সমস্ত পার্থিব সুখের উপর বজ্রাঘাত বই কি? সেই সুখে ভোগবিলাসের বৃহৎ বাঁধপুরী ভাঙ্গিয়া চুবিয়া যায়। অজ্ঞাতজনের প্রেম-চাহনীতে বিপুল দম্ভ অক্ষুশাহত হস্তীর গায় পলারন করে, মাথার সমস্ত স্পর্শ ও ভোগেচ্ছা লুপ্ত হয়। তাহাব জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ নরোত্তম ঠাকুরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে যখন রাজা নৃসিংহ দেব স্বহস্তে মৃদঙ্গবাদনপূর্বক এই গানটি গায়িয়াছিলেন, তখন নরোত্তম ঠাকুর ও রাজা প্রোত্বনের নিকট এক হইয়া গিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস রাধাব কথায় বলিয়াছিলেন, “যে করে কান্থব নাম তাবধরে পায়।” চৈতন্যপ্রভু চণ্ডালের মুখেও

তোমার শুনিয়া তাহান পায়ে ধরিতেন। এরূপ শত শত উদাহরণ দ্বারা
 যেখানে বাইতে পারে যে, বৈষ্ণব কবিতার জন্য সাধনাব ক্ষেত্রে, কবিত্ত্বের উচ্চ
 স্ৰোমে সাধনার শিখরে আসীন ভরুগণ যে জীলা করিয়াছেন, কবিগণ তাহাই
 স্মরণসেবীর ববে তাক্ষুধায় অভিযুক্তিত কবিতা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
 গিয়াছেন। এরূপ সাধনাব রূপধারায় কাব্যকথা আব কোথায় ছুটিয়াছে ?

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বিখ্যাত চন্দ্রহর্যের উল্লেখ অক্ষরে লেখা কবিত্ব-
 মন্ত্রি বৃদ্ধিবে; আধ-কোটা হুসে দে সৌন্দর্য, তাহাই দেখিরা মাতোরাবা হইবে ;
 ভূপবানকে আরতি কবিবার চত নন্দানিল তাহাব ধূপ হইবে ; গগনই তাহাব
 কুলের ডালা হইবে। বিখ্যাত তোমার রাধাকৃষ্ণ বিশাখা চিত্রা ও মধুমঙ্গল-
 রূপ হ-ব-র-লর মধ্যে প্রবেশ কবিত্ত্ব কেন ? উহা যে তোমার ক্ষুদ্র সমাজের
 কতকগুলি আবর্জনা। তোমরা কাঁদিরা কাঁটরা নিজেদের কাছে সেগুলি
 করিয়া তুলিয়াছ; বিখ্যাতিতে সেগুলির প্রবেশাধিকারের স্মৃতি
 কেন ?

তোমার সাধনা যদি সিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তোমার জাতীয় সংস্কার পৃথিবী
 গ্রহণ করিবে। যদি উজ্জল করিয়া দেখাইতে পাব, যদি আবায়ের পদপ্রান্ত
 হইতে চিত্তের আবেগে প্রবাহিত করিয়া, সাধনার কমণ্ডলুতে গবিত্ত্ব করিয়া,
 সমস্ত শিবজটা হইতে মুক্ত কবিতা, তোমার সংস্কার, তোমার জাতীয় ভাব
 পৃথিবীর দারে দারে আনিতে পাব, তবে সেই ভক্তি-মন্দাকিনী স্বদেশ বিদেশে
 প্রত্যেক গৃহে গৃহে আসিয়া পড়িবে। জগতের সঙ্গে জীবিত ও পয়গম্বরের
 জগতের এক বিপুল অংশের অধিবাসীরা শুনিয়া শুনিয়া এখনও কান্ড
 হইতেছে না; অথচ সেই সকল সংস্কারের জন্মস্থান—আরব দেশ। পবিত্র
 সাহিত্যের প্রভাবে মেবীর গর্ভে গ্রীষ্টের জন্ম, যাবের সহিত বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
 তাহাব পরাভব; বিশ্বের বহু স্থলের লোকেরা ক্রমাগত শুনিতেছে, এবং তাহার
 সূচ্যতি কবিত্ত্বেছে; এমন কি, গ্রীক ও রোমক অলৌকিক উপাখ্যানমালা
 সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত। যাহারা পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রভাব
 হইতে মুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যে নুতন ভাবেব স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন,
 তাহাবও ত সে প্রভাব অতিক্রম কবিত্ত্ব পায়েন নাই। শেলী “প্রমিথিয়সে”র কথা
 লইয়া কাব্য লিখিয়াছেন, কীটস্ “হাইপোথিম” লিখিয়াছেন, প্রাচীন ইংলণ্ডের
 এডমন্ড স্পেন্সার “দ্য ফিয়ার্স অফ অ্যাংল” লিখিয়াছেন, সাব গাল্লাহাডের “হোলি
 গ্রেস” বৃন্দা দর্শনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কবিত্ত্ব, বদেশের প্রাচীন সংস্কার নইয়া

শৈলী “কুই ম্যাব”—এর পুষ্পক-বদে। বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আর্থাবেষ্ট্রা
 আলৌকিক উপাখ্যানমালায় টেনিসনের কবিতা এরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে যে,
 আমবা বিষয় প্রকাশ কবিতা এখনও ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। মূল কথা,
 যে জাতি শক্তিশালী, তাহারা স্বীয় দেশের আদর্শ হইয়া অপর জাতিতে পবাস্তিত
 করিবে। বিশ্বমানব শুধু গবাক্ষপথে আকাশের নক্ষত্র গণনা করেন ন, এবং
 শবৎকালের সোনালী বোজকেই বিশ্বের চরম সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করেন না।
 জগতের কোন্ জাতি যুগ যুগ ব্যাপিয়া কোন্ সাধনা করিয়াছে, কোন্ সংস্কারকে
 উজ্জ্বল কবিতা দেখিয়াছে, তাহা ভূনিবাস জন্ত বিশ্বমানবটির বিলক্ষণ বোধ্য
 আছে। অনেক সময় সেই সংস্কার শুধু ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র জাতিগত ধারিক
 অবশেষে জগতের চিত্র দখল করিয়া গইয়াছে। তাই ইস্রায়েলদের আত্মহারা
 অধস্তন চৌদপুরুষের নাম এখনও অর্দ্ধজগৎ বলিয়া বলিয়া মুখস্থ করিতেছে।
 তোমার যদি শক্তি থাকে, তবে তোমার বৈশেষ সাধনাকে—সংস্কারকে—উজ্জ্বল
 কবিতা আঁকিয়া দেখাও। সায়াংবিহারী পক্ষিবিশেষের কণ্ঠে জাতীয় সাধনার
 মিনা না করিয়া, যে সাধনাব ক্ষেত্রে তুমি এখন পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দিতে শিখ নাই?
 তাহাতে একবার প্রবেশ কবিতার চেষ্টা পাও। বাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিয়া
 গৃহ্য কবিতা, তাহা ভিন্ন দেশের একটি সংস্কারমাত্র। সেই সংস্কারের নিকট
 মাথা হেঁট করিয়া অর্য্য দিতেছ, এবং ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যকে সেই
 বিশ্বসাহিত্য হইতে নিদাশিত কবিতার ব্যবস্থা কবিতা! সে-রাস্তা
 শুনিবে? মোল্লাবা ইতিপূর্বে দুর্গানগুপ ভাস্কর্য্য ফেলিবার ব্যবস্থা দিয়াছিল।
 নিজের ঘর ছাড়িয়া পরের ঘরে ভিখারী হইতে যাইতেছ, সেখানে ভিখ
 মিলিবে না।

কাহাবও কাহাবও মুখে একটা অতিযোগ—শুনিতে পাওয়া যায়—বৈষ্ণব
 সাহিত্যটা কামশাস্ত্রমাত্র। তাহারা প্রেমের সাধনাকে বৈরাগ্যের সাধনা বলিয়া
 প্রতিপন্ন কবিতা গিয়াছেন, তাহারা “কামগন্ধ নাহি তায়” বলিয়া নির্মল প্রেমকে
 মাথায় ধারণ করিয়াছেন, প্রেমসাঁকে মাতা, পিতা ও গায়ত্রী বলিয়া পূজা
 কবিতাছেন, তাহাদের কবিতা হইল কামশাস্ত্র! প্রিয়ার প্রণয়ের মধ্যে জননী
 পিতার প্রেম আছে, এবং গায়ত্রীর পবিত্রতা আছে, এত বড় কথা তাহারা
 বলিয়াছেন, “ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয, আছে যে জন, কেহ না দেখে তাহে। প্রেমের
 এ বীতি, যে জন জানরে, সেই সে চিনিতে পারে।” এমন কথা তাহারা বলিয়া
 ছেন, তাহাদের কবিতা হইয়াছে কামশাস্ত্র। “পিরীতি কবিতা কামশাস্ত্রের

"সাধন' অক' পায় না সে।" এমন কথা কোথাকার কোন কবি বলিতে
 পাবিয়াছেন? "বাহাকে একবার ভালবাসিয়াছ, তাহাকে তোমার ছাড়িবার আর
 উপায় নাই; সে যাহাই করুক না কেন, তাহাব ভালবাসা নইয়া থাক; কারণ,
 প্রেম বিনিময়ের সাগরী নহে, উহা মহাদান। একবার দিয়া তুমি তাহা
 ফিরাইয়া লইতে পার না। যদি ফিরাইয়া আন, তবে আর তোমার সাধনা
 হইবে না।"—এত বড় কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাদের কবিতা হইতেছে কাম-
 শাস্ত্র! "মরম না জানে, ধবন বাধানে, এমন আছয়ে যাব। কাল নাই সখি,
 তাদের কথায়, বাহিরে রছন্ তারা। আমার বাহিব-দুয়ারে কপাট লেগেছে,
 তিতর দুয়ার খোলা।"—এমন সকল কথা যাহারা বলিয়াছেন, তাহাদের
 কবিতা হইতেছে কামশাস্ত্র! বিজ্ঞাপতিব উপরই বেশী আক্রোশ। তাহার
 একটি কবিতায় রাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—“হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার
 ফুল, তুমি আমার চক্ষু অঞ্জন, কণ্ঠের হাব, তাহা হইতেও বেশী—পাখীর নিকট
 পাব, নীনের নিকট জল যেরূপ—তুমি আমার তাহাই। তোমাকে ছাড়া আমি
 এক দিনও বাচিতে পারি না। তোমাকে ত আমি সব দিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু
 তুমি কে, আমি তাহা চিনিলাম না।” সর্বস্ব সমর্পণ কবিতা সাধক সেই
 জ্ঞানাতীত ছুর্ভেদ পদম শ্রেহনিকার অসীমত্বকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে
 “অবাক হইয়া কাদিতেছেন—হায়! কাহাকে দিলাম? কে সে? আমার সয়ল
 মুক্তি দিয়া তাহাকে বুঝিলাম না, আমার সকল প্রাণ দিয়া তাহাকে ধরিতে
 ছুইতে পাবিলাম না। “মাধব! তু'হ কৈছে কহবি মোয়।” এই প্রশ্ন,
 সাধনাস্তে সাধকের স্তব্ধ বিষয়কে একছত্রে আঁকিয়া দেখাইতেছে। এই সকল
 কবিতা হইতেছে কামশাস্ত্র! রাধা যেখানে কৃষ্ণের অশবীরী আকির্ভাব বিরহের
 উপশ্রুত দ্বারা হৃদয়ের নিভুতে উপলব্ধি কবিতেন, তাহা ভাবসম্মিলনের অপূর্ণ
 কবিতা। তিনি বলিতেছেন,—আমাব অঙ্গ তাহার বেদী হইবে, এবং সেই বেদী
 আমি চোখের জলে ধৌত করিয়া আমাব মাথাব চুল দিয়া মুছিয়া বাধিব, আমাব
 বস্ত্রের নতিব হাব আলিপনা হইবে, আমার হৃদয় মঙ্গলকলসস্বরূপ হইবে,
 তাহা দ্বারা প্রিয়কে সংবর্দ্ধনা করিয়া লইব। এখানে শবীর এবং অশরীরের ভেদ
 ঘুচিয়া গিয়াছে, জড় ও চৈতন্য এক হইয়াছে। ইহাই কি বিজ্ঞাপতিব কামশাস্ত্র?
 চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—কৃষ্ণকে ভজনা কবিতাে বাইয়া “তোরা না হইবি সতী, না
 হবি অসতী, ফিবিবি লোকের নায়ে।” ধার্মিকের বাহুবেশ ত্যাগ কর, গেরম্মা
 ও জপের মালায় দরকার নাই, ভিতরে খাটা থাকিবে, এবং দশ জনেব এক জন

হইয়া কাম কবিবে; অথচ, “দিনান কবিনি, যত না ছুইয়া, তাহানি ভাবে
 দেখা।” জল না ছুইয়া জান কবিবে, অর্থাৎ, সংসারের মধ্যে সুবিধা থাকিবে,
 কিন্তু সংসারের কাদামাটি যেন পায়ে না লাগে। “ভাবিনি ভাবে দেখা”—
 দেখেব অল্প পুণ্যইয়া উহাকে চিন্ময় কবিতা হইবে। এমন উচ্চ সাধনার
 কথা। যিনি প্রেম কবিতেন, উহার দেরকে “এক কণ্ঠস্বর” কবিতা হইবে,
 অর্থাৎ, বহিঃশব্দগণের রস তাঁহাতে থাকিবে না। পুনঃ পুনঃ এই সত্য উল্লিখ
 যাই। যাহারা প্রেমকে কঠোর তপস্যার বিষয়ভূমি কবিতাহেন, তাহাদের কাব্যতা
 কানশ্যস্ত নহে ত কি? বাহ্য বড়, তাহাকে কিছু বাক্য দেখেন চলে না, বহু
 বিনিসেব হোঁরাতে রোগ নাই। গঙ্গার শব্দ আসিলে বার, কিন্তু গঙ্গার কীট
 মবিলেই ভয় হয়। যে কবিতা না না। এসে পরিপুষ্ট, বাহ্যিক আশ্রয় উপস্থাপন,
 এত হইতে দুই চাবিট ভোগ্যবাসের ছত্র দইয়া, নাড় তড়া কবিতা কি
 দেখাইবে? তাহা হইলে “দশমস্তি পদমঃ পুদিনামি নীলঃ শ্যামঃ এ
 “শীলোপদ্যকর্মিণমেনাদ্যায়ঃ” প্রভৃতি যোগ্যবদক্য সূত্র সাময়িকিক বর্জন কব,
 ভানাস্ অ্যাডোনিম্ ও লুক্‌স্ লেখাব অগ্রায়ে সেকন্দীকে অশ্রু বর্জিত সঙ্গার
 জ্বলাইয়া দাত, এবং ‘বালেন্দ্রব্রজাণ্যদিকার ভানাব’ প্রভৃতি লেখার কব কবিতা
 দায়ের কুমারসম্বন্ধে মাটী নদিল প্রতাপদ বব। ফেনের কবিতা বহু
 পড়িবে না। কবিতা বিষয়ে অতিবিক্ত দায়িত্ব হইলে কবিতা হইতে অকর্ষণের গন্ধে
 শিহরিয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার স্থল কথা বহু বাক্যের চিত্তবিনোদ
 এ কথা আমি নিজে করণা করিয়া লিখিতছি না। বহু পাঠক বৈষ্ণব কবিতার
 স্থল বিনিসটতে তত্ত্বকথার আভাস পাইয়া থাকেন। এজন্য শিব ও কৃষ্ণ
 জীবন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহানরম দাতিতে ঠাকুর বর্তমান শাক্ত
 ব্যক্তিগণ ও মহিলাবর্গের মধ্যে “খণ্ডিত” পান্য পানিহীন। বাক্য
 প্রেমকাহিনীর মধ্যে আধুনিক কবিতা অল্পদানে এই পান্যটি দইতে দেখা
 কিন্তু শব্দ অধর্মেই ভাবেব এমন এক উচ্চপ্রাণে তাহার গুরু বাক্য দইতে
 যে, যত কিছু সঙ্গীততা, তাহা পবিত্র ভাবেব জাপক হইয়া দইতে দেখা
 একটা উচ্চ ভাষায় দাড়াইয়া কথা বলা বার, যেখানে কবিতার আধুনিক
 বুলিগুলির মাথা ভিঁদাইয়া গেলেও কিছু গতি হয় না। বিজ্ঞানের পাকড্রে
 শব্দকোষকারী হস্তে কুৎসিতেব অভ্যস্তর প্রকটিত হয়, কিন্তু সেখানে কবিতার
 ভাস্য নিকলক। বৈষ্ণব সাধনার কবিতাও সেইরূপ। তাহাতে ভাবের কল্প
 বঙ্গনা কবা বিজ্ঞানমাত্র। আমি শুধু সঙ্গীতগণের পদব কথাটি লিখিতছি

যেখানে তাৎক্ষণিক সেক্স সঙ্গম নাই, সেখানে অবশ্য কথার কচি লঠিয়া
 সমালোচনা চলিতে পারে। এখনকার অনেক কবি ছদ্মবেশী কবি।
 কচি মুখ বন্ধা কবিতা চলে, কিন্তু সেই সকল শব্দের প্রচুর ইঙ্গিত অতি
 রহস্য। নির্গজতা যেখানে নিজকে গোষ্ঠীয় করিবার জন্য লজ্জাকে আশ্রয়
 করে, সেখানে ছদ্মবেশী লজ্জাকে সাহিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেওয়া
 উচিত নয়। যাহাতে জাতির উচ্চাঙ্গের পবিত্রতা নাই, অথচ যাহা আকাশের
 উল্লসিত বিলাসকে নির্দেশ করে, তাহা উদ্ভাসিত স্থান পাইবার যোগ্য নহে।
 বৈষ্ণব কবি কবি—ইহাং বৃদ্ধ বয়সে জীবনে প্রথম দিন গুনিতে
 পাইলাম, বৈষ্ণব কবিতায় কবি নাই। হাজার এক জন ইংবেল বন্ধু—যাঁহা
 যত লেখক আধুনিক কালে বড় বেশী ন.চ—এক দিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে
 বলিয়াছিলেন—“বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে স্বকোমল ভাবের শেষ করিয়া গিয়াছেন, আব
 কিছু বাকী থাকেন নাট।” “তবে নীলগাভী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পবন সহিতে
 মোব।” “প্রাণ অঙ্গ লাগি কাদে এতি অঙ্গ মোর।” “চল চল চল অঙ্গের
 লাগী অবনী বহিয়া যায়।” এই সকল জল্পিত পদের কবিত্বের প্রশংসা ও
 আধুনিক বলায় বড় কবিত্বের মুখেই গুনিলাম। “বদনী শাওন ঘন, ঘন
 দেওয়া পবন, রিনি রিনি শব্দে ববিষে।” কিংক, “বিঁ বিঁ বিঁ ঝিগকি ঝাঝে,
 ঝাঝকী সে গরজে” প্রভৃতি ভাষা মাত্রা ত আধুনিক অনেক কবিই কল্পিত
 লিখিয়া গিয়াছেন; “সুখানি”, “ভুলানি”, “লাবণি” প্রভৃতি বৈষ্ণবের উজ্জ্বল
 সাহিত্যের ভাষে উচ্চাঙ্গের বিক্রান্ত হইতেছে। এ সবগুলের মধ্যে ছিটাবোঁটা
 কবি অত্যন্ত কিছু আছে। কিন্তু একটা কথা। বিদেশী কবিতায় দুই ছ
 কাল “ইয়া বাঃ!” “কেয়াবাঃ কেয়াবাঃ!” কবিতাই সমালোচনা হয় না।
 কবি, বৈষ্ণব কবিতায় দুইটি ছত্র তুলিয়া “এতে কি আছে?” বলিয়া নাসিকা
 ক্রান্ত কবিতাই সমালোচক সেই সকল কবিতায় আপেক্ষা দাঁড়ই করেন, এমত বলিতে
 পারি না। সমগ্র ভিনিসটা দেখিবার প্রতিটাই। এজন্যই ইহাতে এক স্তম্ভ
 নীচ, গল্প ইহাতে এক বিলুপ্ত, এবং আল্পাইন গিরিশিখরের একটি কাঁকর
 তুলিয়া নিয়া সেই সেই স্তম্ভের পার্শ্ব দেওয়া যেরূপ, এই সব সমালোচনাও
 সেইরূপ। কোনও কবি হয় ত সহস্র এক ছত্রে একটি সুন্দর ভাব ফুটাইয়া
 তুলিয়াছেন; হয় ত বেহ এক আঁচড়ে চমৎকার একটা ছবি আঁকিয়াছেন।—
 তখন যুগান্তর কৌতুকে বস ও আনন্দ প্রদ হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র জাতির সাধনাব
 ক্ষেত্রে যুগব্যাপিনী তপস্বী যে কলহক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সমগ্রভাবে দেখিবার ও

দেখাইবার জিনিস। শুধু একটু পল্লব লইয়া তাহাকে দেখানো যায় না। কল্প-
বৃক্ষের পত্র জিহ্বা দ্বারা লেহন করিবার শক্তি অনেকের থাকিতে পারে, কিন্তু
তাহার ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করিবার মত চক্ষু ভগবান সকলকে দেন নাই।

আজ ইংরাজ জাতির কেহ সেক্ষপীয়রের নিন্দা করুক, ইংলণ্ডের মাঠে
সেই হতভাগ্যের স্থান হইবে না। আর তুমি জাতীয়তাব বড়াই কর, এত
তোমার ঘাফা বুঝিবার সাধ্য নাই, এমন সকল বিষয় লইয়া উচ্চমুখে কণ-
কুনাইবার স্পর্ধা করিতেছ। সেবতাবা বেখানে প্রবেশ করিতে সাহসী নহেন,
হঠকারিতার বলে সেইখানে ঘাইয়া আরাধ্যের টিকি ধরিতেছ। তুমি
আদর্শকে ধর্ম করিয়া তাহা হের প্রতিপন্ন কবাই তোমার জাতীয়তা। আর
সর্বসমূহ আমাদের সম্পাদকবর্গ। গোচারণেব মাঠের ছায় তাঁহাদের কানজ
পড়িয়া আছে, যে আছে, স্বচ্ছন্দে চরিত্তা বেড়াও।

৩০শে আশ্বিন, ১৩২৪।

গোহাঙ্গুল মুল্লীর বাড়ী ;

বগুড়া, পোঃ মন্ড, ঢাকা।

শ্রীচীন্দ্রমাল সেন

নিধুবাবু।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

কুন্তিবাস ও কাশীদাসের কবি-কীর্ত্তি বিশাল বিস্তৃতির কথা হাড়িয়া দিয়া,
অভিনবজ্ঞান ও আবাবহিত মধ্যকালের কবিদিগের মধ্যে, অন্য কি কথা,
কবি-কল্প ও রায়গুণাকরের অপেক্ষাও নিধুবাবুর খ্যাতিব বিস্তার দেখা-
সে বিস্তার কেবল কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেনেরই সমতুল্য; এ কালের কবি-
কল্পাদির অপেক্ষা অত্যন্ত অনেক; পরন্তু, এই ইংরেজী আশ্রয়ের কবি-কল্পের
সবগুলিকে জুড়িলেও নিধুবাবুর বিস্তৃতি হইতে বহু বহু দূরে থাকেন। কবি-
কল্প মুকুন্দরাম ও রায়গুণাকর ভারতজ্ঞ অপেক্ষাও নিধুবাবুর বিস্তার বেশী
বলিয়াছি; তাহার কাবণ এই যে, নিধুবাবু নিবন্ধের নিত্য আবৃত্তিব বিষয়।

নিধুবাবুর খ্যাতি, নিধুবাবুর নাম সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত, বিপুল। নিধুবাবু
একটা গীতও না জানে, এমন ব্রাহ্মণী বিরল। আর নিধুবাবুর গান জানা
গলায় হয় না থাকিলেও, গ্রামে প্রেমোদয় হইলে, সে গান গুণ গুণ করিয়া
গায়, এমন বাঙ্গালীও বেশী দেখি নাই। নবীন যুবক, পরিপক্ব প্রৌঢ়, কীর্ত্তিবান

সুদ, ভদ্র, ইতব, নার্জিত, অনার্জিত,—সকলেরই নিকট নিধুবাবু সমান সমাদৃত ।

কাটে, বাটে, বৈঠকে, লোকের মুখে, মজলিসে, মায়েকে, নির্জনে—নিধুবাবু

কোথার নন ? নিধুবাবু সর্বত্রই লোকের সঙ্গে—সাথে । কিন্তু, এই নিধুবাবু

কি ? নিধুবাবু কবি কি না ?

নিধুবাবু কবি, না কি বলিব ? কিন্তু নিধুবাবুর কাব্য লোকের মুখস্থ । তবে

এখনকার নবীন কবিরা নিধুবাবুকে কবি না বলিলেও বলিতে পারেন । কারণ,

নিধুবাবু গান রচিতেন, সে গান নিজে গায়িতেন, সে গান সকল লোকেই গায়,

সে গান আবার টপ্পা গান ; পুনশ্চ, সে গান বহুকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয় নাই । সুতরাং এখনকার গীতি-কবিদের গণনায় গান-রচয়িতা নিধুবাবু

কবি না হইলেও পাবেন ; কেন না, গীতিকাব্য অগোণে গ্রন্থে পরিণত হইয়া

পুস্তকবিক্রোতাব আলমারীতে পচাই এখনকার নিয়মালুসারে প্রকৃত কবিতার

পূর্ণ পরিচয় । নিধুবাবুর ভাগ্যে এমন ঘটনা ঘটে নাই । অতএব তিনি কবি

কিसे, এবং কোন্ হিসাবে ?

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দায় । কিন্তু এখনকার গীতি-কবিদের সহিত নিধু-

বাবু কি এক বিন্দুও সৌসাদৃশ্য নাই ? বোধ হয়, একটু আছে । প্রথম-

সঙ্গীত, প্রতীচ্য মতেও, কবিত্বের উচ্চতর নিদান ।—সেতগীয়ার, টেনিসন,

ব্রাউনিং প্রভৃতি বড় বড় অতিবিখ্যাত কবিদিগের প্রসিদ্ধি প্রথমগীতির জন্ত

কম নহে । নিধুবাবুও প্রথম-গীতি রচিতেন । এখনকার নব্য কবিবাও

প্রথম-গীতি রচেন । তবে এদের গীত গাওয়া যায় না ; নিধুবাবুর গান গীত

হয় । পবস্ত, নিধুবাবু ৪০না কবিতেন টপ্পা ; ইহার রচেন তুকো । তুকোই

বলি ; কেন না, তাহা আরতনে অনেক সময়ে টপ্পা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র । নিধুর টপ্পা

সংসারের সব লোকেই বুঝে, নবীন গীতি-কবিদের অস্পষ্টপরিমিত তুকো শতকরা

সাত্বে ৯৯ জনে বুঝে না । কবিদের নিজেরই সকল সময় তাহা বোধগম্য হয়

না । নিধুবাবু ও নব্য বাবু কবি-সম্প্রদায়ে সাদৃশ্য ও পার্থক্য এই । একই

কালে, এবং একই রসে, নিধুর টপ্পা ও নবীন তুকো পাশাপাশি রাখিয়া তুলনায়

সমালোচনা কবিত্তে পারিত্য্য ; কিন্তু স্থানে কুলাইবে না ।

নিধুবাবুর গান সকলেই জানে ; কিন্তু নিধুবাবু ব্যক্তিটা কে, তাঁহার

পুরা নান ও উপাধি কি, নিবাস কোথায়, বৃত্তি ব্যবসায় কি ছিল ; তিনি জৈন্

ভাষা ছিলেন, এমন কি, কোন্ সময়েব লোক ছিলেন ; অনেকেই জানে না ।

আনন্দা নিজেও অনেক দিন জানিতাম না । এখনও যে নিধুবাবুর আত্ম

জীবনচরিত জানিয়াছি, তাহাও নহে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখক অনুসন্ধানে এ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আসল কথা এই যে, তখনকার লোক এখনকার মত আপনাকে অতি বড় বলিয়া ভাবিত না; অতঃপরো গ্রন্থীও লিখিত না। আত্মজীবন গোপন রাখিয়া জীবনে কিছু কাহ্ন করিয়া বাওয়াই তখন রীতি ছিল। নিধুবাবুও তাই করিয়াছিলেন। স্মৃতবাং নিধুবাবু, খুব অনেক দিনের লোক না হইলেও, তাঁহার জীবন-কৃষ্ণ রঙ লোকে জানে না।

নিধুবাবু কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানিতেন; পার্শী, উর্দু, হিন্দীও জানিতেন; নিধুবাবু অল্প ইংরেজীও জানিতেন। বাঙ্গালা ভাষা সবক্ষে বাঙ্গালী নিধুবাবু বলিতেন,—

নানান দেশে নানান ভাষা :

বিনা স্বদেশী ভাষা

মিটে কি তুষা।

বখন “বাঙ্গালা সাহিত্য” বলিয়া একটা সোরগোল উঠে নাই, তখনকার এই আন্তরিক উক্তি নিধুবাবুর। এখন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই উক্তি হয় কিন্তু ইংরেজীতে। খুঁটআখুয়ে বাঙ্গালীও ইংরেজীতে কাব্য লেখে।

নিধুবাবু বাঙ্গালার “সোবী নিগ্রা” বঙ্গিয়াও বিখ্যাত। সোবী সূকবি; সুললিত ও সুমধুর হিন্দুস্থানী টপ্পার জন্মদাতা; সোবী শিগ্রা সঙ্গ এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ। নিধুবাবুও ঠিক তাই। স্মৃতবাং এই উপমা। পবন, নিধুব টপ্পার সোবীর টপ্পার আজ আনন্দও আছে। নিধুবাবু স্মারক ছিলেন, কিন্তু গীতি তাঁহার ব্যবসায় ছিল না। তিনি কখনও ফরম না গীত বচিতেনও না; গাইতেনও না। তিনি ইচ্ছামত নিদ্র হৃদয়ের আবেশ গীত রচনা করিতেন, এবং সে গীত গায়িতেন। কখনও তাঁহারও আদেশে উপরোধে তৎকর্তৃক একটা গানও গীত হয় নাই। কেহ তাঁহাকে গান শুনিয়ে বলিতে সাহসীই হইত না। রাজাই হউন, আব প্রজাই হউন, নিধুবাবু ইচ্ছা কবিতা না গায়িলে; তাঁহার গান কেহ শুনিত পাইত না। নিধুবাবু আখড়ার আটচালার বসিয়া সাবংকালে স্বেচ্ছামত গান গায়িতেন, লোকে আসিয়া তাহা শুনিত, এবং শিতি। শোভাবাজারের বাজা রাজকুক বাহাও প্রভৃতি কলিকাতার বড় বড় বিখাত ধনাঢ্য লোকেরা সে গান শুনিবার জন্য আটচায়া উপস্থিত হইতেন। নিধুবাবু গান শুনিবার জন্য বন্ধনানাধি

মহাবাহু তেজস্কর বাহাদুর একবার নিধুবাবুকে বর্ধমান আন্ত্রান করেন। নিধুবাবু শিষ্টাচারের সম্মানের সহিত সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা বিরল ছিল না। নিধুবাবু একবার কলিকাতার বিখ্যাত বাবু কুমোহন মল্লিকের সহিত জল-পথে বেড়াইতে যান। এই জল-যাত্রা সাত দিনব্যাপিনী হইয়াছিল। কিন্তু নিধুবাবু এই সাত দিনের মধ্যে একটীবারও গান করেন নাই। ইহাতেই বুকুন, তাঁহার স্বভাবের এবং সঙ্গীতের স্বাধীনতা। কবি-হৃদয় আপন মনে আপন আবেগেই গারিত; কখনও কাহাবও মোশামেরী করিত না; কবি-কীর্ত্তি ও সঙ্গীত-সুখ্যাতির জ্ঞাতও শশব্যস্ত ছিল না। কিন্তু এখনকার কবিরা এ অঙ্গে কিরূপ? এখনকার অনেক কবিই ত দেখিতে পাই, একটু সমালোচনার সুখ্যাতির জ্ঞাত, লোকের কাছে কাছে, প্রেসে প্রেসে করেন। অথচ সুখ্যাতি-ঔদাসীন্দ্ৰ ও স্বাধীনতার ভান করিয়া ইহারাই আবার বলেন—“আপনার মনে আপনি গাই।”

নিধুবাবু আসল নাম রামনিধি গুপ্ত। নিধুবাবু বৈদ্যবংশীয়। আদিনিবান ছিল তাঁহাদের হুগলী জিলাব ত্রিবেণীর নিকট চামতা গ্রামে। চামতাতেই রামনিধির জন্ম হয়। জন্ম হয় খৃঃ ১৭৪২ অব্দে। পিতার নাম হরিনারায়ণ কবিরাজ। কবিরাজ মহাশয় বিদগ্ধার্থ্য উপলক্ষে কলিকাতার কুমারটুলীতে গমন করেন। রামনিধি দ্বাদশবর্ষীয় হইতে বৎসর পূর্বে কলিকাতা বোলঙ্গী [বর্গীর] বস্ত্র ভীত হয়। কলিকাতার অনেক লোক ধন প্রাণ লইয়া স্থানান্তরে গমন করে। হরিনারায়ণ-কবিরাজও সেই সময়ে কলিকাতা ছাড়িয়া গল্পীবাস চাপ্তায় যান। সাত বৎসর পবে, কলিকাতার শান্তি সংস্থাপিত হইলে, তিনি পুনর্বার নগরিবাসে কুমারটুলীর-ভবনে প্রত্যগমন করেন।

পিতামাতার সঙ্গে সাত-বৎসর-বয়স্ক রামনিধি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত ও পার্সী পড়েন। প্রথমা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি থাকাত, অপেক্ষাকৃত অল্প দিনেই রামনিধির সবিশেষ পার্শ্বোন্নতি হয়। তিনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষার বেশ উপযুক্ত হইয়া উঠেন। তাহার পর অল্পবিস্তর ইংরেজী শেখেন। ইংবেজী শিক্ষায় সবকারী ইংরেজী সেরেস্তার চাকুরী পান। প্রথমতঃ, ছাপরা কালেক্টরীর ক্লেক ও-ক্লার্ক, এবং পরে তথাকার হেডক্লার্ক নিযুক্ত হন। কালেক্টরীর দেওয়ানী হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা—সম্মত উপযুক্ততা ছিল। কিন্তু শরতানীর বড়গঙ্গা প্রস্তাবে তাহা হয় না। বিদগ্ধার্থ্য তথা (এখনও কোন্ নম্র?) তোবা-

মোহ ও উৎকোচাশ্রিত প্রভূত প্রাহুর্ভাৱ ছিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী কবি-হৃদয় কাব্যমোদী রামনিধি সে পথে যাইবার লোক ছিলেন না। বিশ্বকর্ষের ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া রামনিধি কিছুকাল গণে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। নিধুবাবু ছাপবা কালেক্টরীতে আঠার বৎসর কর্ম করিয়াছিলেন। এই কালের মধ্যে যাহা সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন, তদ্বারা তাঁহার শেষ জীবন মধ্যবৃত্ত-গৃহস্থ-স্বলভ স্বচ্ছলতায় চলিয়াছিল। কর্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসার পরেও নিধুবাবু দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ তিনি কেবলমাত্র কাব্যের কোমলতব অথ সঙ্গীত-রচনা ও সঙ্গীত চর্চাতেই কাটাইয়াছিলেন। তিনি “হাফ আখড়াই” গীতির আবিষ্কার ও প্রচলিত। সুপ্রসিদ্ধ নিধুর উদ্ভা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীতও আছে। ৯৭ বৎসর বয়সে নিধুবাবুর মৃত্যু হয়। তিনি সম্ভ্রান্ত, স্বধর্মবত্ত, নির্ভাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার বংশাবলী কুমারটুলীতে আছেন। বলা-বাংলা, ইহা নিধুবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী।

আলোচনা।

মিলনের অন্তরায়।

এবার বক্রীর পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানে রীতিমত দাঙ্গা বইয়াছে। হান্সমাণ্ড এখনও মিটে নাই। বাণেশ দেথিয়া মনে হয়, পক্ষ একটা অছিল—হাম বড়া, কি হো বড়া, ইহাই পরীক্ষার উপলক্ষ। আমরা বলি—হামও বড়া নহে, হোও বড়া নহে; মিলি বড়া, তিনি গোহুলে বাড়িচ্ছেন। বুধা এ ঘৃণ কেন? হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায় দূর করিতে হইলে হিন্দুর অভিযোগে মুসলমানকে, এবং মুসলমানের অভিযোগে হিন্দুকে কর্ণপাত করিতে হইবে। উভয়ের অভিযোগ ভাবসম্মত হওয়া আবশ্যক—এই কাহারও অন্তায় আবদার সহ্য করিবে না। হিন্দু বনাম মুসলমানের বিরোধের কথা এখন থাকুক। হিন্দু বনাম হিন্দুর বিরোধের কথাই আজ বলিব। আগে ঘর, পরে পর।

হিন্দুসমাজে কায়স্থদের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছে। এক দল উপবীত লইয়া “কশ্মির” হইয়াছেন; অপর দল বধাপূর্বক শূত্র। অর্থাৎ এক দল উন্নতিগামী; অন্য দল হিম্মিল। এই কশ্মির-কায়স্থদের সহিত বৈদ্যদের মনোমালিন্য আছে। প্রায়—ই হাম বড়া, বি হো বড়া। শূত্র কায়স্থদের দলটিও সামান্ত শক্তিশালী নহে। উপবীত লইয়া আলোকে আলো চেয়ে পিছুপিছুতামহের আধার কুঁজেরে পড়িয়া থাকাই হুভের বিষয়, ইহাই শূত্র-কায়স্থদের বিবাস। কশ্মির-কায়স্থরা সকলকে ছাড়িয়া এখন ব্রাহ্মণ জাতির আভিমান করিয়া

মুখপত্রের হইয়াছেন—নগিয়ারা নহে, মসীদারা। প্রকৃত জাতিবিশ্বাস, তাহাদের মত ও
 দৃষ্টিতে অর্থাত্ত্ব-বোধে কার্যের উপনয়নের ব্যবস্থা দেন নাই, দিতেছেন না। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-
 সমাজের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসে উড়াইয়া দিয়া যে সকল কামত উপবীত লইয়াছেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-
 সমাজ তাহাদের সহিত সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়-কার্যত্বগণের
 স্বাক্ষরের কাণ্ড ইহাই। ও দিকে আবার নমঃশূত্র জাতির বলিতেছেন—‘হিন্দুসমাজে
 শ্রমাদিগকে জলচল জাতি বলিয়া গণ্য করা হউক’; যেহেতু, ‘সংস্কারহীন অধঃপতিত
 পৌরাণিক চণ্ডাল জাতি হইতে আমরা অনেক শ্রেষ্ঠ।’ ইহার উত্তরে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ
 বলিতেছেন,—‘তাই ত, তোমরা এত দিন ছিলে কোথায়? এই বংশগত জাতিবিচারে
 কুপ বর্ণাশ্রম-সমাপ্তে কোনও জাতিকে শ্রেষ্ঠ ধান করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। কাজেই
 এ সময়ে তোমরা বাহা আছ, তাহাই থাক; এ সময়ে স্বকৃতির ফলে পরজন্মে তোমরা উচ্চ কুলে
 জন্মগ্রহণ করিও, আশীর্বাদ করি।’ কিন্তু এই কাষ্ঠ-আশীর্বাদে কি নমঃশূত্র, কি ক্ষত্রিয়-
 কারত্ব, কেহই সম্বৃত নহেন; কারণ, তাঁহারা ইহজন্মের দেনা-পাওনা ইহজন্মেই শেষ
 করিতে চাহেন। সম্প্রতি নমঃশূত্র জাতির এক সমাজপতি—গুরুদেব, স্কুলের এক জন
 শিক্ষক—ক্ষত্রিয়-কার্যত্বের মুখপত্রিকা ‘আধ্যাকার্য-প্রতিভা’র শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছেন,—
 ‘আমরা বাসস্থান বরিশাল, বরিশালে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার নমঃশূত্র বাস করিতেছে।
 আমি ও আমার সহস্রাবর্গ (সহস্রাবর্গ) সমাজসমিতি করিয়া একতাহায়ে আবদ্ধ
 হইয়াছি। আমরা বাহা করিব, তাহাতে ঢাকা, বুলনা, ফরিদপুর বাধা। আমি প্রাচীন
 বৈদিক, কিন্তু আমার আশা ভলবতী হইতেছে না। আমরা কতকগুলি স্ত্রী অধিকার
 সহিতে বসিত হইয়াছি। যদি গ্রিথিতে আদেশ করেন, প্রবন্ধ পাঠাইতে পারি।’ ইহা পড়িয়া
 মুখত্বের কথাটি মনে পড়ে।—

—যে মন

রূপিত, চুপেব কথা কহে সে অপরে।’

ক্ষত্রিয়-কার্যত্বসমাজ যদি ঘর-কামরা নমঃশূত্র জাতিতে জলচল করিয়া লয়ন ত উঠন।
 জাতি-অধিকার হইতে কাহাকেও বসিত করিতে নাই। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজ কিন্তু
 নমঃশূত্রের এই ‘স্বাধা অধিকার’কে শাশ্বত অধিকার বলিয়া এখনও স্বীকার করেন
 নাই। সমাজে যেখানে থাকিয়া বস উন্নত হইতে পার, হও;—ইহাই ব্রাহ্মণ-
 সমাজের মূল উপদেশ। কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজের উপদেশ ক্ষত্রিয়-কারত্ব বা মানেন না; নমঃ-
 শূত্রের ত কথাই নাই,—তাহারা একতাবদ্ধ হইয়াও এখনও যে অস্পৃহ। এই স্পৃহাস্পৃহা-
 কলুষ ও ক্ষত্রিয়বিদ্বেষের শাত্ত আগাদের নাই। কিন্তু স্মিয়মাণ করি, নাস্ত্রনাদিক বার্ষিক
 প্রেরণার উচ্চতর পূর্ণের প্রতি অথবা কলুজপ্রয়োগ না করিলে কি চলে না? ব্রাহ্মণ-
 জাতির কথা ইহারা গুরুবাক্যের মত শিরোধার্য করেন না, ব্রাহ্মণের কাছে অস্বকুল ব্যবস্থা
 না পাইয়া ব্রাহ্মণসমাজেরই প্রতি তাহারা ধর্মাহত হইলেন কেন? অনেকেই জানেন, ‘আধ্য-
 কার্য-প্রতিভা’ ক্রমাগতই ব্রাহ্মণবিদ্বেষে ইলাহল উদ্দীপ্ত করিতেছেন। আর তাহারই
 একই পরিচয় দিব।

কবিতার সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অনেক কথা আছে ; কিন্তু সে সকল কথা এ প্রসঙ্গের
 নীমিত্ত নহে। কারণ, ভোলানাথ বাবু বলিয়াছেন,—‘বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উপভাসে
 বিধবার দুইটি বিভিন্ন চিত্র নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এক জন রোহিণী, অপর কুল-
 সন্নিবি।’ এ বিষয়ে আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্রের
 প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই আমাদের কাছে এই নীরস আলোচনার প্রবৃত্ত হইতে
 হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন বাবু অবাস্তব টীকার যোগ করিয়া কি ভাবে গ্রন্থকের উপদেশতা নষ্ট
 করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি।

ভোলানাথ বাবু বলিয়াছেন,—‘রোহিণী বিধবা, কিন্তু বিধবার মত তাহার বেশভূষা
 কিছুই ছিল না ; তাহার অথবৈ তাবুলবাগ, হাতে স্বর্ণ-বলয়, পরিধানে লাল-কিতা-পাড়িয়া
 মুতি। আর সম্বন্ধের উপর চার। বিনিমিত্ত। কৃষ্ণকেশ কবরী।...রোহিণী বোধ হয় ভাবিতে-
 ছিল, সে (?) কি অপরাধে এ বালবৈধব্যগ্রস্তা আমার অদৃষ্টে ঘটিল। আমি অশ্রের অপেক্ষা
 এমন কি ওকতর অপরাধ করিয়াছি যে পৃথিবীর কোনও সুখভোগ কবিত্তে প্রারিলাম না।
 আমার অশ্রুখব জীবন রাখিয়া লাভ কি?’ ইহা হিন্দুসমাজের কথা নহে ; ইহা ব্রাহ্মসমাজের
 কথা—একটা সংস্কার—Individualism বা ব্যক্তি স্বাভাব্যতার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ‘কারস্ব বাল-
 সিধবা’ রোহিণীর ব্যাখ্যায় ব্যক্তি হইয়া এমন কথা লিখিয়া থাকিলে, আবার সেই রোহিণীকে
 প্রতিকূল অবস্থার কেলিগা ডুবাইয়া মারিতেন না। ব্যক্তি স্বাভাব্যতায় অসুখ মানুষকে কোন্
 পক্ষে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, রোহিণী-চিত্রে বরিনচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা
 এইরূপ বুঝিয়াছি।

কিন্তু কালীপ্রসন্ন বাবু ইহারই মূলে টীকা করিয়াছেন,—‘হিন্দুসমাজের এই বালবৈধব্য
 হিন্দুসমাজের কিবা (?) হিন্দুশাস্ত্রের বিধান নহে। আধ্যাত্মিকগণ স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনর্বিবাহ
 বিবাহ করিতে পারিতেন। আমরা পুত্রহীণী বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করি না। কিন্তু
 বাল-বিধবাদিগণের পুনর্বিবাহ আমরা সহস্রকণ্ঠে সমর্থন করিয়া থাকি। আধুনিক অধ্যাপক
 মহাশয়েরা বালবিধবাদের প্রতি এই ভীষণ দণ্ড কেন নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার উত্তর
 কে দিবে?’

তাহার উত্তর আমরাই দিব। কিন্তু জানিতে চাই,—

(১) কালীপ্রসন্ন বাবু ‘সহস্রকণ্ঠে’ যে ব্যবস্থার সমর্থন করেন, তাহা (সমগ্র হিন্দুসমাজ
 সমর্থন না করিলেও) কারস্বসমাজের অনুমোদিত কি না? অনুমোদিত হইলে, সেই ব্যবস্থা
 অনুসারে উপাধিতারী কারস্বপণ চলিতেছেন কি না?

(২) বালবিধবাদের অস্ত্র সমাজে যে ব্যবস্থা আবশ্যিক, পুত্রহীণী বিধবাদের পক্ষে সে
 ব্যবস্থা অনাবশ্যিক কেন? পুত্রহীণী বিধবার পুত্র অকালে মারা গেলে সেই বিধবা পুনর্বিবাহ
 করিতে পারেন কি না? পারিলে, কত বয়স পর্যন্ত সেইরূপ বিধবার বিবাহ হইতে পারে? না
 পারিলে, না পাতিবার হেতু কি? কস্তাবতী বালবিধবার ব্যবস্থা কি?

একটা ব্যবস্থার সমর্থন করিতে হইলে অনেক কথা ভাবিতে হয়। ‘অধ্যাপক মহাশয়েরা’
 কেবল বাল-বিধবার বিবাহের পথ বন্ধ করেন নাই, সকল রকমের বিধবারই বিবাহ বন্ধ
 করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু এই সামাজিক ব্যবস্থাকে 'ভীষণ দণ্ড' মনে করেন, বাস্তবিক ইহা দণ্ড নহে। চিকিৎসকগণ রোগীকে উপবাসের যে ব্যবস্থা দেন, তাহা দণ্ড নহে। হিন্দুর পন্থা-বাননা একটা ব্যাধি। ব্রহ্মচর্যা-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য বাননাকে সংযত করা। রোগিণী বলিযাছে,—‘আমি অন্তরে অপেক্ষা কি গুরুতর অপবাদ করিয়াছি যে পৃথিবীতে কোন স্থপভোষ করিতে পারিলাম না।’ ইহা ব্রহ্মচাৰিণী কাবহ বানবিধবার উক্তি নহে। মানসব্যভিচারিণী রোগিণীর এই আকস্মিক হৃৎ-ইহকাণের হৃৎ। হিন্দুর ধর্ম ইহকালসর্বধ নহে বনিয়াদ রোগিণীর ডাবের সঙ্গে হিন্দুর ডাবের যোগ নাই। রোগিণী যে হৃৎের কল্পনা করিয়াছেন হিন্দু বন্যবাদেরও ততটুকু হৃৎ-উপভোগের অবসর ছিল না। পূর্বের পুরুষেরা ওষুধে ব্রহ্মচর্যা শিক্ষা করিতেন; মেয়েরা গৃহেই গৃহধর্ম শিক্ষা করিয়া কর্মের অমুঠানে ব্রহ্মচর্যের সাধনা করিতেন। পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রভাবের পুরুষের গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু এখনও হিন্দুসমাজে আমাদের মাতা-ভগিনীরা গৃহে গৃহে ব্রতনিয়মের বানধারা চমিয়া হিন্দুর চিত্তাচরিত আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অমমনস্তার ঘৃণিপাকে পড়িয়া পুরুষ এখন দুঃ-কলমেই অর্থকরী বিদ্যা শিখিরা ‘পণ্ডিত’ হইতেছেন। পুরুষের ব্রহ্মচর্যা শিক্ষা উদ্ভিষ্টাছে। সমাজদেহের একটা অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ সময়ে হিন্দুবিধবাব্যবস্থাকে পতিপ্রাণে পাশ্চাত্যী করিবার ব্যবস্থা না কবাই ভাল।

বিধবার বিবাহ শাস্ত্র-অনুসারে চলিতে পারে কি না, এ বিষয়ে দুইটি মত আছে। শাস্ত্র ব্যবসায়ী এক-দল ব্রাহ্মণশাসিত ইহার স্বপক্ষ, অপর দল ইহার বিপক্ষ। প্রথম দলটি বড়, কিন্তু যুক্তি ও তর্কে কোনও দলই ছুঁর্বল নহেন। এ সম্বন্ধে আমার মতন্য এই, বস্তুমান কালে সমাজের শাস্তি ও শুশ্রূষা রক্ষা কবিতে হইলে বিবাহবিবাহের সমর্থন করা চলে না। সে কালের সমাজে বরকর্তাদের উৎপাত ছিল না; কস্তার পিতাকে বরকর্তাদের দ্বারা ঘরে কাঁদিয়া কিরিতে হইত না। সমাজের সে অবস্থার পরিবর্তনে সে ব্যবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে। ইহাতে এ যুগের অধ্যাপক মহাশয়গণকে ধমক দিলে চলিবে কেন? ধনীরা একটি কস্তার পণবার বিবাহ দিতে পারেন, কিন্তু সেক্ষণ সম্ভ্রান্তিহীন ধনী সমাজে কত জন আছেন? ধনীরা কস্তার হৃৎ বাড়ি, বাড়ুক; কিন্তু ঘরদেহের কস্তার হৃৎ বাড়িবে কেন? সাধারণ গৃহস্থের কুমারী-কস্তা বাহাতে, সহজেই পাতলা হইতে পারে, আগে তাহারই ব্যবস্থা কর, তাহার পর বিধবার কথা। বিধবা ত এক দিন পাত্রহা হইয়াছিল, তাহার পবনিততির চক্রে বিধবা হইয়াছে।

বিধবার হৃৎ আনবারও বৃক্কেষ্টপরিমাণে অন্তর কবি, কিন্তু বিধবাব্যবস্থাপতি পুনর্জীবিত করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা মীথ-থাকি। এ সংসারের হৃৎটুকু রামী-শ্যামীর ক্রায়-কড়ায়-গুণায় বন্ধিয়া লইতে পারেন, লউন; কিন্তু শ্যামী ত বিধবা হবেন নাই, তাকে রামী বিধবা হইলেন কেন? বাহার ধন আছে, তিনি অবাধে ধন বিতরণ করিতে পারেন; কিন্তু বাহার ধন নাই, সে কি বিতরণ করিবে? যে বমণীর পতি আছে, তিনি পতিপ্রেমোহাগিনী হইবা এ সংসারে চতুর্ভুজ লাভ করিতে পারেন, করুন; কিন্তু যিনি পতি পাইয়াও হাবাইবা-ছেন, তিনি কি করিবেন? নূতন পতি গ্রহণ করিবেন? কই, পুত্রহারা জননী ত পুত্র

মানি না। কাথাটা বি-বিধারই বেশী? হয় ত বেশী বলিখাই তিনি মৃতদ পতি এহু
কবিতেন। কিন্তু কিসের বিবিনয়ে? শত-শত-কুশারী-কুশারী-বিনিয়ে-শত শত
বিবিন্ন কতকর্তার অভিসম্পাতের বিনিয়ে। এই কারণেই আমরা বিধবা-বিবাহের সমর্থন
করি না। হিন্দুসমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত বিবাহ পরিচয় আছে, তিনিই এ কথা
কহিলেন। ইহা গৌড়মীর কথা নহে। বিধবাবিবাহের পাগপুণ্যের আলোচনা করিব
না; কানন, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয়, এমন কথা বলি নাই। অন্তঃপরি-আশা কবিত্তে পারি
কি, 'স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা' আর ব্রাহ্মণবিদ্বেষের পরিচয় দিয়া মিলনের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না?
তবে করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু বৃথা-তর্ক করিয়া, ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া কোনও
লাভ নাই।

তারকনাথ-স্মৃতি।

মানসী ও মধ্যবর্ণীতে প্রকাশিত তারকনাথ-স্মৃতিতে স্বর্ণলতা-প্রণেতা তারকনাথ বাবুর
স্মরণ কথাই জানা গিয়াছে। ইহাতে তারকনাথ-বাবুর চরিত্রে পঞ্চ ম-কারের দুইটি পাণ্ডুর
দৃশ্য আছে। প্রথম—মহা, দ্বিতীয়—মটন। পুরা আত্মিক না হইলেও তিনি অবশ্যই নিতুপক
ছিলেন; নতুবা তাঁহার স্মৃতি কথা কর্মযোগের প্রাশে স্থান পাইত না। রাজেন্দ্রবাবু তাঁহার
স্মৃতির কথা লিখিয়া অনেককেই হাসাইয়াছেন। এমন হাসির কথা একটু আলোচনা
প্রাসঙ্গিক।
তারকনাথ বাবু যে কেমন-নিষ্ঠার ব্রাহ্মণ-ছিলেন, তাহা তাঁহার ভেল না দাবিয়া
সাবান-বাখার অভ্যাস হইতে এক ছন্দ-বাংলাবিক্রোভাব প্রতি দিন মটন দেওয়া পর্যন্ত ঘটনায়
বেশ পরিচুত হইয়াছে। পাক-কমিড-অবশ্যই এক বামুন ঠাকুর; নতুবা প্রতি ঘাইবে
দে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতপণের প্রতি-প্রভা-ও-প্রভুদেবের মতাকামনা এই দুইটি ভাবই যে তারক-
নাথ-বাবুর মনে-নজাণ ছিল, তাহা তাঁহার একটি রসিকতা হইতেই আমরা জানিতে
পারিমাছি। কথা—তারকনাথ বাবু এক দিন তাঁহার স্মৃতিলেখককে বলিয়াছিলেন, 'রাজেন্দ্র,
আমি বিনা-মিগারে (তিনি গীতিনে) মিগার ব্যবহার কবিতেন) এক পা চলিতে পারি না।
বাবুর মৃত্যুর পর শুধু পাথে কি করিয়া বেড়াইব?' রাজেন্দ্রবাবু ব্যস্ত দিখাছিলেন, 'ভিতরে
ও উপবে মধ্যম দেওয়া এক প্রকার চটা আছে, আপনার পিতার গজালন্ডের পর সেইরূপ
জুতা এক বোড়া আনাইরা দেওয়া ঘাইবে। দশটা দিন কোনও রকমে কাটাইয়া দিবেন।'
তাঁহার পর তারকনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'এক বৎসর বিনা-দাহকণ থাকিতে
হয় না?' রাজেন্দ্রবাবু নিঃসঙ্কেতে উত্তর দিয়াছিলেন, 'শ্রদ্ধের সময় এক বোড়া-চটা জুতা
ব্রাহ্মণকে দান করিলে ঐ কাটাটা কাটা খা' তাহা শুনিয়া তারকনাথ বাবু বলিয়া-
ছিলেন, 'তবে ব্রাহ্মণরা একটা উপায় করিয়া রাখিয়াছেন।' এই অনাবশ্যক রসিকতা-
প্রচারের মূলে কি মাধু উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? অন্ত কেহ তারকনাথ বাবু সেই মজলিসে
উপস্থিত থাকিলে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, 'সে-ব্রাহ্মণরা এই উপায় করিয়া রাখিয়াছেন,

তাঁহার আশ্রয়দেই পূর্বপুরুষ; আব্রাহামের নাম স্মরণে ও তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার
দুর্দশা পূর্বপুরুষের এই কাঁড়া কাটাঁইবার ব্যবস্থা। নতুবা যেখানে যেখানে
তুচ্ছ বোধ করিয়া ভিক্ষার পাত্র সযল করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছুঁি চারি আনর হাত হুতম
ভিখারী ছিলেন না।' ইহাতে আরও দুই একটি উৎকৃষ্ট রসিকতাস্থ গদ্যভঙ্গি আছে। প্রথমটির
বাবু নির্বাক-অর্থে একবার bambooless শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহা শুধু
সহরের ছোব্বা দোকানীদের—take take take, না take না take, একবার take
(লউন বা না লউন, একবার সেবুন)—গ্রাহককে ভুলাইবার কথাটি মনে পড়ে।
দ্বিতীয়টির গদ্য পুনর্বিবাহে অসম্মতি-আনন্দের জোড়ায় হুতমের দুর্ভেদ্যতা বর্ণনা
প্রথম শ্লোকের 'পরোপকৃত্যে ময়া' যিনি এ যাবৎ না শুনিরাছেন, তাঁহার কাছে এ বাক্য
অবশ্যই মৌলিক। রসিকব্রজ প্রকাশনের সহপাঠী যদি রসিকতা পরিচয় না পান
সে পরিচয় আর কে দিবে? বহিঃসংগত লজ্জাভীর্ণ লেখকের ভাবিকার্য্য এমন
সম্মত ও পাঠ্য গিয়াছে, যিনি নাহিত্যসেবার প্রকৃষ্ট পরিচয় না নিতে পারিলেও, পদ্য
'বাবু সে কাল' বলিয়া উর্ব্বান ভাগ করিয়াছেন। বাবা হউন, তারকনাথ বাবা
উদার নহন। ইহা ইন্দ্রনাথের মনোপানের কৃপাও আছে। ইহাতে তারকনাথের
গৌরব কতখানি বাড়িয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। বর্গীয় ইন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্টিতে
ছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু তিনি নাহিত্য ও সম্ময়ে যে ভূমি বাগ্মণ
তাঁহাতেই তিনি আশ্রয় পূজার্থ। আশ্রয় তাঁহাতে সেরে বয়সে দেখিলাম।
তাঁহার চরিত্রে তঁহার কোনও দৃষ্টিই আশ্রয় দেখি মাই। তাঁহার প্রতিটি
চতুর্পাঠী ও অভিযোগে তাঁহার দৃষ্টি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তারকনাথ বাবা
ছেন? রাসলীলার যিনি আছেন, গিরি-গৌরবন্ধনধারণেও তিনিই
মানুষ ছিলেন, তারকনাথও মানুষ ছিলেন। মানুষের পরিচয় দিতে চাইলে, তাঁহার
মন দুই দিকেরই বিচার করিতে হয়। উদারনের হোটেলে পাকিয়া দিতে
কোন বাস্তবী সেই হোটেলে যাতায়াত আছে, তাহা না বলিলেও চলে; কিন্তু
বাস্তবিক নাকি হোটেলের দিকেই হুতম হুতম হুতম হুতম হুতম হুতম
নাক-স্রোতে ভাস্কর্য্যের কথাই বলা উচিত ছিল।

রাজেশ্বর বাবা আনন্দিগোষ, 'নিজের ও পুত্রগণের পোষাক পরিচ্ছদের উপায়' নামক
বড় দৃষ্টি ছিল। তাঁহার দৃষ্টি জিন-সাহেবী কোট-পাকের দিকে পূজনা
ভবিষ্যতে L. M. S. হইলেন, এমন ব্যাপার তাঁহার ছিল কি না, জানিতে পারি
তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উপায় দান করুন, মফা কিছুই
না; এমন কি, ৫০০ টাকার 'স্বর্ণলতা'র copyright বিক্রয় করিয়া
দিয়াছিলেন। শাহা হউন, অনেক বড় লোকেরই বড় দৃষ্টি আশ্রয় দেখিমা

স্তার বিয়েটারে 'স্বর্ণলতা' প্রকাশ,—প্রবন্ধলেখক তারকনাথ বাবাকে
—'স্বর্ণলতা' যদি কখনও সেখানে (টার বিয়েটারে) 'স্বর্ণলতা' কৃত্তিবর্ণ দেখিত
পত্রিকা বলিয়া আশ্রয় দান করিয়া দান দিতে আশ্রয় দেখিমা

কবার 'নৃত্য-কলিত্ব-বুদ্ধিলাভ' না। তাঁর বিদ্রোহের ম্যানেজারের সঙ্গে প্রবন্ধলেখকের এক-
সমক্ষে পত্রব্যবহার হয়েছিল কি ?

'বন্ধারে তিনার পাঠ' অধ্যায়ে প্রকাশ,—পাছে কোনও নিষিদ্ধ মাংস খাইতে হয় বুলিয়া
প্রবন্ধলেখক তারকনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তির 'কৌটিল্য'র নিম্নরূপে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তারকনাথ
বাবু বলিতেন,—‘আমার কিন্তু বক্ষিসবাবুর সহিত ঐ একটি বিষয়ে একমত আছে—পানী-
হাবের সঙ্গে ধর্মের কোনও সংঘাত নাই।’ ইহাতে বুঝা যায়, তারকনাথ বাবুর পানাহারের
সংঘাত ছিল না, কিন্তু তিনি ‘ধার্মিক’ ছিলেন। বাহা ইউক, প্রবন্ধলেখক প্রবন্ধের শেষে ঘন
আবৃত্তি ‘অমরধামে’ গাইয়াছেন—তখন বিদ্রোহ নিষিদ্ধ পানাহারের সহিত হিন্দুধর্মের
কোনও সংঘাত আছে কি না, সে আলোচনা শোভন হইবে না।

এবং তাঁহার সাহিত্যচর্চা-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ব্যক্তি ছাড়া এইবার
ক্রান্তির মতের কথাই বলিব।

তারকনাথ বাবু একজন সাহিত্যদেবী ছিলেন ; স্বতন্ত্র সাহিত্যালোচনার তাঁহার বর্তমান
মান আবশ্যিক। তাঁহার কোনও মত অসার হইলে, তাঁহাও জানা আবশ্যিক। ‘উদ্বোধন-প্রেম’
তিনি পছন্দ করিতেন না। উহা, তাঁহার মতে, ‘ক্লেবল ফাঁকা আশ্রয়, অন্তঃসারশূন্য।’
‘উদ্বোধন-প্রেম’-সম্বন্ধে ইতঃপূর্বে (‘গত শ্রাবণের ‘সাহিত্যে’) আলোচনা করিয়াছি। নূতন
কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। উপন্যাস-রচনার তারকনাথের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে যতভেদ
ছিল, তাঁহাই আলোচনা করিতেছি।

তারকনাথ বাবু বলিতেন,—‘Fictions to please should wear the face of
Truth,’—বাস্তবজীবনে যে নরও ঘটনাবলী নিদ্রিত সংসারে সংঘটিত হইতেছে, তাঁহা অগ্রদ্বন্দ্ব
করিয়া উপন্যাস রচনা করিলে বড় হৃৎযগ্ৰাহী হয়,—বক্ষিসবাবু এই কথা অমূল্যরূপ করেন
নাহি। বাস্তবজীবনে বাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, কোনও উপন্যাসে সেইরূপ ঘটনাবলী প্রাপ্ত হইলে
তাঁহা অতি সহজেই নাড়াগেঁড়ার পিণ্ড হয় ; কিন্তু তারকনাথ বাবুর ঐ সাপেক্ষী উপন্যাসের
একনাড় মাপকাঠি নহে—বাস্তবজীবনে নারকীয় ঘটনাও তা অস্তিত্ব নাই—কতকগুলি
অসম্ভব ও অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশে উপন্যাসের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অসম্ভব
ও অস্বাভাবিক ঘটনা অংগগ্রহণ করিয়া কোন উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহা তাঁহা আমরা
শেষিতে পাই না। তারকনাথ বাবু কথ্য এই,—‘যে সুসলসল-নবাবের দ্বায়েমি খোঁজা প্রার্থী
কিন্তু গুরুত্ববাহী শিত্তর-পুঁথি প্রবেশনিবেধ, তাঁহাতে বক্ষিসবাবু অবশ্য অগণ্যসংখ্যক প্রবেশ-
করাইয়াছেন। শুধু তাঁহাই নহে—আবার নবাবপুত্রী দ্বারা তাঁহার সেবা করান—তাঁহা
প্রচার গোপন নহে—নবাব কতলু খাঁর অমুমোদনে, এবং তাঁহার জাতিপুত্র ওসমানের সমক্ষে
পাশে বসিয়াছেন, “শুন ওসমান। আবার বলি, এই কন্দীই আমার প্রার্থন”।’ ইহাতে
বুঝা যায়, উপন্যাসে তারকনাথ বাবুর দৃষ্টি বড়ই স্থল ছিল। বস্তুমতল্লের চূর্ণশেনানিনী ইতিহাস
নহে উপন্যাস, ইহা বুলিলে তিনি ‘আয়েস-ব্যবহারে অস্বাভাবিকতার আরোপ করিতেন
না। উপন্যাসে ইতিহাসের ‘সুদূর’কে বুলিতে যাক্‌বাই বিভ্রম। যে সেবাপুত্র নারীদের
গৌরব বুলি করে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের দ্বায়েমিকে সেই ভাবেই পড়িয়াছেন। চূর্ণশেনানিনী

মিনী-উপন্যাসে বিত্তীয় খণ্ডের বিস্তারিত পরিচ্ছেদে তাহার আয়েসা তাহারই ওসমানকে বলিয়াছে, 'ওসমান! আমি ত বভাবতঃ রমণী, স্পীডিতেব দেবা আমাব-পবন বর্ষ; না

করিলে দোষ-করিলে-প্রশংসা নাই।' ইহা নবাব কতলু খাঁয়ের দুহিতার কথা নহে, ইহা সেবাধর্মিনী আদর্শ-রমণীর কথা। সেবাধর্মিনী আয়েসাকে মুচ্ছিতা তিলোত্তমার সেবাগ রত হইতে দেখা যায়। কতলু খাঁয়ের অন্তিমকালেও এই রমণীরদ্বকে হির, মস্তী ও নিঃশালভায়ে

'নিঃশায়ে পিতার মন্তক অঙ্গে ধারণ করিয়া রহিবাছেন'—'পুনঃ পুনঃ পানীয়াভিষিক্তা কবি-তেছেন' দেখিতে পাই। উপন্যাসের ত্রায়িকা-হিসাবে সেবারতা আয়েসার পক্ষে জগৎ সিংহের সেবা করা অসম্ভব নহে; অস্বাভাবিকও নহে। কিন্তু জগৎসিংহ নবাবের অন্তঃপুরে—স্বর্বাঙ্গে

এবেশ করিলেন কেন? ইহার উত্তর দুর্গেশনন্দিনী-উপন্যাসেই আছে। ওসমানের সহিত আয়েসার ও জগৎ সিংহের সহিত ওসমানের কথোপকথনেই ব্যক্ত হইয়াছে, কতলু খাঁ ইচ্ছা

করিয়াই জগৎ সিংহকে সাধারণ কাঙ্গাগারে না রাখিয়া হারেমেই আশ্রয় দিয়াছিলেন। জগৎ

সিংহের পিতা হামসিংহের-সন্তোষ-উৎপাদনের জন্যই জগৎসিংহের প্রতি কতলু খাঁয়ের এই সদয় ব্যবহার। এই সদয় ব্যবহারের ফলে ছিল প্রবর্তা-বার্ষ-মোগল সম্রাটের সহিত অনুকূল

মিত্রির আশা। জগৎ সিংহের রূপের কাছে পড়া নবাবনন্দিনী আয়েসার পক্ষে গঠিত হইতে পারে, কিন্তু উপন্যাসিক সে জন্য দায়ী নহেন। ইহা বাস্তব-জগতেরই চিত্র। সেবাধর্মিনী

কোনও হিন্দুললনাও কোনও মুসলমানের রূপের ফানে গড়িতে পারে, পড়িয়াও থাকে।

ধর্মিকন্যা স্বর্ণরতা-রূপে প্রতি পাতকত্রাজ্ঞ গোপালের প্রণয়ে মুগ্ধ হইতে পারে, তবে নবাবনন্দিনী আয়েসাই বা মহারাজ হামসিংহের পুত্রকে ভালবাসিবে না কেন? যে প্রেম একের সর্বত্র দান

করে, উপন্যাসের আয়েসা সেই প্রেমেরই অলস ছবি। উপন্যাসের আয়েসা যখন বুনিয়ে ওসমান তাহার স্বয়ম্বেদভাব সহিত মিলনের পথে কটকট, তখনই সে সাময়িক উত্তেজনা

হৃদয়ের ভাব চাপিয়া বাধিতে না পারিয়া ওসমানকে বলিল, 'শুন ওসমান! এই বন্ধু-
(জগৎসিংহই) আমাব প্রাণেশ্বর' পরক্ষণেই আয়েসা জগৎ সিংহকে বলিল, 'রাজপুত্র'

তুমিও আমার অপরাধ-ক্ষমা কর। যদি ওসমান আদ্য আমাকে মনঃসিদ্ধিত না করিতেন, তবে এ বন্ধু হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও সুখ্যাভিলাষিত

হইত না।' পরে জগৎ সিংহের সহিত এ জগতে তাহার মিলন অসম্ভব বৃত্তিগত যে প্রেমের প্রাজ্জ্বলি হৃদ-ও তৃপ্তির কাননা করিয়াছে; নিজের অলঙ্কার তিলোত্তমার অঙ্গে পরাইয়া

বলিয়াছে, 'আমি যে রত্নগুলি দিলাম, সঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সত্যবদ্র স্বয়ম্বেদে রাখিও।' বস্তুমত্রে আয়েসার চবিতে যে ধৃতিবলের পরিচয় দিয়াছেন, যে সত্যবদ্র

আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা ব্যঙ্গ্য-বস্ত্র নহে। তারকনাথ বাবু বস্তুমত্রে উপন্যাসে যে দোষ দেখিয়াছেন, সে দোষের আমরা সমর্থন

করি না; কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী' ভ্রষ্টাঙ্গী, এমন কথাও বলি না। বিমলা তিলোত্তমার বিনোদ তাহা তিলোত্তমা না জানিলেও, বিমলা জানিত। তিলোত্তমার জন্য বিমলার দোহা,

হাসিটোয়াও রসিকতার স্থানে স্থানে দুর্গেশনন্দিনীর সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। বস্তুমত্রে বিমলাকে বুদ্ধিমত্তা নাথিকা গণিতাছেন; বিমলার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অধিক

পরিমাণে আছে ; কিন্তু নকল কার্কে ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের বৃত্তি পাশ্চাত্য নারীর আদর্শে চালিত হওয়ায় বাস্তবী পার্থক্যের দ্বন্দ্ব বসন্তের আগন্তু আছে । প্রথম দলের ভোদন ও নন্দন পলিচ্ছেন দুইটি আদর্শের ভাল লাগে না । ভিত্তিহীন সম্মুখে অগতঃ সিংহের সহিত বিরোধ ঘোষণা হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত স্থান ভোদনও বৈবক্ষ্যের নহে । উপন্যাসের প্রায়-সর্বত্রই দেখা যায় যে প্রেমালোপ হইতে গায়ে ; কিন্তু দেখা যায় ছাত্রের নিকটবর্তী বোনও গর্ভভ্রষ্টের বসিয়া প্রেমালোপের পথও যখন খোলা আছে, তখন হিন্দু-উপন্যাসিকের এই পথেই চলা চলিত । তাহার পর সমস্তই পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার সহিত অগতঃ সিংহের 'কোর্টসিংগ'র খাড়াই হিন্দু নারীর আগন্তুর প্রতিকূল । কতকু খায়ে চরিত্রকে দুর্গে মধ্য প্রবেশের সুযোগ অক্ষতপেও দেওয়া হইতে পারিত । ভিত্তিহীন গৃহে বীর অগতঃ সিংহের বন্দী হওয়া অসম্ভব নহে, অশোভন । ওসমানের আক্রমণের পূর্বে মোগলসম্রাটের দূত-রূপেও নব সিংহ গড়ের মধ্যে অবস্থান করিয়া বন্দী হইতে পারিত । আমরা অবশ্য উন্নত আদর্শের কথা বলিতেছি ; কিন্তু উপন্যাসিক যাহা গড়েন নাই, তাহা না দেখিয়া, যাহা গড়িয়াছেন, তাহাই দেখিতে হইবে । এই কারণে বলি, 'দর্পশনিনী' বহিঃসম্মুখ প্রবেশ উপন্যাস না উল্লেখ, উহাতে ভাবনাও বা মায়েসার যে রূপ দেখিয়াছেন, উহা-আবেশের একতরু রূপ নহে, স্ক্রিট রূপ ।

এখন তালকলাষ নাদু । 'Fictions to please should wear the face of Truth'

না, স্মৃতিতে তাহার 'স্বপ্নসংগতি' স্বপ্নসংগতিতে সাধারণ স্বেচ্ছা মন্দ হয় না ।

অন্যতঃ তাহাদের বংশের গুরুত্বের শাস্ত্রমোক্ষের সম্মুখে গলায় 'ফাঁদ' টানিয়াছেন,

এই সময় বহিঃসম্মুখ হইতে এক প্রকাণ্ড আলোক দেখা গেল...আলোক দুইজনকে

দুইজনকে ঘাট হইয়া পড়িল ।' ইহা গড়িয়া ছিটেকটিক উপন্যাসিক পাটকড়ি বাবুর

অন্যতঃ মনে পড়ে । পলাইবার পথ নাই, এক হাত দূরে পুলিশ দাঁড়াইয়া আছে,

কিন্তু হঠাৎ নলেরমা অগতঃ হইল ।—তখন 'Face of Truth' 'wear' করে । নীলকমল

এই বিদ্যাবিদগুরুজের, এবং স্বপ্নসংগতি যে ক্রিয়াকর্মের ব্যর্থ অনুবরণ, একটু চোরা করিলেই

দুঃখ ঘাট । প্রসঙ্গের নোকাডুবিতে অগতঃ পতাই পরাজয় ঘোষিত হইয়া থাকে, উহা

অসম্ভববিকার পলা-নব্বের দৃষ্টান্ত । মুদ্রাবান্য অসম্ভবীয় বুঝ দুইটির চিত্রের অসা-

ম্ভবিকতা দৃষ্টে এগা দেওয়া যায় ? চিত্রে এবং স্বপ্নসংগতি স্বপ্নসংগতির ক্ষেত্রে সত্যক

নাও 'কল্পিত' টেনিস-শাট-পরা দরিদ্র পাটকড়ি ত্রাঙ্গ-যুবক গোপাল 'বাবু'র মুখী দেখিলে

'face of truth'এর ঘাট ঘাইয়া যে বোদনও সাহিত্যসিককে হতজ্ঞান হইতে হয় । কর্মজাত

শিল্পের প্রতি বাস্তব রামহনন-ও তাহাও তিন জন সঙ্গী ব্যবহার রসাধিকো বাস্ত-

বিকতার শিল্প কাটিয়াছে । সরদা বাপের বাড়ী গেলে তাহাও বানীর দ্বারা ভাষার দূর

হইবে না, কাজেই যে যায় না ; কিন্তু সরদার যে বাপের বাড়ী ছিল, তাহাও পরিচয় কোথাও

গেয়া যায় না ; অথচ, নীলকমলের তিন পুরুষের, এবং স্বপ্নসংগতির সত্য পুরুষের সংবাদ উহাতে

পাওয়া যায় । দাসীর সঙ্কট অর্থে ভাগ-বসান অপেক্ষা বাপের বাড়ী যাওয়া ভাল ছিল কি না,

এইবার তাহার বিচার করেন নাই, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পাটকড়ি মধ্যে মধ্যে করিয়া বলে কথায়

সময় কাটাইয়াছেন। বাহা ইউরোপ, সরলার চিত্র করণবসের স্পর্শে মনোহর হইয়াছে। এত-বলী পরিবায়-প্রথা ধর্ম হওয়ায়-অধিকাংশ হিন্দু গৃহস্থকে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হইয়াছে, স্বর্ণলতা-উপন্যাসের প্রথম অংশে আমরা তাহারই হচাক চিত্র দেখিতে পাই।

ঐ চিত্রটুকু আমাদের প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই জন্যই আমরা 'স্বর্ণলতা'র প্রশংসা করি। 'খিঘেটার 'স্বর্ণলতা' হইতে 'সরলা'কেই লইয়াছে। বোধ হয় তারকনাথ বাবু স্বর্ণলতাকে মারিয়া বড়ই বিপ্রত হইয়াছিলেন; তাহার পর উপসংহার লিখিয়া সবটুকুই স্বর্ণলতা-নামে বাহির করিয়াছেন; সরলার মন্দিরে স্বর্ণলতাকে বসাইয়া ভাদ্রা মাসে চাঁদের আনা দেখাইয়াছেন। *

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘোড়ার চৌষটি ঘর ভ্রমণ।

এখন দাবা খেলা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারত-বর্ষে এই খেলাব বিশেষ চর্চ্চা ছিল। কিন্তু ভাবতবর্ষে কলাবিজ্ঞান অননুভবিত্ব সঙ্গে সঙ্গে এই খেলাব আলোচনাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। আজকাল ইউরোপে এই ভারতীয় খেলার বিশেষ আদব। ইউরোপীয় দাবা খেলোয়াড় হার্বি, টিচমান, এণ্ডারসন, লোয়েনথার প্রভৃতি খেলোয়াড়ের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইহাদের অনেক অদ্ভুত খেলা আছে। ইহার কখনও কোলও খেলার শূকপক্ষকে মোতাবেক হইয়া এক একটা কবিতা নিজের প্রায় সমস্ত বল ক্ষয় করিতে দিয়া, অবশেষে সামান্য বল লইয়াই বিপক্ষের রাজাকে নাৎ-করিয়া দিয়াছেন। খেলাব কোণে এই যে, শূকপক্ষ এক-একটা কবিতা বল ধ্বংস করিতেছেন বটে; কিন্তু নিজে সেই সঙ্গে ব্যুৎপালের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়া স্বপ্নের মূর্থে ভ্রমণ করিতেছেন। পল-মাক আজকাল অদ্বিতীয় দাবা খেলোয়াড়। তিনি চকু বাঁধিয়া অনারাদেই

* 'তারকনাথপুত্র' গত ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় 'মাননী ও মর্ম্মবাণী' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একই নামের একটি আলোচনা লিখিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। ১৫ই আশ্বিন ডাক-বোপে 'মাননী ও মর্ম্মবাণী' কার্যালয়ে পরিবর্তিত ঠিকানা প্রত্যাখ্যান হইয়াছে। আলোচনাটি অমনোনিতে হইলে, দয়া করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে সেরত দিতে অনুগ্রহ করিয়া ঐ তারিখেই পত্রও দিয়াছিলাম। পড়ে ৩০শে আশ্বিন, আলোচনাটি দয়া করিয়া বৈয়াক্য ডাকে সেরত দিবার জন্য, পুনরায় পত্র যিখাছি। কিন্তু এ যাবৎ (৫ই অক্টোবর) উহা সেরত পাই নাই, প্রত্যাশিতও পাই নাই। হস্তরায় উহা 'মাননী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক মহাশয়ের হস্তগত হইয়া নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। সম্ভাব্যভাবে আলোচনার নকল বাপি নাই, নুতন করিয়া লিখিয়া দিতে হইল।—লেখক।

মহা-নার জন ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব খেলিতে পারেন, এবং সকলকে
অতি অল্প কালের মধ্যেই পরাস্ত করিয়া থাকেন।

বিলাতী মাসিক পত্রিকার অনেকগুলিতে দাবা খেলার সমস্তা থাকে।
দাবা খেলা আমাদের দেশ হইতে উৎপন্ন, এবং এখনও একটা স্বাভাবিক খেলা
রহিয়া প্রচলিত আছে; সেই জন্য দাবাখেলা সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশীয়
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের বোগ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে পূর্বকাল
হইতে দাবা খেলার একটা সমস্তা দিয়া কতক আলোচনা হইয়াছে। এই
সমস্তাটি “বোড়ার চৌষটি ঘর ভ্রমণ”। অর্থাৎ বোড়া এক ঘর হইতে ক্রমাগত
অন্ত ঘরে যাইয়া দাবার ছকের চৌষটি ঘর বেড়াইয়া বেড়াইবে, অথচ এক ঘরে
দুইবার যাইবে না।

ইউরোপীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ এবং দাবা খেলোয়াড়েরা এই সমস্তার একটা
সাধারণ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ডাক্তার বজ্জের
এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহার সেই গবেষণা
আমি সংগ্রহ করিতে পাবি নাই। পঠদশায় দিন কতক আমি ইহার একটা
সহজ মীমাংসা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রের দিক
দিয়া প্রমত্ত বিশেষ জটিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। দাবা হউক, বাদিও সাধারণ
মীমাংসা বাহির হয় নাই, তথাপি দুই একটা বিশেষ মীমাংসা বাহির হইয়াছিল।
দাবা হউক, এই বিশেষ মীমাংসা বাহির করা বিশেষ কঠিন কার্য নয়। যদিও
ইহাতে কতকটা পরিশ্রম প্রয়োজন হইতে হয়, তথাপি ধৈর্য ও একাগ্রতা
থাকিলে সকল কার্যের দ্বার ইহাতেও সিদ্ধিলাভ ঘটে। পরে কন্সোপলক্ষে
অনেক স্থানে অনেক বদ্ধবাককে এই সমস্তার পূরণ করিতে দিয়াছিলাম, এবং
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই সমস্তার পূরণ করিয়া দিয়াছেন। আশা করি
এই পত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে তাঁহাদের এই বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাঁহারাও
এই সমস্তা তাঁহাদিগের নিজের পদ্ধতিতে পূরণ করিয়া ছাপাইবার জন্য
পাঠাইয়া দিবেন। অনেক সমস্তা-পূরণ এক সঙ্গে পাওয়া গেলে বোধ হয়
সংগ্রহণ নিয়ম বাহির করা সহজ হইতে পারে। নিম্নে এই সমস্তা-পূরণের
কতকগুলি মীমাংসা দেওয়া গেল। এই দেশে এই সমস্তা-পূরণের একটা
মীমাংসা প্রচলিত আছে। সেটি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ,—

“হে কুপ দারকানাথ কাসি বাদরনজন।

সমুদ্রের কথাক্রমে ত্রাতা ভব জনান্দন ॥”

এই কবিতার অক্ষরগুলি প্রত্যেক ঘরে সাজাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র বচন আছে। এই বচনটী নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই বচন অনুসারে অক্ষরবর্ণি যথানিয়মে খেলার প্রত্যেক ঘরে সাজাইয়া লইয়া পরে "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ" ইত্যাদি কবিতার দ্বারা ঘোড়া চালনা করিলেই ইহা সহজ হইয়া গড়িবে।

বচন যথা :—

"থুকাবীর্জ নকীমনা,

কেনা মকু জকাভাসি,

ঘারেল্প নবাধব,

তান জশ হেতাবর।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, বচনটার প্রত্যেক লাইনে আটটি করিয়া, অর্থাৎ চারি লাইনে ৩২টি অক্ষর আছে। কিন্তু খেলার ঘর সর্বসত্ত্ব চৌবাটটি। নিম্ন কোষ্টক অনুসারে বচনটী দুইবার ঘরিয়া লইয়া সাজাইলেই চৌবাটটি ঘরের সর্বসত্ত্ব গুলিতেই অক্ষর সাজান হইবে। তৎপরে "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ" কবিতা দ্বারা ঘোটক সকালন করিলেই বেশ চালিত হইবে।—

অক্ষর সাজাইবার নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩
১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫	৪
১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬	৫
১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭	৬
১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮	৭
১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯	৮
১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০	৯
১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১০
১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২	১১
১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩
২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪
২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫
২৩	২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭	১৬
২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯	১৮	১৭
২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯	১৮
২৬	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০	১৯
২৭	২৬	২৫	২৪	২৩	২২	২১	২০
২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	২৩	২২	২১
২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	২৩	২২
৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪	২৩
৩১	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫	২৪
৩২	৩১	৩০	২৯	২৮	২৭	২৬	২৫

খেলার ঘরের সর্বনিম্নে বাম-দিকের প্রথম ঘর হইতে আৰম্ভ করিয়া বাক্যব দক্ষিণ দিকে থু, ফ, বী, দি, ন, কা, দ, না, এই আটটি অক্ষর প্রত্যেক ঘরে পর পর সাজাইয়া বসাইয়া, পুনরায় উহা উপর লাইনের বাম দিকে প্রথম ঘর হইতে কে, না, ম, ক, হ, কা, ভ, সি, আটটি অক্ষর বসাইয়া, পুনরায় তদুর্দ্ধ অর্থাৎ তৃতীয় লাইনের বাম দিক হইতে যথাক্রমে ছা, রে, শ, ন, ন, যা, থ, ব, এবং চতুর্থ লাইনের বাম দিক হইতে ঐরূপ-তা, ন, জ, শ, হে, তা, র, ব অক্ষরগুলি বসাইলে, ৩২টি ঘর পূর্ণ হইল। তৎপরে বরখানিকে ঘুাইয়া উর্দ্ধভাগকে নিম্ন দিকে আনিয়া পূর্ণোক্ত নিয়ম-অনুসারে সর্ব নিম্নের বাম দিকের ঘর হইতে

একপ খু, ক, গী, দি, ব, জা, দ, না, ইত্যাদি অক্ষরগুলি যথাক্রমে পর-পর
সাজাইলেই বাকী ৩২টা বর পূরণ হইল। এই বার "হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ"
কবিতালুপ্তারী বোড়া চালনা করিলেই ঘোড়া সহজেই ৬৪ ঘর ঘুরিয়া আসিবে।

এই নিয়মটী অঙ্গুপাত করিয়া এইরূপে প্রকাশ করা যায় :-

১	৩০	২	২০	৩	২৪	১১	২৬
১৬	১৯	২	২৯	১০	২৭	৪	২৩
৩১	৮	১৭	১৪	২১	৬	২৫	১২
১৮	১৫	৩২	৭	২৮	১৩	২২	৫

এখানে ৩২শের চাল ঘরে আছে ; তাহার পর হইতে ৩৩শের ঘরের চাল
দাবাব ছকের আর অর্ধেকের ঠিক প্রথম ঘরে পড়িবে, এবং দাবাব এই নীচের
অর্ধেক ছকের ঘোড়া ঠিক উপবেব অর্ধেক ছকের স্থায় ঘুরিবে।

এই ঘোড়াব ৬৪ ঘব ভ্রমণেব নিয়ম আমার বন্ধু এবং পবিচিতগণেব মধ্যে
কেহ কেহ জানাইয়াছেন, তাহা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি। বাবু সতীশচন্দ্র
বসু যখন ধানবাদের মুনসেক ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই নিয়মটী
জানাইয়াছিলেন :-

১	৩২	১৫	১২	২৩	৩০	১৭	১০
৪৬	১৩	৬৪	৩১	১৬	১১	২৪	২৯
৩৩	২	৪৭	১৪	৬৩	২২	৯	১৮
৪৮	৪৫	৬	২১	৮	৫৫	২৮	২৫
৩	৩৪	৪৯	৬২	৫	২৬	১৯	৫৩
৫৪	৬১	৪	৭	২০	৩৯	৫৪	২৭
৩৫	৫০	৫৯	৪২	৩৭	৫২	৫৭	৪০
৬০	৪৩	৩৬	৫১	৫৮	৪১	৩৮	৫৩

বাবু প্রমথনাথ চক্রবর্তী ষ্টামার স্টেশনমাষ্টার, উলুবেড়িয়া, নিম্নলিখিত সমস্ত
পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

৭	৫৮	১৯	৩২	২৯	৬০	২১	৩৪
১৮	৩১	৮	৫৯	২০	৩৩	১০	৬৩
৫৭	৬	৪৩	৪০	৬১	৬৪	৩৫	২২
৩০	১৭	৬	৫৩	৪৪	৪১	৬২	১১
৫	৪৬	৩৯	৪২	৫৫	৫২	২৩	৩৬

১৬	২৯	৫৪	৪৫	৩৮	২৫	১২	৫১
৪৭	৪	২৭	১৪	৪৯	২	৩৭	২৪
২৮	২৫	৪৮	৩	২৬	১৩	৫০	১

হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী বাইনান-নিবাসী বাবু বজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় “অমৃতবাজার পত্রিকা”র নিম্নলিখিত ভাবে সমস্তাব পূরণ করিয়াছেন। তাহার বয়স ৭১ বৎসর, এবং তিনি এক জন পাকা খেলোয়াড়।

৭	২৮	২	২৪	১৩	২০	৩	২২
১০	২৫	৬	২৯	৪	২৩	১৬	১৯
২৭	৮	৩১	১২	১৭	১৪	২১	২
৩৩	১১	২৬	৫	৩০	১	১৮	১৫

এই ঘরের অপরাধ ঠিক পূর্ণাঙ্গের মত হইবে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বসু, “সিদ্ধ মলয়” আফিস, কলিকাতা, ১৬—৯—১৯১৩ তারিখের “আনন্দবাজার পত্রিকা”র যে একটি প্রবণের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

১	৫০	৫	১৪	৬৩	২৪	২৭	২২
৬	১৩	৬৪	৪৯	৪	২১	৪২	২৫
৫১	২	৭	৬২	১৫	২৬	২৩	২৮
৮	৬১	১২	৩	৪৮	৪১	২০	৪৫
১১	৫২	৯	১৬	৩৫	৪৪	২৯	৪০
৬০	৫৫	৫৮	৪৭	৩০	৩৯	৩৪	১৯
৫৭	১০	৫৩	৩৬	১৭	৩২	৪০	৩৮
৫৪	৫৯	৫৬	৩১	৪৬	৩৭	১৮	৩৩

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, Principle of class নামের ইংরেজী পুস্তক হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অগষ্টের “আনন্দবাজার পত্রিকা”র একটি সমস্তাব পূরণের নিয়ম বাহির করেন, তাহা এই :—

৪৮	৩৭	২৪	১১	৪৬	৩৫	২২	
২৫	১২	৪৭	৩৬	২৩	১০	৪৫	৩৪
৩৮	৪৯	৬২	৫৫	৬০	৫৭	৮	
১৩	২৬	১	৫৮	৬৩	৫৪	৩৩	৪৪
৫০	৩৯	১৪	৬১	৫৬	৫৯	২০	৭

১৫	২	২৭	৫০	৫৩	৬৪	৪৩	৩২
২৫	৫২	৪	১৭	৩০	৪১	৬	১৯
৩	১৬	২৯	৫২	৫	১৮	৩১	৪২

১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি আর একটি সমস্ত-পূরণের নিয়ম বাহির করেন, তাহা এই। তাহার নিজের উদ্ভাবিত, কি অস্ত্র কিছু হইতে সংগৃহীত, তাহা তিনি লেখেন নাই।—

২৪	১৩	৩৮	৫৩	২৬	১৫	৪০	৫৫
৩৭	৫২	২৫	১৪	৩৯	৫৪	২৭	১৬
১২	২৩	৫০	৫৭	৪	১৭	৫৬	৪১
৫১	৩৬	১	১৮	৫৭	৪৮	৫	২৮
২২	১১	৪৬	৪৯	৩২	৩	৪২	৫৯
৩৫	৬৪	১৯	২	৪৫	৫৮	২৯	৬
১০	২১	৬২	৩৩	৮	৩১	৬০	৪৩
৬৩	৩৪	৯	২০	৬১	৪৬	৭	৩০

আনিও চেষ্টা করিয়া এই সমস্ত-পূরণের দুইটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলাম।

তাঁহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১	৩৬	২৭	৩০	২১	৪	২৫	৩২
২৮	৩৯	২	৩৫	২৬	৩১	২০	৫
৩৭	৬৪	২৯	৫২	৩	২২	৩৩	২৪
৪৯	৪৩	৩৮	৫১	৩৪	৫১	৬	১৯
৫৭	৬২	৪১	৪৪	৫৩	১৮	২৩	৫০
৪২	৪৫	৫৬	৫৯	১২	৯	১৬	৭
৬১	৫৮	৪৭	৫৩	১৭	১৪	৪৯	১০
৪৬	৫৫	৬০	১৩	৪৮	১১	৮	১৫

অন্তর্গত এইরূপ :—

১	২৪	৩৭	৫২	৩১	২৬	৩৫	৪৪
৩৮	৪১	৬৪	২৫	৩৬	৪৩	৩০	২৭
২৩	৯	৩৯	৩২	২১	২৮	৪৫	৩৪
৪০	৬৩	২২	৩	৪৬	৩৩	২০	২৯
১৩	৪	৪৯	৬২	১৯	৬	৪৭	৫৬

৫০	৬১	১২	৫	৪৮	৫৫	১৮	৭
১১	১৪	৫২	৫২	১২	১৬	৫৭	৫৩
৬০	৫১	১০	১৫	৫৮	৫৩	৮	১৭

নিম্নের সমস্ত পুস্তকগুলি ইংরেজী পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে :-

১	৫২	১৫	৩৪	৩	৫০	১৭	৩৩
১৪	৩৩	২	৫১	১৮	৩৫	৪	৬২
৫৩	৬৪	৩৩	২৪	২৯	২৬	৩৭	১৮
৩২	১৩	৬২	২৭	৬০	২৩	৪৮	৫
৬৩	৫৪	১১	৩০	২৫	২৮	১৯	৩৭
১২	৪৩	৫৬	৬১	২২	৫৯	৬	৫৭
৫৫	১০	৪১	৫৮	৪৫	৮	৩৯	২০
৪২	৫৭	৪৪	৯	৪০	২১	৪৬	৭

অন্যটি এইরূপ :-

৩৭	৬২	৪৩	৫৬	৩৫	৬০	৩১	১০
৪৪	৫৫	৩৬	৬১	৪২	৪৯	৩৪	৫৯
৬১	৫৮	৫৩	৪৬	৫৭	৪০	৫১	১৮
৫৪	৪৫	৬৪	৩৯	৫২	৪৭	৫৮	৩৩
১	২৩	১৫	২০	৭	৩২	১৩	২২
১৬	১৯	৮	২৫	১৪	২১	৩	৩১
২৭	২	১৭	১০	২৯	৪	২৩	১২
১৮	৯	২৮	৩	২৪	১১	৩০	৫

১২

১	১৮	৫৩	৩৮	১৫	৩০	৫১	৩৪
৪৪	৩৯	২	১৭	৫২	৩৩	১৪	৩১
১৯	৪	৩৭	৫৬	২৯	১৬	৩৫	১০
৪০	৪৪	২০	৩	৩৬	৪৯	৩২	১৫
৫	২২	৫৭	৪৪	৯	২৭	৬৩	৪৪
৫৭	১৪	৭	২১	৬৪	৪৫	১২	১৭
২৩	৬	৪৩	৫০	২৪	১০	৪৭	৩২
৪২	৫৯	২৪	৭	৪৬	৩১	২১	১১

	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০
২৬০	৫০	১১	২৪	৬০	১৪	৩৭	২৬	৩৫	২৬০
২৬০	২৩	৬২	৫১	১২	২৫	৩৪	১৫	৩৮	২৬০
২৬০	১০	৪৯	৬৪	২১	৪০	১৬	৩৬	২৭	২৬০
২৬০	৬১	২২	৯	৫২	৩০	২৮	৩৯	১৬	২৬০
২৬০	৪৮	৭	৬০	১	২০	৪১	৪৪	২৯	২৬০
২৬০	৫৯	৪	৪৫	৮	৫৩	৩২	১৭	৪২	২৬০
২৬০	৬	৪৭	২	৫৭	৪৪	১৯	৩০	৫৫	২৬০
২৬০	৩	৫৮	৫	৪৬	৩১	৫৬	৪৩	১৮	২৬০
	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	২৬০	

শেষের সমস্ত-পূরণ শুধু দাবা খেলার সমস্ত-পূরণ নহে, উহা একটা ম্যাজিক-স্কোয়ার (magic square) বটে; অর্থাৎ উহা পঞ্জিকায় যেমন ৩২শে বব পূরণ করা আছে, সেইরূপ আড়াআড়ি কিংবা লম্বালম্বি যোগ করিলে ২৬০ হইবে।

নিম্নে একখানি প্রচলিত ইংবেজী কাগজে প্রকাশিত একটা সমস্ত-পূরণের নিয়ম দিতেছি। ঐটা মনে রাখিব। একটা নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেটাও সিপিবদ্ধ করিয়া দিতেছি। প্রচলিত নিয়মটা এই :—

৫৮	৩৫	৪	১৯	৫৬	৩৭	৬	২৩
১	১৮	৫৭	৩৬	৫	২২	৫৫	৩৮
৩৭	৫৯	২০	৩	৪০	৫৩	২৪	৭
১৭	২	৩৩	৬০	২১	৮	৩৯	৫৪
৬২	৪৭	১৬	২৯	৫২	৪১	১০	২৫
১৫	৩২	৬১	৪৮	৯	২৮	৫১	৪২
৪৬	৬৩	৩০	১৩	৪৪	৪৯	২৬	১১
৩১	১৪	৪৫	৬৪	২৭	১২	৪৩	৫০

এইরূপে বস্তুগুলিকে এইরূপ ভাবে নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে।—

ক ১	ক ২	ক ৩	ক ৪	ক ৫	ক ৬	ক ৭	ক ৮
ক ১০	ক ১১	ক ১২	ক ১৩	ক ১৪	ক ১৫	ক ১৬	ক ১৭
ক ২০	ক ২১	ক ২২	ক ২৩	ক ২৪	ক ২৫	ক ২৬	ক ২৭

ক ১৫	ক ১১	ক ৮	ক ৩	খ ১৪	খ ১১	খ ৭	খ ২
গ ১৫	গ ১১	গ ৮	গ ৩	গ ১৪	গ ১১	গ ৭	গ ২
ঘ ১০	ঘ ১৪	ঘ ৮	ঘ ৮	ঘ ১০	ঘ ১৪	ঘ ৮	ঘ ৮
ঘ ৮	ঘ ২	ঘ ১৬	ঘ ২২	ঘ ৬	ঘ ২	ঘ ১৬	ঘ ২
ঘ ১৫	ঘ ১১	ঘ ৭	ঘ ৩	ঘ ১৫	ঘ ১১	ঘ ৭	ঘ ৩

ঘরগুলিকে এইরূপ ভাবে নির্দিষ্ট করিবার প্রণালী যে অতি সহজ, একটু পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। দাবা খেলার ৬৪ ঘর, ১৬ ঘর করিয়া ছকে চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই চারিটা ভাগে ক খ গ ঘ, এই চারিটা অক্ষর সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে ১৬ ঘর নির্দিষ্ট করিবার জন্ত অক্ষরের পার্শ্বে ক খ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম কোণের ঘর ক ১ হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা হইতে ক ১ ক ২ ক ৩ ক ৪, এই চারিটা ঘোড়ার ঘর এই ছকের মধ্যে ঘুরিবে; তাহা পরে ক ১-এর পার্শ্বে ঘর ক ৫ নাম দিয়া ঘোড়ার চালক, ক ৬, ক ৭, ক ৮ ঘর নির্দিষ্ট কর। তাহার পার্শ্বের ঘর ক ৯ হইতে ক ১০, ক ১১, ক ১২ ঘর নির্দিষ্ট কর। এইরূপ অন্যান্য ঘর নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এক্ষণে উপরে যে সমস্ত পূরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই নূতন রূপ নির্দিষ্ট ঘরের প্রণালী মতে সংজ্ঞা (notion) দ্বারা লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ পাড়ায়।

ক ১০	ক ১১	ক ১২	ক ১৩	খ ১০	খ ১১	খ ১২	খ ১৩
গ ১০	গ ১১	গ ১২	গ ১৩	ঘ ১০	ঘ ১১	ঘ ১২	ঘ ১৩
ক ১৫	ক ১৪	ক ১৩	ক ১২	খ ১৫	খ ১৪	খ ১৩	খ ১২
গ ১৫	গ ১৪	গ ১৩	গ ১২	ঘ ১৫	ঘ ১৪	ঘ ১৩	ঘ ১২
ক ৭	ক ৬	ক ৫	ক ৪	খ ৭	খ ৬	খ ৫	খ ৪
গ ৭	গ ৬	গ ৫	গ ৪	ঘ ৭	ঘ ৬	ঘ ৫	ঘ ৪
ক ৮	ক ১	ক ২	ক ৩	খ ৮	খ ১	খ ২	খ ৩
গ ৮	গ ১	গ ২	গ ৩	ঘ ৮	ঘ ১	ঘ ২	ঘ ৩

এই বিবরণে দেখা যাইবে যে, ক-এর শেষে-ঘে-ঘে-সংখ্যা, তাহা খ গ-এর সংখ্যা হইতে অভিন্ন; অতএব, ক-এর শেষের সংখ্যাগুলি স্থিতিগোচর থাকিবেই

এই সমস্ত পূরণ স্থিতিপথে থাকিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ক-এর সংখ্যাগুলি এইরূপ :-

ক ১০	ক ১১	ক ১২	ক ১৩
ক ১৪	ক ১৫	ক ১৬	ক ১৭
ক ১৮	ক ১৯	ক ২০	ক ২১
ক ২২	ক ২৩	ক ২৪	ক ২৫

ক-এর এই সংখ্যাগুলির মধ্যেও নিয়ম আছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যার যোগফল ২৫। প্রথম লাইনের সংখ্যা হইতে দ্বিতীয় লাইনের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারা যায়। দ্বিতীয় লাইন ও তৃতীয় লাইন সংখ্যার বিয়োগফল ৮। ইহা হইতে তৃতীয় লাইনের সংখ্যা অনায়াসে জানা যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের সংখ্যা বোড়ার চালে অবস্থিত থাকিলে, তাহার যোগফল ৯। অতএব প্রথম লাইনের সংখ্যা ১০, ১১, ১২, ৯ উহা হইতে ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনের সংখ্যা উদ্ধার করা যায়। এই সামান্য নিয়মটী মনে রাখিলেই এই সমস্ত সংখ্যা-পূরণ মনে রাখা অতীব সহজ। আশা করি, 'সাহিত্য'র পাঠকগণ মৌলিক উপায় দ্বারা এইরূপ সমস্ত পূরণের নিয়ম প্রকাশ করিয়া দাবাখেলায় অমুবাগী ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদন করিবেন।

শ্রীসরসীলাল সরকার।

দক্ষিণ-ভারত।

মাস্তান হইতে কজিবরম প্রায় পাঁচ বন্টার পথ। বেলা দুইটার সময় আমবা চিকলগং জংশনে পঁহুছিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্তন করিতে হয়। চিকলগংই একটা তীর্থস্থান—এখানে হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে গম্ভীরীর্থ অবস্থিত। কিন্তু সেখানে বাইবাব আমাদের সুবিধা হয় নাই। আমরা কজিবরম অভিমুখে চলিলাম। বেলা চারিটা বাজিল। দূরে দুইটা গোপুরমের উচ্চ চূড়া নয়নগোচর হইল। বুঝিলাম, আমরা কজিবরমের নিকটে আসিয়াছি। গাড়ী ষ্টেশনে আসিল। আমরা গাড়ী হইতে নামিলাম। এক জন পাণ্ডা ভাল ঘর দেখাইয়া দিবে বলিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। কাঞ্চীনগর দুই ভাগে বিভক্ত—শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চী ষ্টেশনের নিকটে। আমরা সেখানেই থাকিব, স্থির করিলাম। কাঞ্চীর পথগুলি অতি সুন্দর। পবিত্র প্রসন্ন পথগুলি স্বচ্ছভাবে বিস্তৃত। পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষের শ্রেণী—দাবারগতঃ নারিকেল বৃক্ষ। বৃক্ষশ্রেণীর পর একটু ব্যর্থান, তাহার পূর্ব বাড়ীগুলি পঞ্চম্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। বড়-বাড়ী বেশী দেখিলাম না। রাস্তার ধানে জলেকুল। সেখানে বিচিত্র-বস্ত্র-পরিহিত তামিল-রমণীগণ কলসী লইয়া জল

আহরণ করিতেছে। পথিপার্শ্ব বৃক্ষের ছায়ার ছেলে মেয়েরা খেলা-ববিত্তেছে। নগরের স্প্রশস্ত পথগুলি “নগরেব কাঞ্চী” এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছিল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমরা একটা বাসা পাইলাম। বাসাটি দোতলা, এবং শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমের সম্মিহিত। নীল আকাশের পটে গোপুরমের সমুদয় শ্রী আমবা বাসায় বসিয়াই দেখিতে পাইতাম। গোপুরমের সমুদয় প্রস্তরগঠিত চত্বরের উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যও এখান হইতে দেখা যাইত। সন্ধ্যাবেলায় নহবৎ বাজিত, গোপুরমের সর্বাঙ্গে আলোক প্রজ্জ্বলিত হইত, এবং মন্দির-বাট্রীদিগের ভিড়ে সমুদয় স্তুবিভূত পথ জনাকীর্ণ হইত—সে সময় সকলের হৃদয় আপনা হইতেই ভক্তির মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইত।

শিবকাঞ্চীর এই স্তূবহং মন্দিরে একাত্তনাথ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মন্দিরের চারি পার্শ্ব উচ্চ প্রস্তরগঠিত প্রাচীরের দ্বারা বেষ্টিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০০ প্রায় ৫০০ গজ হইবে। এই প্রাচীরের দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বারের উপর ছইটি গোপুরম। দক্ষিণের গোপুরমটিই সমধিক উচ্চ। ইহা কাঞ্চীর মধ্যে উচ্চতম গোপুরম, এবং দক্ষিণ-ভারতের সর্বাঙ্গেক্ষা উচ্চ গোপুরমগুলির মধ্যে অগ্রতম। গোপুরমের চিত্র অনেকেই হয় ত দেখিয়াছেন। ইহা সমচতুর্কোণ ভিত্তির উপর নির্মিত। শিবকাঞ্চীর বৃহৎ গোপুরমে সর্বশুদ্ধ এগারটি তল আছে। উপরের দিকে ক্রমশঃ আরতন কমিয়া আসিয়াছে কিন্তু সর্বত্র চতুর্কোণ। হিন্দু স্থপতিবিদ্যার বিশিষ্ট লক্ষণ arch বা থিলানের অভাব। দক্ষিণ-ভারতের গোপুরম ও মন্দিরগুলিতেও কোথাও থিলান নাই। এই গোপুরমের প্রতি তলের মধ্যদেশে জয় ও বিজয়ের মূর্তি।

এতদ্ব্যতীত আরও মূর্তি ও শিল্পকার্য্য বিদ্যমান। গোপুরম দ্বিা ভিত্তে প্রবেশ করিলে ছই তিনটি সরোবর দেখা যায়। একধারে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট একটা দালান। সংস্কারাভাবে ইহা ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মূল মন্দিরের সম্মুখে একটা বিস্তৃত চত্বর। তাহার স্তম্ভগুলি নানা প্রকাব কারুকার্য্যে খচিত। জয় স্তম্ভের পা ছইটি তুলিয়া প্রায় দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহার পৃষ্ঠে বোধক্বেশে অখারোহী—এই মূর্তিটি দক্ষিণ-ভারতের স্তম্ভগুলির উপর প্রায়ই উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যাবেলায় এই সকল স্তম্ভগুলি এবং দ্বারপথ আলোকদ্বাতায় সজ্জিত হয়; তখন দৃষ্ট অতি মনোহর বোধ হয়। মন্দিরের মধ্যে একটা বৃহৎ পিত্তল নির্মিত বৃহৎ মূর্তি। দক্ষিণ-ভারতের পাঁচটা প্রসিদ্ধ স্থানে ক্ষিত, অপ,

ভেল, বক্ষ, বোম—এই শব্দভূতের পাঁচটি শিবলিঙ্গ আছে। কাঞ্চীতে স্থিতি-
মূর্তি। এই জন্ত এখানে শিবলিঙ্গ জল বা দ্রব দ্বারা অভিষিক্ত হয় না। মন্দিরের
অভ্যন্তরে এক স্থানে এক অতি প্রাচীন আয় বুদ্ধ আছে। শোনা যায় যে,
ইহাব চারি-পাখার চারি প্রকাব ভিন্ন আশ্বাদনের কল ধরিয়া থাকে। এই
আয়বুদ্ধ হইতেই নহাদেবের নাম একাত্নাথ হইয়াছে। বিমান মন্দিরের
চারি পাশে বাবাণ্ডায় অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত।

শিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবীর মন্দির অতি প্রাচীন। দক্ষিণদেশীয় অস্ত্রাণ্ড
মন্দিরের স্থায় ইহাও উচ্চ প্রাচীর দিয়া চতুর্দিকে বেষ্টিত। সুপ্রশস্ত বাধান
প্রাঙ্গণের মধ্যে পুষ্করিণী, মণ্ডপ ও বিমান মন্দির বিরাজিত। এখানে একটি
মন্দিরের মধ্যে জগদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্তি পূজিত হইয়া থাকে। কামাক্ষী-
দেবীর মূর্তি,—বিশেষ করিয়া তাঁহাব বহুপুষ্পাভরণ-ভূষিত, ভোগমূর্তি * দেখিলে
হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। তা যেন অন্ন অন্ন হাসিতেছেন। তাঁহার সেই
ঈবৎ-স্মিতবিকশিত বদন হইতে ঝর্ণণা ও প্রসন্নতা যেন করিয়া পড়িতেছে।

শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। উভয় স্থান
দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সংযুক্ত। স্বত্বের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, এবং
তাঁহাব পশ্চাতে সুবিলস্ত গৃহশ্রেণী। বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরও অতিশয় প্রাচীন।
এখানে শতস্তম্ভবিশিষ্ট একটি মণ্ডপ আছে। কৃষ্ণপ্রস্তবনির্মিত স্তম্ভগুলির
উপর—সম্মুখোদ্যেব মূর্তি, এবং নানা প্রকার জীব জন্তুর মূর্তি ক্ষোদিত
আছে। এই মণ্ডপের শিল্পকাৰ্য্য অতি উৎকৃষ্ট। বিষ্ণুকাঞ্চীর=বিগ্ৰহের নান
বদনরাজস্বামী। অন্ধকার প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া আমরা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ
করিলাম। শতজক্ৰগদাগন্ধধারী—নানালঙ্কারশোভিত বৃহৎ বিষ্ণুমূর্তিব সম্মুখে
আমরা নীত হইলাম। দর্শনান্তর অস্ত্রাণ্ড ক্ষুদ্র বিগ্রহ দেখিয়া আমরা ক্রিয়য়া
আসিলাম।

ত্রীবক্রম ঘাইবার পূর্বে বামামুখ করেক বৎসর বিষ্ণুকাঞ্চীতে বাস করিয়া
ছিলেন। ত্রীচৈতন্যদেব শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী উভয় স্থানই দর্শন করিয়া
ছিলেন + চৈতন্যচবিতামৃতের ন্যায়খণ্ডে দোষতে পাই—

দানিগাছের মন্দিরগুলিতে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া মূর্তি থাকে। একটি প্রস্তর-
নির্মিত অচল মূর্তি, আর এটি ধাতুনির্মিত ভোগমূর্তি। উৎসবদির সময় এই ভোগমূর্তিই
বাহিরে লইয়া যাত্রা হয়।

শিবকাকী আসি তৈয়া শিব-দখশন।

এভাতে বৈকুণ্ঠ তৈয়া শিব-দখশন।

বিষ্ণুকাকী আসি দেগিল মন্দির-দখশন।

প্রণাম করিয়া কৈল বহুত গুণন।

প্রেরাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।

দিন দুই রহি লোক কুরুভক্ত কৈল।

কাকীতে দুই দিন থাকিয়া আমরা বিকালের ট্রেনে তাজোর অভিনয়
যাত্রা করিলাম। চিসলপুং ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্তন করিয়া Ceylon Boat
mailএ আরোহণ করিলাম। এই ট্রেন মাল্ভাজ নগরী হইতে লঙ্ঘাত্তী-
দিগকে লইয়া রামেশ্বর দিয়া পরবর্তী ষ্টেশন-থলুকোট পর্যন্ত গিয়া থাকে। সেখানে
ষ্টীমার (Ceylon Boat) যোগে লঙ্ঘাত্তীপ দুই ঘণ্টার পথ। সমস্ত রাত্রি
ট্রেনে কাটিল। প্রত্যুষে গাড়ী তাজোর ষ্টেশনে থামিল। ষ্টেশনের খুব
নিকটেই নবনির্মিত তাজোর-বাস ছত্রমেঘ প্রাসাদভূষা-দ্বিতল অট্টালিকা।
এখানে থাকিবার কিছুমাত্র অসুবিধা নাই। আহা! বন্দ-বন্দ করিয়া লইতে
হইয়াছিল। কিন্তু পবে আমাদের মনে হইয়াছিল যে, হোটেলের সন্ধান লইতে
আমাদের কম কষ্ট হইত। দক্ষিণ-মাজিগণ হোটেলের সন্ধান লইলে অনেক
অসুবিধা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। কলিকাতার হোটেলগুলি
সাধারণতঃ বেশ পরিদ্রুত পবিচ্ছন্ন নহে। তাহার পর নানা অর্থ-ব্যয়
বলিয়া নির্ভাবান লোকদের খাইতে অভিরুচি হয় না। কিন্তু দক্ষিণ দেশের
হোটেলগুলি বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য, নাছ নাংস নাই, তবে
কোথাও কোথাও-পলাপু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনে অবশ্য বাবুদ-ভাদ-
বেলী। কিন্তু খোল ও দধি বেলী করিয়া খাইলে সে-বাল সহ্য করা যায়।
স্বাস্থ্যবান লোকদের বিশেষ অনিষ্ট হয় না।

তাজোরের মন্দিরটি অতিশয় উচ্চ ও সুগঠিত। মন্দিরের বাহিরে গোপুর
আছে—কিন্তু অগ্ন্যস্ত্র মন্দিরের স্থায় এখানে গোপুরটি নূন মন্দির অপেক্ষ
বৃহত্তর নহে। মন্দির-বেষ্টনকারী প্রাচীরের চারিদিকে পরিখা। যুদ্ধের সময়
এখানে সৈন্যসমাবেশ করা হইত, এবং কামান বন্দুক প্রভৃতির-জন্ত দেওয়ালে
ছিদ্র কাটিয়া রাখা হইয়াছিল। মন্দিরমধ্যস্থ সুবিদ্যুত প্রাঙ্গণটি প্রস্তরমণ্ডিত।
মন্দিরের সম্মুখে তাজোরের প্রসিদ্ধ স্মরণ-প্রস্তরগঠিত রথ-মূর্তি। ১৬৬-
বাজের বিশাল মূর্তি দেখিয়া আমরা বিম্বিত হইয়া রহিলাম। নিকটে এত

সাহিত্য নাই, যেখানে এই প্রস্তর পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টিপথ পর্যন্ত হইতে এই বৃহৎ ব্যাপারটি এত দূর আনিয়া এই উচ্চ বেদীর উপর স্থাপন কবিত্তে যে কত পবিত্র ও কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা ভাবিবার বিষয়। মন্দির-মধ্যস্থ শিবলিঙ্গটিও অতি বৃহৎ—আমরা এত বৃহৎ লিঙ্গ কুড়াপি দেখি নাই। তাজোরের সমুন্নত মন্দিরের কার্যকার্য অতি সুন্দর। প্রাঙ্গণস্থ স্তূপত্রয়া • দেবের মন্দিরের শিল্পকার্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

প্রাঙ্গণের চতুর্দিকেব প্রাচীর উজ্জ্বল বর্ণের বিবিধ চিত্রে সুশোভিত। একটা কক্ষের মধ্যে তাজোরের প্রাচীন রাজাদের চিত্র, এবং অখ, নয়র প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর সুবস্ত্রিত প্রতিকৃতি। কিন্তু এখানে দেবদর্শনার্থীর কোনও সমাগম দেখিলাম না। এত ঐশ্বর্য ও শিল্পকৌশল তত্ত্বিপূর্ণ যাত্রীব অভাবে প্রাণহীন বলিয়া বোধ হইল।

বিকালে আমরা রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। ইহাও একটি ভূগর্ভস্থে অবস্থিত। সকালে এক জন Guide বা প্রদর্শকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বিকালেও সে আমাদের সঙ্গে চলিল। সে ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে পারে। আমাদের বিবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু সে অনর্গল বর্ণনা কবিত্তে বাইতে লাগিল। বেশ বোঝা গেল যে, সে এই সব বর্ণনা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। তাজোরের রাজপ্রাসাদের কিয়দংশে এখনে সরকারী আফিস হইতেছে। বিচিত্র সভাগৃহ দেখিয়া আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। এক অংশে রাজবংশের বুদ্ধমান বংশধরগণ বাস করিয়া থাকেন। রাজবাটীর মধ্যস্থ কক্ষগুলি বিশৃঙ্খলভাবে নির্মিত। প্রাচীরবেষ্টিত একটা শুষ্ক জলাশয় দেখিলাম—রাজারা এখানে জলবিহার করিতেন। একটা ভূগর্ভস্থ অন্ধকাব স্রুঙ্গের মধ্য দিয়া আসিয়া কিছু দূর আগ্রসর হইয়াছিলাম। স্থানটি ভীতিজনক। একটা কক্ষে স্বর্ণময়-অশ্বা-চতুর্গ, সিংহাসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বদ্ধ রহিয়াছে—এই সকল নইয়া উত্তরাবিস্তারী দেব মধ্যে মোকদ্দমা চলিতেছে। রাজপ্রাসাদে বিশেষ চিত্তাকর্ষক কিছু নাই। প্রাসাদের বাহিরে পরিখার পার্শ্বে নক্ষের উপর এক স্তূপবৎ কামান দেখিলাম। আজ কতকগুলি দরিদ্র শিশু নগ্নদেহে নিশ্চিন্তমনে ইহার উপর চড়িয়া খেলা করিতেছে।

পর-দিন প্রাতে আমরা মল্লিবপার্বস্থ শিবগঙ্গা নামক জলাশয় দেখিতে

• দক্ষিণ-দেশে বহুসংখ্যক কাঠিকের নশির হাছে। তিনি এতদ্ব্যন্থে স্বতন্ত্র দেব নামেই সমাদৃত পরিচিত।

গেলান। বর্ষাকালে নদীর জল বেরূপ ঘোলা হয়, এই পুষ্করিণীর জলও তদ্রূপ।

প্রাচীন অর্থবৃক্ষের ছায়ার প্রশস্ত বাধান ঘাট। ঘাটের সোপানাবলী আবোহণ

করিয়া রমণীগণ কলসীকক্ষে জল লইয়া যাইতেছিল। পুষ্করিণীর নিকটে

Schwartz নামক ওলন্দাজ-পাদ্রীর-গির্জা। দাক্ষিণাত্যে পাদ্রীগণ বহু দিন

হইতে প্রচাৰ কাৰ্য্য করিতেছে। সেই জন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বহু-

সংখ্যক খৃষ্টান আছে। সরোবরপার্শ্বস্থ উদ্যান দেখিয়া আমরা ষটবারুর নগরের

নগরের মধ্য দিয়া বেড়াইয়া আসিলাম। সুপ্রশস্ত রামপথের পার্শ্বে দোকান,

বাজার এবং বসতবাড়ী। পথোপরি জনপ্রবাহ। দুই চারিটা তদ্রবংগী-

জীলোক হাঁটিয়া যাইতেছেন। পাঠক স্বরণ রাখিবেন যে, দাক্ষিণাত্যে পক্ষী নাই;

তদ্রবংগীর জীলোকেরা অনাকৃতস্থলে প্রকাশ্য স্থলে বাহিব হন। কিন্তু তাহ

বলিয়া আমাদের সংস্কারকেবল দল বেরূপ নলেন, সেরূপ নহে। আমাদের

সমাজে জীলোকগণ বেরূপ পবপুঙ্কষের নহিত আলাপ করেন না, দাক্ষিণাত্যেও

সেইরূপ। মূল প্রথা উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে এক; উত্তর দেশের সমাজেই

জী ও পুরুষ স্বতন্ত্র করিয়া রাখে।

তাঞ্জোর হইতে ত্রিচিনাপল্লী আড়াই ঘণ্টার পথ। আমরা দুইটা ব পথ

গাড়ীতে চড়িলাম। বিকালে ত্রিচিনাপল্লী অংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানে

গাড়ী পরিবর্তন করিয়া আমরা ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম।

ত্রিচিনাপল্লী বড় সহর, এখানে তিনটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ফোর্ট

ষ্টেশনের কাছেই দেশী লোকদের বাস, এবং এখান হইতে শ্রীবঙ্গর নিকটবর্তী

তাই আমরা ফোর্ট ষ্টেশনেই নামিলাম। আমরা যখন ষ্টেশন হইতে নহরের

অভিমুখে যাইতেছিলাম, তখন হৃদ্যদেব পশ্চিম গগনে চলিয়া পড়িয়াছেন।

পৃথিবীর তপ্ত বক্ষ হইতে ক্রোশাবসানব্যঞ্জক নিঃশ্বাসের ছায় বিকালের বাতাস

বহিতেছে। পথের ধারে হরিৎ বর্ণের ক্ষেত্রগুলি শোভা পাইতেছে। মারিফো

ও অন্যান্য বৃক্ষের উচ্চ শিরগুলি সূর্য্যকিরণে বঞ্জিত হইতেছে। পাদ্রীদের গির্জা,

কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতির বৃহৎ অট্টালিকাগুলি শোভা পাইতেছে। হাটের

টেনিস, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলিতেছে।

আমাদের গাড়ীর গরুগুলি ঘণ্টাধরনি করিতে করিতে ছুটিতেছিল। রাজ-

পথস্থ লোকগণ বিদেশী দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল। পথের

ধারে এক বিস্তীর্ণ জলাশয় স্থান দেখিলাম। শুনিলাম, কাবেরী নদীর প্রবাহ

হইতে এই জল ছাপাইয়া আসিয়াছে। একটু পরেই আমাদের গাড়ীগুলি
চিনিয়া পিলের স্বন্দর ছত্রে নমুণে আসিয়া দাঁড়াইল।

ছত্র দ্বিতল। বাড়ীবা দানবগতঃ এক তলাতেই থাকে। সম্ভ্রান্ত যাত্রীগণ
গৃহস্থায়ী বিশেষ অহুমতি পাইলে দ্বিতলে থাকিতে পাবেন। আমবা গুলিগাম,
একতলার স্থান নাই—ছত্রবক্ষক আমাদিগকে স্বতন্ত্র আশ্রয় খুঁজিতে বলিল।

অনুত্যা আমরা গৃহস্থায়ী ভবন অভিযুগে গাড়ী ছুটাইলাম। তখন সন্ধ্যা
হইয়াছিল। পথিপার্শ্বস্থ জলের কলের চারিদিকে বিচিত্র-বেশ-পরিহিত জলাধিনি
সমগীযুগেব ভিড় অতি স্বন্দর দেখাটতেছিল। ক্রমে আমবা উদ্দিষ্ট ভবনে
উপস্থিত হইলাম। পিলে মহাশয় ব্যবসাদার লোক। একটা দ্বিতল প্রকোষ্ঠে

তাঁহার কবেকট কক্ষচারী দোকানের থাটা খুলিয়া বসিয়াছিলেন। আমরা প্রবিচয়
প্রদান কবিলে তাঁহারা যথেষ্ট সন্মান কবিয়া আমাদিগকে পাশের সুসজ্জিত
কক্ষে বসিতে বলিলেন, এবং কহিলেন, “ছত্রেব ভূতগণ আপনাদের উচ্চপদ জানে
না বলিয়া উপযুক্ত অভ্যর্থনা কবিতে পারে নাই। তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন।

তাহাদিগকে এই লিপি দিলেই উপবেষ ঘর খুলিয়া দিবে। আপনাবা-নেখানে
থাকিতে পারিবেন।” ইহাদের সৌজশ্বে মুগ্ধ হইয়া আমরা ছত্রে ফিরিলাম।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পান্ননিবাসের স্থানে স্থানে স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীগণ
ছোট ছোট দল-বৃন্দিয়া বসিয়াছিল। একটা বৃহৎ কক্ষে রঙ্গনাথ স্বামীব শ্রম
মুগ্ধ। আমবা উপবেষ ঘবে গেলাম। একটা দীর্ঘ হলের দুই-পাশে দুইটা কুত্র
হইল। দেওয়ালে বহুসংখ্যক ছবি। চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য গৃহোপকরণে
কক্ষগুলি সুসজ্জিত।

পর দিন প্রাতে শ্রীরাম সাজা করিলাম। সহর ছাড়িয়াই আমরা
আবেদী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পবিত্র নদীর স্নান-শোভা
দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল।

ক্রমশঃ।

ঐবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্মৃতি-কথা। (৩য় অঙ্ক)

নিদাঘদিনান্তে যখন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের খাগড়াইর আবাসে উপনীত হইলাম, তখন তিনি অসুস্থদেহে বিশ্রাম করিতেছিলেন; আনন্দিনিকে পাইয়া মাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। তাহার পর বর্তমান সময়ের সাহিত্যের কথা হইতে লাগিল। চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল লেখা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছেন—কিন্তু যত দিন বাঙ্গালা সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইবে, তত দিন তাহার ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ রচনারীতির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া আদৃত হইবে। ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’-রচনাকালে তিনি তরুণবয়স্ক। তখনই তিনি যে রচনারীতি লিখিব করিয়াছিলেন, এবারও সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাও অনাবিল প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, বঙ্কিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’র লেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলের রচনাই পবিত্রীকৃত করিয়া দিতেন—নে পরিবর্তনে তাহাদের রচনাও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার পার্থে মলিন দেখাইত না। বিজ্ঞাণ্ডয় স্বাক্ষর মুখোপাধ্যায়ের কোনও কোনও রচনাও তিনি পুনর্বার লিখিয়া আনিতে বলিয়া প্রত্যর্পণ করিতেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবুর রচনারীতির বৈশিষ্ট্য তিনি এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার রচনার কোনরূপ পরিবর্তন করিতেন না। আমি চন্দ্রশেখর বাবুকে বলিলাম, “বঙ্কিম বাবু তাহার আপনার নথকে যে সত্য কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তিনি ইংরাজী লিখিতেন।—এমন সময় তিনি বুঝিতে পাবেন, বাঙ্গালীকে বুঝাইতে হইলে—বাঙ্গালী জাতি গড়িতে হইলে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে হইবে। ইহা বঙ্কিমই তিনি ‘বঙ্গদর্শন’ বাহির করবেন, বাঙ্গালা লেখক গড়িবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লালিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্বানের সঙ্গে সঙ্গে যেনন অর্জুন আর গাণ্ডীব তুলিতেও পারেন নাই, তাহার সমস্ত শক্তি সহসা তিরোহিত হইয়াছিল, ‘বঙ্গদর্শন’র অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই ‘বঙ্গদর্শন’র অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান লেখকও আব সাহিত্য-ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। এই সময় বোধ হয় ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে বাঙ্গালা-চর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ আশ্রয়প্রকাশ করে।”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “নে আগ্রহ ‘বঙ্গদর্শন’ব পরিকল্পনার পূর্বেই আশ্রয়প্রকাশ করিয়াছিল। মধুসূদনের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ধরিলেও, তখন তিনি বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। তাহার ‘হর্গেশনামিনী’,

‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’-তখন প্রকাশিত হইয়াছে—‘বিয়বৃক্ষ’ তখন লিখিত হইয়াছে—প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বশ তখন ‘বদে বণা ভণা।’ সে বশ তাঁহার বাঙ্গালা বচনাৰ ফল।”

আমি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতি-কথা বিবৃত করিতে বসায়, তিনি বলিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয়, তখন তিনি যশস্রী লেখক—আমি কেবল বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর স্কুলে অতিবিক্রম প্রমোদবাবের পদ পাইয়াছি। তখন তাঁহার সঙ্গে সসঙ্কোচে আলাপ করিতাম—সে সব আলাপে মাত্রব্যকে সম্যক বিবিস্তার সম্ভাবনা থাকে না। কাহেই সে সময়ের কথা আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারিব না। বলিবার পক্ষে একটু প্রস্তুতবাণও আছে। আমার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলিতে হইলে, আশা কৈ আমার কথা যেরূপ বলিতে হয়, সেরূপ বলা অহঙ্কারের পরিচায়ক—তাই আমি সে সব কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।”

তাঁহার পর তিনি বলিলেন, “কিন্তু আমার সহিত ব্যবহারেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাভাবিক নেতৃত্ব-শক্তি—লোকদিগকে বশ করিবার ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। ‘প্রদীপে’ ‘বদ্যবৎসল বদ্যম’ প্রবন্ধ লিখিবার পর চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সময়ে একটি প্রবন্ধ লিখিবেন মনে করিয়া, আমাকে আমার স্মৃতি-কথা বিবৃত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে—বে. কয়টি কথা বলিয়াছিলাম, সে কয়টি তোমাকে বলিতে পারি। সেই কয়টি কথা হইতেই তুমি তাঁহার মে ওণের পরিচয় পাইবে।”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যখন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গবিভূত-কাণ্ডি—তিনি তরুণবয়স্ক; বি. এ. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজের স্কুলে চাকরী পাইয়াছেন। বহরমপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষরকাণ্ডি—‘কলমর্শন’-এর প্রকাশপত্রিকার পুষ্টি ও পূর্ণ হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট; বহরমপুরে তখন বহু সাহিত্যিকের বাস—literary atmosphere ছিল। ইংরাজীতে সুপণ্ডিত লালবিহাবী সে তখন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক। পণ্ডিত গোহালাম শিরোরঙ্গ বর্দমানে স্কুলের পণ্ডিত ও রামগতি সায়রঙ্গ তখন কলেজে শিক্ষক। ৩ মাস ওরফাদ

গোহালামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ অঙ্ককাল আর বড় পঠিত হয় না—কিন্তু এক সময় ইহাই বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। ব্যাকরণখানি অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বোকাগানের সম্বন্ধে দানবন্ধু শির তাঁহার ‘হবনী কাণ্ড’ লিখিয়াছেন—

বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বহরমপুরে উকীল। গঙ্গাচরণ সরকারও তখন বহরমপুরে বিচারক। 'ঐতিহাসিক-রহস্য'র উদঘাটক ডাক্তার রামদাস সেন তখনই বহু পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। রামদাস বাবুর বৈঠকখানায় বনিয়া বকিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এবং রামদাস বাবুকে লেখকশ্রেয়-ভুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফলে, রামদাস বাবুর এই প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন' অনুল্লভ করিয়াছিল।

বকিমচন্দ্র প্রভৃতি জ্ঞানচর্চার-জ্ঞাত বহরমপুরে একটি সমিতিও সংস্থাপিত করেন। সে সমিতিতে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর, বকিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। বকিমচন্দ্র 'রত্নাবলী' নাটক সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। লালবিহারী বাবু বঙ্গিম বাবুকে বিদ্রোপ করেন, বঙ্গিম বাবুও জবাব দেন। * উভয়ে বিশেষ সত্তাব ছিল না। চন্দ্রশেখর বাবু সে সমিতিতে প্রবন্ধ শুনিতে বাইতেন। সমিতি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

এই সময় তিনি ঘটনাচক্রে বাঙ্গালা রচনার ত্রুটী করেন। তিনি বলিলেন—

"লোহারিম গুণধাম জাত সদাচার,
বিবাহিত রত্নাবলী কাব্য অলঙ্কার,
জিহ্বাঘাটে 'নালতীনাথ' স্থললিত,
'বঙ্গ ব্যাকরণ' বঙ্গনয় বিচলিত।"

রামগতি স্মারক মহাশয় 'বঙ্গবিচার' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থের প্রণেতা। তৎকালে বিদ্যাপাঠ্য ভাবতবর্ষের ইতিহাসে এক ভাগ স্মারক মহাশয়, এক ভাগ ইন্দুচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও এক ভাগ ভূদেব বাবু নির্দিষ্ট ছিলেন। স্মারক মহাশয়ই প্রথম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন।

অক্ষাপদ সার বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর বলিয়াছেন,—বকিমচন্দ্র প্রবন্ধে বাকুলের সভ্যতার ইতিহাস হইতে একংশ উদ্ধৃত করেন। লালবিহারী বাবু বিদ্রোপ করিয়া বলেন, তিনি যাকুলের কথা আপনার বলিয়া ঢালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—'Bengal Peasant Life' প্রণেতা হুগ্গিন্স লালবিহারী সে এই সময়ে (১৮৭০—৭১) বহরমপুর কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। Grant Hall Club নামক নব-প্রতিষ্ঠিত সভায় তিনি সম্পাদক ও প্রধান কর্মী ছিলেন। বকিমচন্দ্র উহার সহকারী সভাপতি, এবং তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের বিশ্বাস উহার সভাপতি ছিলেন। বকিমচন্দ্র ঐ সভায় Indian Civilisation সম্বন্ধে, সার গুরুদাস Abused India vindicated সম্বন্ধে, এবং মতি বাবু Polygamy সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রদ্বিয়ার্থিতেন। দিশম্বর বিশ্বাস বদলী হইয়া গেলে, সার গুরুদাস প্রস্তাব করেন যে, সহকারী সভাপতি বকিমচন্দ্র উহার স্থলে সভাপতি হউন। ইহাতে লালবিহারী অত্যন্ত বিরক্ত হবেন। ডাক্তার দ্বাৰা ছিল যে, তিনি বকিমচন্দ্রের অগোচরে ভাল ইংরাজী জানেন, এবং প্রেসিডেন্ট-পদে তাহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার। লালবিহারীর মনোভাব বঙ্গিম বুঝিতেন। সার গুরুদাস বকিমকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলে, বঙ্গিম তাহাতে বলেন, 'করিবেন কি?' ইহা শুনে লালবিহারী রাগে আগ্রাসিত হইয়া উঠিয়া যায়। অগত্যা পদে লালবিহারী দশমী জন্মে বদলী করেন।—মাননী, ১৯৪৭।

“শ্রীকৃষ্ণ দাস, বহুবনপুর কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। তিনি এক এ.
গড়িবার সময় ব্রাহ্ম মতের অনুবাহী-ইওয়াতে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আর
বহুবনপুরে আনিতে দেন নাই; রাজশাহীতেই ‘নজরবন্দী’ রাখিরাছিলেন।
‘বঙ্গদর্শন’-প্রচারের কয়েক মাস পরেই তিনি ‘জ্ঞানানুবে’ প্রকাশ করিলেন।
তিনি বহুবনপুরে আসিয়া আমাকে ‘জ্ঞানানুবে’ লিখিবাব জন্ত জিদ করিলেন।
আমি তৎপূর্বে কখনও বাঙ্গালা লিখি নাই। সময় সময় ইংবাজী সংবাদপত্রে
লিখিয়াছি-বটে; কিন্তু বাঙ্গালা লেখক হইবার কল্পনা না ইচ্ছা কখনও আমার
হয় নাই। আমি বাঙ্গালা লিখিতে জানি না, শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিলে, তিনি
বলিলেন, তাঁহার এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পুত্রিত-আমার-রচনা-ভাষা ও ব্যাকরণগত
ত্রুটি সংশোধিত করিবেন। যদি পাবিয়া উঠি, তাঁহার কাগজেব জন্ত কিছু
লিখিব প্রতিশ্রুত হইয়া কিছু দিন পবে তাঁহাকে ‘বিদ্যাবিজয়না’ শীর্ষক একটি
প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া দিলাম, প্রবন্ধে যেন লেখকের
নাম না থাকে। তিনি কিন্তু প্রবন্ধের শেষে আমার নাম ও সঙ্গে সঙ্গে ‘খাগড়া,
বহুবনপুর’ ছাপাইয়া দিলেন। আমার সেই প্রথম প্রবন্ধ বঙ্গিমচন্দ্রের দৃষ্টি
আকৃষ্ট করিল। এক দিন কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় আসিয়া আমাকে
বলিলেন, বঙ্গিমচন্দ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন। আমি এক
দিন কবিরাজ মহাশয়ের সহিত বঙ্গিমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। যাদব
অভ্যর্থনায় পব বঙ্গিমচন্দ্র নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি এই চাকরীতেই
থাকিব কি না—তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া, শেষে ‘জ্ঞানানুবে’ প্রকাশিত প্রবন্ধটি
মৌলিক কি অনুবাদের তাহা জানিতে চাহিলেন। উত্তরে আমি বলিলাম,
প্রবন্ধটির পরিচয়না-আনাব, কেবল উপাদান প্রধানতঃ ভিজরেলীর *Curiosi-
ties of Literature* হইতে গৃহীত। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার সহিত
সাক্ষাৎের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন, আমি ‘বঙ্গদর্শন’েব জন্ত কোনও
প্রবন্ধ লিখিলে তিনি সানন্দে তাহা ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশ করিবেন। তৎপূর্ণ
লেখকের পক্ষে তাঁহার এই কথা যে কত উৎসাহজনক, তাহা সহজেই অল্পমেয়।
জগোৎসবের পব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইলাম। তিনি তখন পুরা
ইংরাজীনিবিশ, আমিও যুবক। আমি শেকহাওের জন্ত হাত বাড়াইয়া দিলাম।
বঙ্গিমবাবু বলিলেন, ও ব্যবহাট্টা তাঁহার কাছে বড়ই *insincere* মনে হয়।
তিনি উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। এরূপ ব্যবহারে তৎপূর্ণ লেখক যে
তাঁহার অনুবক্ত হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে?

“আমার ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ প্রকাশিত হইলে একবাণ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি তখন কাঁটালপাড়ায়। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ‘আপনি আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে; আমি তাহার ভূমিকা লিখিয়াছি। আপনি ‘বঙ্গদর্শনে’র ভ্রাতৃ গ্রন্থাবলীর একটা সমালোচনা লিখিয়া দিউন।’ আমি বিস্মিত হইলাম। ‘বঙ্গদর্শনে’র সমালোচনায় বঙ্গিম ব্যতীত আর কাহার অধিকার থাকিতে পারে? আমি বলিলাম, ‘সে কি কখন হয়? আপনি লিখুন।’ তিনি বলিলেন, ‘আমি ভূমিকা লিখিয়াছি; সমালোচনা করিব না। আপনি লিখিলে আরও ভাল হইবে।’ বলা বাহুল্য, আমি সে অনুরোধ ভোগ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি নাই। কিন্তু এই অনুরোধে তাহার নেতৃত্বগুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাইয়ছিল। বঙ্গিমচন্দ্র যে লেখককে এরূপ অনুরোধ করেন, সে লেখক তাহার ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারে না।

“বঙ্গিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ উত্তীর্ণ হইল। কাগজ প্রকাশে বিলম্ব হইতে লাগিল। * শুনা গেল, ‘বঙ্গদর্শন’ আর প্রকাশিত হইবে না। এ সংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। যাহাতে তিনি অন্ততঃ আবদ্ধ গুণটি শেষ করেন, সেই ভ্রাতৃ অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ কাব্যস্থল হইলাম। আমি সে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘সকলে সাংসদ করুন, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।’ আমি সে অনুরোধ—আদেশ বঙ্গিম মনে করিয়াছিলাম।

“একটি ঘটনার কথা বলি—আমাব কোনও প্রবন্ধে আমি কৌতুহল—লিপিতে কৌতুহল লিখিয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘আমি কৌতুহল লিখিয়াছি; কিন্তু কথাটা কৌতুহল; তিনি সেটার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; আমাকে জ্ঞানানুপ্রোক্ষনবোধে জানাইলেন। কথা শুনিয়া আমি নিব্বাক হইলাম। আমি লিখিবার সময় অনাবধানিতাবশতঃ একটা বানান ভুল করিয়াছি, আর বঙ্গিমচন্দ্র তাহাই সংশোধিত করিয়া আবার সে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই কথা বলায় তাহার নেতৃত্বগুণ—লোককে বশ করিবার ক্ষমতা কিরূপ প্রকাশিত হইয়া

“বঙ্গিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শন’ জুখিয়া দিবার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক লেখকদিগের পক্ষে গৌরবের নহে। ‘বঙ্গদর্শনে’ আর্থিক লাভ হইতেছে দেখিয়া লেখকগণ তাহার অংশ লইতে অস্বীকার হইলে, তাহা সহ্য নম্পাদকের সহিত তাহাদের অনৈকম্যের প্রমাণ।

ছিল, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হয় নাই। রক্ষিমচন্দ্র Republic of Letters-
এব উপযুক্তমন্তব্য ছিলেন।”

অন্তান্ত কথার পর চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল সাহিত্যের গল্পাংশের কথায়
বলিলেন, “সাহিত্য-মন্ডলনের সাহিত্য বিভাগের সভাপতি পণ্ডিতরাজ শ্রীযুত
দাদবশ্বর তর্করত্ন বলিয়াছেন—‘দিন দিন ছোট গল্পলেখকের সংখ্যা হই
করিয়া বাড়িতেছে, মাসিক পত্রিকার পত্র উদ্ঘাটন করিলে একটি নয়, দুই
তিনটি ছোট গল্প আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু পড়িলেই বুঝা যায়, তাহার
মধ্যে অধিকাংশ লেখকেরই মৌলিকতার অভাব। অধিকাংশ ছোট গল্পই
জীবিত বা মৃত পাত্রসত্য লেখকগণের ছোট গল্পের অনুবাদ।—ইহাব অর্থ

আর কিছুই নয়, গল্প প্রস্তুত করিতে হইলে যে কল্পনার আবশ্যক, চিত্তার
লাবশ্যক, জলস লেখক সেই পরিশ্রমটুকু কবিত্তে—নারাজ। অনুবাদেও
আবশ্যকতা আছে; কিন্তু তাহা ছোট গল্প নয়, গভীর বিষয় লইয়া। জন
ষ্টার্ট মিলের তর্কবিদ্যাব অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কার্ল হিল, প্রেকলে,
ইয়ার্সনের এসের (essays) অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; প্রেটো ও
হেগেলের প্রতিষ্ঠিত বর্ননের অনুবাদ হউক, আবশ্যকতা আছে; কিন্তু ছোট
গল্প, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতিভাবান লেখক বাঙ্গালায় বর্তমান রহিয়াছেন,
তাহার জন্য আবার ইংবেজী গল্পের অনুবাদ কেন? তুমি অসমর্থ হও, ছাড়িয়া
নাও।’ আজ কাল মাসিকপত্রের গল্প পড়িতে পড়িতে এই কথাই মনে হয়।”

আমি কোনও মাসিকপত্রের সম্পাদকের নাম করিয়া বলিলাম, “অতি অল্প
দিন পূর্বে আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইরাছিল। তিনি স্পষ্টই বলিলেন,
‘তিনি উচ্চাঙ্গের—আর্ট হিসাবে উৎকৃষ্ট গল্প চাহেন না। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর
চমকদার গল্পই চাহেন। তাঁহার গ্রাহকগণ তাহাই চাহেন—গ্রাহকের অধি-
কাংশই মহিলা ও ব্যবসায়ী দলের।’”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “তাহা না হয় বুঝিলাম, কিন্তু তিনি স্বয়ং তৃতীয়
শ্রেণীর গল্প লেখেন কেন? ব্যবসায়ের হিসাবে না হয় তিনি তৃতীয় শ্রেণীর
গল্পে মাসিকপত্রখানি পূর্ণ করিয়া গ্রাহক ধরিলেন; কিন্তু নিজে লিখিবার
সময় তাহা সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর্ট হিসাবে উৎকৃষ্ট গল্প লিখিতে
পাবেন। কই, তাহা ত করেন না!”

আমি বলিলাম, “সেটা বোধ হয় অক্ষমতাবশতঃ।”

চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, “তাহাই ত বোধ হয়।”

তাহার পর তিনি বলিলেন, “এক কালে আমাদের লেখকদিগের মধ্যে পাদটীকায় পুস্তকের নামোল্লেখ—authority quote কবা যোগের অভ্যাস প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। এখনও সে রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাহা যে মূল পুস্তক দেখেন নাই—অন্তত তাহাতে প্রকাশিত মতের উল্লেখনাত্ৰ দেখিয়া পাদটীকায় মূল পুস্তকের নামোল্লেখ কবিয়া বিদ্যাবাহুল্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন।—কিন্তু বাঙ্গালার ইহার স্বরূপাত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শনে’। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।—তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন। তৎপূর্বে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকę বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত।

তিনি ‘বঙ্গদর্শনে’র ক্ষুদ্র জ্ঞান ও নীতিবিষয়ক সন্দর্ভ (প্রথম বর্ষ) ত্রিপিণ্ড বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, ‘এই প্রবন্ধে যে সব মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন করিয়া authority quote করিলে তাকে এ প্রবন্ধ ছাপান যায়।’ রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাই কবিলেন—প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি স্বীয় মন্তব্যে সমর্থনে পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ লেখকদিগের মতের উল্লেখ করিলেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালী রচনার পাদটীকায় এইরূপ নামোল্লেখ আরম্ভ হইল।—আব এই প্রথার যে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।”

তাহার পর চন্দ্রশেখর বাবু আজ কাল মাসিকপত্রে প্রকাশিত কবিতার রুচির নিন্দা করেন। আজ কাল এক শ্রেণীর লেখক আর্টের নামে অসীমভাৱ আমদানী করিয়া অক্ষমতা-গোপনের প্রয়াস গাইয়া থাকেন। ইংবাজীতে যাহাকে realism বলে, তাহারও প্রকারভেদ আছে। Gutter-reporting realism আর্ট নহে। মনে হইল, চন্দ্রশেখর বাবু এই বতাবলম্বী।

অনুবাদেই মূলের সৌন্দর্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য—ভাষান্তরিত হইলে রচনার সৌন্দর্যহানি অনিবার্য; তাহার উপর আবার অনুবাদের অনুবাদ হইলে ‘সত্য নকলে আসিল খাতা’—হইয়া পড়ে। মূল না পড়িয়া অনুবাদের অনুবাদ করা অসম্ভব, চন্দ্রশেখর বাবু কথাপ্রসঙ্গে এই মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি এখনও কন্নড়ী সাহিত্যের আলোচনা করেন কি না ভিজ্ঞাসা করি। চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, অল্পশ্রমীরা এখন আব বাঙ্গালীর চর্চাই হইয়া উঠে না—কন্নড়ী বা সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রবেশ কথা। বিশেষ নক:খলে কন্নড়ী পুস্তক সহজপ্রাপ্য নহে। যোধ হয় অমেকে অবগত নহেন, চন্দ্রশেখর বাবু

নূর ফারাসীতে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসমণ্ডকীয় বহু পুস্তক পাঠ করিয়াছেন।
তত আর কোনও বাঙ্গালী পাঠ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি তাঁহার
শিক্ষার্থ্যনের কলে বাঙ্গালী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন না, ইহা অত্যন্ত দুঃখের
বিষয়।

চন্দ্রশেখর বাবুকে উদ্ভাস্ত প্রেম-রচনার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি
বলিলেন, “তখন শোকারেণে আপনার তৃপ্তিব জন্ত আপনি লিখিতাম। প্রথম
প্রবন্ধটি বহরমপুরে, দ্বিতীয়টি কলিকাতায় ও আর কয়টি পুঁটিরায় লিখিত হয়।
তখন আমি পুঁটিয়া স্কুলে মাষ্টারী করি। ছুটির সময় বহরমপুরে আসিতে
হাজরাহীর পথে আসিতে হইত। আনিবার সময় আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ দাসের
সাহিত্য গ্রহণ করিয়া আসিতাম। সেবার এই রচনার কথা ওনিয়া শ্রীকৃষ্ণ
দাসের দেখিবার জন্ত কাতাথানি রাখিয়া দিলেন। আমি বহরমপুরে আসিলাম।
ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় হরিশচন্দ্র শর্ম্মার ছাপাখানায় যোগ দেন।
তিনি থান্ডা কলিকাতায় লইয়া যান। কিছু দিন পবে তিনি আনাকে
লিখিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন ছাপাখানায় যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোন রচনা
তাঁহার কাছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার রচনার কথা শুনের, এবং রচনা-
গুলি পাঠান্তে ‘শ্রদ্ধা’-শ্রীকৃষ্ণ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশজন্ত লইয়া গিয়াছেন।
শ্রীকৃষ্ণ আমাকে না জানাইয়া প্রবন্ধ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে কি না
এই সন্দেহ প্রকাশ করায়, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, তিনি প্রবন্ধ লইয়া গিয়াছেন
তিনিই আমি বোধ হয় আর প্রবন্ধ দিতে অস্বীকার করিব না। আমি
শ্রীকৃষ্ণকে সেই ভাবেই উত্তর দিলাম। ইহার কয় দিন পরে শ্রীকৃষ্ণ লিখিলেন,
তিনি বচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। পুস্তক
তাঁহার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইবে; প্রেসের প্রফসংশোধক ও তিনি স্বয়ং প্রফ
দেখিয়া দিবেন। তবে পুস্তকখানি বড়ই স্বল্পায়তন হইবে। স্তবরাং একটু
কম হ্রাস-স্তান হয়; আর আমি যদি বাড়াইতে চাহি, তবে যেন স্তব শীঘ্র
আরও কিছু বচনা পাঠাই; কারণ, পুস্তক ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। পর
সপ্তাহকে পাইয়া রাত্রিতে ‘শরনমন্দিরে’ লিখিতে বসি, এবং পর দিন অপরাহ্নের
সময়ে উহা শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়া নিশ্চিত হই। ইহাই ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’-
প্রকাশের ইতিহাস।”

শ্রীহেনেজপ্রসাদ ঘোষ।

কাব্যময়ী।

বিনোদের প্রতিদিনই সময়ে সময়ে মনের মধ্যে একটা দিব্য ভাবের উল্লস হয়। সংসারে কারোব স্থান কোথায়? সৌন্দর্য কোন্ দিক দি? ফাটিয়া উঠে? সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, অনেক প্রকারে তাহার মর্ম্মদুঃখ বর্ণনা করিলেও, বাস্তবের মধ্যে, মানব-হৃদয়ে, কর্ম্ম-জগতে তাহার জীবন্ত প্রমাণ কিরূপ কেন? সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে মতভেদ কেন? ধর্ম্মের সহিত বিরোধ কেন? জরানরাজ-থলুপমণিত সংসারের মধ্যে তাহার গতি কোন্ দিক দিয়া?—মানব এ সকল সমস্তার পূরণ কবিত্তে অক্ষম হইলে তাহার জন্যই বুঝা।

প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিবাব সময় বিনোদের ঘুমে বিবাদের দৈব দ্রষ্টা। সে দিন সকলে তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য কবিয়াছিল। অর্থাৎ বহির্দেশে সেটা বয়সের দোষ। পিসী বুঝাইয়া দিতেন যে, অত্যন্ত লোমপড়া শিবি। বিনোদের নাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। জননী বসিতেন, হাঁওরা বদনা দরকার করিয়া, এক এক আয়নার হাঁওরা এক এক সময় দূষিত হইয়া পড়ে। সকলে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিত। কি ঘোর অসভ্যতা! বিনোদ তাহাতে বিরক্ত হইত।

এমনোবে এই ঘোব বাধা বিঘ্ন, শোক দুঃখ, এবং অজ্ঞতা ও অসম্মততা মধ্যেও একটা অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তৃত রহিয়াছে—তাহা নিশ্চয়, ন্যচ জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়। অল্পচ আমবা তাহা দেখিতে পাই না। এটা বোধ হয় আনাদের দৃষ্টিরই দোষ।—কোন্ দিক দিয়া দেখিলে সে সৌন্দর্য্য অহুত হয়। তাহাবই আবিষ্কার করা আরম্ভক।

বিনোদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দার্শনিক ভাব অবলম্বন করিল। কলিকাতা প্রভাত চিরকালই সৌন্দর্য্যবিহীন। যে বাহ সৌন্দর্য্যটুকু নিশাকালে ব্যৱনারার রূপের মত ঝলসিয়া উঠে, প্রভাতসমাগমে তাহার মাধুর্য্য থাকে না। তবু সেদিন প্রভাতে, বাটার ছেলেগুলি, বাহিরের কাক ও কুকুর, ধরেব দান্দানো বাহিরের পাণ্ডুবর্ণ পক্ষিক, সকলে মিলিয়া বোধ হয় বিনোদের মনে একটা আশার সঞ্চার করিতেছিল।

কিন্তু সে আশা বুঝা। গৃহও যেমন কাব্যহীন, গৃহের বাহিরও তেমনি। নাবি নাবি নর নাবী নিমতলায় ঘাট দিয়া গঙ্গাস্নানে বাইতেছে, এবং গঙ্গাস্নান

কবিরা, ফিরতেছে, সফলকর্মী মধ্যশ্রী সংসারাসক্তিতে পরিপূর্ণ। কাহারও প্রকৃষতা নাই। নীচ কর্মক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবিহীন অনাগোনা ও নোড়া নোড়ি।

কবিরা বিবিধ চাকরের নাসিকা-গর্জন তখনও শেষ হয় নাই, তাহার মূখ-দিয়া লালানিঃস্থত হইতেছিল। বিনোদ এক পদাঘাতে তাহাকে শয্যা হইতে তুলিয়া

নিয়া। ভূতা মনে কবির যে, ছোটবাবু আজ 'স্কেপিয়া উঠিয়াছে'। সে আস্তে-
~~কিছু~~ 'জা' তৈয়ারী কবিতা গেল। সেই দৈনিক চা'ব পেয়ালা, গোরালিনী-

লাকী দ্বারের চীন। সৈতকথানাব একটা জানালা খুলিবানাত্র প্রাতঃকালের বৈদিকপত্র আবিভূত হইল।

ট্রানকারেব প্রথম নির্যোষ কর্ণকুহরে সঞ্চারিত হইল। দুই একখানা 'মোটরকার' পেট্রোলের স্বগন্ধ বিকীর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। নিরুপায় হইয়া বিনোদ সংবাদপত্র লইয়া বসিল।

মুখ্য চমিত্তেছে। এক দিকে 'হোমরুল'র আন্দোলন, অস্ত্র পৃষ্ঠায় যুদ্ধ-
~~সংবাদ~~। মঙ্গলবার। হাবডার 'ব্রিজ-কমিশন'র গণের নোটিশ! বকবাদের

দলদ্বার বিবরণী। গোটা কতক আয়তন ও জ্ঞান জ্বালাচরী। থিয়েটার, ফুটবল,
~~মাসিক~~ দাদার তালিকা। নোয়াখালির বঙ্গ ও নোকুলয়। ক্রমে বিজ্ঞাপন।

কবিরা ওয়াশিংটন প্রকার আলনা, বোবন বর্জিত-করিবার উপায়, কর্মখালির
~~সংবাদ~~ ও উচ্ছ্বাস লোভের কর্মজালসার আবেদন। কর্ম! কর্ম! সংসারবৃত্ত

কর্মজালভায়ে অবনত, ফুল, ক্লিষ্ট। এ কর্মের শেষ কোথায়?
~~কর্মজালভায়ে~~

এই সংবাদপত্রের বিরাট-আট পৃষ্ঠা! সংসারের বহু সমাজের দৈনিক
~~বাহ্যিক~~। ইহার মধ্যে কাব্য কোনটুকু? তবে আমরা ইহার জন্ত এত

উৎকণ্ঠিত কেন? নবগণের কাব্য আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আয়তন্য
~~গৌলগ্যটুকুও~~ নাই।

বিনোদ সংবাদপত্র তুলিয়া নিয়া-গভীর-চিন্তায় মগ্ন হইল। ক্রমে বেলা
~~কিছু~~ বাহিয়া গেলে পুরাতন 'লবীবিদ্যার' শিশি হইতে শেষ তৈলটুকু

স্নাতকপটে বাটব করিয়া ক্রমে শাখিল।
~~স্নাতকপটে~~

টব কলের জলে পরিপূর্ণ হইতেছিল। ব্রাহ্মণ বলিল, 'দাদাবাবু, এখনও
~~স্নান~~ চড়ে নাই।' বিনোদ তাহার কথার উত্তর না দিয়া স্নান করিতে

বসিল।
~~স্নান~~

মঙ্গলবিনোদের অবস্থা একটু জড়া ও কড়া বকস দেখিয়া পিসী দুইটি
~~গোটা~~ গলি-গলি-কানিয়া সময়ে বকস-কবিরা দিয়াছিলেন। তখন বেলা

প্রায় দুইটা। খালার মান-বিশ্ব ব্যজন দেখিয়া বিনোদ তাহার সৌন্দর্য অল্পতব।
~~প্রায় দুইটা~~

করিবার চেষ্টা করি। সকলেই মৃত। অন্ন, অস্ত্র, ভবকাণী, ছদ্ম, স্বেচ্ছা
সজীব নহে। প্রাণ সজীব পদার্থ চাহে না। পরিপাক করিতে পারে না।
শাখভৌতিক সুরঞ্জাম অবলম্বন করি। প্রাণেব খেলা! কি অপদার্থ এই প্রাণেব
কতকগুলি অঙ্গার বস্তুর আণবিক উত্তাপ যত দিন আসব গ্রহণ করিতে পারি,
তত দিন তাহাদেরই ভাব ও মতিগতি লইয়া এই পাশবিক জীবন কাটিই।
তাহাদেরই মধ্যে আমরা সৌন্দর্য দেখি, এবং সাহিত্যের সৃষ্টি করি।

২.

আহাবের পূর্বে বিনোদ অনেক গভীর বিষয় ভাবিয়াছিল। আহাবে
প্রবল স্বেচ্ছা ক্রমে ক্রমে বিগীন হইয়া গেল। হায় রে অন্ন। বিনোদ প্রতিজ্ঞা
করিল, আব কখনও গুরুতর আহার কবিবে না। ক্ষুধা কাবা নইয়া গায়ে
কিন্তু নিবৃত্তি হইলে অন্তর্দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে নিজা, দুঃস্বপ্ন, এবং ক্রমি
অগ্রিমাল্য। জঠরানল জ্বলিয়া না উঠিলে সৌন্দর্যেব কোনও আভাস পাওয়া
নকতিন। ক্ষুধা! ক্ষুধা! ক্ষুধাই প্রেমিকের সম্বল, ক্ষুধাব চিবনামিনী। ইন্দ্র
বিরহ ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। জ্ঞান ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। ভক্তি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যখন ক্ষুধা
ও তৃষ্ণায় জীব বিকল হয়, তখনই নিভৃত অগ্নি অন্তরের সৌন্দর্য নিকাশ করিতে
চাহে। কিন্তু সেই নিকলস্ক, নখ সৌন্দর্য অসিরা অন্তর্যাক্ষনের আবরণ দি।
চাকিয়া ফেলি। আমার জঠরাগ্নি অল্প জঠরাগ্নির সহিত নিশিদ্ধ বিরুদ্ধোদ্যম
প্রদীপ্ত কবিতা পাবে না। আমাব অক্ষ অস্ত্রের সহিত মিশে না। আমার
হৃদয় আমার শোণিতেই আবদ্ধ থাকে। আমাব যন্ত্র আমাবই স্বেচ্ছা
হৃদয় সেখানে কপটি রুদ্ধ, অস্ত্রের প্রবেশনিষেধ! ক্ষুধা অমানবৎ এই উদ্বিগ্ন
বহু ক্ষুধা অগুসমস্তির চিতা। আমি নিজেই তাহাব মধ্যে দগ্ধ হই, অথচ সকলে
সম্মুখে তাহা লুকাইয়া রাখে। আমাদের ভয়, পাছে হিংসাবিবর্গ জীবনটুকু
তাহার প্রতি সঞ্চারিত হয়। হায় রে উপবাসী পরলোকস্থ আত্মা! তোমার
ক্ষুধা। জানাদের অবস্থা তোমরা বোধ হয় দেখিয়া হাস।

ভবিষ্যতে ক্ষুধা-নিবৃত্তিব জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হওয়া অতি মুখের কাজ, ইহ
সিদ্ধান্ত করিয়া বিনোদ শয়োগত হইল। বিনোদের একটা গুণ ছিল। সে
দোকু এহেন সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। কিন্তু বিনোদের চেম্বারে না ঘুমিয়ে
নিজা আসিত না। কারণ, এম. এ. পাশ করা পর্যাণ্ট বিনোদ শয়ান শয়ন
করিয়া পাঠ করিত। বড় বড় কঠিন সমস্যা ও প্রগাঢ় চিন্তা তাহাব
শয়নকালেই মনোমধ্যে উদ্ভূত হইত, এবং এ দেশের অধিনাসিকের প্রতিকার,

শ্রম ও বীণা, যে শ্রমাবহাতেই নিক্ত হইল। তাহা বিনোদের মতে নিশ্চিত। অনেক সমস মনে হইত, সেটা অন্তর্ভুক্ত। বিনোদের মতো মতো হইত, কোনও গির্জাঘরে কিংবা ধূসর বর্ণের মাঠে; কিংবা মরুভূমির উপর শয়ন করিয়া বিশ্বের কাব' সযক্রে আলোচনা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কখনো উঠে না।

পূজার সময় হইল। এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিলে হয় ত সংসারের নিগূঢ় আবিষ্কার করা দুসব হইয়া পড়িবে, তাহা মনে করিয়া একটা কোনও অজানা দেশ প্র্যাটন করিবার সম্বন্ধ বিনোদের মনে উদ্ভিত হইল।

এইবে-বিশাল ও দীর্ঘ ভারতবর্ষ, ইহার প্রত্যেক প্রদেশই অদ্ভুত। প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষত্ব। কোনটাবই ইতিহাস কাহাবও মত নহে। তাহাদের সমাজ কি প্রকারে পরিবর্তিত হইতেছে, এবং এক প্রদেশের হ্রাস অন্য প্রদেশে গিয়া কি প্রকারে সমাজের পরিবর্তন ঘটায়, তাহা সৌন্দর্য্যতত্ত্বে একটি শিথিবাব ও দেখিবার বিষয়।

বিনোদ বাস্তব হইতে গোটা কতক টাকা সংগ্রহ করিয়া বলিকাতা হইতে নিজস্ব হইল। ক্রম বর্ণের একটা পিরহান ও ক্রম বর্ণের একপানা ধুতি পরিধান করিয়া, এবং ক্রম বর্ণের চাদর দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া, বিনোদ একেবারে ছোটনাগপুরের বেলে আবোহণ করিয়া বসিল।

এবমুখাবের বিকৃতবর্ণ পরিচ্ছদ দেখিয়া অনেকের কৌতূহল জন্মিয়াছিল। এক জন-ভ্রমলোক জিজ্ঞাসা করিল, "আম্রশ্রমের নিবাস?"

বিনোদ। এখানেই।

ভ্রমলোক। মহাশয় এ কালো ধুতি চাদর কোথা হইতে যোগাড় করিলেন?

বিনোদ। রজস্রা লইয়াছি। অনেকে গেরুয়া রং পছন্দ কবে, কিন্তু সেটা আমার বই গ্রাব কিছু না। আমার মতে বিনেশে কাপড় চোপড় ময়লা হইয়া বালিয়া, কালো রংই খুব সনজ্ঞাপ্রয়োগী।

ভ্রমলোক বিনোদের বর্ণের নিতট দুখ লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, "আমার মতে কালোর মধ্যেই জগতের সৌন্দর্য্য নিহিত। হুংবেদ-মধ্যে। মবণের মধ্যে। মৃত্যুর মধ্যে।"

ইহা বলিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাহিষের আলোকের দিকে যের অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন।

বিনোদ খুব অস্থানদিত হইয়া বলিল, "মার্জ্জনা করিবেন, আমার গৌব হইতেছে - আপনি এক জন কবি।"

হৃদলোক ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ঠিক কবি নাই। আপনি কাব্য লিখি না, তদে কাব্যটা কি, তাহার অনুসন্ধানে ব্যস্ত।'

বিনোদ। কি সুন্দর। আমি ঠিক আপনাকে জ্ঞাব একটি লোকের তদাস কহিতেছিলাম। যদি ধৃষ্টতা না হয়, তবে আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করি।

কাব্যিক ?

ভদ্রলোক। আমি প্রজাতভাবে জীবন কাটাইতে চাই। তবে আপাততঃ আমার নাম স্বরীকেশ বলিয়া জ্ঞানিয়া রাখুন। মনে করুন, আমি এক জন পুলিশের কর্মচারী, কিন্তু পেন্সনপ্রাপ্ত এবং বার্ষিকাগত। আপনি নির্বিদ্বেদ আমার সহিত মিশিতে পাবেন। আপনি কত দূর যাইবেন?

বিনোদ। ঠিক নাই। তবে আপাততঃ রাস্তার টিকিট এইরাছি।

ভদ্রলোক। অত দূর যাইবাব এখন দরকার নাই। আপনাকে প্রথমে কল্লার খনিগুলি দেখাইয়া দিতে চাই। আপনি 'কল্লার' টিকিট লউন।

ইহা বলিয়া স্বরীকেশ বাবু একটি সিগারেট টানিতে বসিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার টিকিট বদলাইয়া লইয়া আসিল।

স্বরীকেশ বাবু বলিলেন, 'পথে এক জন সঙ্গী দরকার। আমি বিনোদ পারিয়াছি, আপনি আমাবই মত সৌন্দর্যের পথের পথিক। আমিও জীবনের প্রাকালে, অর্থাৎ যৌবনকালে, (তাহার পূর্বে জীবনের কালাকাল বিচার হ'ল না) আপনার জ্ঞাব বহির্ভাগে—খুজিয়া বেড়াইতাম (আমাব অধিকতর কল্লার কল্লার খনি কম, সুতবাং কোনও কথা ছাড়িয়া গেলে আপনাকে মনে পূরণ করিয়া লইতে হইবে)। কিন্তু বহির্ভাগে যে সৌন্দর্যটুকু আমার চোখে এবং উপাসনা করি, তাহাব—নাই।'

যৌবনের কথা শুনিয়া বিনোদের প্রেমের কথা মনে পড়িল। 'প্রেম মধ্যমে আপনার মতানত কি?'

স্বরীকেশ।—কিসের প্রেম?—র প্রেম?

বিনোদ। আপনি রসমীর প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?

স্বরীকেশ (হাসিয়া)।—আমি ত তাহা বলিঙ্গাই। আপনি কেন প্রেমের কথা বলিতেছেন?

বিনোদ। মনে কল্প তাহাই।

স্বরীকেশ। আমি তে ভাবে দেখি নাই। আমার নতে বসন্তের মত।

কারণ, বনগী ছঃধর্মবী প্রকৃতি। আগ্নায়ি যদি তুমিবার ইচ্ছা থাকে, তবে একটা
 দল বলি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে—তখন বঙ্গদেশের উপত্যকাসমূহি বড় ভাল
 সাগিত—আমার হঠাৎ মনে হইয়াছিল যে, আমি—বাগি। তখন বাদলা দেশ
 সর্বত্র—ম্যালেবিয়ার পবিপূর্ণ হয় নাই, তবে আমার—যেখানে ছিল, সে—হান
 বঙ্গদাম ছেলায়। সে সেখানে থাকিত বলিয়াই ইউক, কিংবা উপত্যক পড়িয়াই
 ইউক, আমার—এতি একটা প্রগাঢ় ভাষাবাসা জন্মিয়া গেল। তাহাব জল, রায়,
 স্পানপূর্ণ পুকুরি, শ্রীহীন বাসগৃহ, ঘন-আধারপূর্ণ কদলীবন, এমন কি,
 ন্যালেরিয়া পর্যন্ত আমাব প্রাণমন প্রিয় হইয়া পড়িল। তাই সপ্তমীর দিন
 কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি একাকী সেই গ্রামখানিতে গিয়া উপস্থিত।
 বিনোদ। রেলের ধাবে ?

দ্বীকেশ। তখন বেল ছিল না বলিয়াই রুগা। বেল থাকিলে বঙ্গদেব
 উপত্যকসেব অর্ধেকাংশ কদম্ব হইয়া পড়িত।—ব্রজে গিয়াছিলাম।—যদয়ের
 ছদয়ে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া গিয়াছিলাম।—প্রত্যেক পথশ্রান্ত নিঃশাসেব সঙ্গে,
 প্রত্যেক দীপহীন-ঈর্ষ পাছনিবাসের নৈশবায়ুর সঙ্গে আমার—র কথা মনে
 পড়িত। কি কথা ? মাহুয়ের সঙ্গে মাহুয়ের কি কথা সম্ভব ?

বিনোদ। স্বপ্ন-ছঃধের কথা।
 দ্বীকেশ। বেশ ভাল—দেখুন।—আমাব স্বপ্ন-ছঃধের কথা আলনার
 কখনই ভাল লাগিবে না, যদি একটু কিছু তাহাতে মিশ্রিত না থাকে।—আমাব
 গানেশ সঙ্গে, আমাব সখার সঙ্গে, কাব্যের সঙ্গেও সেইটুকু চাহি। মনে ককন,
 যদি আমি ‘দেশের’ কথাই বলি, তার মধ্যেও তারতম্য আছে। সে কথার
 গান দবকাব নাই। পথ-হাটিকা গ্রামে উপস্থিত হইলাম।—সপ্তমীর টান
 উঠিতেছিল। বন বাদাড় ভাঙ্গিয়া, কদলীর বন পার হইয়া, একটি বিন্দুক, ভয়
 জীর্ণ, পুরাতন বাটাতে গিয়া উপস্থিত।

বিনোদ। সে গ্রামে পূজা হয় না ?
 দ্বীকেশ। পূজা হই রকম। পুরাতন ও নূতন। নূতন পূজার আসবে
 গ্রাম হইতে দলে দলে সকলে সহরে আসিতেছে। তাদের কথা ও-জিরা
 পুরাতন, কিন্তু পূজা বাহাডঘবনাত্র। পুরাতন পূজা এখন নীরবে হয়।
 নীরবে। আধাবে ও বোগে শোকে। জগতে চিরকাল ইহাই হইয়া থাকে।
 পৌত্তলিকতা সহবে আসিয়া জীবন্ত হয়। তাহার মধ্যে যে দৃশ্যটুকু নিহিত
 থাকে, সেটুকু মরণের পথে পুরাতন ভীর্ণে নৌদণ্ড বিস্তার করিয়া যায়।

তাহারই কথা হইল।—আমার বাচ্চাগুলির বন্ধু শ্রীশেব সেই বাচ্চা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চারি বৎসর তাহাকে দেখি নাই। আমি দ্বারে আঘাত করিয়া আকিলি—‘শ্রীশ’—। কোনও সাড়া শব্দ নাই।

স্বয়ীকেশ। শ্রীশ তাহারই এক বৎসর পূর্বে মরিয়া গিয়াছিল। আমি

তাহার প্রাণের বন্ধু হইয়াও তাহা জানিতাম না। অথচ শ্রীশের রান্না

চিঠি আমার বাস্কে—কিন্তু আমার তখনও বিশ্বাস হয় নাই। আমার সেই

বাচ্চাতে প্রবেশের অধিকার ছিল। প্রাঙ্গণ পার হইয়া গৃহে গেলাম, তখন

সম্মুখে একটি কঙ্কালসমী মূর্তি প্রদীপ লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই শ্রীশের

মূর্তি। ‘বাবা, তুমি এতদিন পবে এসেছিস’? আমি প্রশ্ন করিলাম। তিনি

কাদিলেন না। কিন্তু তাঁহার নয়নের জ্যোতিঃ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম যে, প্রব-

লোকহু শ্রীশের স্মৃতি আমার দিকে কঙ্কণদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। আমার

চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। আমি বিজ্ঞাসা করিলাম, ‘শ্রীশ, শ্রীশের স্ত্রী কোথায়?’

তিনি বলিলেন, তাহাও একটি কথা হইয়াছিল, এখন তাহার পিতাও ক’লে

আবার বলিলেন, ‘তোমার—বুঝি আর-বাঁচে না। একবার দেখিবে এস।’

বিনোদ। সে কে?

স্বয়ীকেশ। বুঝিয়া লউন। যে নাই, তাহার নাম বলিয়া লাভ কি? সে

শ্রীশের অত্যন্ত আদরের সহোদর। আমি যে তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহা পূর্বে

বুঝিতে পারি নাই। কেন বুঝি? তখন মৃত্যু কি, তাহা জানিতাম না।

আত্মীয়স্বজনের মরণ, সমাজের মরণ, দেশের মরণ, সকলই প্রাকৃতিক মরণ,

ইহাবই সঞ্চাব, হইলে হৃদয়ে প্রেম জাগিয়া উঠে। রুম্মাব নিকটে গেলাম।

নে রলিল, আমি তাহার অনেক নাথের, কিন্তু তাহার বাঁচিতে সাধ ছিল না।

কল্পিত নেত্রের জ্যোতিঃ স্নান হইয়া গেল,—হৃদয়ের কথা হৃদয়েই আকিল; শব,

শব্দ, রূপের বাহিরে সে চকিয়া গেল। সেই কদলীবনের মধ্যে, পুরাতন তথ-

নাট্যের মধ্যে, তাহাও বহু-তথ-সম্পূর্ণ মেঘ পড়িয়া রহিল।

—ইহাই পুরাতন পথ। প্রেমের পথ। আব একটা নূতন পথ আছে।

তাহাও প্রেমের। কিন্তু উভয়ের দোলনায় বিচার কবিয়া দেখা কর্তব্য।

বিনোদ-বীরভায়ে-গঙ্গা শুনিতেছিল। সপ্তদ্বীপ নিশি—আনন্দহীন, যোগ-

প্রদীপিত, জীর্ণ কীর গ্রাম—সন্তুতিবিয়োগশোকার্তা জননীর কঙ্কণমালা দেহ—

মিরাশ হৃদয়ের শেষ কথা—নবমে একত্র হইয়া বিনোদের মানসপটে নথ-

মধ্যে অশ্রুপূর্ণ একটা চিত্রের মত প্রতিভাত হইতেছিল। একটা অজ্ঞাত দুঃখ
বিনোদের হৃদয়ে জড়াইতেছিল। বিনোদের নয়নকোণে অশ্রুবিন্দু দেখা গেল।

স্বয়ংকেশ বাবু তাহা দেখিয়া খুব কনিয়া-একবার সিগারেট টানিয়া লইলেন,
এবং তাহার গ্রীবা বিনোদের স্বস্তির নিকে পুনর্বার প্রসারিত করিয়া বলিলেন—

‘শ্রোতা দ্বন্দ্বব, আমবা কবি।’

‘প্রণী দ্বন্দ্বব, আমবা ছবি।’

‘আমবা আমাদের কাব্য বুঝিতে পারি না, আমরা আমাদের সৌন্দর্য দেখিতে
পাই না। একটা সৌন্দর্য আছে, তাহা ব্যবহারিক—বাহিরের রূপে তাহা

আভাস পাওয়া যায়। সে থাকে না, চিরকাল বদলায়, নষ্ট হইয়া যায়। তাহার
নীচে স্বগতের ‘অন্তঃশিলা’ অশ্রুপ্রবাহ। তাহার নীচে ধর্মের জ্যোতির্মান চক্ষু।

তাহাই পবিত্রতাব্য উৎস। সৌন্দর্য সেখানে। আমরা যাহা বাহিরে দেখি

ও শুনি, তাহা কালের ও সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব। তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া

আমাদের হৃদয়ে যে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহার প্রতিঘাত অন্তর্জগতে গিয়া

কায়ের স্রষ্টি করে : মানবের জায় কাব্যের দ্বিজ্ঞান আছে।

‘আব একটা কথা মনে রাখিবেন। দ্বন্দ্ব সৌন্দর্যের একটা অঙ্গ। এই

প্রাচ্যধানি এই অঙ্গকারে আমবা দেখিতে পাইতেছি, উহা অগ্নিবাসীবা পরম্পর

হইতে অনেক দূরে থাকে। তাহা সেই জগৎ পরম্পরকে ভালবাসে। সহরে

আমরা গ্যানলাইটের পার্শ্বে জড়াজড় করিয়া থাকি, কিন্তু সবলেই পরম্পরের

শত্রু। দূরে থাকিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, মিলিতে ইচ্ছা কবে। অনেক কথা

মনে পড়ে। সে কে? কোথার তাহার বাস? সে আমার কি না? তুমি

গিয়াছে, তাহাকে কেহ হয় কি না? এ আসিবে, তাহাদের কে? মতই অজ্ঞাত,

ততই আনন্দের প্রিয়। ততই আমবা পথ খুঁজিয়া তাহার নিকট বাইতে চাহি।

সেটুকু জানিতে পারিয়াছি, সেটুকু আমাদের নহে; তাহার মধ্যে কাব্য নাই,

সৌন্দর্য নাই। তাহাকে কখনও জানিতে পারিলাম না, যে আপনাকে হৃদয়ের

স্বার্থে লুকাইয়া রাখে সেই আমাদের। সেই লুকানটুকু যত দিন না বাহির

করিতে পারি, তত দিন আমাদের তৃষ্ণা মিটে না, সৌন্দর্যের তত্ত্ব পাওয়া

যায় না।’

দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া ট্রেসনে ট্রেপ আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্শ্বতীয়

ভূমি, অদূরে গিরিশ্রেণী। বহু শত কলকাতাবধানাব আগার লগ্নেরে গ্রীবা

উত্তোলন করিয়া ধুম উল্লিখন করিতেছিল। রাশি রাশি করলাব শুণ মাঠের

এপার হইতে ওপার ছাইয়া। ভূগর্ভে ও বাহিবে লক্ষাধিক লোক থনিষ্ঠা
করলার ভার মস্তকে বহন করিয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর স্থায় অবিবাম আনাগোনা
কবিভেছে।

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'এও দেখিতেছি কলিকাতার মত জনপূর্ণ।'

হৃষীকেশ। এই শতাব্দীর চিত্তার মানমণ্ডলার মধ্যে এটা প্রধান। বহু

জনাকীর্ণ স্থান মহারাজাধিব সমিধ-সংগ্রহ লইয়া ব্যস্ত। সেখানেই নগর টাকা

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা জন্মাবধি মৃত্যুর আয়োজনে ব্যস্ত, এবং বহু

উপার্জন করি, তাহাতেই ব্যয় হইয়া যায়। যে মৃত্যুর যত আয়োজন করিতে

পারে, সেই জগতে তত প্রধান। ধর্ম্মজগতেও তাই, কর্ম্মজগতেও তাই।

মহাতে শীঘ্র মরণের সম্ভাবনা, তাহাই খুব-পৌরবের, এবং সভ্যজগতের

অনুমানিত।

বিনোদ। মরণকে বাঞ্ছনীয় নহে ?

হৃষীকেশ। নিশ্চয়। তবে উহার মধ্যে সৌন্দর্য্য কোন্ দিকে ? নিজে

বাঁচিয়া অপরকে যারা, না অপরকে দলিত কবিয়া নিজে বাঁচা ? আবার

গভীর ভাবে দেখিলে বুঝিতে পাবিবেন যে, অপরকে মাঝিয়া নিজের জীবনবন্ধ

যে উপায়, সেই উপায় দ্বাবাই নিজের মৃত্যু শীঘ্র ঘটে। একটা লোক তাহা

বাকিতে পারিলে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

বিনোদ। সে কে ?

হৃষীকেশ। আমাদের রামধনের কথা শুনে নাই ? সে লোকটা টাক

গাব দিয়া, কলকারখানার 'শেয়ার' লইয়া, জাল জুয়াচুরী করিয়া, অগ্নি

বজ্রের আহার বন্ধ করিয়া, কালক্রমে অনেক টাকার মালিক হইয়া পড়িয়া

ছিল। ফলে, গাড়ী, ঘোড়া, ইমারত, নাচ, গান, বায়ুসেবন, রাজিভাগরণ

'মোটবকার', তীর্থ আহার্য ও পানীয়, দেশবিদেশে দৌড়াদৌড়ি, সভায় চীৎকার,

দলাদলি, বাতব্যাধি, অবশেষে পক্ষাঘাত। ক্রমে ডাক্তার ও উকীলের আবির্ভাব,

মারলা ও মোকদ্দমা, এবং শেষ অবস্থায় পুত্রের হস্তে নষ্টভাষাত। লোকটার

প্রাণসংশয় দেখিয়া গৃহিণীর রাজি তিনটার সময় থিয়েটার হইতে আসিয়া

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন। পাড়ার লোকের জাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া রামধন

উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আবস্ত করিল।

বিনোদ। উদ্দেশ্য ?

হৃষীকেশ। একটা আঙ্গিনার যদি এক জন কাঁদে, এবং অশ্রু ভ্রম হাটসে,

তবে সেখানে একটা 'বিশাল' (অভিনয়) হইতেছে, প্রতিবাসীর মনে ইহাই
বর্ণনা হয়। এই চালাকীটুকু কবিতা রামধন সে যাত্রা কলঙ্ক ও আসন্নমৃত্যু
হইতে উদ্ধাব প্রাপ্ত হইল। ভগবান জীবকে যতই অধন করিয়া হুটি করান
না কেন, সকলেবই একটু অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞান আছে। মান অপমানের
ভয় আছে। ইহাই কান্যের প্রথম বিষয়। মিল্টনের শরতানকে মনে কবিতা
দেখুন।

৫

এখানে ন্যামিরা স্বাক্ষর বাবু গাড়ী ভাড়া কবিতা বাহির হইলেন।

বিনোদ প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিল। তাহার দেখা নাই। বিনোদ ব্রত

হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তাহার কোনও সন্ধান পাইল না। বিনোদ

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, তাহার 'মনিব্যাগ' নাই; কেবল টিকিটখানি ও

এক খণ্ড কাগজ আছে। কাগজখানি খুলিয়া বিনোদ পাঠ কবিতা দেখিল,

—আপনার চল্লিশ টকাব নোট, আমি ঋণস্বরূপ গ্রহণ কবিলান। কোনও

দ্রব্যে তাহা—পোধ কবিতা দিব। আপাততঃ আপনি পথে বিপন্ন বলিয়া একটা

সন্ধান বলিয়া দিতেছি—এখানে ইবিনাথ মিত্র বলিয়া এক জন সম্ভব লোক

বাস করবেন। অতিথিসংকারে তিনি প্রখ্যাত। তাহার বাসীর উপস্থিত

হইলে আপনার কষ্ট দূর হইবে—মনে রাখিবেন, অগ্রং কাব্যময়।—আপনার

চিরস্নেহের স্বামী— বিনোদ ভাবিল, 'লোকটা কি ভদ্রানক জন্মচোব!' কিন্তু

কোনও উপায় নাই। এখন ইবিনাথ বাবুর সন্ধান পাওয়া যায় কোথায়?

সন্ধ্যা এক জন কুলী ধাঁড়াইয়া বিনোদের কক্ষবর্ণ বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিতে

ছিল। বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিনাথ বাবুর বাড়ী জান ?'

কুলী। কেন জ্ঞানিব না?

বিনোদ। দেখাইয়া দাও। বখসিস দিব।

কুলী। আমি সেই বাড়ীর চাকর গো।

উভয়ে পথ ধরিয়া চলিতেছিল।

বিনোদ।—বাবু তি বকম লোক ?

কুলী। অনেকটা আপনার মতনই বটে গো। কিন্তু বুড়াও বটে, মা

বাপও বটে।

বিনোদ ভাবিল, 'বর্ণনাটা মন্দ নহে। তাহার মধ্যে একটু সৌন্দর্য ছিল।'

বিনোদ। বাবুর হেলেপুলে কয়ট ?

কুলী'র নাম মাদারাম। জাতিতে সাঁওতাল। সে-বলিল, 'তাহা ত গদিয়া দেপি নাই। অনেকগুলো মেয়েও বটে, অনেকগুলো ছেলেও বটে। শব্দ তাদেরও ছেলে মেয়ে কম নয় হে। দশটা, বিশটা, ত্রিশটা ছাঁ-গুন্ডা হইতে পাবে। বেকী হওয়া অসম্ভব নয়।'

বিনোদ। তুমি কি কর ?

মাদারাম। আমি হুখীমনিব গকর বাস কাট-গো, আব-কলবি-কুলী মরগে মুখে জল দিই।

বিনোদ প্রথম কথাটা বুঝিতে পারিল না। দ্বিতীয় কথা'র উত্তরে কহিল,

'এখানে অনেক লোক নবে ?'

মাদারাম (হাস্তপূর্বক)। সেই রকম দেখা যায় বৈ কি। যত মরে, তা'র অধিক ছাঁ জন্মায়। আগে বাবুর বক্তৃশ্রাব্যনা-বদ ছিল, এখন চল্লিশখানা গো।

বিনোদ যখন হরিনাথ বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন স্বর্ষ্য অস্ত হইতেছিল। গেটে প্রবেশ করিয়া বিনোদ দেখিল, কতকগুলি মাদি, সাদি, গাছপালা ও অজানা ফুলের বাগান। মধ্যে মধ্যে, শতমূলী'র দীর্ঘ শ্রামল বাদেব-মধ্যে আঁত-মূল খেত পুষ্পগুচ্ছ নৌক-বিকীরণ কবিতেছিল। সম্মুখে একটি রাগিগঞ্জের 'টাইল'-মণ্ডিত বাংলো। একটি বৃদ্ধ চশমা-চক্ষে বেঞ্চে বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন। মুখমণ্ডল চক্ষু বিমর্ষ।

মাদারাম অভিযান পূর্বক কহিল, 'এই ব্যাটাছেলোট ইষ্টাশনে-আপনার নাম করিতেছিলেন গো।' মাদারাম চলিয়া গেল। বৃদ্ধ সসম্মুখে বলিলেন,

'আপনি বহন।' বিনোদ লজ্জিত ভাবে বলিল, 'আমি বিপন্ন। আপনার গৃহে আসিবার আমার কোনও অধিকার নাই। তবে এক জন জুবাচোর আমার পার্শ্বেই টাকা কয়টি লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।' বৃদ্ধ ক্ষণে ভাবে বলিলেন, 'আপনার নিবাস ?'

বিনোদ। কলিকাতার। আমার নাম বিনোদলাল। আমার পিতার নাম ওবমানাথ বসু। বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম করিয়া টাকা আনাহই, তাহারও উপায় নাই। আপনি যদি এই সোনার আংটাট হাতে রাখিয়া আমারে আপাততঃ গোটা দুই টাকা দেন, তবে বাড়ীতে একটা 'আর্জেন্ট' টেলিগ্রাম কবিয়া দি।

ইহা বলিয়া বিনোদ তাহার অঙ্গুলী হইতে পিতৃদত্ত স্বর্ণাঙ্গুলীর খুঁটিয়া বৃত্তেব হস্তে দিল। বৃদ্ধ সেই অঙ্গুলীট উন্টাইয়া পান্টাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া

বিনোদের মুখেব দিলে চাহিয়া রহিলেন। বিনোদ দেখিল যে, তাহার বিষয়
মুখ্যতঃ শিশুর প্রকৃতি, উভয় চক্ষু বহিয়া বিমল অশ্রুবিন্দু ঝবিতেছে। হঠাৎ বুদ্ধের
সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, তিনি পড়িয়া যাইবেন।
বিনোদ সময়ে বুদ্ধের শুভ্রকেশবাশিপূর্ণ মস্তক স্বীয় বক্ষে বাবণ করিয়া তন্ত-
ভাবে 'জিজ্ঞাসা' করিল, 'আপনার কোনও অসুখ হয় নাই ত ? বাড়ীতে যদি
কেহ থাকে, তবে—'

বুদ্ধ বলিল, 'না। আনন্দ আমার সর্বশরীর কম্পিত হইতেছে। সে
আনন্দ ধরিবার শক্তি এখন আমার নাই। তাহার কাবণ বলি, শুন। তোমার
পিতা রমানাথ আনান বাল্যস্থা ও প্রাণদাতা। 'হগলী ব্রহ্মেব' নীচে বধন
নোকা উঠাইয়া আমি ডুরিয়া যাই, তোমার পিতা রমানাথ আমার প্রাণবন্ধ
করিয়াছিল। এই অতীরিষ্ট অসুখার্থ এক দিন তাহার অঙ্গুলিতে পবাইয়া দিয়া
ছিলাম। তুমি দুই টাকার স্রজ বাহা আমার হাতে দিয়াছ, তাহার মূল্য আমার
দ্রুত লক্ষ সুবর্ণমুক্তা অপেক্ষা বেশী। তুমি বোধ হয় এখনও বিশ্বাস কর নাই ?
বুদ্ধের পবিত্র স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের বিশাল আনন্দ বিনোদের প্রাণে সঞ্চারিত
হইতেছিল। বিনোদ বলিল, 'নিশ্চয় বিশ্বাস করি। আপনাকে দেখিয়া আমার
স্বপ্ন পিতাকে মনে পড়িতেছে।'

বুদ্ধ। হাঁ। ঠিক। স্বপ্ন। তাহা হইলেই হইল। একটাই পথ আছে,
তাহাতে ইহলোকের ও পরলোকের লোক পরস্পরের হাত ধরিয়া বিচরণ করে ;
সেই পথেই স্নেহ, বিশ্বাস, ভক্তি ও স্তুতি। আমারও মনে পড়িতেছে। প্রথমে
তুমি তোমাদের সংসারের কথা বল, পরে আমিও বলিব।

বিনোদ তাহার জননীর কথা, সংসারের স্বচ্ছল অবস্থার কথা, তাহার
লেখাপড়ার কথা, এবং অবশেষে দেশ-ভ্রমণের সঙ্কল্পের কথা সলজ্জভাবে সংক্ষেপে
বর্ণনা গেল। বুদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অমৃতধারার চ্যাব তাহা গ্রহণ
করিতেছিলেন। তাহার পর বুদ্ধ তাহার নিজের সংসারের কথা বলিলেন।

'আমার সংসার দুইটি। তাহার অর্থ এই যে, আমার বিষয়কর্ম ও
'কলিয়ারির' ভার আমার পুত্র সীতানাথের হস্তে শস্ত। সে নিজের কন্যা ও
তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ লইয়া অনেকটা দূরে থাকে। এই যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা
মাঠের ওপারে দেখিতেছে, ত্রুটি তাহাদের বাসস্থান। আর আমি এখানে
একাকী থাকি।'

বুদ্ধের চক্ষু আবার অশ্রুপূর্ণ হইল। 'ঠিক একাকী নহ। আমার একটি

আদরের কথা ছিল। সে নাই। ষোল বৎসর পূর্বে সে একটি কথা বাখিয়া পবলোকে চলিয়া গিয়াছে। পবলোকে—স্বামিসন্নিধানৈ। তাহাদের দেশে কেহ নাই। দেশ উচ্ছন্ন গিয়াছে। আমার নাতনীট বড় মেহেব—তাহাকে আমি দুঃখীমণি বলিয়া ডাকি। কিন্তু তার পিতা সাধ কবিতা নাম রাখিয়াছিল—‘কাব্যময়ী’। বুদ্ধ তখন কাব্যময়ীকে আহ্বান করিলেন।

৬

দুঃখীমণির গলদেশে ক্ষুদ্র রক্তাক্ষর মালা। দক্ষিণ হস্তে একগাছি পুস্প বলয়। পরিধানে এক খণ্ড পুরাতন নীলবর্ণ শাড়ী। মস্তকের কোণে কিছু তাহা শুপাকাবে সাঁওতাল-বাঁকিদিগের স্থায় মস্তকের দক্ষিণ পাশে শুক বনলতা দিয়া বাঁধা। কমণ্ডলু জাকাবের একটি কাংস্তগাত্র-হস্তে দুঃখীমণি উপস্থিত হইয়া বলিল, ‘দাদা! আজ বড় গক ছুধ দেয় নাই।’ বুদ্ধ হস্তিনে বাবু বলিলেন, ‘তবেই ত সর্কনাশ! আমাদের বিনোদ খাইবে কি?’

বিকট কৃষ্ণ বর্ণের চাদের জড়ান, বিনোদেব স্ত্রী, সুন্দর, লজ্জাবনত, স্বীকৃত মুখখানি দেখিয়া দুঃখীমণি প্রথমে বড় ভয় পাইয়াছিল। কিন্তু মাতামহের আশ্বাসপূর্ণ ‘আমাদের বিনোদ’ শুনিয়া তাহার সে ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখীমণি দুই চক্ষু ভরিয়া বিনোদেব দিকে তাকাইয়া, মাতামহেব স্নেহপূর্ণ স্বামী প্রতি-
শ্বনিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—‘আমাদের?’

বুদ্ধ বলিলেন, ‘হাঁ, আমাদের। অনেক দিন পবে এ বাড়ীতে এক দিন অতিথি আসিয়াছে, সে ‘আমাদের’। তুমি কিছু জলধাবার যোগাড় কর। বিনোদ সমস্ত দিন খায় নাই।’

বিনোদ দুঃখীমণির দৃষ্টিতেই কাব্যের প্রথম আভাস পাইয়াছিল। একটা কথা ঠিক। যেটুকু সুন্দর, তাহার বর্ণনা সম্ভবে না। সাহিত্য কেবল বীণা-
স্থায় স্বর দিয়া সুরের উৎপত্তি করে। তাহার কোনও অর্থ নাই। তাহা-
প্রাণে যেটুকু সৌন্দর্য পূর্বে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই আলোকে সে সাহিত্য দিবা একটা ছবি গড়িয়া লয়। বিনোদ চঞ্চলাব স্থায় সে আলোকটুকু দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কোন আধারে তাহার প্রথম চিত্র গড়িয়া তুলিবে, তাহার কোনও কলকিনারা পাইল না।

বিনোদকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া হবিনাথ বাবু বলিলেন, ‘তোমার মাকে এক-
খানা পত্র লিখিয়া জানাও। নয় ত টেলিগ্রাম কর। তিনি ভাবিবেন।’

বিনোদ মনে করিল, ‘ঠিক।’ পত্র লেখাই স্থিৰ করিয়া বিনোদ লিখিল, ‘মা।

না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি, কিছু ননে কবিও না। 'এ স্থানটি পাহাড়ে
পরিপূর্ণ। খুব সুন্দর। আমি এখানে একটা কাব্য বচনা করিয়াই বাটী
ফিরিব। আমি হরিনাথ বাবুর বাটীতে আছি। বোধ হয়, তাঁহাকে মনে
পড়িবে। তিনি আমার পিতার পাম বন্ধু ছিলেন।'

বৃদ্ধ হরিনাথ বাবু শুন কবিলে, বিনোদ তাহাব জগিত কাব্যের প্রথমাংশ
খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক কবিল। দুঃখীমণি জলখাবারের থালা সাজাইয়া
আনিয়াছে। বিনোদ বলিল, 'পূর্বে আমার খুব খাওয়া অভ্যাস ছিল। এখন
ছাড়িয়া দিয়াছি। যাহা হউক, আজ সবগুলিই খাইব, কিন্তু মনে থাকে যেন,
আর এত অপরিমিত জলখাবার তৈয়ারি না হয়।' বিনোদের আজ্ঞা শিরোধার্য
করিয়া দুঃখীমণি বলিল, 'আচ্ছা।'

আহারের সম্বন্ধে বিনোদের কখনই লজ্জা ছিল না, তবুও সে দিন মুখ
ফিরাইয়া ধীরে ধীরে খাইতে বলিয়া গেল। দুঃখীমণি মাতামহের শয্যার পাশে
গিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি—আমাদের কে?'

হরিনাথ। এখন তাহা বলিব না। তুমি 'বিনোদ বাবু' বলিয়া ডাকিতে
পার। প্রাতঃকালে ও বাড়ীতে বহিয়া গিয়া তোমার দিদিমাকে বলিবে যে, উনি
আমার প্রাণেব বন্ধু বমানাথ বাবুর পুত্র। এ দেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন।
আব দেখ; বিনোদ বেশ হয় না। গিয়া বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে।
আমার পুত্রাব সময়েই তি ও চন্দন তাহাব অস্ত্র ঠিক করিয়া রাখিবে।

বিনোদ আহার কবিত কবিত জাহা উনিতেছিল। কি লজ্জার কথা!
কি লজ্জার কথা।

প্রভাতে নাঠেব ওপার হইতে একটা সজ্জীত-তবঙ্গ আসিয়া হরিনাথ বাবুর
ওড়ুটাব ও উত্থান ছাইয়া নেগিল। ভৈববীৰ আলাপ।

গান শুনিয়া বিনোদের প্রভাত নিদ্রায় অড়তাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। বিনোদ
জাবিতেছিল, 'জগতে কি চাহি? পরিস্রাষ্ট্র আহার, সন্দেহ পরিচ্ছদ, সুরমা
বাসাগাব, আজ্ঞাকারী সন্দাদী, দুইটি পিয়ানোব তান, একবাব হাওয়াগাড়ী
সাক্ষ্য দৌড়, মধ্যে মধ্যে একটু তন্দ্রাব আবোগ ও সেই সময় প্রিয়তমার আশ্রয়—
কিন্তু যদি প্রিয়তমা কথার বাধ্য না হয়? তবেই ত মুঞ্চিল! আর কি চাহি?

দেশেব জন্ত ঘোর দুঃখপ্রকাশ ও খববেব কাগজে দেশের নানাবিধ মঙ্গলেব জন্ত
প্রশংসা। কিনে ম্যানেজিরা বিবিত হয়, কিসে দেশেব অবিবাসীরা বীৰপুত্র

হইয়া পড়ে, এবং কিসে সৰ্ব্বদা মিলিয়া আত্মশাসন ও আত্মগৰ্জনে দড় হয়, তাহার উপায়-উদ্ভাবন।

বিনোদ খানিকটা পাইচারি কবির বাগানে আসিয়া বসিল। হুঃখীমণি দূর হইতে ডাকিল, 'বিনোদ বাবু—চা খাবেন না?'

বিনোদ গৃহের মধ্যে গিয়া বলিল, 'হুঃখীমণি, আমি চা খাই না, অন্ততঃ এখন-ছাড়িয়া দিয়াছি।'

হুঃখীমণি। তবে ও বাড়ীতে চলুন।

হরিনাথ বাবু। বিনোদ, একবার ওদের সঙ্গে দেখা কর গে।

হুঃখীমণি বিনোদের খুতি চাদর আনিয়া দিল। বিনোদ বলিল, 'কাল্পে পোষাকে আমাকে কি মানায় না? ওগুলি সবই-রেশমী।'

হুঃখীমণি। অন্ততঃ কাপড়খানা ছাড়ুন।

বিনোদ হুঃখীমণির আদারটুকু গ্রাহ্য কবির গুল বসন পরিধান করিল। ঘাবে ভূতা মাদারাম দাঁড়াইয়া ছিল। বিনোদ বলিল, 'মাদারাম, পথ দেখাইয়া দিতে পারিবি?'

মাদারাম। এই রকম ত বোধ হয় গো। তবে কত বলছেন যে, হুঃখীমণি পথ দেখাইয়া দিবেক।

বিনোদ বাহিরের 'গেট' পার হইয়া গেল। হুঃখীমণি ডাকিল, 'বিনোদ বাবু! দাঁড়ান, আমি আপনাব চশমা নিয়ে যাচ্ছি। আমি সঙ্গে যাব।'

হুঃখীমণি চশমা লইয়া আসিলে বিনোদ বলিল, 'ওটা এখন পকেটে থাক।'

হুঃখীমণি সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিল। বিনোদ মধ্যে। পশ্চাতে মাদারাম সগর্বে হাসিতেছিল। বিস্তীর্ণ মাঠ, বন্ধ পথ, মধ্যে মধ্যে দুই একটি শাল-বৃক্ষ ও শিলাখণ্ড। এক মাইল গিয়া হুঃখীমণির মস্তকের কেশপাশ শিথিল হইয়া পড়িল, শুক বনলতার বন্ধন খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। হুঃখীমণি তাহা কড়াইতে গিয়া দেখিল যে, বিনোদ তাহার পূর্বেই সেগুলি একত্র করিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়াছে। বিনোদ লজ্জিতা কাব্যময়ীকে দেখিয়া বলিল, 'আমার একটু কাব্যচর্চাব সাধ হইয়াছে। বাধা দিও না।'

অদূরে প্রজাপতির স্তায় একখানা মোটরকার টোঁড়িয়া আসিতেছিল। সেখানি তাহাদের নিকট আসিয়াই থামিয়া গেল। হুঃখীমণি আবার কেশগুচ্ছগুলি বাধিবে মনে করিয়াছিল, তাহা হইল না।

১০৯৬

১০৯৬

বিনোদ বাবু। এই আমাদের লীলা দিদি।

বিনোদ ভাবিল, 'কি ব্রজাল। কি ঘোর ছরস্তু বাধা বিপত্তি।'

কিন্তু তখনও বিনোদ মুখ ফিরাইয়া দেখে নাই। লীলার দিকে চাহিতে

গিয়া বিনোদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। শুভ্রবসনা লীলা মোটরকার নিজেই চালাই-

তেছিল, পার্শ্বে দুইটি শিশু-হস্তদ্বয়ে বসিয়া। তাহা বা মাক্যাবামকে দেখিয়া

তাহার স্বক্বে আরোহণ করিয়া বলিল, 'আমবা মোটরকারে যাব না।'

দুঃখীমণি বিনোদকে দেখাইয়া বলিল, 'ইনিই আমাদের বিনোদ বাবু।

আমরা তোমাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলুম।'

লীলা বিনোদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল 'কি ছরস্তু ছেলেরা।

পুদের স্নানারাম কাঁধে করিয়া লইয়া যাউক। আপনি ও দুঃখীমণি 'ব্যাকসিটে'

বসুন। আমরা কলিয়ারি'ব দিকে যাব।'

বিনোদ অবাক হইয়া লীলার নপ দেখিতেছিল। চক্ষের নিম্নে প্রভাত

সুখ্যবস্মি ধরতর হইয়া পড়িল, মাতের শ্রামল শপের শিশিবগুলি শুকাইয়া গেল,

প্রান্তবের বায়ু চঞ্চল ভাবে বহিল, তদুবে বনকুম্মেব সৌরভ-বিলীন হইল।

দুঃখীমণি 'কারে' আবোহণ করিয়া ডাকিল, 'বিনোদ বাবু আসুন, আমরা

কলিয়ারি দেখিয়া আসি।'

বিনোদের মোহ ভদ্র হইল। বিনোদ লীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

'আপনি ব্যাকসিটে বসুন, আমি মোটর চালাইব।'

লীলা হাসিয়া বলিল, 'বেশ কথা।'

লীলা সুস্ববী ও নবীন। দুঃখীমণিকে উপেক্ষা করিয়া লীলার নিকট বসি-

ত হঠাৎ বিনোদেব মনে ভ্রান্ত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু লীলাকে 'কার'

চালাইতে দিয়া দুঃখীমণি'ব সঙ্গে বলিয়া থাকি'টা কি অসম্ভবতা নয়? বিনোদ

নেই সমস্তাটুকু পূরণ করিয়া মোটর চালাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে সকলে 'কলিয়ারি'ব সম্মুখে উপস্থিত। কলিয়ারি'ব

কর্মচারিগণ 'মিস' লীলাকে অভিবাদন করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দলে দলে

মাওতাল-যুবতীগণ আসিয়া দুঃখীমণি হাত ধাবল। দুঃখীমণি এক জনের কানে

কানে কহিল, 'ইনি আমাদের বিনোদ বাবু।'

লীলা। সংবাদটা পথে দিগে ভাল হইত না?

কার্য্যমগ্নী কাতর ভাবে বলিল, 'যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারি নাই।

লীলা দিদি। আমি চিরকালই মূর্থ।'

লীলা সাঁওতাল কুলীগকে দেখাইয়া বলিল, 'বিনোদ বাবু, এরা বড় হতভাগ্য জাতি। এদের বাঁধিয়া রাখা শক্ত। ভাল ঘর দিয়াছি, কাপড় বিক্রিয়া দিয়াছি, অল্প কলিরারির চেয়ে এরা এখানে সুখে থাকে, তবুও নধো নধো গলাইয়া যায়।'

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'কেন ?'

লীলা। এদের বিবাহ-বন্ধন বড় কাঁচা। এখন ঘর খুসী, তখন ক্রীবে লইয়া চলিয়া যায়। আমি সেটা নিতান্ত অজ্ঞান মনে করিয়া এদের সাহায্য দিই। তাও মানে না। এদের পুরুষ যোগটা টাকা পাইলেই ক্রীবে যৌন মার্জনা করে।

বিনোদ প্রথমে মনে করিল, 'লীলা কি নির্ভজ্ঞা, বেহায়া মেয়ে।' কিন্তু 'সমাজ এমন একটা জিনিস যে, ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়।' লীলার ভারতবর্ষীয় মরলতাব-মধ্যে পাশ্চাত্য মন্তব্যবিধি আইনের সংমিশ্রণ দেখিয়া, এবং সাঁওতাল যুবতীগণের হাসিখুসীপরিপূর্ণ মুখ দেখিয়া, বিনোদ পাপ ও পুণ্যের মন্দিরকে কাব্য রচনা করিয়া বসিল।

'আমির বোধ হয়, মানবের পূর্ব প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়া নতন-কিছু সৃষ্টি কবিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া পড়ে।' সাঁওতালদের মধ্যে মহাসংহিতা সংস্থাপন করা যেমন অসম্ভব, আমাদের দেশে পণ লইবার প্রথা তুলিয়া দেওয়াও সেই রকম অসম্ভব। বরং আমার বোধ হয় যোগ টাকা লইয়া অব্যাহত ক্রী ছাড়িয়া দেওয়া ভাল, কিন্তু এক রাশি পণ লইয়া আত্মসংযমিনী স্ত্রীকে কাবাগারে বন্দী করিয়া বরণ্য দেওয়া মহাপাপ। প্রথমটা পাপের দণ্ড, দ্বিতীয়টা পুণ্যের দণ্ড।'

লীলাব মুখ বক্ৰিম হইয়া পড়িল। 'এদের উদ্দেশ্য কি ? কি চার ?'

বিনোদ। স্বাধীনতা চার। যাহারা আত্মস্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বামীকে পড়ে উৎসর্গ করিয়াছে, তাদের কৃথা সত্য। তাহার নাম উপাসনা। ভারত-বর্ষে বিশেষত্ব সেইটুকু। সেটা পাশ্চাত্য চক্ষে হয়।

লীলা। 'আপনার মত যে, ক্রী চিরকালই স্বামীর উপাসনা করিবে, আর স্বামী যাহা খুসী করিতে থাকিবে।' লীলার রাগ হইয়াছিল।

বিনোদ নতমুখে বলিল, 'উপাসনার বলে স্বামীকে দেবতুল্য করিয়া লইবে। তখন সে "যাহা খুসী" কবিবে না। তাই বোধ হয় বিদ্যাতার নিয়ম। শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্য, প্রীতি, স্নেহ ও ধর্ম্ম, ক্রীর সাধনার বলে স্বামীকে

সম্পন্নিত হয়। স্বামীর অপরাধ দেখিলে সমাজের তাহাকে দণ্ড দেওয়া উচিত।
সীতাত্তাল সমাজ পুরুষকে দণ্ড দিয়া বিশেষ কোনও অসভ্যতা প্রকাশ করিয়াছে,
‘তাহা বোধ হয় না।’

বিনোদ আবার বলিল, ‘প্রহাতে একটা গুল্মের গান শুনিতেছিলাম।
কথাগুলি মনে নাই। সখা, জগতে কি চায়? সখার অদৃষ্ট চিরকালই দয়।
কি চায় সে তা নিজেই জানে না।’

দুঃখীমণি দাঁড়ে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, ‘বিনোদ বাবু, ঐ যে গান তুমি
সকাল বেলা শুনিয়াছিলে, সে লীল-নিসির গান।’

হঠাৎ বিনোদকে ‘তুমি’ বলিয়া সম্বোধন করিতে লীলা একটু বিরক্ত হইল।

লীলা বিনোদকে কলর খনির দিকে লইয়া গেল। দুঃখীমণি গেল না।

‘আপনি এ সব পূর্বে কখনও শ্রবণ নাই?’

বিনোদ হাসিয়া বলিল, ‘না। আমার বোধ হয় ইহার মধ্যে কাব্য আছে।
শৌন্দর্য আছে। আমার বুদ্ধিতে পারি না।’

লীলা বলিল, ‘হাই আছে। এই সব ভয়রাশি সৌন্দর্যের পথে কাটার
কলা। দুঃখীমণি কাল রাতে আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন।

আপনি এক ছন্দ বিখ্যাত কবি। আপনার একটা কবিতা আমি দেখিব।’

বিনোদ। লীলা! আমি কবি নহি। দ্রুতদ্রুত। আমি বিষ্ণুকাব্যের
কোনও ভাষ্য এখমও পাই নাই। এ জন্মে পাইব কি না, জানি না। মাঝে
মাঝে সৌন্দর্যের ছটা দেখিয়া বৃত্ত হই, কিন্তু কোন পথ দিয়া তাহার আকর
গিয়াছে, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, অক্ষরায়নের ভূগর্ভে
কলার খনির গভীর স্তরে ঐতিহাসিক পাওয়া যায়। তুমি কখনও তাহার
সন্ধানে পাইয়াছ কি? এই যে বিস্তীর্ণ দেশ, কত দুঃখী দরিদ্রকে তুমি অন্ন
দিতেছ, কত অসুস্থ জাতি লইয়া কলকারখানা পাড়িয়াছ, কখনও ভাবিয়া
দেখিয়াছ কি, ইহাদের দুঃখ কখনও মিটে না কেন? ইহাদের উন্নতি কোন
দিক দিয়া হইবে? কোন্ পথে গেলে এই যৌব অক্ষরায়নের মধ্যে সেই মণির
সন্ধান পাইবে? তোমার রূপ আছে, ঐশ্বর্য আছে, প্রভুত্ব আছে। তুমি
স্বস্ত করিতে পার। তোমার করস্পর্শ বাহা হইবে, আমার শত কাব্যও তাহা
করিতে পারি না। লীলা! আমি শাহা বলিলাম, মনে রাখিও। তোমার শক্তি
সেই মণির সন্ধানে নিযুক্ত হউক। যদি কখনও তাহার সন্ধান পাও, তবে
আমি তোমার ‘ভাই’ বলিয়া রূপে দোষণ করিব।

কীল' বিনোদের বন্ধে তাহার 'অনন্দের মুখ' নিঃসৃত হইয়াছিল।
হইতে তুমি 'আমাব তাই।' আমি প্রতিজ্ঞা করিলান।

বাহির হইতে আলোক আসিয়া খনিব মুখে মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বলিত হইত।
দিনোপ অবাধ হইয়া লীলার অপূর্ণ কপের পরিবর্তন দেখিতে
মারলই হৃদয়, সকলই শোভাপূর্ণ। বসন্তের মুখ শবদের আবরণে
হৃদয় বীণাবদ্ধ। অল্প-সম্প্রদায় প্রদীপ্ত হয়, ছবির মত গাঢ়িরা উঠে, কাল
স্থিতির সেইখানে।

সংহার স্থিতি স্থান, সংহারের স্থান। বিবস্ত্রিতমানে কতক জি
আছে, তাহার অমর। তাহার মধ্যে প্রেম একটি। সেখানে
অধিকার নাই। কালোয় তাহাকে দৃষ্টি করিতে পারে না।
কুঠারের আঘাত সেখানে লিঙ্কল হইয়া যায়। বিপুল ভীষণসংগ্রামে বড়
সঙ্গে ও দাবানলে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দুই ও ক্ষীণ বনভূমি একান্ত
মধ্যে সহস্র বৎসর ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করে। তাহার মরণ নাই।

দুই দিনের মধ্যে অনেক ঝড় বহিয়া গেল। হরিনাথ বাবু জী
বাবু বিনোদকে খুব পছন্দ হইরাছে। তাঁহার বিনোদের অনন্দের
লিখিয়াছেন। কথা—লীলার সঙ্গে বিনোদের বিবাহের প্রস্তাব।
ধাবণা যে, লীলা বিনোদকে ভালবাসে। ধাবণাটা অত্যন্ত হয় নাই,
বিনোদের গানগুলি নইয়া লীলা গাইত। লীলা তাহার 'গাউন' হাওয়া
শাড়ী পরিধান করিত, এবং নিজের পরিবর্তন দেখিয়া অতিশয়
লীলা কুলদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ও তাহারে ধর্ম
জন্ম কতকগুলি প্রকাণ্ড উগায় উদ্ভাবন করিয়া বসিল। ইহা অপেক্ষা
প্রমাণ কি চাহি? এমন কি, এই সব কথা শুনিয়া ডাক্তার বর
(এডিনবরা) সন্দেহচিত্তে সীতানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠ্য
তাঁহার কি আশা কোনও আশা নাই?

সীতানাথ বাবু বিপুল ঐক্য লোভনীর হইলেও ডাক্তার বর সেটা
দৃষ্টপাত করেন নাই, সেটা তিনি লীলার বড় বিমর্ষে কলি
দিলেন। লীলার দিদি হরিনাথ বাবু জীতে পত্র লিখিয়া
তোমরা কি পাগল হইরাছ। আমাব নোদ হয়, তোমাদের
ঘটিয়াছে।' লীলা এসব কথা কিছুই জানিত না। হঠাৎ
পাইল সন্তোষ হইল। 'দীনা, তোমার হৃদয় বন্ধিয়া

সন্ধ্যার সব একাকিনী গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া লীলা-দিদিমণির অন্ধৃত পত্রে-
উত্তর দিতে বসিল।

লীলা ভাবিল, 'এ সব কথা উঠিল কেন? হৃদয়ে বুঝিবার কি আছে? আমি
বিনোদকে ভালবাসি। ভালবাসা কি? বিনোদকে দেখিলে, বিনোদের কথা
হনিলে, আমি ব্যাকুল হইয়া পড়ি। সেটা কি যৌবনের মোহ? কখনও না।
অনেক সময় অনেকে অধীর হইয়া পড়ে। জীবনে সাথী চায়।

'কিন্তু একটা কথা। আমি ত বিনোদকে জানিতাম না। হঠাৎ আমি
তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্যবৃত্ত হইলাম কেন? মনে কর, সে আমার বন্ধু।
তাই কি? বন্ধু কি? তাহার কি আমার বাধা? তাহার কি জীবনের পথে
আমার সঙ্গী হইয়া বাইবে?

'বিনোদই কি বাইবে? কখনও না। সে তাহার গন্তব্য পথ আমাকে
বলিয়া দিয়াছে। আমি তাহার কথা শুনিব। সেই পথ অন্বেষণ করিব।
নাও করিতে পারি। বিনোদ কি আমার বাধা হইবে, কখনই না। আমি
উপাসনা চাহি। উপাসনা করিতে পারিব না। সেটা নিশ্চিত।

'তবুও তাহাকে ভালবাসি কেন?'

লীলার হৃদয় জলধিতরঙ্গের হ্রাস উছলিতে লাগিল।

'ওটা ভালবাসা নয়—দ্রোহ। নিবাসা নয়—পরাজয়। বিনোদ—তাহার
উদ্ধৃত বাক্য আমাকে গবাস্ত করিয়াছে। সে কখনও আমার হইবে না।

'ওঃ! এই কথাটুকু এতক্ষণ মনে প্রড়ে নাই। আমি বুঝিতে পারিয়াছি,
বিনোদ কাম্যমরীচ। বিনোদ হুঃখীমণিকে ভালবাসে। সে যদি বলে, 'না',
তবুও আমি বিশ্বাস করিব না। কখনও বিশ্বাস করিব না।

'বিনোদ ভক্তি চাহে, উপাসনা চাহে। হুঃখের মধ্যে নগ্ন অঙ্গসন্ধান
করে। সে বকম কাব্য আমার মনে উদ্ভিত হইবে না। সে হুঃখীমণিকে
লইয়া সুখে থাকুক। আমি তাহার পথে বাধা দিব না। তাহাকে সুখী
দেখিলেই আমার সুখ।

'কিন্তু বিনোদ বলিয়াছে, সে-চিরকালই জন্মহুঃখী হইয়া থাকিবে। তাহাই
বা হইতে দিব কেন?'

হায় রে রমণী-হৃদয়েব দৌরলা। শক্তি কখনও আপনাকে চিনিতে পারে না।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া-লীলা-শিথিল, 'দিদিমণি, তোমার বয়সের সঙ্গে
সঙ্গের বাড়িতেছে। বিনোদ আমার ভাই। আমাদের হুঃখী ভ্রাতৃ

কেহ নাই। সেই জন্ত হঠাৎ মনে হইয়াছে, বিনোদ আমাদের 'ভাই'। বিনোদ সংসারের কিছু বুঝে না, কিন্তু তঁতার কথাগুলি মনে লাগিয়াছিল, তাই ভ্রাতৃ-স্নেহের একটা গ্রন্থি হৃদয়ে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আমার হৃদয়ের অজ্ঞ কোনও সংবাদ নাই। আমাদের হৃদয়ে খুব বল আছে। বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব। তুমি 'সকলকে' এ কথা বলিতে পার।'

হরিনাথ বাবুর বাড়ীতে বিনোদ বসিয়া 'জননীকে পত্র লিখিতেছিল, 'না' তুমি বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। জীলা বড়লোকের মেয়ে। তাহার বিবাহের ক্রমাগত একবার হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার বিবাহের জন্ত ব্যস্ত হইও না। আমার মনের কথা তোমার সঙ্গে দেখা হইলে বলিব।'

দুঃখীমণি সমস্ত দিন মাঠে মাঠে রোজে দৌড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে বিনোদের জন্ত জলখাবার প্রস্তুত করিয়া 'দাদামণি'র নিকট শয্যা উইয়া পড়িল।

হরিনাথ বাবু দ্বিজ্ঞানসা করিলেন, 'আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে?'

দুঃখীমণি- আজ গরু চরাইতে গিয়াছিলাম। মাঠে ঘাস নাই, তাই অনেক দূরে গিয়াছিলাম। সেখানে রোজ বড় প্রথর। অজ্ঞ দিন ছোট ছোট পাখী গাছে বসিয়া ডাকিত, আজ ডাকে নাই। অজ্ঞ দিন একটু ছায়া থাকে, আজ তাহাও ছিল না। শীত গিয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় ভাল। দাদামণি! আজ বুকে সেই রকম যাতনা!

হরিনাথ বাবু দুঃখীমণির কপাল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, খুব উত্তপ্ত।

হরিনাথ বাবুর ভয় হইল। দুঃখীমণি তাহাব মাতার ছাত্র 'হার্টে'র ব্যায়না ছিল। হরিনাথ বাবু শয্যা হইতে উঠিয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন।

দুঃখীমণি। কেন? কেন? দাদামণি?

হরিনাথ বাবু। ডাক্তারকে ডাকিয়া আনুক।

দুঃখীমণি হাসিয়া বলিল, 'কখনই না। সামান্য শীত। খুব সামান্য। তুমি বিনোদ বাবুকে জল খাইতে বল।'

হরিনাথ বাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'তবে বিনোদকে ডাকি।'

হরিনাথ বাবু বলিলেন, 'বিনোদ। দুঃখীমণির একটু জ্বর হইয়াছে বোধ হয়। কিন্তু ডাক্তার ডাকিতে বারণ করিতেছে।'

বিনোদ গভীরভাবে বলিল, 'এখন ররকার নাই। যদি সকালে জ্বর না ছাড়ে, তখন দেখা যাবে।'

ভূত সন্ধ্যা-শ্রবীপ গৃহে রাখিয়া গিয়াছে। হরিনাথ বাবু তন্দ্রাভিত্ত হইয়া পড়িলেন। বিনোদ শিয়রে একখানি চেয়ারে বসিয়া রহিল।

হুঃখীমণি বিনোদকে বলিল, 'আপনি জলখাবারটুকু খেয়ে আসুন।' সে বিনোদের দিকে তাকাইতে গেল, কিন্তু দৃষ্টি উঠিল না। অর্দ্ধপথে, অর্দ্ধনিম্নীলিত চক্ষু মধ্য দৃষ্টি রহিয়া গেল।

বিনোদ ভাবিল, 'আপনি' আবার কেন? অরে বোধ হয় হুঃখীমণির আলৌকিক রূপ সম্পূর্ণ হুটিয়া উঠিয়াছিল। বিনোদ তাহাই দেখিতে লাগিল।

বিনোদ বলিল, 'তুমি বড় ভ্রমাবধান। আর কখনও যোদ্ধে দোড়া দোড়ি করিও না।'

হুঃখীমণি। না।

বিনোদ ধীরে ধীরে হুঃখীমণির কেশপাশ উন্মুক্ত করিতেছিল। হুঃখীমণি বলিল, 'না।'

তাহা শুনিয়া বিনোদ সনত কেশগুলি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিল। হুঃখীমণি তাহাতে বাধা দিল না। বিনোদ কপাল স্পর্শ করিয়া বলিল, 'তোমার বেশ অর হয়েছে।'

হুঃখীমণি। না।

বিনোদ। তবে আমার সঙ্গে বল কর।

হুঃখীমণি। না।

বিনোদ। তবে আমি তোমাকে ঘন পাড়াইয়া দিই। ইহা বলিয়া বিনোদ নিস্কিবাধে হুঃখীমণির হস্তকের এক ভাগ বান হস্তে বাখিয়া, দক্ষিণ করমুখযোগে তাহার জ্রুগল স্পর্শ করিল। সেই স্পর্শে লজ্জাবতী লতা বহু হুঃখীমণির নয়ন মুদ্রিত হইল। ক্ষণকাল পরে পত্রবয় কোমল অঙ্গুলী দ্বারা আনরণ করিয়া বিনোদ বলিল, 'এইবার একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর।'

বিনোদ ভাবিতেছিল, 'এই চিত্তহুঃখীমণির বদ্ব করিবার কেহ নাই।' আনরা বনের ফুল আনিয়া উদ্যানে বদ্ব করিয়া রাখি, সে স্নেহটুকুও ইহার উপর সিদ্ধি হয় না। অথচ হুঃখীমণি সন্তানের সেবা করিয়া বেড়ায়।'

বাতায়ন দিয়া সহস্র নক্ষত্রালোক গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। বিনোদ কোণাশের দিকে তাকাইয়া মনে মনে বলিল, 'দয়াময়! তোমাকেই যখন আমরা উপেক্ষা করিয়া তেলিয়া ফেলিয়া দিই, তখন তোমার সম্মান-কোন ছার? তোমাকেই যখন বিশ্বাস করি ন, তখন-প্রেমের-হান কোথায়? তবুও

তোমার কত করুণা! 'এইগুলিকে' জগতে পাঠাইয়া মানবের উচ্চাসন দেখাইয়া দাও।'

কোনগুলি? বিনোদের অশ্রু গিয়া দুঃখীমণির নয়নকোণে পড়িল।
উভয়ের অশ্রুধারা সেই পুণ্য নিশীথে মিশিল।

দুঃখীমণি চুপি চুপি শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। - বিনোদের জলধাবাব ও
অন্নব্যঞ্জন পার্শ্বের গৃহে সাজাইয়া রাখিয়াছে। - রাত্রি তখন প্রায় দশটা। -

হরিনাথ বাবু প্রগাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। তাই ত উপায়? কি করিয়া জাগাইব
একবার নিদ্রিত মুখখানি অনিমেঘনয়নে দেখিয়া-সইল। - 'তাহাতে দোষ
কি? - বিনোদ জীলাদিদিকে ভালবাসে? তাহাতে কি আসে যায়?'

বিনোদ স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নভরে বলিল, 'না, না, তোমার ভুল
হয়েছে।' বিনোদ জাগিয়া উঠিল। - বিনোদ গৃহের চকুপাশ্বে চাহিয়া জিজ্ঞাসা
করিল, 'আমি স্বপ্ন দেখছি নাকি?'

দুঃখীমণি খুব হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয়।'

বিনোদ। আমি কি বলছিলাম?

দুঃখীমণি। 'আমার ভুল হয়েছে।'

বিনোদ। ঠিক তাই! আমার সম্বন্ধে তুমি যত কথা ভাব সবই ভুল, সে
ভুলটুকু কেন হয়? আমি বুঝাইয়া দিই। প্রথমতঃ, তুমি আমাকে তরুণ
উচ্চাসনে বসাইয়াছ, এক জন করি বলিয়া স্থির করিয়াছ। আমি সে আসনের
অধিকারী নহি। দ্বিতীয়তঃ, সেই উচ্চাসনে আর এক জনের পার্শ্বে বসাইয়া
কল্পনায় একটা জগতের সৃষ্টি করিয়াছ। তৃতীয়তঃ, নিজেই এই কল্পনা-জগত
পাতিয়া নিজের দুঃখ, এবং আমার দুঃখ টানিয়া আনিয়াছ।

দুঃখীমণি। তোমার দুঃখ?

বিনোদ। নিবপরাণীর দুঃখ। কার্যময়ী! তোমার মনে বন্ধন যাহা উদ্ভূত
হয়, আমি জাগতে ও স্বপ্নে-দেখি। আমি সকল ভাব বিসর্জন দিয়া, আমার
হৃদয় তোমাকে পাতিয়া দিয়াছি। তুমি কল্পনায় দুঃখ গড়িলেও আমি মনে
দুঃখ পাই। আমি জানি, তোমার জীবন দুঃখময়, এবং তোমার স্বভাবই দুঃখের
ছবি সৃষ্টি করা। যে দেশ তোমার, তাহাও চিরদুঃখী। - কিন্তু আমি সে দুঃখ
সহিব, কেন না, এই সহ্যটুকুই আনন্দ ও ধর্ম।

কার্যময়ী প্রশান্ত প্রেমময় দৃষ্টিতে বিনোদের দিকে চাহিল। মানবজীবনে
সে দৃষ্টি দর্শন।

'বিনোদ, এখন আমার সন্দেহ গিয়াছে, লজ্জাও গিয়াছে।' আমার বোধ
হয়, হই জন জগতে একত্র সুখী হইতে পারে না। আমার দুঃখ সহিলে তুমি
সুখী হও, তোমার দুঃখভাব সহিলে আমি সুখী হই। - তবে আমাদের উভয়কেই
চিরদুঃখী হইতে হইবে। আমার কল্পনায় কি দোষ পাইলে বিনোদ?'

বিনোদ কাব্যময়ীর হাত ধরিয়া বলিল, ‘চল, আমি আহারের কথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।’

গৃহান্তরে গিয়া বিনোদ আননে বসিল। কাব্যময়ী পার্শ্বে উপবেশন করিল। বিনোদ গোটা হই সন্দেশ মুখে দিরা বলিল, ‘আশ্চর্যের কথা—এই, এক জন যদি আর এক জনের চঃখভার বহে, তবে উভয়কেই ভগবান স্মৃখী করেন। তুমি যদি আমার দীনগৃহে লক্ষ্মী হইয়া এস, তবে সেটুকু চেষ্টা করিয়া দেখিব।’ কাব্যময়ী সরমে অবগুষ্ঠন দিয়া চলিয়া গেল।

১১

দশরীষ দিন দিব্যভাগে একটি পথিক ‘রা’চি একমুপ্রেনে’ বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ ধরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাভর্জন করিতেছিল। পথিক নিদ্রিত। হঠাৎ মেদিনীপুর ষ্টেশনে এক জন লোক প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়ের নামই কি বিনোদ বাবু?’

বিনোদ। ‘কেন?’

আগন্তুক। ‘আপনাকে এক জন ভদ্রলোক এই পত্রখানি দিতে বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পত্রটি সম্যাসী বলিয়া বোধ হয়।’

পত্র গ্রহণ কবিবান্নাজ রেল ছাড়িয়া দিল। বিনোদ আলোকের সাহায্যে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল—‘বিনোদ বাবু—বোধ হয় মনে পড়িতে পারে—আমি সেই দ্বীকেশ। আপনার পকেট হইতে যে চশ্মিটি টাকা অগ্রহরণ করিয়াছিলাম, তাহার ফলে, আপনি কাব্যময়ীর সন্ধান পাইয়াছেন। ফলাফলস্বরূপ ভার ভগবানের হস্তে। আপাতঃ এই পত্রের মধ্যে ঠিক টাকার নোট পাইবেন। পাঁচ টাকা স্বেচ্ছকপে গ্রহণ করিবেন আর একটা কথা, কাব্যময়ীর সঙ্গে আপনার অচিরে বিবাহ হইবে।—আম্মার ভাগ্যে তাহা দর্শন করা ঘটবে না সন্দেহ। কারণ, আমি সম্যাসাত্রম গ্রহণ করিয়াছি। যদি আপনার কাব্যময়ী ব্রতের ভরিয়াতে কোনও আভাস পাই, তবে বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত দেখা হইতে পারে। শেষ কথা—আপনাকে যে আমার বাল্যবন্ধু শ্রীশের কথা বলিয়াছিলাম, কাব্যময়ী সেই শ্রীশের কন্যা। যদি পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে, সেই পুতাতন গল্প মনে কবিয়া তাহার স্তম্ভ একবিন্দু অশ্রুবিন্দুজন করিবেন।

অশ্রু বিজয়ার দিন—ধর্মজগৎ ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে, আজ আরও একপদ গতিবিস্তারে অগ্রসর হইছেন।—কল্যাণকামনার আমি আশীর্বাদ করিতেছি। ব্রাহ্মী জিবিয়া, অননীর চরণে প্রণাম করিয়া সব কথা বলিবেন। বোধ হয় মনে থাকিবে—ভঃখের পথেই ধর্ম—অশ্রাব মধ্যে পবিত্রতা ও ধর্ম নিহিত। ধর্মের মধ্যে শক্তি—চিরসুখের হৃদকেশ।’

ব্রহ্মজনাথ মজুমদার।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। কবিতা।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কাবির' তাঁহার অস্বিকৃত 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র বিষয়-বৈজ্ঞান্যতা। আবার পরিত্যক্ত চিত্র-রীতির পুনরাবর্তন।—অবনীন্দ্রনাথ ঘের পাকা ঘুঁটা কঁচিহারা খেলাটা মাটী করিতেছেন।—কেমন করিয়া বলিব—কেমন সেই চিত্রখানি। কোন ভাব্যর বর্ণিব সেই তিন রূপসীর তিন রূপ। কেমন কবিতা বখাইব তাহারের তেঁত খেলামো-দেহবস্ত্রের সেই আঁকা-বাকা ভাব, পাঁচটি-বিনিমিড-হাতের সেই ত্রিভঙ্গিম লক্ষী, শুকনো, পাকানো, লতানে আঁকুলের সেই উৎকণ্ঠ, বিক্ষেপ, প্রক্ষেপ। কোন ছন্দে বাণবিশ্ব এই তিন হৃদয়ীর সৌন্দর্য।—অবনীন্দ্রনাথ-সেকালের মোহাই মিয়া ছবিখানি আঁকিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার 'মডেল'—আদর্শ তত পুরাতন নহে। বাঙ্গালীর হুঁতুগাফনে এখনও কলিকাতায় রাজপথে বিবাহের শোভাযাত্রায়, ময়ূরপঙ্খীর উপর নিলক্ষ্য নাচের মে-অঙ্কন caricature—ললিত লাক্ষের যে অপকর্ষন-মেখিয়া মরমে মরিয়া যাইতে হয়, হৃৎকণ্ঠ, নাদমুখ হৃদয়ীর অপকর্ষণে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র রাকেল-সেই রূপকা, নিলক্ষ্য-ভঙ্গীর আয়োজ করিয়াছেন। শ্রীমতী-প্রিয়দর্শা দেবীর 'এবারের-আগমনী'র প্রথম নোটটি দামুদী প্রবর্তিত বর্ণনা—পুরাতনের চলনসই প্রতিক্রিয়া। তাহার পর টানিয়া বোনা। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দত্তী আধ-আধ আড়ল ভাব্যর 'নারীশিক্ষা'র সুরধন ও নারীজাতির শিক্ষাশিক্ষার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মৃতন কথা নাই বটে, কিন্তু ভাব্যর নূতন সৃষ্টি আছে।—তাই এখানে কাটা-নিম্নই প্রবানভাবে অর্থকরী। 'কাটা' শিল্প—অর্থব্য, দরজীর কাজ। 'প্রবান' উল্লেখ প্রাধান্ত নিশ্চয়ই শিরোধার্য। তার পর 'শিল্প' * * * 'অর্থকরী'। প্রায়শ্চর্য ভাব্যর সৃষ্টি শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইন্দু' উল্লেখযোগ্য, উপভোগ্য। অপভাষার কালো মেঘেও উভয় ফলনার 'ইন্দু' মলিন হয় নাই। 'ইন্দু' যে ভাবুক-চিত্রকরের সৃষ্টি, তাহা কথার আঁকা ছোট ছোট চিত্রে, কবিত্বের মুহূর্তে, সৌন্দর্যের চকিত বিকাশে সুস্পষ্ট-সুস্বভব ফলাফল। 'ভারতীয় কুস্ত্র শ্রীযামিনীকান্ত দোম' যে বিবেশের 'নীলপাখী' ছাড়াইয়া বিলাছেন, তাহা এতদূর উড়িতেছে। শ্রীকালিদাস রায় টেনিসনের 'Turner' হইতে যে 'সৌভাগ্য'র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যদি টেনিসনের-দৃষ্টিগোচর বা কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাও গোবে-নড়িয়া উঠিবেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন অগচর জাহির করিতে কবি কালিদাসের লক্ষ্য হয় নাই।—আজ কাল ইহার 'কবিতা' রেখিয়া মনে হয়, 'একাত্তর পাঁচজন' জিতুবনবিজয়ী ভব' কবিত্বের কবিত্বীবনের 'হৃদয়' হইয়াছে। শ্রীমোহিতরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইন্দ্রের ও ভারতবাসীর মধ্যে সামাজিক সম্বন্ধ' উল্লেখযোগ্য।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদ্যায়ের এক বর্ণিত আবার বৃষ্টিতে পারিলো না। কিন্তু 'মানে' না হউক, মজা হয় যথা,—'ইন্দ্রধনু পরিবে সে ধরপীর ফাঁস ?' কখনই নহে। 'ইন্দ্রধনু' দূরে থাক, তাহার দ্বিধাও কখনও এমন দুঃস্বপ্ন করিবে না, সে বিষয়ে আশ্রয় নিঃসন্দেহ। যে চালা 'সোনার-বাটীর' সন্ধানে 'ইন্দ্রধনু' লক্ষ্য কবিতা-তপস্বীর মাঠে-ছুটিয়াছিল, সেও 'ইন্দ্রধনু'র এমন অপকর্ষন ঘটাই নাই

স্বতঃস্বেচ্ছা, উট-এসবিনী বতীন্দ্র-প্রতিভা-ভিত্তি হইবার কোনও কারণ নাই। "কররক্তমাগ"।

—সোনার উপর গিঁটী। 'কণিক চিত্তের দীপ্তি খেদাল-বনিত।' 'নূতন কিছু বসন্তের' ভয়-
ভয়কাব। কবির মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই যথাস্থ, অগতঃ বড়িয়া, নতুবা এমন উপায়ে 'খেয়ালের
খনি' সম্ভব হইত না। উপসংহারে একারে 'কাব্য'র চূড়ান্ত।—

‘সবু শেষ-আশা প্রিয়, যদি কোন দিন

উঠে সে পালের মত মরমের তলে,

চিত্তে মেঘ করে আসে মেহার্ভ নবীন

জানিও একটি চিত্ত ছায়া-অস্তবালে

আগ্নি লাভণের মত—পূর্ণ কূলে-কূলে

রবে চির-নির্নিমেঘ ঐ মুখ চাহি’—

সমস্ত আকাশ ভরি—পূর্ণা দৃষ্টিভঙ্গ

এই স্নেহস্থিতি দাব—অন্ত দাব নাহি।’

—সোনার চরণের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে কবিও নিশ্চয়ই বলিবেন,—‘কোন ০ ২ লিখা রে?’

‘মেহার্ভ নবীন’ কে? এ প্রশ্ন বঙ্গাবের আপাতী সাত বৎসরের সমস্ত বরষাজীকে অনায়াসে

হারাইয়া দিতে পারিবে। তার পর, ‘পূর্ণ কূলে—কূলে, সমস্ত আকাশ ভরি—’। বতীন্দ্রনাথের

আকাশের কূল পাইয়াছেন! কে বা কি ‘পূর্ণ কূলে কূলে’, তাহা অবগত বতীন্দ্র-কূট। তার

পর, ‘পূর্ণা দৃষ্টিভঙ্গ সমস্ত আকাশ ভরি’। সে! ইহাতেও নিস্তার নাই। কোনও উৎ

স্বতঃস্বেচ্ছা, ‘সবু শেষ-আশা’, ‘চিত্তে সে পালের মত মরমের তলে।’ ইংরেজী ভাষায়

ইহাকেই বোধ হয় climax বলে। পালের কবিতাই বটে। আশ্চর্য্য এই যে, ইহাও ছাপা

হইয়াছে। ‘ভাও-চাপালি পণ্য হে নো’ বটে, কিন্তু ইহার দাম যে একটা কাগা বড়ো নয়।

শ্রীশ্রীশ্রী: দেবীর ‘এরণ’ গদ্য-প্রহেলিকা। ইহাতে ‘বেদনাহত’ আছে, ‘মুজুরী’ আছে,

‘বৈদ্যনাথ’ আছে, ‘কেবল নিম্নে না’। তাহা হইলেই ‘সময়োচিত’ হইত। শ্রীনিলাল

সঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সুতগত ব্যাপার’ ভুক্তিতে গর। ভুতের ব্যাপার যেমন হয়। ‘বাদশাহ আক-

বদর নিরাকরতা’ শ্রীশ্রীশ্রীনাথ সমাধারের রচনা। আদ্যবরের স্বাক্ষর এ পর্য্যন্ত পাওয়া

যায় নাই। লেখক বলেন,—‘মধ্যস্থ প্রমাণের সহিত ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে

যে, আদ্যবর নিরাকর হইলেন।’ কিন্তু ‘মধ্যস্থ-প্রমাণের সহিত ইহা হইতে’ কি ভাষা?

‘ইহা হইতে’ ভাষার প্রতিপাদ্য ত অসুখান কুৎ করিয়া লইতে হয়। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

‘অন্ধকার’ সৃষ্টিপত্রের তুমুল অন্তরালে ‘গদ্য’ হইতে বাধ্য। যেনন যাগানবস্ত্র, তেমনই ভাষা,

সেমনই ভাষা। এ বদে, শানাকে দেব, ও বলে আমাকে দেব। বাঙ্গালা ভাষায় একটা

অনুত-প্রয়োগ ক্রমে উদ্ভিগা আসিয়া ভূতিগা বসিতেছে। ‘একটি চাপা নিবাস উঠিল—সে যেন

চুপ-চুপে অকুট হাঙ্গারায়’ নর্দনায় ‘সে’ এখন ‘তাছায়’ স্থান অধিকার করিতেছে।

‘চুপে-চুপে অকুট’ অবশ্য লেখকের বদ প্যাটেন্ট। শ্রীকৃষ্ণাধিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শেষ-

গৌলি’ ধূলিজালে অন্ধকার—আলো। লেশমাত্র নাই। আমরা জানিতাম, ভাব প্রকাশ

করিবার জন্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এখনকার স্টেড-কবিতা ভাব চাকিবার জন্ত

তাহার ব্যবহার-করিতেছেন। বিবর্ত বাঙ্গালীতে অন্তর্ভুক্ত করা না দিলে এই শ্রেণীর

রচনা চিরকালই abracadabra হইয়া থাকিবে। ‘বঙ্গলো’ ও ‘চন্দকে’ মিল. হয় হুটে,

কিন্তু তাহা ‘যার সঙ্গে যার’ মতে মন কিবা হাড়ী কিবা জোন-বৎ অর্থ। ‘শুকিরে

গোছে, তবণ কলি আমার মনন-চন্দকে’ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক বটে, কিন্তু মনের মধ্যে

চন্দ্রক-বৃক্ষের উপমা কষ্ট-কল্পনার আটাশে ছেলে। ইহা যদি চলে, তাহা হইলে 'জড়িয়ে গেছে রশ্মি ও পালে আমার মানস-মাস্তুলে'ও কবিতা হইতে পারে। 'মৃত্যু দেখে কান্ডানী চুবন'—চুবনের অনেক রকম-ফেরে বাঙ্গালা 'কাব্য'তে দেখা গিয়াছে, কিজ 'কান্ডানী' চুবন সম্পূর্ণ নুতন। কুঞ্জের কি চিং হইয়া শুইবার সাধ হয় না? মৃত্যুরও চুবনের সাধ হইতে পারে। কিন্তু তাহার চুবনের নাম 'কান্ডানী' হইল কেন? কান্ডান মাসেই কি মৃত্যুর 'চুবন পায়'? অথবা কল্পনা-নিধান-কবিতা-বাহিত মৃত্যুর চুবন কুজীর ছায়ায়? মৃত্যুর চুবনে গাভীরের টুকরারের মত শব্দ হয় বলিয়াই কি তাহার এই অভিধান?—এ সমস্তাৎকে পূর্ণ করিবে? 'ছায়া-পথ'টি কবির কল্পনার 'বীণে' পরিণত হইয়াছে। ইহা খুব উচ্চ সাধার কল্পনা। সমগ্রই ত মানব-বুদ্ধির অগম্য। 'চুকুরো'—অলঙ্কারও এইরূপ অস্পৃষ্ট। অনিন্দ্য-পাখীকেও চেনা যায় কিন্তু কল্পনানিধানের কবিতার 'অ-পার' পায় হওয়া যায়। বগল-সম্পাদকেব বালাই লইয়া মরি। নহিলে এমন 'শেষ-গোবুলি' বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটত না। শ্রীধর্মেশ্বর আতর্ষা 'মল্লারের স্বরে' আস্তন লইয়া খেলা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'যেবে ধরিবার আগে কেউতে ধরিবার' চেষ্টা বুদ্ধির কাজ নহে। বাঙ্গালা দেশের মানসিকপক্ষে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাস যে রচির উত্তরসাধক, বাঙ্গালী পাঠক তাহা চাহিতেছে। তাই তত্ত্বান্ত-পুরচাঁচী মানসিকে আজকাল অবাধে এই প্রশ্নের গল্পে আমদানী হইতেছে। Realism যথ্য হউক।—
 'আর্ট' গোকুলে বাড়ুক। 'লক্ষ্মী'র মাহাত্ম্য কুটিল-ভুক্ত।—কীট হাতের এইরূপ স্রষ্টা ইহা মাহাত্ম্য বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়া গিতেছেন, তাঁহাদের মনোবাহ্য পূর্ণ হউক। কিন্তু ইহারাই হেঁকে-মেয়ে লইয়া ঘর-করেন, তাঁহারা সাবধান হউন। শ্রীবিজ্ঞাননাথ বাগচীর 'ঈশ্বতে ও রাস' 'ভাবসী'র কবিতার standardএর মান রাখিয়াছে। 'ইহা বলিলেই সকল বলা হইল'। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'আর্টে অধিকারী-ভেদে' বুঝা বাইতেছে, 'অনধিকারচর্চাও' 'আর্টের' অন্তর্গত।—'অধিকারী-ভেদে' অশিক্ষিতপটু, অনধিকারী শেখক দীর্ঘ-ইকার নিদ্রাছেন। যদি সংস্কৃত লেখ, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধি-কর, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুসারে বানান করিও। নয় ত 'সুবজ-পত্র' খাও।—লেখক বর্জেন,—'অনুশাসন না করিলে' শিল্পবোধ অসম্ভব।' বটে? রামমোহন রায় এক দিন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুল কিরাইতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গী বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবস্ত্র হইয়া বলিয়াছিল,—'রায়-মহাশয়। "শেষের সে দিন মন করু রে-অরণ" কি কেবল পরের-অন্তই হইরাছিল?' লেখককেও তেমনই সিজ্ঞাসা করা যায়—এ উপদেশটাও কি কেবল পরের-অন্ত? তুমি কবে শিল্পের অনুশীলন করিলে? পুঁথি খুলিয়া তজ্জনাৎ কোন-আর্ট-শিল্পে 'অনুশীলন' বলে? রবীন্দ্রনাথের 'পানে' তাঁহার একালের ভাবের সেকালের স্বর বাজিতেছে—
 শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হতাশের-ধ্বং' চমৎকার। মিনি ইহার লক্ষ্য, তাঁহার পক্ষেও ইহা উপভোগ্য। ইহাতে মনিঃ-শেষ আছে; দীনবন্ধু যাহাকে 'নৌমাছি-খোঁচা' বলিতেন, তাহা নাই। গগন বাবুর হাত আসিয়াছে; মাথা বুলিতেছে।—আমরা উচ্চল বর্তমানে উচ্চলতম ভবিষ্যতের আশ্বাস দেখিতেছি। শ্রীজিতুমা চক্রবর্তী 'মাসকাবারে' এবার বৈরাগ্য-রসজ্ঞতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া অনেকেই তৃপ্তিত হইবেন।—

‘‘শায়র’’ একাশিত ‘‘বানী’’ দাবক সরটি তাহার ‘‘ভাল লাগিয়াছে।’’ তাহি তিনি ‘‘গল্পটি’’ অধিগা তব্রুত-ভিকার করিয়া ‘‘ভাবলী’’র পাঠকপাঠিকাবিশ্বকে বাঁটরা দিয়াছেন। ‘‘একটি’’ ‘‘তথ’’ এই যে, কুলজনা ‘‘শক্তিমান’’ কুলজানিনী হইতে পারে।—আর, গল্পের লাবিকা সোমামিনী নরেনের সঙ্গে তার জীবন কাটাইবার মতিপ্রায়ে ঘব ছাড়ে নাই।’’ কুলজনার স্বয়ং-ছাড়ার কৈফিয়ত দেখিতে হইল। সোমামিনী এখন নরেনের সঙ্গে ‘‘বাহির’’ হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার ‘‘অভিপ্রায়’’ কিরূপ ছিল? গল্পের ইচ্ছজালে সে এক মুহুর্তে স্বামীর অমুরাঙ্গিণী হইতে পারে, কিন্তু সেই কুল-ভাণের মুহুর্তটি? অজিত বাবুর হিন্দু রা ত্রাক না থাকিয়া ‘‘সহজিয়া’’ হইল না। ‘‘ধূবি’’ হইল ‘‘পাই,’’ ‘‘নারায়ণ’’ে নলিনী পণ্ডিতকে পাঠাইয়া দিতে পারি। শিক্কার ‘‘ধিক্,’’ বিদ্যায় ‘‘ধিক্,’’ দার্শনিকতায় ‘‘ধিক্।’’ ‘‘সংযম’’ কি সাহিত্যে নামধেয় হইল?’’

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান।—ঐ প্রকাশক, দত্ত সম্পাদিত। ৩৩৬৭ নং কলেজ স্ট্রিট, নিউ বেঙ্গল প্রেস হইতে প্রকাশিত।

এই অভিধানখানি অক্ষয়চন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রথমে সংকলিত হইয়াছিল। ‘‘সম্প্রতি’’ ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে লক্ষপ্রতিষ্ঠ প্রীযুক্ত প্রকাশক দত্ত এই সংস্করণের সম্পাদক। অভিধানখানি এবার পূর্বাঙ্গের বর্ধিত, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্বে সংস্করণে ইহাতে যে সকল ভ্রম বা ত্রুটি ছিল, সম্পাদক সে সকলের বর্জ্য করিয়া সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিয়া, স্বীয় অভিজ্ঞতা ও অমূল্যস্বত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ছোট বড় নির্দিষ্টকালে অনেক গ্রন্থকারের চরিত সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের দ্বারা প্রস্তুত ও বাঙ্গালার Dictionary of National Biographyর সমূহ পুস্তকের তুলনা করিয়া দিয়াছেন।

এই অভিধানখানি কেবল শব্দকোষ নহে। ইহা একাধারে শব্দকোষ, চরিতকোষ, সাহিত্যপঞ্জিকা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত প্রবাদেব সংগ্রহ। সংক্ষেপে বাঙ্গালা বিশ্বকোষ। একাধারে এত-অন্যতরিত অল্প কোনও গ্রন্থে দেওয়া যায়, এমন ত মনে হয় না। তদ্ব্যতীত ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, এর-পরিচয়, প্রসিদ্ধ উপদ্রাস ও নাটকসমূহের চরিত্রবিশেষণ, বৈষ্ণব কবিত্বের ব্যবহৃত শব্দকোষ-সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রবাদেব সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা, বঙ্গদেশের শাসন-কর্তৃদণ্ডের, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের, এবং লর্ড বিশপদের জীবনচরিত ও অজ্ঞাতপূর্ব অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের ও বিবিধ জাতীয় গ্রন্থের সমাবেশে অভিধানখানি উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি, মিত্রের সরল বাঙ্গালা ‘‘অভিধান’’ শিক্তিসমাজে সমাদর লাভ করিবে। ভিসম্বর মাসে ইহার দ্বিতীয় বৎ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। বর্তমানে কাপড়-পাত্রের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সে হিসাবে, চানডায় ও কাপড়ে বাধা, দুই বৎসর সম্পূর্ণ গ্রন্থের সংস্করণের সাড়ে ছয় টাকা মূল্য যে প্রত্যন্ত-স্বল্পত, তাহা নহাই বাহা।

লক্ষ্মীছাড়া।

লক্ষ্মীছাড়া লোক অনেক থাকে বটে, কিন্তু ছিষ্টে সরকারের মত লক্ষ্মীছাড়া আর হ'লি ছিল না। জন্মবার মাস কতক পরেই সে মাকে খাইল; তিন বৎসর বয়সে বাপও মারা গেল। বিধবা পিসী মাতৃশিক্ষণী ব্রাহ্মপুত্রকে মাহিলা করিতে লাগিল; কিন্তু ছিষ্টের অদৃষ্টদেবতার ইহাও সহ হইল না। কালের ডাকে পিসীও অনাথ, ব্রাহ্মপুত্রকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তখন ছিষ্টেব বয়স সাত বৎসর মাত্র। উপরের এক জন ছাড়া তাহাকে দেখিবার আর কেহ নহিল না।

ছিষ্টের জেঠা ছিল, জেঠী ছিল। কিন্তু জেঠী নিজের সংসার ছেলেপিলে লইয়াই অস্থির। আর জেঠা গোবিন্দ সরকার লোকের মামলা মোকদ্দমার তত্ত্ব এবং হরিনামের মালা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং ছিষ্টেকে দেখিবার অবসর তাহাদের ছিল না। ছিষ্টে বামুনপাড়ার গরু চরাইয়া, বামুনদের পাত্রেব ভাত খাইয়া মাহিলা হইতে লাগিল।

ছিষ্টেব বাপের লাথরাঙ্গে জন্মের দশ বারো বিবাহ জমী ছিল, খিড়কী পুরুষের একেই অংশ ছিল। গোবিন্দ সরকার শুধু দামে পড়িয়াই ব্রাহ্মপুত্রের জমী জন্মবার দেখা ধোঁয়া করিতে লাগিলেন। আর ছিষ্টেকে দেখিতে লাগিল, উপরওয়াল।

এই অদৃষ্ট উপরওয়ালার অবাচিত করুণার বলে ছিষ্টে তখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িল, তখন জেঠা এক দিন তাহাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “হাঁবে ছিষ্টে, আমার ভাইপো হ'য়ে তুই লোকের গরু চরিয়ে বেড়াবি, এটা কি ভাব রাখার? তুই আমার যবে থাক।”

ছিষ্টেব তখন বামুনদের পাত্তা ও পাতের ভাতে অকচি জন্মিয়া গিয়াছিল; সুতরাং জেঠার কথায় সে হাতে চাঁদ পাইল। জেঠার আশ্রয়ে থাকিতেই স্বীকৃত হইল।

জেঠার পরে থাকিয়া ছিষ্টে গরম ভাতের খুঁচ দেখিতে পাইল বটে, কিন্তু তাহাও পরিবর্তে সারাদিন মাঠে যে খাটুনি খাটিতে হইত, তাহাতে সে

ভাত ও গরম ভাতের মধ্যে কোনটা তাহার পক্ষে অধিক সুখকর, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না। জেঠাব তিন চারিটা গরু ছিল। ছিষ্টে আসিবার পবই রাখানটা সেই যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। জেঠা বলিলেন, “ওবে ছিষ্টে, ‘গো-সেবা পরম ধর্ম’। বারো বৎসর গোয়াল পবিকাৰ কবলে হাতে পদ্মগন্ধ হয়।” ধার্মিক জেঠার আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিষ্টেকে—এই পরম ধর্মের অমুষ্ঠান করিতে হইল।

হোট ছেলেরা তাহাব এমনই নেওটা হইবা পড়িয়াছিল যে, ছিষ্টেব কোল ছাড়া—সে এক মুহূর্ত ধাক্কিতে পারিত না। একবার মাটিতে বসাইয়া দিঙে চীৎকারে পাড়া মাখায় কবিত। রোদনান্তে তাহার নাসানিস্ত জলধারা পবিকাৰ করিতে ছিষ্টের কাপড়ের খুঁট ভিজিয়া গাইত।

এইরূপ ব্যতিন্যস্ত হইয়া ছিষ্টে এক দিন জেঠা মহাশয়ের নিকট গরম ভাত ও পান্তা ভাতের পার্থক্য বুঝিয়া লইতে গেলে, জেঠা শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, “ওরে হতভাগা, সে নে পরের ভাত, লোকে বলতো—অমুকের চাকর।

আব এটা নিজেব ভাত, তুই কি আমার অপব পব ? আপনার ভাইপো যে।”

ছিষ্টেও বুঝিল, তথ্যটা মিথ্যা নয়। বাপ আর জেঠার কি প্রভেদ আছে? স্ততবাং সে দিন রাত খাটিয়া দুই বেলা দুই মুঠা ববের ভাত খাইতে লাগিল। আর জেঠা গামলায় এবং হরিনামে অধিকতব মনোযোগ দিবার অবকাশ পাইয়া হরিকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

মান কতক পবে গোবিন্দ সরকার এক দিন ভ্রাতৃশূব্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাপ ছিষ্টধর, তোমাব জয়া-জয়গাওলো পাঁচ ভুতে লুটে থাকে, তার চেয়ে ওগুলো বেচে ফেল। ওর একটা বিলি বন্দেজ হোক।”

ছিষ্টে জেঠাব পরামর্শে সম্মতিদান করিল। বিপিন চক্রবর্তী তাহাকে বলিলেন, “মুন্-বেটা চান্দ, জমী বেচবি কি ছুৎকে?”

ছিষ্টে বলিল, “জেঠ বলেছে, ওগুলোর বিলি বন্দেজ হবে।”

চক্রবর্তী বলিলেন, “তোব সাত পুত্রের মাথা হবে। আমাকে কবলুতী করে দে। বছর বছর খাজনা পাৰি, জমী তোবই থাকবে।”

ছিষ্টে গিয়া জেঠাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। জেঠা মালা জপিতেছিলেন। জপ বন্ধ রাখিয়া তিনি বলিলেন, “লোকের কথাই কাণ দিস নে বাবা, লোকে কি কানও ভাল দেখতে পাবে? আমি আপনার লোক, আমি তোব যন্দ কববো, আর পরে হান করবে? বলে—মার চেয়ে দরদী যে, তারে বলি জান।”

সে দিন রাত্রিতে আহারকালে জেঠা আপনার পাতেব মাছের মুড়াটা ভাইপোর পাতে তুলিয়া দিলেন। গৃহিণী প্রতিবাদের স্বর তুলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্বে জেঠা মেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, “আহা, থাক! ও-কি আমার পর? ও খেলেই আমার খাওয়া হ’লো।”

মাছেব মুড়াটা যত মিষ্ট না হউক, জেঠাব এই কথাগুলো ছিষ্টের এত মিষ্ট লাগিল যে, তাহাব চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল।

পব দিন সকালেই গোবিন্দ সরকার ভাইপোকে লইয়া রামপুরের রেজেন্সী আফিসে গেলেন। ছিষ্টে জেঠাব শিক্ষারত ষাওয়া-পরাব জন্ম জমী বন্দ করিতেছে, ইহা রেজিস্ট্রারের সম্মুখে স্বীকার করিয়া টিপসই দিয়া হুদীভাঙ্গা বেচিয়া আসিল। আসিবাব সময় জেঠা তাহাকে নাড়ে সাত আনা দিয়া একটা গেল্পী কিনিয়া দিলেন।

গ্রামের লোকে বলিল, ছোঁড়াটা কি লক্ষীছাড়া!

“দিদি! ও দিদি!”

দিদি মুখ ঝামটা দিয়া উত্তর কবিল, “কেন?”

ক্রুদ্ধভাবে ছিষ্টে বলিল, “কেন আমার কি? আমি এলাম ভোর হপুর খেটে, আর উনি ঘবে-গুয়ে গুয়ে বলছেন কেন? বাঃ বে!”

কথাটা হইতেছিল, গোবিন্দ সরকারের বিধবা কত্তা বিধুমুখীর সঙ্গে; বিধবা হইয়া সে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

ছিষ্টে একটু অপেক্ষা করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, “তবু যে উত্তে রইলে?”

বিধু বলিল, “উঠে কি কববো?”

ছিষ্টে বলিল, “ভাত দেবে, আর করবে কি?”

বিধু মুখটা বাগিশে গুজিয়া বলিল, “ভাত নাই।”

বিস্মিতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিয়া উঠিল, “ভাত নাই!”

বিধু বলিল, “না। বাবা-বাড়াব-পর আমার বাড়ীর এক জন সোক এসেছিল। সে তোব ভাত খেয়ে গেছে।”

ছিষ্টে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দিদিব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর উগ্রকণ্ঠে বলিল, “বাঃ রে, ভাত খেয়ে গেছে, তা আমি খাব কি?”

বিধু ধড়নড় কব্বিয়া উঠিয়া বলিল; তীব্রভাবে বলিল, “আমার মাথা খেতে পাববি?”

বিধু গলাটা যেন ভারী হইয়া আসিল। দীর্ঘ হাসিয়া ছিটে বলিল,

“যে রকম পেটের জ্বালা ধরেছে, খেতে থাকলে তা খুব পারতাম দিদি।”

বিধু মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ মুছিল। ছিটে সহান্তে বলিল,

“তুমি যে কৈদে কোলে দিদি।”

বিধু ডুকুটা কবিতা শুদ্ধা দিয়া বলিল, “বোয়ে গেছে আমার কাঁদতে।

তোম মত লক্ষীছাড়ার জন্ত আবার মাহুবে কাঁদে।”

ছিটে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, “সত্যি দিদি, তুমি ছাড়া আমার

জন্তে আর কেউ কাঁদে না।”

বিধু কোনও উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। ছিটে নাটীতে পা ঘষিতে

ঘষিতে বলিল, “তাই তো দিদি মুড়ি-টুড়ি কিছু নাই? উঠে দেখ না?”

ধরা গলায় “আমি পারব না” বলিয়া বিধু আবার শুইয়া পড়িল। ছিটে

বলিল, “তবে-কি আমি উপোস সেব নাকি?”

তীব্রকণ্ঠে বিধু বলিল, “ভোক কপাল! বেটাছেলে, হাত পা আছে,

আর কোথাও এই খাটুনী খাটল তো ছ’বেলা পেট ভ’রে খেয়ে বাচিস্।”

ছিটে কোনও উত্তর দিল না; শুধু দাঁড়াইয়া মূহ মূহ হাসিতে লাগিল।

গৃহিণী আহাঁরাঙ্কে গালে দোঁড়াও কোলে ছেলে লইয়া বেড়াইতে বাহির

হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বাড়ীতে ঢুকিলেন। ঢুকিয়াই ছিটেকে দেখিয়া

বলিলেন, “এই যে ছিটে, ছেলেটাতো কেঁদে কেঁদে সারা হ’য়ে গেল। নে,

একবার ধর।”

ছিটে করুণদৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে চাহিল। বিধু উঠিয়া বসিল, এবং

মাতার দিকে রুদ্ধদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া শ্বেবেব স্বরে বলিল, “শুধু ছেলেটা দিচ্

কেন মা, তুমি আছ, বাবাকে ডাক, আর কেউ থাকে, ডেকে নিয়ে এস।

সকলে দিলে ছোড়াটার বুকে চেপে ব’সো।”

নাসা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “কেন বল দেখি বিদি, আজ কাল

দেখছি তোর বড় কথা হ’য়েছে।”

বিধু উঠিয়া দাঁড়াইল; তীব্রকণ্ঠে বলিল, “কথার মত কাজ কবলেই কথা

ভুলতে হয় মা। তোমরা কি মাহু? ”

গর্জ্জন করিয়া গৃহিণী বলিলেন, “না, মাহু শুধু তুমি।—আচ্ছা—আম্বক

বাড়ীতে; আশার সঙ্গে সনানে কথা! খেঁবো মেরে বিদেয় করবো, তা জানিস্?”

মাতার-মুখের উপর জলন্ত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া কঠোরস্বরে বিধু বলিল, “তা—

তোমরা পার মা।”

বিধু জোরে জোরে পা ফেলিয়া রান্নাঘরে ছুটিয়া ।

হাঁড়ীতে এক মুঠা পাস্তা ভাত ছিল । কতকটা আমানীর সহিত সেই ভাত-
গুলি একটা পাথরে বাড়িয়া বিধু ছিষ্টেকে ডাকিল । ছিষ্টে সহর্ষে উঠানে
নামিয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতেছিল । এমন সময় সরকার মহাশয় সদর দরজা
হইতে চীৎকার করিতে কবিত্তে বাড়ীতে ঢুকিলেন—“বাবু গেলেন কোথায় ?
গরুগুলো মাঠ থেকে এসে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে । হতভাগা লক্ষীছাড়
আমার সর্বনাশ করবে দেখছি, গরুর শাপে যে সব যাবে ?”

গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, “শ্যাম, আগে নিজের পিণ্ডী দান হোক । গরুর কি
আবার ক্ষিদে ভেটা আছে ?”

ক্রুদ্ধভাবে সবকার মহাশয় বলিলেন, “ওগো বাবু, গরুগুলোকে এক মুঠো
দান জল দিয়ে এসে নিজের পিণ্ডী চটকাও না । গরু যে মাংসা-ভক্ষকী,
ভগবতীর নিঃশ্বাসে যে ভিটে উঠে যাবে ।”

গৃহিণী বন্ধার দিয়া বলিলেন, “তুমিও যেমন, ঐ তিন-কুল-থেকো লক্ষীছাড়কে
আবার ঘরে ঠাই দেয় ।”

রান্নাঘর হইতে বিধু ডাকিল, “ছিষ্টে ।”

ছিষ্টে বলিল, “আগে গরুগুলোকে খাবার দিয়ে আসি দিদি ।”

ছিষ্টে চলিয়া গেল । “চুলোয় বা” বলিয়া বিধু ভাত আমানী পুনরায়
হাঁড়ীতে ঢালিয়া রাখিয়া রাগে গর-গর করিতে করিতে বাটের দিকে চলিয়া
গেল । গৃহিণী তাহার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্বামীকে
সম্বোধন করিয়া বলিল, “বিদ্রির আজ কাল বড় বড় বেড়েচে দেখচি ।”

গম্ভীরস্বরে সরকার মহাশয় বদলিলেন, “বাড়লেই পড়তে হয় গিন্নী, দর্পহানী
স্বধূহন আছে । তিনি কারও বাড়ি রাখেন না । হরি বল মন, হরি বল ।”

৩

গোবিন্দ সরকারের মেয়ে বিধুর স্বদয়তা ঠিক বাপের মত ছিল না । —হুঃখেব
প্রচণ্ড আঘাতে তাহা এতই কোমল হইয়া পড়িয়াছিল যে, হুঃখীর হুঃখে তাহা
ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারিত না । স্তব্ধাং ছিষ্টের জন্ত তাহার প্রাণটা
আপনা হইতেই কাঁদিয়া উঠিত । কিন্তু প্রতীকার করিবার উপায় তাহা ছিল
না । তাহার ইচ্ছা, ছিষ্টে অল্প পাটনি খাউক । কিন্তু ছিষ্টে তাহাতে সম্মত হইবে
না । জেঠার বাড়ী ছাড়িয়া দিদিকে ছাড়িয়া অল্পখ যাইতে তাহার মন সন্নিহিত না ।
বিধু তাহাকে তিরস্কার করিত, পালাপালি দিত ; ছিষ্টে হাসিমুখে নীচবে সে

স্নেহ-কোমল তিরস্কার সহিত যাইত। এই তিরস্কার, এই গালাগালির ভিতর
এমন একটা স্নেহের আশ্বাস অনুভব করিত যে, ছঃখময় জীবনে এই আশ্বাসটাই
তাহার লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাহার এই লোভনীয় ভিনিসটুকু বজ্র-দিদিকে যে কতটা নিগ্রহ সহ্য
করিতে হইত, তাহা ছিষ্টে জানিত না। যে দিন জাগিতে পারিল, সে দিন সে
জ্যেষ্ঠার আশ্রয় ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। জ্যেষ্ঠাও ইহাতে অসম্মত
ছিলেন না। বলিলেন, “তোমার যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার। তুমি ছ’বেলায়
বা খাও, তার অদ্বৈক ঘরচে একটা লোক থাকবে! গল্প বাছুরগুলোও
খেয়ে বাঁচবে।”

ছিষ্টে বলিল, “বেশ, কিন্তু আমার জমী জায়গাগুলো?”

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, “সে সব তো তুমি বেচে ফেলেছ।”

ছিষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, “বেচেছি তো, তা’র টাকা কোথায়?”

জ্যেষ্ঠা বলিলেন, “চাক্ষুঃ, তা আমি কি জ্ঞানি?”

ছিষ্টে রাগিয়া বলিল, “তবে না জুয়াচুৰী।”

কি? পরন দার্শনিক গোবিন্দ সবকারের জুরাচোর! জ্যেষ্ঠা রাগে কাঁপিতে
কাঁপিতে পায়ে-জুতাটা খুলিয়া লইয়া ছিষ্টের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। জুতাটা
গিয়া ছিষ্টের কপালে লাগিল। ছিষ্টে কপালটা টিপিয়া ধরিয়া বাড়ীর বাহির
হইয়া গেল।

ছিষ্টে গিয়া বিপিন চক্রবর্তীকে চাপিয়া ধরিল। বলিল, “বামুনকাকা, আমার
ঘা-হর একটা উপায় কবে দাও।”

বিপিন চক্রবর্তীর সহিত গোবিন্দ সবকারের একটু বিবাদ ছিল। সবকার
মহাশর তাঁহার বিরুদ্ধে একটা মোক্ষদমাব তদ্বির কবিয়া প্রতিপক্ষকে জয়ী
করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বিপিন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উপায়
পাঠিয়া ছিষ্টকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “উপায় তোমার ক’রে দিতে পারি, তুমি
আমার কথামত চলবে?”

ছিষ্টে তাঁহার কথামত কাজ করিতে স্বীকার করিল। বিপিন বলিলেন,
“বেশ, তোমার জমী জায়গা সব ব’র ক’রে দেব, তোমার বিয়ে দিয়ে তোমাকে
স্বিত্ত করব।”

ছিষ্টে আশ্চর্যান্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “বিয়ে?”

বিপিন বলিলেন, “হঁ। বিয়ে শ্রীপতি ঘোষ নাবা গেছে। তা’র বিধবা

শ্রী আর একটা মেয়ে আছে। তাদের দেখবার শুনবার কেউ নাই। তোমাকে যবজামাই হ'য়ে তাদের দেখা শোনা করতে হবে।”

ছিষ্টে শ্রীপতি বোয়কেও জানিত, তাহাব মেয়ে পুঁটীকেও জানিত। মেয়েটা দেখিতে বেশ— কিন্তু তাহার সহিত যে বিবাহ হইতে পারে, এ কথাটা ছিষ্টে আদৌ করনা করিতে পারিত না। হুতরাং সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,
“আমার সঙ্গে বিয়ে দেবে?”

বিপিন বলিলেন, “আমি বলবোই দেবে। কিন্তু বাপু, তোমার এ যক্ষ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকলে চলবে না, আগে জমী জাবগাগুলো উদ্ধার করতে হবে।”

ছিষ্টে বলিল, “আমি যে সব বেচে ফেলেছি।”

বিপিন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বিষয় বিক্রয় করিলেও তাহা আইন-সিদ্ধ হয় নাই; কেন না, নাবালকের দান-বিক্রয়ে অধিকার নাই। যেকদমা করিলেই সমস্ত বিষয় বাহিব হইয়া আসিবে। ছিষ্টে মোকদ্দমা করিতে টাকা কোথায় পাইবে জিজ্ঞাসা করিলে বিপিন বলিলেন, “সে জন্ত তোমার চিন্তা নাই। টাকা যা খরচ হয়, আমি দেব; কিন্তু বাপু, এর পর ঝালধাবের আড়াই বিধা জমিটা আমার দিতে হবে।”

ছিষ্টে জমী দিতে স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “জন্ত দিন আদি থাকবে কোথায়? খাব কি?”

বিপিন বলিলেন, “তত দিন তোমার হব খণ্ডবাড়ীতেই থাকবে, সেই খানেই খাবোদাবে।”

ছিষ্টে বামুনকাকার পায়ের ধূলী গাইয়া মাথায় দিল।

৪

বিধু যখন রায়দীঘীতে গা-ধুইয়া ফিবিতেছিল, তখন ছিষ্টে গিয়া তাহান সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে ছিষ্টে, তোর নাড়ি বিয়ে?”

ছিষ্টে বলিল, “হাঁ দিদি, বামুনকাকা আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।”

বিধু বলিল, “তা বেশ, বামুনকাকার কথামত চলবি। যা বলে, তাই শুনবি।”

ছিষ্টে মাথা নাড়িয়া বলিল, “তা আর শুনবো না দিদি, আমার বিয়ে হবে, জমী জাবগা সব ফিবে পাব। তবে তি জান—”

বিধু জিজ্ঞাসা করিল, “আবার কি ?”

ছিষ্টে বলিল, “আর কিছু নয়, তবে ধৈর্যের সঙ্গে মোকদ্দমা—”

বিধু একটু বিরক্তভাবে বলিল, “তা-হোক মোকদ্দমা, খবরদার বলছি, বামুন কাকার কথার একটু এ-দিক ও-দিক করিস না। তা হ’লে তোর মুখ পর্যন্ত দেখবো না।”

ছিষ্টে বলিল, “না দিদি, তা করবো না। তা হ’লে তোমারও এতে মত আছে ?”

বিধু বলিল, “খুব মত আছে।”

ছিষ্টে প্রস্থানোক্ত হইল। বিধু ডাকিয়া বলিল, “হীরে ছিষ্টে ?”

ছিষ্টে কিরিয়া দাঁড়াইল। বিধু জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার হবু শাড়ী কেন খস্ক করে রে ?”

ছিষ্টে সহাস্তে উত্তর করিল, “তা খুব ষড় করে। তবে তোমার মতন কি ?”

ঈষৎ হাসিয়া বিধু বলিল, “আনার মত গাল দিতে পারে না বুঝি ?”

ছিষ্টে বলিল, “গাল ? তা দিদি, তোমার মত গাল যদি দেশগুড় তোক দেয়—”

ছিষ্টে হেঁটমুখে দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া মাটা খুঁড়িতে লাগিল।

বিধু রাগতভাবে বলিল, “যা যা, আর তোর অত জ্বাকামো করতে হবে না।”

ছিষ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বহিল। বিধু সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, “হী রে, যৌ তোর সামনে আসে ? কথা টা কয় ?”

ছিষ্টে মুখ টিপিয়া মুছ মুছ হাসিতে লাগিল। বিধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “তা

নিয়েরটা হ’য়ে থাক, তার পর এক দিন গিয়ে দেখে আসব।”

ঐষ তুলিয়া ছিষ্টে বলিল, “বিরের সময় যাবে না ?”

বিধু বলিল, “যাব না কেন। তুই নিয়ে যাবি ত ?”

মুখ ভার করিয়া ছিষ্টে বলিল, “নাঃ।”

“আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে” বলিয়া বিধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৫

গোবিন্দ সরকার বখন শুনিলেন যে, ছিষ্টের জমী জায়গা ভোগ করার জন্ত

ছিষ্টে তিন বৎসরের জমীর আর বাবদ তাঁহার নামে দুই শত ত্রিশান্তর টাকা

দাবিতে গালিগালাহ করিয়াছে, তখন তিনি কয়েকবার শ্রীহরিকে অবগণ করিয়া

কথা বলিয়া আসিলেন যে, তিন বৎসর আগে ভেরুণত ভের মালাব মাহ চৈত্রের

সাত তারিখে স্থাধর সাত শত একচল্লিশ টাকা মূল্যে এই সকল জমী জায়গা তাঁহাকে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সে বিক্রয় কোবালা রেজিষ্টার সাহেবের দ্বারা রীতিমত রেজিষ্টারী হইয়াছে। এক্ষণে দুই লোকের প্রবোচনার ছিষ্টগর তাঁহাব নামে এই বে-আইনী নালিশ করিয়াছে।

ইহারি জবাবে স্থাধর বলিল, প্রতিবাদীর কথিত তামিবে সে একখান বিক্রয় কোবালা রেজিষ্টারী কবিয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সে যেচ্ছায় কবে' নাই, বা সে জন্ত তাহাকে এক পরসাদ দেওয়া হয় নাই। তাহাব নাবালক অবস্থায় তাহাকে ভুলাইয়া এই দলীল লেখাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং প্রতিবাদীর দাখিলা এই বিক্রয়-কোবালা আইন অনুসারে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ।

গোবিন্দ সরকার মোকদ্দমায় যুগ। মোকদ্দমার তদ্বির করিয়া তিনি মাথাব হুল সাদা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ মোকদ্দমায় তাঁহার প্রায়শ্চর্য নিশ্চিত। উকীলও মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। সরকার মহাশয় কিন্তু মিটাইবার মত কোনও উপায় খুজিয়া পাইলেন না। বিপিন চক্রবর্তী বলিলেন, “ছিষ্টগরের জমীর সঙ্গে গোবিন্দ সরকার যদি নিজেব তিন বিঘা জমী কিরাইয়া দেন, তবেই মোকদ্দমা মিটিতে পারে।” সরকার মহাশয় ছিষ্টগরের অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু বিপিন চক্রবর্তী তাহাতে কাণ দিলেন না, হাসিয়া প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিলেন। সরকার মহাশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল। বিশেষ অগ্রহায়ণ ছিষ্টেব বিবাহের দিনস্থির হইল। ১৫ই মোকদ্দমা মিটিয়া গেলেই—মোকদ্দমায় যে ছিষ্টেই জমী হইবে, সে পক্ষে কাহাবই সন্দেহ ছিল না—বিশেষ তারিখে বিবাহ হইয়া বাইবে। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। ছিষ্টেব উল্লাসের সীমা রহিল না। তাহার অত্যধিক উল্লাস দেখিয়া লোকে তাহাকে কত-পরহাস করিতে থাকিল। আর গোবিন্দ সরকার চিন্তাবিবে জর্জরিত হইয়া ভক্তবাহা-কল্পতরু শ্রীহবিকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন।

সেদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সরকার মহাশয় মালা জপ করিলেন। জপ শেষ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন তাঁহার মুখে প্রকলতার চিহ্ন দেখিয়া গৃহিণী আশ্বস্তা হইলেন।

পব দিন সকালে ছিষ্টে জেঠার বাড়ীৰ সম্মুখ দিয়া বাজারে যাইতেছিল।

সহসা পশ্চাৎ হইতে জেঠা ডাকিলেন, “বাবা ছিষ্টধর!”

ছিষ্টে চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল । জেঠার চেহারা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল । এই কয়দিনেই তিনি বেন আধখানা হইয়া গিয়াছেন । জেঠা ধীর-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, “গোটা কতক কথা আছে বাবা ।”

ছিষ্টে বিস্মিতভাবে জেঠার পশ্চাৎ বাড়ী চুকিল । সরকার মহাশয় তাহাকে ঘবেব তিতব লইয়া গিয়াই তাহার হাত ছুইটা জড়াইয়া ধরিয়া, হাউ হাউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । ছিষ্টে বিস্মিত-স্তুভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল ।

সরকার মহাশয় কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “বাবা ছিষ্টবর, বুড়ো জেঠাকে নাংবি ? এই বয়সে—”

ছিষ্টে অন্যাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । সরকার মহাশয় বাঁ হাতে চোখ মুছিয়া অশ্রুগদগদকণ্ঠে বলিলেন, “এই বয়সে তুই আমাকে অপমান করাবি ? আমার অপমানে কি তোর অপমান নয় ? আমার গানের রক্ত তোর গায়েব-রক্ত কি আলাদা ?”

ছিষ্টের বকের তিতব কেমন করিয়া উঠিল । মুখ নীচু করিয়া বলিল, “আমাকে কেন জুতো মারলে ?”

সরকার মহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “রাগ চণ্ডাল বাবা, রাগ চণ্ডাল ।”

ছিষ্টে নিরুত্তর । সরকার মহাশয় বলিলেন, “আর যদিই নেবে থাকি-তোব বাপ যদি মারতো, তার নামে কি নালিশ করতিম ? বাপ আর জেঠা কি আলাদা ছিষ্টবর ?”

লজ্জাজড়িতকণ্ঠে ছিষ্টে বলিল, “আমার অন্তায় হয়েছে জেঠা ।”

জেঠা সহর্ষে বলিলেন, “তোর অন্তায় নয় বাবা, লোকে তোকে নাচিয়েছে । তা নইলে তুই কি আমাব তেমন ? কিন্তু বাবা, এই আমি বলে রাখছি, মোকদ্দমা শেষ হ’লেই আমি গলায়-দড়ী দেব, জলে ঝাঁপ দেব । তোমাকে এর পাপের ভাগী হ’তে হবে—”

ছিষ্টের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল । ভয়ে ভয়ে বলিল, “আমি কি করবো ?”

তখন সরকার মহাশয় তাহাকে বসাইয়া, এক্ষণে তাহাব কি করা কর্তব্য, তাহার বিস্তৃত উপদেশ দিলেন । উপদেশদানান্তে বলিলেন, “তুমি কি মনে

কর বাবা, আমি জৌনার বিষয় ফাঁকি দিবে’নেব ? রাধে মাধব, রাধে মাধব !

আমি কি এতটা পাষাণ ? পাছে ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ বিষয়টা ফাঁকি দিয়ে

নেয়, তাই ওটাকে হাত ক’রে রেখেছি । আমি সব ফিরিয়ে দেব, কুড়ায় গুণ্ডায়

হিসেব ক’বে ফিবিবে দেব । তোমার বিষয় আমি নেব ? হয়ি, হয়ি !”

ছিটে স্নানমুখে বলিল, “কিন্তু বামুনকাকা যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে?”

সদন্তে সরকার মহাশয় বলিলেন, “বিয়ে? আজ যদি মনে কবি, কাল তোব তিন গণ্ডা বিয়ে দিতে পারি। নয় তো আমার নাম গোবিন্দ সরকারই নয়।”

ছিটে চুপ করিয়া রসিয়া রহিল। সরকার মহাশয় বলিলেন, “তোব যদি রাগ থাকে, তুই আমাকে ছুঁ বা মার, কিন্তু বাবা, বিপিন চক্রবর্তীকে দিবে আমার অপমানটা করাসু নি।”

সরকার মহাশয়ের ছুই চক্ষু দিয়া সবদব ধাবা গড়াইতে লাগিল। ছিটে উঠিয়া ধীবে ধীরে চলিয়া গেল। বিবু স্নান ক'রিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। সে ছিটেকে বাড়ীর বাহির হইতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল। ঈষৎ-উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, “ছিটে!”

ছিটে তাহার দিকে ফিরিয়া গাহিল না, মাথা নীচু ক'রিয়া আপন মনে চলিয়া গেল।

আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে ছিটে হাকিমের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, “হজুর, আমি স্বেচ্ছায় জেঠাকে বিষয় বিক্রী ক'রেছি। পাঁচ জনের কথায় আমি মিথ্যা নালিশ ক'রেছিলাম, এখন আর আমি মোকদ্দমা চালাতে চাই না।”

আশঙ্কিত শ্রদ্ধ শ্রোক হুঁ ক'রিয়া ছিটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হাকিম মোকদ্দমা খাবিজ ক'রিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর গোবিন্দ সরকার মালা হাতে প্রফুল্লচিত্তে গৃহিণীর সহিত গমন করিতেছিলেন। এমন সময় ছিটে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, “জেঠা!”

জেঠা উত্তর দিলেন, “কে?”

ছিটে বলিল, “আমি ছিটধর।”

জেঠা গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে কি?”

ছিটে জেঠার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “আমাকে ওখানে আশ্রয় দিতে দেবে না।”

জেঠা কক্ষকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “তোমার মত লম্বীছাড়া কে মাই দেবে, বল। তুমি একটা আস্ত কাল-সাপ। আমাকে সর্বস্বান্ত ক'রতে বসেছিলে।

কেবল ধর্মই আমাকে রক্ষা ক'রেছেন।—হরি হে দীনবন্ধু!”

ছিটে স্তম্ভিতভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল। গৃহিণী স্বাক্ষর দিয়া বলিলেন,

“কাল জেঠার নামে নালিশ ক’বে আজ আবাব সম্পর্ক পাতাতে এসেছেন।

লক্ষীছাড়া হ’লে তার কি লজ্জাও থাকে না গা?”

গৃহিণী উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জেঠা মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘন ঘন মালা ঘুরাইতে লাগিলেন।

ছিটে অন্ধকারময় উঠানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে রন্ধনশালাব দিকে অগ্রসর হইল। বিধু রান্নাঘরের দাবায় দাঁড়াইয়াছিল। ছিটে তাহার সম্মুখে গিয়া ডাকিল, “দিদি!”

রোষণস্তীরস্বরে বিধু উত্তর দিল, “কেন?”

ছিটে বলিল, “সাবাদিন খাওয়া হয়নি দিদি, কিছু আছে?”

বিধু গর্জন করিয়া বলিল, “উনানের ছাই আছে। খাবি?”

ছিটে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। বিধু উচ্চকণ্ঠে বলিল, “হতভাগা লক্ষীছাড়া, আমি তোকে খাবাব দেব? দূর হ’য়ে যা বলছি আমার সামনে থেকে।”

ছিটে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস-তাগ করিল। তাব পব একবার দিদির মুখের উপর কাতর্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ধাব-শুদ্ধ অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। বিধু দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

সহসা বেন বিধুর চমক ভাঙ্গিল; সে ছুটিয়া গিয়া সদর দবজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, “ছিটে, ছিটে!”

কোনও উত্তর আসিল না। বিধু আবাব চীৎকার করিয়া ডাকিল, “ছিটে, ওরে ছিটে!”

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সরকার মহাশয় বলিলেন, “সে লক্ষীছাড়া চুলোর গেছে, এখন তুই তার সঙ্গে খাবি?”

বিধু ছই হাতে সদর দবজা চাপিয়া শুস্তিতভাবে দাঁড়াইয়া বহিল। সরকার মহাশয় অপান্তে মালাছড়াটা গলায় কেলিয়া ভক্তগদগদকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

“হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো নীনবকো জগৎপতে।

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহন্ততে ॥”

ত্রিনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আলোচনা ।

নারীর ব্যক্তিবিকাশে মতভেদ ।

ব্রাহ্মণের সমাজে আজ কাল সকল সংস্কারই তামসিক বলিয়া ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু এইরূপ ঘোষণা বাঁহারা করেন, তাঁহারা যদি না জানেন যে, ব্রাহ্মণ-সমাজও সকল সংস্কার সাধিক নহে, তবে তাহা হিন্দুসমাজের একান্তই দুর্ভাগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজও তামসিক সংস্কারের অন্তর নাই; 'নারায়ণে' 'বুদ্ধিমানের কপ' এবং 'দিগ্বিদ্য' কিছু কিছু দেখাইয়াছেন; আবও দেখাইতে পারিতেন। বাহা হউক, ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মণ উভয়কেই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তামসিক সংস্কার সকল সমাজেই আছে। যে হেতু, কোনও সমাজ নারী মনে পাক্তিত্বের সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া নারীকে যবনিকার অন্তরালে রাখা কথিয়া তামসিকতার পরিচয় দিতেছে; কোনও সমাজ বা নারীর স্বাধীনতার পথ মুক্ত করিয়া প্রকৃতির সহিত নারীর সমানভাবে মেলানো ও হৃদয়ের স্বাধীনতা দিয়া তামসিকতার পরিচয় দিতেছে। ব্যাপারটি ঘুরাইলে বাহা, ফিরাইলে তাহাই। এক দিকে সংস্কার ঘোষাই দিতে গিয়া দুর্বলতার প্রকাশ দেওয়া; অপর দিকে উন্নতির ঘোষাই দিতে গিয়া অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করা। প্রভেদ ইহাই। সমাজের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন একটা সামাজিক আদর্শের সহিত অল্প সামাজিক আদর্শের তুলনা না করাই উচিত। কিন্তু এ নিয়ম সকলে মানেন না বলিয়াই সামাজিক তত্ত্বটুকু মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত না হইতে পারে। কিন্তু বিলুপ্ত করিবার কল এই, যে সমাজের মনোমত কথা বলা না যায়, সেই সমাজই রূপ হন। সুতরাং কলাফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতের প্রচারের দ্বারা মাতৃভাষায় সেবা করা উচিত।

সমাজে—সকল সমাজেই—মন্দ সংস্কার আছে; ভাল সংস্কারও আছে। কিন্তু দেখা যায়, 'ভারতী' প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক পত্রিকাগুলি হিন্দুসমাজের মন্দ সংস্কারগুলি যেভাবে দেখাইবার চেষ্টা করেন; ভাল সংস্কারগুলি দেখাইবার জন্ত যদি তাহারা শতাংশের একাংশও চেষ্টা করিতেন, অথবা ভাষাদেব নিজের সমাজের মন্দ সংস্কারগুলিও যদি দেশের লোকের সমুখে তুল্যভাবে দেখাইতেন, তাহা হইলে সাহিত্যের পণ্ডাগোলে সমাজের কথা উঠিত না, কতিপয় ব্রাহ্ম লেখকের দ্বারা নসিদ্ধাবৃত্তির পরিচয় দিবার জন্ত আবাদিককেও সাহিত্যের আসরে দাঁড়াইতে হইত না।

এ সমাজে হিন্দুবিষেয়ীদের বপক্ষে বলিবার কথাও আছে। মাঘের মখন এক আদর্শ ছাড়াই অপর আদর্শ গ্রহণ করে; তখন বুদ্ধিতে হয়, নুতন আদর্শই তাহার চক্ষে নির্দোষ বা অপেক্ষাকৃত নির্দোষ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বাধ্য হইয়া এক আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কথা যতজ্ঞ। কিন্তু সর্বাঙ্গভাবে বিষয়টির বিচার করিতে চলিবে না। বাধ্য হইয়া বা না হইয়া যে, যে আদর্শ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই আদর্শ অভ্যুত্থিত হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু সে স্বাভাবিক অপর আদর্শকে উপেক্ষা করিতে পারে

না; কারণ, ইহা অসম্ভব করা অনুচিত যে, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি লোক যে আদর্শকে
 আকর্ষণীয়-ধরিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও সন্নিবেশক নাই। বলিয়া রাখা ভাল,
 আমরা ব্রাহ্মসমাজকে স্বাক্ষর চক্ষে দেখি না; কারণ, ব্রাহ্মসমাজেও দূরদর্শী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির
 অভাব নাই। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যে সকল লেখক সাধারণতঃ হিন্দুবিদ্বেষের পরিচর্য্য দেন,
 তাহাদের অপেক্ষা বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, দেবীপ্রসন্ন—প্রভৃতি কোনও অংশেই নিকৃষ্ট
 নহেন। হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম বা বংশগত জাতিবিচারের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা না থাকিতে
 পারে, কিন্তু হিন্দুর আচার-নিয়ম বা বিধি-ব্যবহার প্রতি—যত দূর জানি—ইহারা বিবেকভাবে গম্য
 নহেন। যে মেবেল্লানাথের ব্রাহ্মসমাজ ‘মহর্ষি’ নাম দিতে কুণ্ঠিত নহেন, ব্রাহ্মসমাজের সেই
 এসমাজ-মহর্ষির প্রদর্শিত পথে আজ কাল কব-অন্ন ব্রাহ্ম চলিতেছেন? বাহারা চলেন না,
 তাহারা মুখে হিন্দুবিদ্বেষের শব্দচব্ব দিলেও, অন্তরে তাহাদের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অজ্ঞানতাই প্রকাশ
 পায়। কারণ, তর্কচ্ছলে বাহাই বলা বাউক, আমাদের বিশ্বাস, ব্রাহ্মরা হিন্দুসমাজেরই একটি
 শাখা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে কোনও কোনও ব্রাহ্ম-লেখক বিপরীত বুদ্ধির বশে হিন্দু-
 সমাজের যে কলঙ্কবোধনা করেন, তাহারাও সে কলঙ্কের ভাঙ্গী। আর যদি হিন্দুধর্মের
 সহিত ব্রাহ্মধর্মের কোনও বন্ধন না থাকে, তবে হিন্দু ও ব্রাহ্ম-কেহ তাহারও ক্ষেত্র দেখাইতে
 পারেন না। এ বেশে মুসলমানের ব্রাহ্মদের আবির্ভাবের বহু পূর্বে হিন্দুর ঘরের পাশে ঘর
 তুলিয়া, মনিরের পাশে মনজিদ তুলিয়া, মরিয়া এবং মরিখা বাস করিতেছেন। ভারতে
 হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘিলনের অস্ত্রাঘের কারণ যথেষ্ট আছে; তথাপি কয় জন
 শিক্ষিত মুসলমান হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে লেখনী টাননা করিতেছেন? শিক্ষিত হিন্দুরাও
 মুসলমান সমাজের কুংসা কীর্ণন করেন না। তবে ব্রাহ্মরাই বা কোন অধিকারে হিন্দুসমাজকে
 আক্রমণ করেন? হিন্দুরাই বা আর কত কাল তাহাদের আদর্শচ্যুত বীড়য্যো, মুখ্যো, চাঁট্যো,
 দাস ও মিত্রকে ‘সনাতন’ কথা শুনাইবা, ঘরের ছেলেকে ঘরে আনিবার চেষ্টা করিবেন?
 সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা, সেই মদ্যচর্য্যের কথা, সেই সখ্যেমের কথা—সে সকল কথা এখনকার
 কালে বিকাসিত না। কারণ, তাহাতে ‘দখনে হাওরা বয়’ না, ‘মুছিত ঘোহনাতলে’
 নাবীক প্রেম ‘পুলক নগর’ না, ‘কুখিত পামাণ’ শুমরিয়া উঠে না। সে সকল কথা
 থাকুক।

ক্রীতবর ববীন্দ্রনাথের বটে, কতকগুলি অমূলক সংস্কারের বশবর্তী হওয়ার হিন্দুসমাজ
 ক্রমেই অবনত হইতেছে। আমরা এ কথা স্বীকার করি না; কারণ, অমূলক হউক আর সমূলক
 হউক, হিন্দুসমাজের কোনও সংস্কারই আধুনিক নহে, এবং সেই সকল সংস্কারের সূত্রেই ভারতীয়
 সভ্যতা-বিকাশলাভ করিয়াছিল, এবং ঐ সকল সংস্কার থাকা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতের অসম্ভাব্য
 জাতির অপেক্ষা হিন্দুজাতি জানে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিতে কোনও অংশেই নিকৃষ্ট নহে। আমাদের মনে
 হয়, যে কারণে হিন্দুসমাজে শৃঙ্খলা লেগে হইয়াছে, সেই কারণেই ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি প্রান্ত
 আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ক্রমেই অবনত হইতেছে। কারণটি একই—হিন্দু ও ব্রাহ্মের
 সমাজ ক্রমে পাক্ষাত্যভাবাপন্ন হইয়া মূল আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছে। এই যে ঘরে ঘরে
 মারামারি, কাটাকাটা, ইহার কারণ ঐ পাক্ষাত্য ভাবের প্রভাব। ব্রাহ্মে নহিত হিন্দুর যে

এই বিরোধ, ইহার মূলে রহিয়াছে ভীষণ স্বার্থ—যে স্বার্থের প্রেরণায় 'গরের ধনে গোন্ধ' কোনও ধনী তাঁহার দ্বিগুণ প্রতিবেশীর দ্বীর্ণ কুটীরবাসী ভাদিয়া কেলিষা প্রমোদগার নির্ভাণ করেন।

'কর্তার ইচ্ছায় কর্তৃ' করিতে তাঁহার অভাব, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান অতি নীচ হইতে পারে; হউক। কিন্তু তাঁহার যে-শাস্তিপ্রিয়, এ কথা তাঁহাদের পরম শত্রুরাও দাঁকার করেন। আর কতকগুলো বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য যে সমাজে শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও সম্ভব কারণই দেখি না। কিন্তু 'ভারতী' সমাজবিরুদ্ধ শ্রী-বাণী-নতায় অল্প শাস্তিকে বিসর্জন দিবার ব্যবস্থা দিয়া বলিতেছেন,—'শ্রীর ব্যক্তিগত স্বাভাবিক হইলে সমাজে মোটের উপর শাস্তিই চেরে অশাস্তির সম্ভাবনা বেশি। বস্তুত (১) সেই অনাস্ত্রিম সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়াই ত মানুষ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া জয়। কেন না, অশান্তিতে যুগাইবার একমাত্র প্রশস্ত রাস্তা, মানুষকে অল্প তামসিক সংস্কারের গারদে তিরদিন নগ্নরসসী করিয়া রাখা।' অর্থাৎ, নারীর স্বাধীনতা হই-ই চাই, তাহাতে সমাজের শাস্তি নষ্ট হয়, হউক। ইহাতে বুঝা যায়, 'ভারতী' সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিকেই বড় ভাবেন; কিন্তু আমরা ব্যক্তিক সমাজ অপেক্ষা বড় বলি না। কারণ, ব্যক্তি যখন সমাজের মধ্যে। ঐহিক জীবনের বর্তমান-প্রতিষ্ঠানের অধীন হইয়াছে, তখনই ত সে তাহার স্বাভাবিক নষ্ট করিয়াছে। ব্যক্তিগত সমাজের ধর্ম বা প্রথম দৃষ্টা 'ভারতী' নহেন, 'প্রবাসী' নহেন, 'ব্রাহ্মসমাজও' নহেন। ব্রাহ্ম-ঐহাদের সমাজ গঠন করিবার জন্য ইউরোপ-হইতে যে সকল মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত স্বাভাবিক তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত—এইট মাল বা একটি মশলা। এই ব্যক্তিগত স্বাভাবিক হিন্দুর কর্ণে সোনার পাখরবাটীর সভ অসম্ভব বা অস্বাভাবিক শুনার। যাহা হউক, এ দেশে মনুষ্যকোর প্রতি বাঁহায় আঁধা নাই, তিনিও এই নতের কত দূর পক্ষপাতী, তাহাও দেখা যাইবে। নারীর ব্যক্তিকও ঐ ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কথ। কিন্তু নারীর ব্যক্তিগত আমরা কথায় শুনিব, না—কাজে দেখিব? হিন্দুরা না হয় কুসংস্কারের বশে সম্ভ্রান্ত্য মানিয়া কোনও অবস্থাতেই নারী-স্বাভাবিক দিবার পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাভাবিক কথ। জইয়া বাঁহারা লাক্ষ্যলক্ষি করেন, তাঁহারাও ত নারীর ব্যক্তিগত বিকাশের ব্যবস্থা করেন না। যে ভাবে ব্যক্তিগত স্বাভাবিক পরিচিতিতে পারেন, নারীদিগকে আশ্রিত সে অযোগ্য হইতে দেন না কেন? যে বিধান সমাজের চক্ষে পুরুষকে কলুষতা স্পর্শ করে না, সেই বিধান নারীকেও ত কলুষতা স্পর্শ করিতে পারে না; পারে না। তবে করে কেন? হিন্দুরা না হব 'এক-চোখো'—কথায় কথায় ধর্ম ও নীতির কথা বলেন; কিন্তু বাঁহারা 'দুই-চোখো', অর্থাৎ, স্বাধীনতার জন্য বাঁহারা সামাজিক অশাস্তিকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁহারাও যদি এ বিষয়ে হিন্দুদের মতই 'এক-চোখো' হন, তবে আর সংস্কারের ধর্ম ধরিয়া লাভ কি? বাঁহারা সমাজের বর্তমান অবস্থার বিষয় না ভাবিয়া, সমাজের কুশাস্ত্রী-কর্তাদের নিকে না চাহিয়া, বরণ-সমস্তা অধিকতর স্ফটিক করিয়া, বিধবার বৈধব্যস্রগা দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাভাবিক হইলে মাতির ছুটাছুটি করিতে পারেন, তাঁহারা এই ব্যক্তিগত স্বাভাবিকের গলদ-টুকু দেখিতে পান না, ইহাই তাঁহাদের ব্যাপার। এই সকল কথা ভাবিয়াই আমরা (গৃহে) বলিরাছি, 'পাঁচ কোটি লোকের মধ্যে পাঁচটি নারী যদি আত্মহত্যা করিল, অমনই চাঁৎকার—

আব' চাঁৎকার ; কিন্তু প্রতি বৎসর শত-শত নরনারী ধর্ষ ও নীতির-পথ-ছাড়িয়া জীবন হারাইতেছে, সে দিকে কল্প জনের লক্ষ্য আছে।' ইহা উপহাসের কথা নহে। যে দেশের লোকের আয় লোক-প্রতি দৈনিক একটি পয়সা, সে দেশের লোক খাইবেই বা কি, আর উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তের লক্ষ্য ব্যয় করিবেই বা কি ? উচ্চশিক্ষা-লাভ দুইটি বলিয়াই আমরা নারীজাতিকে ধর্ষ ও নীতির সংস্কারে জাগিতে ও জুড়াইতে বলি ; কাব্য, মূল-উদ্দেশ্য একই—মনকে সংযত করা। কিন্তু এই ধর্ষ ও নীতির কথা 'ভারতী'র কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয় নাই ; যে-হেতু তিনি বলিয়াছেন, 'যে কারণে বাঙালী (বাঙ্গালী) মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে, সেই কারণেই তাদের মধ্যে স্ত্রী নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই। দুই রোগের ভিন্ন লক্ষণ হইলেও তাদের মূল কারণ এক। মূল কারণ ব্যক্তিবিহীন, সংস্কারশূন্য, অবলম্ব্য জীবনের মানি ও দুঃখ এবং সেই হেতু শরীর ও মনের অবদান ও দুর্বলতা।' কথাটা আলোচনার যোগ্য না হইলেও বিশ্লেষণ-যোগ্য বটে : নতবা, 'ভারতী' তাহার ভুল দেখিতে পাইবেন না। মানুষ সমাজশাসন না মানিলেও যতঃই যে সকল সংস্কারের অধীন হয়, আত্মবল্য সংস্কার তাহাদের অন্ততম ; কিন্তু সত্য বা পাতিত্রয়ের সংস্কারটি সমাজবল্য মানুষেরই হাত-গড়া। রাজপুতানার নারীরা জহর-ব্রতে জীবন আহুতি দিতেন ; বাঙ্গালাতেও সতীদাহের প্রথা ছিল। সত্যের সংস্কার হইবেই এই প্রথা স্বহি। এই প্রথা আত্মহত্যার পোষক, আত্মবল্যের বিরোধী। হতভাগ্য নারীরা যে যে কারণে আত্মহত্যা করে, সেই সেই কারণে সত্য-বিসর্জন দেয় না। নদীজে থাকিয়া সামাজিক নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইয়া যে নারীরা জহর তথাকথিত অবলম্ব্য জীবনের মানিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, সে নারী আত্মহত্যা করিতেও পারে ; আত্মহত্যা না করিয়া সত্য-বিসর্জন দিয়া বহিষ্কার-দিন কাটাতেও পারে। কিন্তু ইহা অনিশ্চিত, যে নারীরা চলা-ফেরা, গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাহিরের অগতির সহিত বাহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন, মানসিক বিকারে হয় সে আত্মহত্যা করিলে, নতুবা 'সমাজশাসনে বহিব না আর, বহিব না দুঃখ-জালা।' বলিয়া চিরজীবনের মত অস্থায়-গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আর যে সমাজে গৃহের বাহিবে নারীর অবাধগতি প্রচলিত, মানসিক বিকারে সত্য-বিসর্জন-জিবার সুযোগও সে সমাজ নারীকে জ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসম্মত-দিয়াছেন। শুধু ব্যক্তিগতবাদের দোড় এই পর্যন্ত। এই জন্য আমরা যে কারণে আত্মহত্যা মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যা বাড়িতেছে সেই কারণে তাদের মধ্যে স্ত্রী, নারীর সংখ্যাও বাড়িবেই—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়াও বলি,—যে উপায়ে বাঙালী মেয়েদের আত্মহত্যার প্রতিরোধ নষ্ট হইতে পারে, সেই উপায়েই পতিতা, নারীর সংখ্যাও হ্রাস হইতে পারে। সেই উপায় ব্যক্তিবিহীন ও সংস্কারশূন্য প্রত্যেক সমাজেই আছে। ধর্ষ ও নীতির শাস্তি-নিকেতনেই সে উপায় আছে। অবদান ও দুর্বলতা অশান্তিনিকেতনে যত দূর আসে, শাস্তি-নিকেতনে তত দূর আসে না।

'ভারতী'র দেখ-দেখাইলাম, এইবার শুধুর কথা বলিব। তিনি বলিয়াছেন,—'বাঙালীর (বাঙ্গালীর), মেয়েরা বেশি গরু শড়ে বলিবা বেশি আত্মহত্যা করে, এ সম্ভাবনাটাকে [সম্পাদক] সম্পাদক একেবারেই ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।' আরও বলিয়াছেন, 'কথাটা আত্মহত্যার আসল কারণ এবং মুখ্য কারণ; না হইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাহা

দে স্বাভাবিকতার প্রযুক্তিকে জাগাইয়া তোলে এ কথা স্বীকার করা যায় না।' এখন 'ভারতী'র মত শ্রেষ্ঠ, কি 'প্রবাসী'-সম্পাদকের মত শ্রেষ্ঠ, সে বিচার স্বাধীন করিবেন; 'ভারতী' এ বিষয়ে আমাদের মতের সমর্থন কবিয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহাকে তাঁহার এই উদ্যোগের জন্য সরল-ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু এই ধন্যবাদ-প্রাপ্তির পূর্বেই 'ভারতী' নান্যস্ত করিয়াছেন,—আমরা তাঁহার পবন হিতৈষী, যে হেতু তিনি এবং তাঁহার হিন্দু নারীর ব্যক্তি 'জাগ্রত' দাবিঃ জন্য দয়া করিয়া যে জাগ্রত আলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা (গৃহস্থ ও উপাসনায়) 'স্বতন্ত্র-ও-অচ্যুতের কুলোব বাতান'-দিয়া সেই 'ধোয়াটাকে জমশ আঙনে পরিণত করি' তুলিতে সাহায্য' করিতেছি। অর্থে পুষ্ট 'ভারতী' তাঁহার এই হিতৈষিণীকে অবসাহায্যে পরিতুষ্ট না করেন, ইহাই এখন আশঙ্ক্য বিষয়: কিন্তু বর্জ্য ব্রাহ্মণ-সমাজের গত বৎসরের কাঁধাবিবদগীতে প্রকাশ, অর্থের অভাবে ব্রাহ্মণ-সমাজ নাকি 'স্বতির ও আচারের কুলোব বাতান' জ্বরে দিতে পারিতেছেন না। অতএব মা ভৈঃ।

মূল কথা এই,—শুধু ও অন্য ব্যক্তিত্ববাদের হিন্দুসমাজ জাগ্রিবে না। নীতি-ব্যাখ্যে দুর্জন, উচ্ছৃঙ্খলতা সেখানে বাড়িবেই। দাঁতে মিশি, ঠোটে আলতা এবং পাঁচা চুল পাকা তুলা লাগাইলে যৌবন কিরিয়া আসে না। ব্যক্তিত্ব চাহিলেই ব্যক্তিত্ব পাওয়া যায় না। ব্যক্তিত্ব জাগ্রত করিবার আগে মনুষ্যত্বের সাধনা চাই। আশ্র কাল নারীবিগকে মানুষ নহি, তুলিবার জন্য কতটুকু চেষ্টা হইতেছে?—বেধুন-কলেক্স এখন হিন্দুনারীর শ্বশিষ্কার ভাঃ লইয়াছে। নীতিহীন গল্প-নাটক এখন নারীদের ধর্মমূলক শিক্ষার অন্তরায় হইয়াছে। গোলাপ-জল এখন গঙ্গাজল, সা-র-গা-না এখন দেবপূজার মন্ত্র, চরিত্রহীন শ্বশিক্ষক এখন শুক! এখন অবস্থায় নারীদের ব্যক্তিত্ব জাগ্রত না করিলে আর চল কই?

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাহ্‌ এতিম।

দামোদর নদেব উত্তরে চাম্পাই নগরী নামে এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম আছে। উহা বর্দ্ধমান জেলার গলসী থানার অন্তর্গত, এবং মানকব রেলস্টেশনের দক্ষিণে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্বে চাম্পাই নগরী—নগরীবিশেষই ছিল; এখনও উহা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পবগণাবিশেষ।—উহা এক সমস্ত জনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। এই অঞ্চলের লোকেবা উহাকেই বর্তী বেহলাব জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।—এ সম্বন্ধে অনেক অনেক মত আছে।—কেহ কেহ পূর্ব-বঙ্গের কোনও চম্পানগরীকে বেহলাব জন্মভূমি বলিয়া পুস্তক-প্রবন্ধাদিরও বচনা কবিয়াছেন।—বর্তমান প্রবন্ধে বেহলা প্রসঙ্গে

কোনও আলোচনার অবশ্যকতা নাই। কিন্তু বেহুলার দুই একটি কথা না বলিলে, এ চাম্পাই নগরীর প্রসিদ্ধতা গুপ্ত থাকিয়া যায়। অতএব জনাবশ্যক হইলেও, বেহলা-সম্বন্ধীয় দুই একটি বিষয়ে উল্লেখ করিব।

চাম্পাই নগরীতে সবস্বতীপূজার বষ্টির দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমাগত ষোল্ল দিন পর্যন্ত একটি মেলা হইয়া থাকে।—উহা বেহুলার মেলা নামে আখ্যাত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। ঐ মেলা উপলক্ষে তথায় প্রতি বৎসর অসংখ্য নরনারী বস্রাগম হইয়া থাকে।—এই অঞ্চলের লোকেরা চাম্পাই নগরীর এক দ্রাবশিষ্ট এমাবতের উচ্চস্থানকে বেহুলার ‘লোহার বাসরঘর’ বলিয়া থাকেন। মেলার সমাগত হিন্দুললনাগণ হানান্ত্রে আর্দ্রবসনে ও আর্দ্র-

বেশে সতীহরক্ষা-কামনার তথায় ভূমিষ্ঠতা হইয়া সতী বেহুলার উদ্দেশে প্রণাম করেন, এবং ‘বেহুলার শিল’ নামে যে এক শিল পতিত আছে, তাহাতে ইষ্টক চূর্ণ করিয়া, সিন্দূরবস্ত্রকে সীমান্তে ধারণ করেন। ঐ উচ্চ স্থান হইতে দক্ষিণবাহিনী একটি নালার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। কথিত হয় যে, বেহলাবাসীদের কেন গড়াইয়া ঐ নালার হইয়াছিল, এবং ক্রমে দক্ষিণবাহিনী হইয়া, গাঙ্গুব নদে নিঃসরাছিল। চাম্পাই নগরীর পূর্বাংশে কতক দূর পর্যন্ত এখনও গাঙ্গুব নামেব নিদর্শন পাওব যায়।—তৎপরে পূর্ব দিকে বর্তমান পর্যন্ত উহার আব কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্তমানের পূর্ব-দক্ষিণে গাংপুব নামেব গ্রাম আছে, তাহাব পশ্চিমে খালের মত কতক দূর স্থান গাঙ্গুব বলিয়া কথিত হয়। এখন গাঙ্গুবের শেষ সীমা গাংপুব; এই জায়গাই বোধ হয় গ্রামের নাম গাংপুব হইয়াছে।

গাংপুবই এখন গাঙ্গুবের শেষ সীমা হইলেও, বর্তমানের উত্তর-পূর্ব দিকে তাব একটি নদী ‘বেহলা নদী’ নামে কথিত হয়। উহা বর্তমান জেলার সাত-গেছে খানায় অন্তর্গত ভূমিভাগের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, অতি প্রাচীন কালে গাঙ্গুব ও বেহলা নদীর সংযোগ ছিল, এবং গাঙ্গুবের গাংপুবের পববর্তী স্থানের অংশের নাম বেহলা নদী ছিল।

আমাদের চাম্পাই নগরী দুইবার দেবিবার স্তবোগ ঘটয়াছিল। কত দূর পর্যন্ত উহার সীমানা, তন্মধ্যে এখনও বেণে জাতি বাস করিতে পারে না। শুনা যায়, ঐ জাতি উন্নয়ন করিতে গেলে সেই স্থান হইতে সাপ বাহির হয়।

চাম্পাই নগরীর অনেকগুলি পল্লী আছে। সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিযাত।—সেজা কস্কাও উহার একটি গরীবিশেষের নাম। কস্কাও অনেকগুলি

পাঠানের বসতি আছে। তাহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ দরিয়া খাঁ, তাঁহাকে আক্গান বংশধর বলিয়া উল্লেখ করিতেন। বলিতেন, তাহাব পূর্বপুরুষ বা বিদ্রোহী বহিম খাঁর বিশ্বস্ত অমুচব ছিলেন। বিদ্রোহশেষে এতিম শাহজাদা আজিম-উল-শানের পরণাম হইলে, শাহজাদা তাঁহাকে ফরা করিয়া, তাহাব প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, ঐ যোদ্ধা কসবা জাইগীব দান করেন।

এতিম খাঁ ঐ জাইগীব-নাভের পর চাম্পাই নগরীব ঐ কসবা পল্লাতে আসিয়া বাস করেন। তাহার অল্প দিন পরেই এতিম এক মহাতপা সুবী মুসলমানেশ্বর হইয়া কিছুকাল ধরিয়া তাহার পরিচর্যা ও তাহাব নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা কবিতে থাকেন, এবং শাহ এতিম দরবেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তখন তিনি বিষয়-বাসনা-বিরহিত ও সংসার-কামনা-শূন্য হইয়া লোকালয় পবিত্র্যাগপূর্বক চাম্পাইনগরীর পশ্চিমদিকস্থিত দামোদর নদের উত্তর তীরে এক প্রশস্ত প্রান্তরে তপঃসাধনায় নিরত থাকেন। তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমান থাকিয়া, তাহার আবাধনা প্রভাবে প্রসিদ্ধ পীত-শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনু ও মুসলমান নরনারী তাঁহাকে ভক্তি করিতেন।

তাঁহার গাহাওয়া সম্বন্ধে কতকগুলি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তৎসমূহের মধ্যে এখানে একটির উল্লেখ করিব। তিনি একদা ঐ প্রান্তরের এক তেঁতুল বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ ছিলেন। এমন সময়ে প্রবল ঝটিকাবেগে ঐ বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভগ্ন হইল। তিনি ধ্যানমগ্ন—ঐ স্থান ত্যাগ না কবিলে ঐ ভগ্ন শাখা তাঁহারই উপর পতিত হইবে বলিয়া ঐ শাখা স্থানচ্যুত হইবে। মাত্রই—এক শিষ্য তাঁহার গাত্রস্পর্শপূর্বক স্থান ত্যাগ করিতে বলিল। শাহ এতিম তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানচ্যুত নিম্নাগত শাখার দিকে লক্ষ্য কবিলেন; শাখা তৎক্ষণাৎ অশ্রু এক শাখার বাধা পাইয়া তাহারই সংলগ্ন হইল। ঐ বৃক্ষ উক্ত উক্ত শাখা সহ অজাপি বর্তমান আছে। দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, একটা স্থানচ্যুত পতনোন্মুখ শাখা অশ্রু এক শাখায় সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কালক্রমে শাহ এতিম, ঐ প্রান্তরেই লোকনরনের অন্তর্বিভ হয়েন। সেই স্থান এখনও “শাহ এতিমের বেড়” নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়া আসিতেছে। শাহ এতিমের সমাধি—প্রাচীন ইষ্টকে রচিত; উহাব চতুর্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। সমাধির অনেক স্থান ভগ্ন হইয়াছে; অনেক ইটু ধরিয়া পড়িয়াছে। উহার নিকটেই একটি অর্দ্ধ-ভগ্ন প্রস্তবফলকে কতকগুলি আবেদী ভোগবা অক্ষব স্ফোমিত আছে। ঐ অক্ষবগুলির অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া এমন

ভাষ্যে বিকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র 'আজিম-উল-খান' ভিন্ন অন্য কোনও
শব্দ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। প্রস্তরকলকটা বোধ হয় পূর্বে শাহ
এতিমের সমাধিসংলগ্ন ছিল, —পর্বে উহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আনরা
১৫৮৫ বৎসর পূর্বে ঐ সমাধিস্থান দেখিয়াছিলেন।

শাহ এতিমের সমাধির নিকটে আরও পাঁচ ছয়টা পাক্কা সমাধি আছে;
সেগুলি তাঁহার শিষ্যবর্গের। তাঁহার সমাধিস্থানে একটি ক্ষুদ্র পুষ্কবিগী আছে।
নাধাবর্ণতঃ নদীতটস্থ পুষ্কবিগীর জল বর্ষাশেষে শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ
পুষ্কবিগীর পাশ দিয়া দামোদব নদ প্রবাহিত হইলেও, উহাতে বাব শাস সমান
জল থাকে। রোগমুক্তি ও সন্তানাদির কামনার্থ অনেকে ঐ পুষ্কবিগীতে স্নান
ও উহা ব জল পান করিয়া থাকেন। শাহ এতিম শিষ্য সহ দামোদবতটে
চিহ্ননিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁহার অস্থি-পঞ্জর ধরণীব ধূলিবাশিতে পবিত্র হইয়াছে।
তথাপি তাঁহার সমাধিস্থান ক্ষয়িত ও তীর্থস্থান-স্বরূপে অনেকেব সম্মান লাভ
করিয়া আসিতেছে। শাহ এতিম বিদ্রোহীদের দলভুক্ত অস্ত্রধারী ছিলেন।
অন্তে তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। কিন্তু ~~সদগুরু ও সদগুরু উপদেশ লাভ~~
করিয়া পীক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নরহস্তা রক্তাকরও এক দিন
সদগুরু ও সদগুরু উপদেশ পাইয়া জমবস্ত লাভ করিয়াছিলেন।

আবদুল লতিফ।

শ্রীরঙ্গম :

বিত্তীর্ণ-জলপ্রবাহ। বর্ষাসমাগমে বাবিরান্ধি গাঢ় বর্ণে বজ্রিত হইয়াছে।
জল-কূদে কূলে ভাবিয়া উঠিয়াছে। পর পাবে শ্রীরঙ্গমের শ্রামল স্নিগ্ধ কান্তি
দেখা যাইতেছে। তীরস্থিত বনবিন্যস্ত তরুবাঞ্জির অধোবিলম্বিত শ্রামল পত্রাবলী
প্রাণ স্পর্শ করিয়া গৈরিক বর্ণে জলরাশি ক্রমবেগে প্রবাহিত হইতেছে।
কারেবী নদীর উপরে বৃহৎ ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের গাড়ী বখন সেই পুলের
উপরে দিয়া বাইতেছিল, তখন আনবা একবার নীচে চাহিয়া গভীর জলরাশির
ক্রান্ত প্রবাহ দেখিতেছিলাম, একবার শ্রীরঙ্গমের তরুবাঞ্জির শ্রামকান্তি ও
একবার ত্রিচিনাপল্লীর শুভ্রসৌধচিত্ত তীর্থ-শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।
দেখিতে দেখিতে আনবা পূর্ব পাবে উপস্থিত হইল।

শ্রীরঙ্গম কান্দেবী নদীর মধ্যস্থ দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটির আয়তন বিশাল বলিয়া

এবং নদীর গতি এখানে বক্রাকার বলিয়া ইহার দীপঙ্ক সহজে প্রতিভাত হয় না; মনে হয়, ইহা বুকি নদীর পর পার। আমরা মন্দির-অভিমুখে চলিলাম। পথের ধারে দুই-একটা বাড়ী দেখা যাইতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গৃহের উপরেই বড় কবিরাজী আঁকা ত্রিবন্ধ—(ত্রিগুণ, সূর্যদর্শন ও পাঞ্চজন্ত)—বোঝা কবি দিতেছিল যে, ইহা বৈষ্ণব-প্রধান স্থান। কাবেরীর একটি সঙ্গীর্ণ প্রাচীর এই দীপের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। কাবেরী সেই দ্রুত প্রাণ অতিক্রম করিয়া একটু পরেই আমরা মন্দিরের বহির্দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা মিলিতে বিলম্ব হইল না। তাহার আশ্রয়ে দ্বারি রাখিয়া আমরা স্নানার্থ কাবেরীর ঘাটে ফিরিয়া চলিলাম।

নদীতীরে বহু নর নারী সংকল্প করিয়া স্নান করিতেছিল। আমরাও পাণ্ডার সম্মুখে সংকল্প করিয়া স্নান করিলাম। নদীজল খববেগে প্রবাহিত। আমরা সাহস করিয়া অধিক দূর অগ্রসব হইতে পারিলাম না। দুই চাবিট দ্রুত মন্ত্র আমাদের পাদদেশে দংশন কবির আমাদের মুহূর্ত্তের জন্য চকিত কবিরাজী কুপিতেছিল। স্নানান্তে মন্দিরাভিমুখে চলিলাম।

শ্রীমদ্ভগবৎ মন্দির অতিশয় বৃহৎ—অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া আছে। সুপ্রশস্ত-রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা স্তম্ভবৎ তোবণের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই তোরণের উপরে একটা গোপুর্ম্ম—মন্দিরের সর্বাপেক্ষা বাহিরে অবস্থিত প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রবেশ কবিবার এই পথ। এই তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আমরা রাজপথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক বিপণী ও গৃহারী দেখিতে পাইলাম। রাজপথের জনতার মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসব হইলাম। সম্মুখে দ্বিতীয় তোরণ, তাহার উপরে গোপুর্ম্ম, এবং মন্দির যেমন-কাবী দ্বিতীয় প্রাচীর। এই ভাবে উপর্যুপরি সাতটি তোরণের মধ্য দিয়া সাতটি প্রাচীর অতিক্রম করিলে, মূল মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই সকল প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এত অধিকসংখ্যক গৃহ ও বিপণী রহিয়াছে যে, মন্দিরটিকেই একটা নগরী বলা যায়। সর্বাপেক্ষা বাহিরের প্রাচীর দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইলের তিন-চতুর্থাংশ, এবং প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। মূল ভেদিকাভাগে অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে আমরা কাককাথ্যখচিত বহুসংখ্যক-স্তম্ভযুক্ত একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইলাম। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে মন্দিরের মধ্যে দেবের বৃহৎ মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে বিমান-মন্দির। আমরা দ্বারের নিকটে ডাইলাম। মন্দিরের মধ্যে শ্রীমদনার্থ্যনানী বহুসংখ্যক লক্ষ্যবশেষ-ভি

ভোগমুর্তি, এবং তাহাব পশ্চাতে কৃষ্ণপ্রভরনির্মিত বিশাল-শয়ান-মূর্তি—বিষ্ণু-
জনন-শয্যা-শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মন্তকের উপর অন্তের সহস্র কণা
বিস্তৃত।—অন্ধকারে এই মূর্তি স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এদীপে-
আলোক সূচিকণ বিগ্রহেব নানা স্থলে প্রতিফলিত হইতেছিল। পূজাসমাপনান্তে
আমরা বাহিরে আসিলাম। আনাদের মথার উপর ছাদ ধাকায় বিমান-
মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া বাইতেছিল না। কিছু-দূর দিয়া গিয়া মন্দিরবেব
সুবর্ণমণ্ডিত চূড়া দেখিতে পাইলাম। ছোট ছোট দোকানগুলি চিত্র, শঙ্খ,
আরনা প্রভৃতি বিচিত্র দ্রব্যে পবিপূর্ণ। যে রাজা এই মন্দির নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন, এক স্থানে তাঁহার, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধুর প্রতিকৃতি
দেখিতে পাইলাম। রত্ননাথস্বামী বহুমূল্যবান মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণালঙ্কার
আছে। উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে তাহা দর্শকগণকে দেখান হইয়া থাকে।

এই মন্দিরনিৰ্ম্মাণে কত অজস্র অর্থ-ব্যয় হইয়াছে, এবং এই দেবায়তন কত
দীর্ঘকাল ধরিয়া দূরদেশ হইতে আগত ধর্ম্মপিপাসু ভারতবাসীর হৃদয়ে ভক্তির উৎস
ছুটাইয়াছে, আমবা তাহাই ভাবিতেছিলাম। রামায়জের গুরু যামুনাচাৰ্য্য এইখানে
বাস করিতেন। যামুনাচাৰ্য্যেব মৃত্যুর পর রামায়জ কাঞ্চী হইতে আসিয়া এই স্থানে
তাঁহার পুণ্যময় দীর্ঘ জীবনেব অবিস্মরণকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোম্ভ-
স্বত্বেব বৈষ্ণব ভাষা—ভারতবিখ্যাত শ্রীভাষা—এবং অজ্ঞাত বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ
এই স্থানে রচিত হইয়াছিল। আজ প্রায় আট-শত বৎসর হইল, তিনি শ্রীবঙ্গমে
তাঁহার নন্দব দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। আবও
চারি-শত বৎসর পরে সুদূর বঙ্গদেশ হইতে সমাগত এক প্রেমোন্নত যুবকেব
শ্রীচরণস্পর্শে শ্রীবঙ্গমেব পবিত্র স্থলি পবিত্রতব হইয়াছিল। সেই যুবকটি
ভাবতের গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে চারি মাস কাল অবস্থান
করিয়াছিলেন। তাঁহার কুল্লাবিন্দসদৃশ—নয়নযুগল হইতে উৎসের ত্রায়
উৎসারিত প্রেমাপ্রভে কতবাব মন্দিরাজন অভিষিক্ত হইয়াছিল; তাঁহার মধুব
কণ্ঠে উচ্চারিত অন্তঃসম হরিনামে মন্দিরভাস্কর্য্য বায়ু তব্ধারিত হইয়া কত
স্বার এই প্রভবময় প্রাচীরে আঘাত করিয়াছিল।

কাণেরীতে স্নান কবি দেখি রত্ননাথ।

প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্ত্তন।

ঐতি প্রাপ্তি করি মানিল কৃতার্থ।

দেখি চন্দ্রকান হৈল সব লোকের জন।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

না জানি মন্দিরমধ্যে শ্রীবৈষ্ণব ত্রেহটভট্টের বাটী কোথায় অবস্থিত ছিল। সেখানে
মুহাপ্ত চারি মাস কাল বাপন করিয়া চাতুর্মাস্ত্র ব্রত পাবণ করিয়াছিলেন।

অনেকেই জনৈক ভক্ত বিপ্লবের অন্তর গীতা-পাঠের কাহিনী অবগত আছেন।
এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে সেই ঘটনা ঘটরাছিল, এবং শ্রীচৈতন্যদেবই সেই
উপহাসিত বিপ্লবের ভক্তির উৎকর্ষ সর্বজনের বিদিত করিয়াছিলেন। চৈতন্য-
চবিতামৃত হইতে আমরা সেই কাহিনী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

সেই ক্ষেত্রে বহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি শুধু-আজ্ঞা মানি।

দেবালয়ে আসি করে গীতা-আবর্জন।

অঙ্কুরের রূপে কৃষ্ণ হয়-রজ্জ্ব-ধর।

অষ্টাদশাধ্যায়ে পড়ে আনন্দ-আবেশে।

বসিয়াছেন তাতে যেন শ্যামল স্বপ্নর।

অশুদ্ধ পড়েন, লোক সব উপহাসে।

অঙ্কুরেরে কহিয়াছেন হিত উপদেশ।

কেহ হানে, কেহ নিশে, তাহা নাহি মানে।

তারে দেখি-হয় বোর আনন্দ-আবেশ।

আবিশ্ট হঞা গীতা-পড়ে আনন্দিতমনে।

যাবৎ পাঠো তাবৎ পাঠ তাঁব নরণন।

পুলকাত্ম রূপধের যাবৎ পঠন।

এই লাগি গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভু-মন।

প্রভু কহে—গীতা-পাঠ তোমার অধিকার।

মহাপ্রভু পুছিল তারে—শুন মহাশয়।

তুমি সে জানহ এই গীতার স্বর্থ মার।

কোন অর্থ জানি তোমার এত যত্ন-হয়।

এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।

বিপ্র-কহে—মুখ আমি, নন্দার্থ না জানি।

প্রভু-পদে যরি বিপ্র করেন বোধন।

সেই জ্ঞানহীন-ভক্ত ব্রাহ্মণের স্বপ্নে ভগবানের অদ্বৈত যে কৃষ্ণমূর্তি স্মরিত হইত,
পাণ্ডিত্যভিমানী-দর্শকগণের স্বপ্নে সে স্মৃতি হইলে তাহারা ধ্বংস হইত,—ইহা
দেখাইবার জন্যই লীলাময় মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে এই অভিনয়
কবিষাছিলেন।

শ্রীরঙ্গম দ্বীপে রঙ্গনাথ স্বামী-মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ঠৈবদেব
একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নাম জয়কেশবের মন্দির। বিখ্যাত পদ-
লিঙ্গের মধ্যে অপ-মব বা জলময় লিঙ্গ এখানে বিরাজিত। জয়কেশবের মন্দিরও
জুবুহৎ, এবং বহু-স্বাক্ষরার্থে শোভিত। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন
মন্দিরের সংস্কারকার্য চলিতেছিল। শুনিলাম, এক জন শ্রেষ্ঠ মন্দিরটি সংস্কৃত
কবিবাব জয়-করেক লক্ষ টাকা দান কবিষাছেন। প্রস্তরখণ্ড সকল উৎকীর্ণ
হইয়া যে-সকল মূর্তি গঠিত হইতেছিল, সেই মূর্তিগুলি প্রাচীন শিল্পকাৰ্য্যের পাদে
স্থান-পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ভুবনেশ্বর, শ্রীরঙ্গম ও-রামেশ্বরে প্রাচীন
কীর্তির সংস্কারকার্য দেখিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমাদের দেশে
বর্তমান সময়ে শিল্পের যে অবনতি ঘটয়াছে, শিল্পী-অভাব তাহার কারণ নহে।
প্রকৃত কারণ এই যে, দেশের শিল্পিগণ যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পায় না। পূর্বে

হিন্দু নরপতিগণ দেবমন্দির নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লইয়া
মুক্তহস্তে কার্য আরম্ভ করিতেন। দূর-দূরান্তর হইতে শিল্পিগণ তথায় উপনীত
হইত, এবং পরস্পরের প্রতিযোগিতায় জাতীয় শিল্পের উন্নতিবিধান করিত।
একসঙ্গে সে অমিতব্যয়িতা নাই। আমরা ইংরেজী ফ্যাশনে বাড়ী করিতে আরম্ভ
করিয়াছি। তাহাব মধ্যে ভাবভীর শিল্পের কোনও বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবাব
কখনও প্রয়াস করি না। যাহারা খুঁজিয়াছেন, তাহারা কখনও শিল্পীর অভাব
অনুভব করেন নাই।

মন্দির দুইটি দেখিয়া আমরা দ্বিপ্রহরের পর ছত্রে ক্রিয়া আসিলাম।
প্রথমে সূর্য্যকিরণে নগরের গৃহগুলি সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাহাদেবই মধ্য
হইতে নগরের ঠিক মধ্যস্থলে ত্রিচিনাপল্লীব পর্বত-দুর্গ হঠাৎ আকাশে
সমুথিত দেখিলাম। পর্বতের অনাবৃত পৃষ্ঠে সেনানিবাস, এবং সর্বোচ্চ শিখরে
গণেশের মন্দির-শোভা পাইয়াছিল। পর্বতবেষ্টনকারী পথ ধরিয়া দুই চারিটি
পল্লিক গতিশীল বিন্দু গ্রাম যাতায়াত করিতেছে। সন্ধ্যার সময় আমাদের
ট্রেন। সহর হইতে কয়েকটি আবশ্যক বস্তু ক্রয় করিয়া জিনিসপত্র বাধিয়া
আমরা ষ্টেশনে চলিলাম। আমাদের বটিকাগুলি দ্রুতবেগে ষ্টেশন
অভিমুখে ধাবিত হইত। পথের উভয় পার্শ্বে ফলবিক্রেতীগণ আতা ও
আপেলের ঝুড়ি লইয়া বসিয়াছে। রাজপথের নবনারীগণ গাড়ী দেখিয়া পথ
ছাড়িয়া দিতেছে। গৃহ ও বৃক্ষগুলিও শিরোভাগ অস্তোমুখ-হৃৎ-কিরণে রঞ্জিত
হইয়াছে। কাল আমবা-বহু দূবে চলিয়া বাইব। এই সকল দৃশ্য আর কখনও
দেখিতে পাইব-কি না সন্দেহ। এই চিত্তা স্বন্দর দৃশ্যগুলির মধ্যে করুণ ভাব
প্রকারিত করিল। দুই দিনেব প্রায় বেড়াইতে আসিয়াও সংসারী জীবকে
মায়ার বন্ধনে গড়িতে হয়!

শ্রীবনমুকুনার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গ বিজ্ঞান-মন্দিরের (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠা-উৎসব।

সত ১৪ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে বিশ্ববিশ্বকীর্তি আচার্য্য সারঙ্গদীপচন্দ্র বসু মহাশয়ের চিরজীবনের কামনা পূর্ণ হইয়াছে। কলিকাতার সারকুলার রোডে আচার্য্যের বাসভবনের উত্তর পার্শ্বে 'বঙ্গ বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনার' তাঁহার 'বিজ্ঞান-মন্দির' দেব চরণে নিবেদন' করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্য্য-পদে ব্রতী হইয়া বৈদিক মন্ত্রে শিষ্যগণকে দীক্ষিত করিয়াছেন। শিষ্যবর্গও বৈদিক যন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানশালায় গঠনে হিন্দু, মে কালের অনঙ্গরূপে হিন্দু। বক্তৃতা-শালায় চিত্রে হিন্দু আশা ও আকাঙ্ক্ষা হিন্দু চিত্রকর নন্দলাল প্রতিভার আলোকে ফুটাইয়া দিয়াছেন।

বক্তৃতা-শালায় অভ্যন্তরে ছাদে চন্দ্রাতপের মত ভারতের চিরন্তন প্রতীক শতদল ধলে ধলে ফুটিয়া আছে। সমুদ্ভূতি-প্রবণ উদ্ভিদের সুবিশাল মালা সেই সহস্রার-কমলকে বেষ্টিত করিয়া জগদীশচন্দ্রের নূতন আবিষ্কারের ভোতনা করিতেছে। বেদীর পশ্চাতে প্রাচীরে রূপক-চিত্রে নন্দলাল নব-ভারতের মনোহর আরাধকে নূতন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—পুণ্য প্রবাহিণীর পবিত্র পুলিন হইতে জ্ঞান-বিগ্রহ অগ্রসর হইতেছেন;—তাঁহার দৃষ্টি অনন্তে সমুদ্র। তাঁহার পার্শ্বে নারী—শক্তি পুরুষকে প্রেরণা দিতেছেন। ভারত যখন অনন্তের সন্ধানে প্রথম যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাঁহার মুখে এমনই জ্যোতি প্রতিভাসিত হইয়া থাকিবে। ভারত যখন জাগিয়া সত্যের উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ সত্যের আবিষ্কারকামনায় অনন্তে উদার-একাগ্র দৃষ্টি সমুদ্র করিয়া জীবন-তীর্থে বাবিত হইয়াছিল, তখন বৃষ্টি এমনই তাবে গগন পবন পূর্ণ হইয়াছিল। শক্তি-রাশিগণ নারী তখনও সত্যের সন্ধানে পুরুষোত্তমকে এমনই ভাবে প্রেরণা দিয়াছিলেন। মার জগদীশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা চিত্রকরের কর্ণনায় অপূর্ব গুণ্ডি পরিগ্রহ—কবিশা-মুগ্ধ জাতিকে গম্ভ্য তীর্থেব ইন্দিত করিতেছে।

ছবির নীচে রক্ত-পতাকার 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র অঙ্কিত । শব্দধ্বরের মধ্যে বজ্র । আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে বজ্রের সার্থকতা বুঝাইয়া দিয়াছেন । ত্যাগের অবতার দধীচি 'লোক-হিতার্থায় জগদ্ধিতায় চ' আপনাকে অস্তি দান করিয়া মানব-সমবায়ের নিকাম ধর্মের আদর্শ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । সেই অস্থিনির্মিত বজ্রে দানব-শক্তির অপচয় ও দেব-শক্তির উপচয় হইয়াছিল ।—সেই 'বজ্র' আচার্য্য জগদীশের আরাধ্যা বিজ্ঞানলক্ষ্মীর মন্দিরের প্রতীক । দধীচির সেই বজ্র-ও ভারতীয় সাধকের জন্ম-বাণী 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্র গলা-ধমুনার মত মিলিয়াছে । শক্তি ও তক্তির অতুলনীয় সম্মিলন । এ প্রতীক সার্থক হউক, স্বস্ত হউক, হে-ভগবান !

বৈদীর নন্দুখতাগে, স্বর্ণ, রক্ত ও তাম্রে নির্মিত সূর্য্য-বিগ্রহ । ধ্বান্তারি, সর্বপাপন্ন দিবাকর স্তম্ভায়-রথে অমন-পথে যাত্রা করিয়াছেন । অন্ধকার অস্তহিত, আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে । মহাছাতি কাজপেন্স ক্রিরণের—আলোকের,—প্রকাশেব দেবতা ; তাঁহার প্রসাদে-বিজ্ঞানলক্ষ্মীর এই মন্দির জ্ঞান-ময়ুধমাদার চিরনগুজ্জ্বল থাকুক । অজ্ঞানের অন্ধকার অস্তহিত হউক,—এই মন্দিরে ঐতিকলিত আলোকে বিশ্বাসীরা চিন্তে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক । ভারত-ধ্বস্ত-হউক ; আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের—সাধনা সিদ্ধ হউক ; প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ' তাঁহার অমুভূতিলজ্ঞ জ্ঞানের দীপ হইতে ভারত-বিগ্নে অগণিত-দীপ-জীবনের জ্যোতি সঞ্চার করুক ।

ছয়টার পর জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন । সমগ্র সভাজন সন্মোহমান হইয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন । সম্মুখে রক্তকোষের-পটে দেদীপ্যমান বজ্রে, বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রে, এবং জগদীশের বিগ্রহে—জাতির নব-তীর্থের যাত্রী পুরুষোত্তমের অবভাস দেখিলাম । মনে আন্তরিক-কামনা জাগিয়া উঠিল—যা ! ভূতানার এই একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের সাধনার পথ প্রশস্ত করিয়া দাও—কালের প্রভাব হইতে মুক্ত ব্যাধিয়া এই-বাদ্যালীর বাঙ্গালীকে বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আবোধনাব্যবকাশ দাও ।

স্বমধুর-সঙ্গীতের পর জগদীশচন্দ্র বৈদিক মন্ত্রে আচার্য্য-পদে-বৃত্ত হইলেন । আচার্য্য-বরণের পব বৈদিক মন্ত্রে তিনি কয়েক জন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন ; তাঁহারাও বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । তাহার পর সাব রবীন্দ্রনাথের রচিত 'আবাহন'-নঙ্গীত গীত হইল ।—

মাতৃমন্দির পূণ্য অঙ্গন

সকল বোণী, সকল ত্যাগী,

কর মহোচ্ছল আজিহে।

এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,

শুভ শব্দ বাজহ বাজহে।

এস দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন মুক্তবন্দ সমাজ হে।

ঘন তিসির রাজির চির প্রতীক্ষা

এস জ্ঞানী, এস কর্মী, নাশ ভারতলাগ হে।

পূর্ণ কব, লহ জ্যোতির্লীলা,

এস মঙ্গল, এস গৌরব,

যাজিঘল সব সাবহে।

এস অক্ষয় পূণ্য দৌরভ,

শুভ শব্দ বাজহ বাজহে।

এস ভেদঃহৃদ্য উচ্ছল কীর্তি অধর মাক হে।

বল 'জয় নরোত্তম, পুরুষদত্তম,

বীর ধর্ম পূণ্য কর্মে বিশ্বদয়ে রাজ হে,

জয় তপস্বীরাগ হে।

শুভ শব্দ বাজহ বাজহে।

জয় হে, জয় হে, জয় হে।

জয় জয় নরোত্তম, পুরুষদত্তম,

এস—বহু মহাসনে, মাতৃআশীর্ভাষণে,

জয় তপস্বীরাগ হে।

সকল সাধক এস হে, যত কর এ সেবা হে।

জয় হে, জয় হে, জয় হে।

সঙ্গীতের অবদানে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিবার উপায় নাই। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—

‘হঁহা ‘পরীক্ষাগার’ নয়, বিজ্ঞান-লব্ধীর মন্দির। মন্দির অন্বেষণ মন্দিরেই করিতে

হয়। অতীন্দ্রিয় জগতের মন্দির উপলব্ধি অমুভূতিসাধ্য। সে অমুভূতি

বিকাশ যে সাধনানীপেক্ষ, সে সাধনা মন্দিরেই সম্ভব। তাহার পর ববীজ

মাধের রচিত ভারতভাগ্য-বিধাতার বন্দনা—বাল্মীকীর আশাব গান, আকাজক্ষাব

গান, ভক্তিব গান, শক্তির গান, মুক্তির গান, ভারতের যশস্বিনী—সমবেত

কণ্ঠে গীত হইল।—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

পল্লাব সিদ্ধ শুভ্রাতি মরাঠা জাবিড উৎকল বহু

রিক্সা হিমাচল ঘমুনা গল্পা উচ্ছল মলধি-তরঙ্গ।

তব শুভ-নামে জাগে, তব শুভ আশিষ মাগে, গাহে তব জয়গাথা।

জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

জয়হে জয়হে জয়হে জয় জয় জয় জয় হে।

অব্রহ তব আল্লান প্রচলিত, শুনি তব উদার বাণী

হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পাবসিক মুসলমান খৃষ্টানী

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে, প্রেমহার হয় গাথা।

জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয়হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।

জয়হে জয়হে জয়হে জয় জয় জয় জয় হে।

পতন শুভাগম-বঙ্গুর পথা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,

হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুগ্ধরিহ পথ দ্বিনবাঘি ।

নাশপ বিপ্লবমাঝে তব শয্যামনি বাজে, সন্ধ্যা-দুঃখ-জাতা ।

জনগণ-পথ-পরিচায়ক জগৎ ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ ।

যেই তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মুচ্ছিত দেশে

জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল-নত নবন অনিমেষে ।

দুঃখপ্রেম-আতঙ্কে রুদ্ধ করিলে অন্ধ-মেঘমরা তুমি নাভা !

জনগণ-দুঃখজারক জগৎ ভারত-ভাগ্য-বিধাতা !

জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ ।

রাজ্য প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি-পূর্ণ উদয়গিরিজায়ে-

গাহে বিহঙ্গম, পুষ্প নদীর নবজীবন রস ঢালে ।

তব বরুণাঙ্গণ-রাগে নিখিল ভারত জাগে, তব চরণে নত মাথা ।

জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ ।

জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ জগৎ ।

সত্যস্ব সন্ধ্যা দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ কবিলেন ।

তাহার পর, যাহাদের জন্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা

করিলেন, তাহারা—বঙ্গালার নন্দদুলাল—বঙ্গালীর উত্তরপুরুষগণ—বন্দে

নাতিরম্ মন্ত্রে হকার, কবিতা প্রাণশক্তির ও বঙ্গালীর নর্যগত ভক্তির পরিচয়

দিয়া সমবেত ভক্ত-সম্প্রদায়ের ভক্তিনন্দ চিত্ত আশায় উদীপ্ত করিলেন ।

সত্যস্ব হইল ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণ ।

নিবেদন ।

বাহিন বৎসর পূর্বে যে অরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, সে দিন দেবতার করুণা

জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম । সে দিন যে মানস করিয়াছিলাম,

এত দিন পবে তাহাই দেবচরণে নিবেদন কবিতোছি । আজ যাহা প্রতিষ্ঠা

করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য,

পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে,

তাহা শাস্ত্র কবিতা হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয় ।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার অস্তিত্ব অনেক মানব, আবশ্যক। যাহা কল্পনায় রাজ্যে ছিল, তাহা ইঞ্জিনিয়ার করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্মিত ইঞ্জিয় যখন পূর্বাপত্ত হয়, তখন-ধাতুনির্মিত অস্ত্রাদিরের শরণাগত হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে অশব্দ ও অক্ষকারময় ছিল, এখন তাহার গভীর নিম্নে ও চূড়ান্ত আলোরশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইঞ্জিনিয়ার না হইলেও দ্রব্যনির্মিত কৃত্রিম ইঞ্জিন দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরও অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইঞ্জিনিয়ার অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসযোগ্যই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সভ্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা হই-একটি ঘটনাব দ্বারা-হয় না, তাহাও প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্য-প্রতিষ্ঠার স্বত্বই মন্দির উথিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোনও উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কর্তনও বিফল হয় না, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ-শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাহারা কর্তব্যদগ্ধে আপ দিয়াছেন, এবং প্রতিকূল তরঙ্গাবাতে-মৃতকর হইয়া অদৃষ্টের নিকট প্রাণত্যাগ স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে ক্রমশ তাহাদের হৃদয়।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষায় অধ্যা বলিব, তাহা শেষ করিতে হইল জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র সত্যিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য প্রাবৃত্ত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বদ্বিগোচর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্তই স্বীয় জীবনে-পরীক্ষিত-সত্যদ্বারা যে হই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ কবিনে। পরীক্ষাব্যাপ্ত, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অষ্ট শতাব্দীর পূর্বের কথা। তাহাবই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অস্ত্রের উপর প্রভুহাবিতার অপেক্ষা নিজের জীবন-নাশন বহুতর প্রেরণ। তিনি জনহিতকর নানা কার্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাহার সমস্ত চেতনা ও মর্মে নিয়োজিত

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল । ইংল-সম্প্রদেয় কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দাবিদ্র্যের লাহুনা ভোগ করিতে হইয়াছিল । সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন । এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন্ কোন্ বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম । পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল ।

তাঁহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি । বিজ্ঞানের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী-মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত । কিন্তু তাহাব মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় ? শিক্ষাকার্য্যে অল্পে যাহা বলিয়াছে, সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত । ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অল্পসন্ধান কার্য্য কোনও দিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম । বিলাতের স্তায় এ দেশে পরীক্ষাগার নাই, হৃদয় যন্ত্র-নিষ্কাশণও এ দেশে কোনও দিনও হইতে পারে না, তাহাও কত বার শুনিয়াছি । তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হাবাইয়াছে, কেবল সেই বৃথা পরিতাপ করে । অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে । ভারতই আমাদের কর্ণভূমি, সহজ পথ আমাদের জন্ত নহে । তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া এক জন তাহাব সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল । তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না । বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুদ্ধিতে হইয়াছিল । এত দিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে ।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল । চার্লসীভে আচার্য্য হার্টস বিহাৎতবল সমক্ষে যে দুকহ কার্য্য আবস্ত করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল । কিন্তু এদেশের কোনও প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্কৃত-সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাই কোনও সভাই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিগেন না ; যুদ্ধিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান । অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্তমানকালের সর্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি । আশ বার্ষ বৎসর পূর্বে তাহার উত্তর পাইলাম ; তাহাতে

অবগত হইলাম, যে আমার আবিষ্কারা রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে, এবং এই সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সে দিন যে আমি প্রাজ্ঞিত হইয়াছি, তাহা কখনও নির্দোষিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পব বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পবীন্দ্র এক দিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্রের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চমান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন-সংবাদ ধবিবার-কলু নির্মাণ করিয়া পরীক্ষা কবিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলেব সাড়া কোনও অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি যেকপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই-একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলেব ক্লান্তি দূর হইল, এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল।

উদ্ভেকক ঔষধ-প্রয়োগে তাহার সাড়া দিব্য শক্তি বাড়িয়া গেল, এবং বিষ-প্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের অন্ত অস্তহিত হইল। যে সাড়া দিব্য শক্তি

জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, অড়েও তাহার-ক্রিয়া-দোষিত হইল। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সন্মুখে পরীক্ষা দ্বারা

সম্প্রমাণ কবিত্তে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু-জরাজীর্ণপ্রকৃতি প্রচলিত মতেই বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই এক জন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিবর্তিত হইলেন। তন্মিহি আমি

পদার্থবিৎ, আমার স্বীয়-গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকারচেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার

পরে আরও দুই একটি অশোভন ঘটনা ঘটয়াছিল। যাহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জন আমার আবিষ্কার গণ্ডে নিজেই বলিয়া

প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিম্নয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর

যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য-পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল এক দিনের অন্তর্গত মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি

অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোনও বৃহৎ

কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্বুধ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন।—যদি অসীম গৈরী থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনও দিন দেখিতে গাইতেন, বার বার পরাক্রান্ত হইয়াও যে পরাজয় হয় নাই, সেই এক দিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী-পর্যটন

ভাগ্য ও কার্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম, উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দিন আমাকে ভ্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্যোগ্যও এক দিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরাজ এক দিন আমাব পরীক্ষাগারে দেখিতে আইসেন; তিনি উদ্ভিন্ন-জীৱন সম্বন্ধে যে সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং যে সকল কর্মকাণ্ড প্রামাণ্য শিল্প-অনুসারে এই সকল কল-নির্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক। জানিতে পারিলাম, সেই দিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত গবর্নমেন্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্ত আমাকে পৃথিবী-পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে অসংখ্য লইয়া কেহ আমাব প্রতীক্ষা কবে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আনির ক্রেতা দেখাইবার জন্তই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী, অদৃষ্টে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতবর্ষে জয় হইল, এবং গাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্মান অধ্যাপক ফেফাবের অর্ধ শতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমাব কোনও কোনও আরিফিয়া ফেফাবের করেফটী মতেব বিরুদ্ধে। ইহাতে—উঁহাব অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ

রক্ষা কবিত্তে গিয়াছিল। সেখানে ফেলার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে
আমায় নিমন্ত্রণ কবিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে
আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাহার নিকটে
পৌছিয়াছে; তাঁহার হৃৎকর রহিল যে, একজন সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে
দেখিয়া যাইতে পারিগেন না। বাহার বৈবভাব আশঙ্কা করিয়াছিল। তিনিই
মিত্ররূপে আনাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, বাহা আপন
পর্যাপ্তবয়স্ক মধ্যম সত্যের দ্বারা দেখিয়া জানেন উৎকল্ল হয়। তিনি সংস্কৃত বয়স
পূর্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবান্ আসিয়া যখন
জীবেদের বর্ষস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন,
সার্বিক আনার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডী নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য
অর্জুনের।

পৃথিবী পর্যটন ও জীব জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে
নূতন সত্য আবিষ্কার কবিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনা আবশ্যক।
জগতে তাহার প্রচার আবশ্যক। ইহাতে আমার পূর্বসঙ্গ নৃত্যের হইয়াছে।
নয় দিন সংগ্রামের পর ভাবত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার কবিত্তে সমর্থ
হইয়াছে, তাহা বেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য বাহারা অনুময়ণ করিলেন,
তাঁহাদের পথ যেন কোনও দিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোনও স্থান
আছে, বাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে।
বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যে
অবিধার জন্য তাহা বহু বিস্তৃত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভিন্ন
প্রাচীর উথিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তগণ অতি বিচিত্র এবং বহুসংখ্যক। এত বিভিন্নজাত
মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সত্য
চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরনয়ন নিস্তরু অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোনও
সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে
সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতর
সন্ধানে ছুটিয়া পড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাধিয়াছে। এতদ্বারা ভারতীয়
প্রাধিক, কখনও তাহার চিন্তা-কল্পনার উন্মুক্ত বাজ্যে অবাধে প্রবেশ কবিত্তে
এবং পথ মুহূর্তেই তাহাকে পাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশবলে জড়ন

অজুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে, এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে, তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম যেরূপ নমূল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষা-প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাহিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল, তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম-চক্ষু পবীক্ষা কবিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন বহুস্ত-অবিকার করিয়াছে যে, তাহার দুইটা চক্ষু এক সময়ে জাগ্রিত থাকে না, পঞ্চায়ত্রে একটি ঘুমায়, আন একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্থতির অনুশ্রু ছাপ প্রকাশিত কবিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক-সাহায্যে ক্রুর প্রস্তরের ভিতরের নিষ্কাশকোশল বাহির করিয়াছে। আশবিক কারিকার্য্য ঘূর্ণ-মান-বিহীন-উদ্ভিগ্ন দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্দোষ জীবনের বেদনাচাক্ষু মানবের অল্পভূতির অন্তর্গত করিয়াছেন। হির বৃক্ষের অদৃশ্য বুদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে, এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বুদ্ধি মাত্রা পরিবর্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সমুচিত হয়, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎকুল কবে, যে মাদক তাহাকে অসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ কবে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ-ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবগন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন-বিষের প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুযন্ত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণিত করিয়াছে যে, যে সকল কাবণে মানুষের স্নায়ু উত্তেজনা বদ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ু উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কখনো প্রসূত নহে। যে সকল অল্পসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর-পরিস্র-গবীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপবিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অল্পসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানা পথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, এমন কি, মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোনও বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভাবতীর সাধকের দৃষ্টি নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্দেগীসঙ্গমেই সেই মহাসীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অল্পসন্ধান বিজ্ঞানের বহুশাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাও বৈদ্যে নানা ব্যাবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত

হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি এক জনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটামাত্র বিরয়েব লুপ্ত বীক্ষণাগার-নিষ্কর্ণে অপরিসীম বন আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতিবিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানবিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, এ কথা বিস্তরজন-মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে, কেবলমাত্র বিশ্বাস-বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্ততম। হইতে পারে না বলি-কোনও দিন পরাশ্রয় হই নাই, এখনও হইব না। আম্রাব যাহা নিজস্ব বলিদ্বারা মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই কার্যেই নিয়োগ করিব। বিস্তরহস্তে আসিয়াছিলেন বিস্তরহস্তেই ফিবিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতাদ্বারা প্রসাদ-বলিয়া মানিব। আর এক জনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাহার সাহচর্য আমার-দুঃখ ও পরাজয়ে-মধ্যেও বহুদিন-অন্ত-করিসিবে। বিধাতার করুণা হইতে কোনও দিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দেহান ছিলেন, তখনও ছুই এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেঁটন করিয়া রাখিয়াছিল। আম্র তাঁহা বা স্মৃতি-পথ-পারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত-বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশা-কাঁচা আবশ্য করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও সন্মত করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুই জন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্বে তাঁহাদের একটী সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিলাম। গবর্নেন্ট এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছেন।—এই সকল দেখিয়া-মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সফল করিয়া-ছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয় ত, দেহিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিশেষ হইতে স্যাংগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অমূল্যবস্তু হই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর জগতে সেই নূতন-তত্ত্ব প্রচার। সেই জন্যই এই স্মৃতি-বক্তৃতা-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

আমাব-পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অল্প কোথাও নির্মিত হয় নাই।

শেষ সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এ স্থানে কোনও বহু-কুশ্লিষ্ট তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান-সমক্ষে এই মন্দিরে যে সকল আবক্ষিত হইয়াছে, সেই সকল নূতন সত্য এ স্থানে পরীক্ষামহকারে সর্বোচ্চ প্রমাণিত হইবে। সর্ব জাতি সকল নরনারীৰ জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বাৰা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্য জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার-এইরূপে জগতের সম্প্রতি হইবে, এবং হয় ত তদ্ভাৰা ব্যাবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোনও পেটেন্ট-সত্তা হইবে না; কাৰণ, আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলভ্যের উপায় নহে।

আমাব আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্বে ভাবতে জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদবে গৃহীত হইয়াছিল। এখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, এখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন গৌণময়। বাহা সত্য, বাহা স্নান, তাহাই আমাদের আবাস্য। শিল্পী কাকর্ষ্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিন্ন-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতীকনি। সে জীবন আহত হইয়া মুগ্ধ প্রায় হয়, এবং কণিক মুগ্ধ হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্তমান। এক দিকে জীবনের, অপর দিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্তে আমরা আঘাত দ্বাৰা মুগ্ধ হইতেছি, এবং পুনরায় সজীবিত হইতেছি। আঘাত-বশেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাচিয়া বহিয়াছি।

একদিন আসিবে, যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন বাহা হেলিয়া উঠিবে, তাহা আব উঠিবে না, অল্প কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বকনের ত্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীৰ জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা।

কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকর্ষ ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার বাজস্ব কোন কোন দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশেষ পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ন্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুফানভূত, অনীম জীবসকলের অমুভূতি-শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে? তাহার পব কি কবিরাই বা দ্বায়ুহুজের উস্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরিণী স্নেহ-মনতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোনটা অজয়, কোনটা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলীদের খেলা শেষ হইবে, এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই সকল অশরীরিণী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে— অথবা অধিকতররূপে পরিস্কৃত হইবে?

কোন-রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধাত্তে পূর্ণা পৃথিবী জইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু-সর্ব-জয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহাব আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয়-অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও-নির্দোষিত হয় না। অমবস্থেব বীজ চিন্তার বিস্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোনও দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান-প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসব পূর্বে এই ভারতবর্ষেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব-ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, হুংঘমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সুসাগরী ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমূলক-রাজ অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই বৈ আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্থ।

এই আমূলকের চিহ্ন মন্দিরের গায়ে প্রথিত বহিরাছে। পতাকাধরপ সর্বোপরি বহুচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র-নিপাপ দধীচি মূর্তির অস্থি দ্বারা নিখিত হইয়াছিল। যাহাব পবর্ষে জীবনদান করেন, তাহাদের অস্থি দ্বায়ী রক্ত নির্গিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবযেব বিনাশ ও দেবভে

প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে । আজ আমাদের অর্থ, অর্থ আনলকম্বাজ ; কিন্তু পূর্বে
দিনেব মহিমা মহন্তর হইরা পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে । এই আশা লইয়া
অন্ত আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম ; কলা হইতে পুনরায় কথ-
শ্রোতে জীবনতরী ভাসাইব । আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্থ লইয়া
এখানে আগিয়াছি ; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু জন্ম-মন্দিরে ।
তাঁহার পূজাব প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহবলে, অন্তরের শক্তিতে, এবং জন্মসেব-
ভক্তিতে । তাঁহার পর সাধক কি আশীর্বাদ আকাজ্জক করিবে ? যখন
প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন কবিরাও তাঁহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন
পবাস্ত্রিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুব অপেক্ষা করিবে ; তখনই আরাধ্যা দেবী
তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন । এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাঁহার
পুরস্কার লাভ করিবে ।

বক্ষিষচন্দ্র ।

[শ্রীকৃষ্ণ অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী কবিতা হইতে ।]

মধু-পুষ্পভরা এই মধু দিনে আজ,
সহসা নীরব তব পিককুল-রাজ,—
হে বসন্ত !—প্রাণসম ছিল যে তোমার,
কোথা গেল বল সেই সুধাস্বর-ধার ?
সৃষ্টিকাবি-বুষ্টিধারা, কোকিল-কুজন,
ভ্রমর-গুঞ্জন, মুহূঃ মল্লর পবন,
নব-মুকুলিত তরু, আনন্দের হাসি,
ভরা-হৃদি-ভার-হারি থরা-অঞ্জন-শিশি,
নবোদগত ভাবচয়, কোমল, মহান,
যুধিকা ও শতদল, বিহঙ্গের গান,—
তোমারি সন্তান সব,—প্রতিভার বলে,
কবি' রূপান্তর হুচু-শব্দ-শতদলে,
রচিত সে প্রাচীন স্রষ্টা গ্রন্থচয়,—
চিত্রিয়া বিবিধ—

রমণীর মধুমাখা কটাক্ষ কোমল,—

প্রণয়-রসের উৎস, পবিত্র নিম্নজ।

কি মধুর বাণী তব হে শিল্পি-উত্তম !

প্রতি ছত্রে চম্পকেব বর্ণ মনোরম ;

গন্ধরাজ পুষ্পবাস—সৌরভের সাব

নারীর নুপুর-কাঞ্চী-কঙ্কণ-বঙ্কার ;

গৃহের আনন্দরোল ; হাটের শহর,—

বায়ু সহ রত, যেন, পত্রের মর্ম্মর।

পাঠ করে যেই তব রচনা স্তম্ভব,

নেত্রে তার খুলে যায় দৃষ্ট মনোহর ;

প্রতি পত্রে প্রকটিত বিশ্ব চরাচর ;—

হর ক্ষত, দিবা, রাত্রি, কত নারী-নর,

বিরাজে তথায় ; শুধু নহে মনোরম,—

কীৰ্ত্তিত, প্রকৃত বলি মনে হর ভ্রম।

প্রকৃতির লীলাভূমি, হে বঙ্গ জননর !

গিরি, নদী, অধিত্যকা, কানন, প্রান্তর !

প্রেমের জনমভূমি ! পুষ্পের আকর !

যুদ্ধে যুদ্ধে তব মধু কোকিলের স্বর,

মলয়-নিঃস্বন সুদা জন-চিন্ত-হর ;

কিস্ত এ কবির ভাষা আরো মিষ্টতর !

এ কবির প্রাণ ছিল যুক্ত তব প্রাণে,

প্রানিত স্বরূপ তব তাই হৃদয়জ্ঞানে।

রাজোচিত ছিল তার প্রকৃতি মহান,

দেবোপম ধৈর্য্য, চক্ষু দিব্য-দীপ্তিমান।

আয়স-কঠোর এই নিরানন্দ দিনে,

ধীর-পদে বীরসম নির্ভীকচরণে,

চলিত সে, স্থির-লক্ষ্য ; প্রতি পদে তার,

সৌন্দর্য্য ঢালিত বশি হবিয়া আধার,—

বীর-হস্তে লৌহ-অসি-যথা শোভা-পার,

কুসুমের হার যদি তাহাবে সজ্জায়।

উষর মরুর মাঝে, যতনে আপন,

করিল সে রক্ত-বক্ষ-গোলাপ বপন ;

গাহিল সে মহীগান, গলায়ে পাবাণ ;

গুণ-কল্প ধরে নাই হেন মিষ্ট তান।

শ্রীঅতুলচন্দ্র বোষ।

রাজলক্ষ্মী

উষা বাহ্যঃ মেয়ে, অরুণের কথা,
 ঢালি দিল ঘেন আলোকের বজ্রা
 নীরবে নিশির নিবিড় আধারে।
 ভবি' গেল বিশ্ব আলোর জোয়ারে।
 সাগরের নীল ফেনপুষ্পরাশি
 ভেদ করি' মরি, গাল-ডরা হাসি,
 এসেছেন আহা জননী ঠান্ডিরা;
 নাকেতে বেসর, কাণে-দোলে হীরা।
 বদনে এখনও হাসিছে বালেন্দু;
 কেশের তরঙ্গে নীল-নীল-বিন্দু
 এখনও ঝরিছে মায়ের আমার;
 ঝলকে তলকে মুকুতা'ব হার;
 ভুঞ্জে স্বৈত শাখা মরি কি মধুর।
 চরণ পা'রলে প্রবীকনুপুর;
 যেখানে গাড়ান আমার অমুজা
 নিত্য সেথা সুখ, নিত্য সেথা পূজা।

এই বালিকার সৌন্দর্যের শিখা
 করিছে ঘাহন মায়া-যবনিকা।
 সে অনলে আজি, নেই-হোমি যোগে,
 ভক্তি-সংস্কারস ঢালি অম্বরোগে,
 করি জয়ধ্বনি, ডাকিতেছি তোরে,
 দেখা দে, দেখা দে, দেখা দে মা মোবে।
 এ অনিত্যরূপে হয় না মা তৃপ্তি,
 নিত্যরূপে তোর প্রকাশিয়া দীপ্তি,
 দেখা দে মা আজি। কাণেতে কুন্তল,
 রত্ন চেলী অঙ্গে কবে ঝলমল,
 চরণে নুপুর আনন্দে ঝঙ্কারে,
 মধুব বচনে পিক-বধু হাসে,
 যেখানে পা পড়ে ধরা হেসে উঠে।
 পাদ-পদ্ম-স্পর্শে পদ্ম-ফুল ফোটে।
 সেই নিত্য রূপে দে মা দরশন,
 মহা ধ্যানে আজি মুদিত নয়ন।

ঐ দেবেন্দ্রনাথ সেন।

স্থাপত্য-শিল্প।

এইবার স্থাপত্যের উৎকর্ষসাধনে কি কি বিষয়ের প্রয়োজন, তাহার আলোচনা করিবা। এই আলোচনা কবির পূর্বে দেখা যাউক যে, স্থাপত্যের মধ্যে কত প্রকারের বিভিন্ন শ্রেণী বর্তমান। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—নন্দিত বা দেবায়তনসংলগ্ন, স্মারক, স্মারিক, সামরিক ও বাসস্থলীয়। উদাহরণ দ্বারা এই শ্রেণীগুলির অর্থ বিশদ করা যাউক। ইহাদের পাশ্বে ইহাদের অন্তর্গত উদাহরণগুলি সন্নিবেশিত হইল।

দেবায়তনসংলগ্ন—অগ্নিপ্রাচীর, সেন্টপলের গির্জা (St. Paul's Cathedral),

দিল্লীর জামে মসজিদ, আবু পর্বতশৃঙ্গ দিলোয়ারা প্রভৃতি।

স্মারক—ভাঙ্গমহল, এবেল-স্মিত Lysistrates Monument, সারনাথের স্তূপ, কুবাকড়

বাইজি সাহেবের সমাধি প্রভৃতি।

স্মারিক—কলিকাতার রাইটাস বিল্ডিং, হাইকোর্ট, লণ্ডনস্থ প্যারিসিয়ানেন্ট প্রভৃতি।

সামরিক—দিল্লীর দুর্গ, আগার দুর্গ, কলিকাতার দুর্গ ইত্যাদি।

বাসস্থলীয়—তোবার আনার মত সাধারণ বা ধনী লিখনের আবাসস্থলী, বা রাজ-

প্রাসাদ, যেমন, ভার্সাইল (Versailles) প্রভৃতি।

পূর্বোক্ত শ্রেণীগুলিকে আবার উহাদের অন্তর্গত ক্ষুদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাহা-হউক, প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটী বিশেষত্ব আছে;

এই বিশেষত্ব উদ্দেশ্য বা সার্থকতা দ্বারা অল্পপ্রাণিত। সুতরাং বুঝা যেন যে,

স্থাপত্যের উৎকর্ষবিধানের সার্থকতার সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। এ কথা

আমি পূর্বে প্রথমে বর্ণনায় চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধ উদ্দেশ্যের রক্ষা সাধিত

হইলেই যে স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধিত হইল, ইহা কখনই কেহ স্বীকার করিবেন

না। প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কোনও একটি দৌর্ভাগ্যে

নিমিত্ত করিলে ও তাহাতে মৌলিকতার অবতারণা করিলে কেহ যদি মনে

করেন যে, স্থাপত্যের সার্থকতা রক্ষিত হইয়াছে, তিনি নিতান্ত ভ্রান্ত। শরীরের

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্ষুদ্র ও পেশীবহুল হইলেই যে দেহে লাবণ্যের পরিচয় পাওয়া

যাইবে, তাহা আশা করহি অজ্ঞান। দেহের কমনীয়তা ও লাবণ্য এক রকম

বস্তু ; ইহার সন্ধান, শরীরবিজ্ঞানে কেন, কোনও বিজ্ঞানেই মিলিবে না। এই প্রকার কোনও সৌধের সার্বিকতা শুদ্ধ উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, যৌগিকত্ব ও সূচুতায় মিলিবে না ; ইহার সার্বিকতা সৌন্দর্য্যবিধানে। দেহের সম্বন্ধেও যেমন, সৌধের সম্বন্ধেও তেমনই। দৈহিক-সৌন্দর্য্য যে কি এবং কোথায়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না বটে কিন্তু ইহা বেশ অনুভব করিতে পারা যায় ; তেমনই স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য কি, এবং কি প্রকারে সংরক্ষিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। তবে এ কথা স্মার্য্য যে, অলঙ্কার সম্পাদন করিলেই সম্মিলনে বা সঙ্গীতবাহ্য সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। অলঙ্কার অনেক সময় শোভাবৃদ্ধি না করিয়া ইহার তিরোধানের সহায়তা করে ; কোনও হস্তের রক্ষা বিজ্ঞতা অনেক স্থলে তাহার উপরিবিহীন অলঙ্কার অপেক্ষা অধিকতর মনোজ্ঞ, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। গিয়াসুদ্দিন টোগলকের সমাধিস্থানের বাহ্য-সম্পৎ কিছুই নাই বলিলেও চলে, কিন্তু রচনা ও অঙ্গসংস্থানে, এবং অলঙ্কার-বিমুক্ততার মধ্যে এমন এক অতুল্য সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে যে, সমাধিটির প্রতি দুইনিমেষ-করিলে মন এক অব্যক্ত রসাবেশে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ সৌন্দর্য্য ইংলণ্ডস্থ নব্যমান স্থাপত্যেরও এক বিশিষ্টতা।

অনেককে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে-অটলিকাকে সুন্দর করিবার আরম্ভকতা কি ? ইহার উত্তর যে কি দিব, তাহা ত ভাবিয়া পাই না। আমাব কেবল একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা এই।—পৃথিবীতে থাকিতে হইলে মানুষের বাস্তববোধের আয়োজন করা ও তজ্জন্ত অর্থোপার্জন করাই ত যথেষ্ট। সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির আলোচনা বা স্বপ্নের সম্ভবিত্বগুলির পরিপোষণের কোনও সার্বিকতাই ত থাকে না ; তথাপি আমবা জীবনধারণোপায়ের বন্দোবস্ত ভিন্ন নানা আপত্তিকর অপ্রয়োজনীয় কার্য্য করি কেন ? কবি এই জন্ত যে, যাহা মানুষকে মানবের জীব হইতে বিশিষ্টতা প্রদান করে, এবং যাহা দ্বারা মানুষকে “তাদ্রাস্ত্র্য”^{*} সিদ্ধ হয়, সেই বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনের প্রয়োজন বলিয়া। এই কারণেই আমাদের বাস প্রভৃতিতে শুদ্ধ সূচুত্ব ও সুবিধামূল্যবায়ী করিয়া নির্মাণ করিলে আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করা হইবে না, এবং স্থাপত্য মানুষের রচিত বলিয়া ইহার সার্বিকতারও লোপ হইবে।

বসনাধূর্য্য উপভোগ করিবার জন্ত যেমন কাব্য বা সঙ্গীতের সৃষ্টি, প্রয়োজনীয়তার

* ‘অন্যোনিয়ান্তঃ ভাষাঙ্গাৎ বহুভাষাচ্ছিত্ত্বং ভাষাগিত্যাকাংক্ষা’ । ভাষাপরিচ্ছেদঃ ।

কথা ছাড়িয়া দিলেও স্থাপত্য সম্বন্ধেও এ কথা প্রয়োজ্য; যে স্থাপত্যে রসাহাদন করিতে পারা যায় না, তাহা নগণ্য, তুচ্ছ। কাব্যে বা সঙ্গীতে যেমন হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, স্থাপত্যেও তদ্রূপ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—ধর্ম্মের চব্বয় পবিত্রিতি বসোপভোগ দ্বারা পরমানন্দ লাভ করা; কেন-না, সেই ত্রয়ই রসস্বরূপ। এ হিসাবে স্থাপত্যেরও আধ্যাত্মিকতা সিদ্ধ হয়। এই কারণেই মহাকবি গেটে (Goethe) গ্রথিক স্থাপত্যকে “প্রস্তরীভূত ধর্ম্ম” (petrified religion) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; তিনি এই স্থাপত্যকে মনুষ্যের আধ্যাত্মজ্ঞানের সহায়ক-স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এক একটি সৌধের প্রুতি দৃষ্টিনিমেষ করিলে আনন্দের সৌন্দর্য্যবোধ ত দূরে থাক, হৃদয়ে এমন এক একটি বৃত্তি আগিয়া উঠে, যাহা আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে অধোগামী করিয়া ডুলে। কলিকাতার Town Hall ও তৎপার্শ্বস্থিত Temple-Chambers সৌধ অনেকে দেখিয়াছেন; কেমন বিপ্লবের কথা যে, দুইটি বিপরীতধর্ম্মাক্রান্ত ও বিপরীত বৃত্তি-উত্তেজক সৌধ পাশাপাশি নির্মিত হইরাছে; একটিতে যেন দ্বিতীয়জীবনেও জটিল সমস্তাভ্যাসের ন্যায়ান ক্রিয়বার একটা তাব ব্যগ্রতা ও উবেগ মুক্তিপ্রাপ্তি করিয়া রহিয়াছে; আর একটি বেন তেন প্রকারেণ অর্থোপার্জন দ্বারা, আপনার যুলোদর ও দীর্ঘাদ অনাবৃত রাখিয়া যেন পণ্ডরের পবিত্র দিতেছে, শুদ্ধ তাহাও নহে। ইহাতে পক্ষাঘাতবর্ত্তমান; পণ্ডরের দণ্ডে ইহা বেন মন্তক উন্নত করিয়া আকাশ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে; এই যে পূর্ণ পণ্ডর তাব আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত রাখা হইরাছে, ইহাতে আমাদের প্রবৃত্তিগুলির উপর কি গভীর রোপসম্পাত বা ছায়াস্পর্শ বটিবে না?

আর একটি কথা প্রেরিধানযোগ্য। তুমি যে অন্তর্ভেদী সৌধ রচনা করিয়া আবার দৃষ্টি সীমা ক্ষুণ্ণ—তাহার গতি অবরুদ্ধ করিতেছ, আর প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু ও আলোকের অব্যাহত অধিকার হইতে আমার বঞ্চিত করিতেছ, তোমার কি উচিত নহে, অন্ততঃ তদ্বতীর অঙ্গুরোধেও কর্তব্য নহে যে, আমার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে, তাহাকে চরিতার্থ না কর, অন্ততঃ তাহার নুলে আঘাত করিবে না? শ্রিষ্টাচারের অন্তর্বাচরণ মানবমনায়ে যেমন নিন্দনীয়, তেমনই যে সৌধনির্মাণ দ্বারা আমার সৌন্দর্য্যজ্ঞান অব্যাহত থাকে না, হৃদয়ে গভীর উদ্বেগ হয়, তাহা দ্বারা কি পূর্ব্বোক্ত শ্রিষ্টাচারেরই সনাতন নিয়মকে অবমাননা করা হয় না? তুমি আমার বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের প্রত্যেক অঙ্গুলিপরিমাণ স্থানে ইষ্টক ও শৌহনির্মিত ভূপের পত্তন করিয়া আয়বুদ্ধি বা ব্যয়হ্রাসের সন্ধানে কিরিতেছ,

এবং তাহার সুবিধা সংঘটন করিতে পারিলেই অনিন্দে উৎফুল্ল হইতেছে ; ইহাতে কি তোমার পশুদের পরিচয় প্রদান করা হইতেছে না ? তোমার নীচ স্বার্থ-প্রবৃত্তি বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করা হইতেছে না ? জীবনটা শুধু ত কড়া ক্রান্তি লইয়া নহে । এবং ইহাই যদি জীবনের নিয়ামক হয়, তাহা হইলে সে জীবনের কোনও সার্থকতাই নাই । সুতরাং সামাজিক নিষ্ঠাচার হিসাবে না ধরিলেও, ব্যক্তিগত ভাবেও নিজ নিজ সৌধকে সুন্দর করিবার আবশ্যকতা আছে ।

আমি ভাল হইলে শুদ্ধ যে সমাজের মঙ্গল, তাহা নহে, আমার নিজেরও উপকার । তেমনিই সুন্দর ও স্থাপত্যশ্রীযুক্ত কোনও সৌধ রচনা করিলে অপরের সৌন্দর্য্য-ভূতিরই যে কেবলমাত্র পুষ্ট সাধিত হয়, তাহা নহে, নিজেরও বহু উপকার সাধিত হইবে । ইহাতে মানুষকে সৌন্দর্য্যভোগজ্ঞানের সহিত স্বার্থ বিনর্জন দিতে শিক্ষা দিবে । বাতবিক, কলিকাতার বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতি সন্ধ্যায় রাস্তাগুলি দেখিলে আমার ত আতঙ্কের উদয় হয় ; যতই ভাল হউক না, মানুষের পশুদের এক বীভৎস মূর্তি দেখিয়া আমার ত শাসরোধ হইবার উপক্রম হয়, এবং এগুলিকে ভূমিসাৎ করিতে ইচ্ছা করে ।

গৃহনির্মাণ ব্যাপারে সামাজিক দাবীদায়কের স্বার্থ-উপলব্ধি করিয়া ইউরোপেব ক্রান্ত, জর্মনী প্রভৃতি দেশে অনেক বিধ নিষেধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । গৃহস্থানী ইচ্ছা করিলেই যে সে প্রকারেব গৃহ রচনা করিতে পারেন না ; রাষ্ট্রের স্থপতির আদেশ ও অভিমত লইয়া কার্য্য করিতে হয় । Albert Shaw লিখিত Municipal Administration in the European Continent গ্রন্থে দেখিয়াছি যে, প্যারিসগরুর কতিপয় নির্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আদর্শ নক্সা (Type plan) অঙ্কিত ও নির্দিষ্ট করা হইয়াছে ; উহার অনুসরণ করিয়া গৃহ-নির্মাণ করিতে হয় । এক এক পথের উপর ঠিক একই প্রকারেব বহির্দৃশ্যযুক্ত সৌধের শ্রেণী চলিয়াছে । ইহাতে কিন্তু অনেকগুলি দোষ বর্ত্তমান ;—একই পথের উপর নানা প্রকারের উদ্দেশ্য লইয়া সৌধ নির্মাণ করা হয় । কলিকাতার হারিসন-রোডের কথা উদাহরণ-স্বরূপ অবতারণা করা যাউক ; এই পথের উপর স্তম্ভলোকের গৃহস্থলী, বিদ্যুৎ-ব্যাঙ্ক, মাড়বারীদিগের বাণিজ্যসভা (Chamber of commerce), দেব-মন্দির প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে নির্মিত সৌধ রহিয়াছে ; ইহা আশা করা অসম্ভব যে, এই নমুনা সৌধগুলির বহির্দৃশ্য একই প্রকারের হইবে । কেহ যদি এ কথা বলেন যে, সমাজেব সকলেই ব্যবহারানুযায়ী হইবেন, বা সকলেই কুসাদানুযায়ী বা

যানসারঞ্জীবী হইবেন, তাহা হইলে সে কথা যেমন অতিশয় অধৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, কোনও একটি পথের উপর নির্মিত সুন্দর বাটীগুলির একই প্রকার বহিরাঙ্কিত হইবে, এইরূপ আদেশ তরুণ মুক্তিবিরুদ্ধ বোধ হইবে। ইহা দ্বারা এক হিসাবে যেমন স্থাপত্যের সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, তেমনই স্থাপত্য-বিকাশের যাহা প্রাণস্বরূপ, সেই স্বাধীনতার লোপ করিয়া, ইহার উৎকর্ষের তিবোধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া Viollet-le-Duc প্রভৃতি করাসীদেশস্থ অনেক প্রসিদ্ধ স্থপতি অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু তেমন ফলোদয় হয় নাই।—উঁহারা ছাঃ করেন যে, এ অবস্থায় বৌলিক ও অনন্তসাহায্য প্রতিনিধান স্থপতির উদ্ভব কখনই সম্ভবপর নহে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কয়েকটি বিবি-নিবেশের কথা মনে আসিতেছে; ফুটপাথের উপর স্তম্ভযুক্ত বারান্ডা নির্মাণ করিতে হইলে ইহাদের অল্পমোদিত নক্সার অল্পমোদন করিতে হইবে; বাটীটির দৈর্ঘ্য, উচ্চতা বা বহির্দৃশ্য যাহাই হউক না, ইহাদের ‘একমুখ-দ্বিতীয়’ ও মাথুলী নক্সাহুয়ারী বারান্ডাটি নির্মিত হইলেই উহা স্থাপত্যের ললামত্ব হইয়া পড়িবে, এবং তৎসঙ্গে স্থাপত্যের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাহুয়ারী বাটীর বহির্দৃশ্যের পরিবর্তনও কি বাঞ্ছনীয় নহে? কিন্তু সে কথা তুমি কে?

সামাজিক শিষ্টাচার ও কর্তব্যানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া স্থানের আট্টালিকার নির্মাণ সমর্ষিত হইয়াছে। আবাসপত্রের নিকটে কলকারখানা নির্মাণ বা হুর্গের প্রবেশ দেওয়া যেমন কর্ণ ও নাসিকার পক্ষে কষ্টদায়ক বলিয়া আইন-বিরুদ্ধ, তেমনই বিরুদ্ধ ক্রটিসম্পন্ন বা কদাকার গৃহনির্মাণ দ্বারা অপরের চক্রে পীড়াদায়ক বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে আইন-প্রণয়নও বাঞ্ছনীয়। নাসিকা, কর্ণ যেমন একারণ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত, চক্ষুও তরুণ; সুতরাং ইহার তৃপ্তিসাধন নারাজিক কর্তব্যের অঙ্গীভূত। স্রবের বিষয়, আনিরা ক্রমশঃ ইহা কদময়্য করিতেছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা ভয়ের কারণও আছে। শিষ্টাচার কর্তব্যের অন্তর্গত হইলেও, ইহার বাহ্য উপহাসাম্পন্ন হইয়া পড়ে; ভাবায় শিষ্টাচারের বাহ্য অনেক সময় যেমন “ন্যাকানী” বা তওসী হইয়া পড়ে, বা মিথ্যা প্রশংসাবাদে পর্যাবসিত হয়, কিংবা সময় সময় মূর্থানীয় সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়; তেমনই স্থাপত্য-সম্বন্ধীয় শিষ্টাচারের প্রাচুর্যে উদ্দেশ্যহানি অবশ্যস্বাবী। ইহাকে স্থাপত্যবিষয়ক চাটুভাদরুপ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। “আপ্ ওইয়ে

—আপ্ খাইয়ে” দ্বারা অনেক সময় উদারভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বটে;

কিন্তু অনেক স্থলে অস্বাভাবিক কৃষ্ণ উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাও ঘটে ।

উপযুক্ত উপমানের সাহায্য বুঝা গেল যে, স্থাপত্য-সংপৃক্ত শিল্পীচর্চা ও স্থাপত্য-সংপৃক্ত চাটুবাদে অনেক প্রভেদ । এই শিল্পীচর্চাবাহুল্যের প্রবোচনায় অনেকে সৌধের গায়ে অলঙ্কার-সম্পাদন বা ইহার অলঙ্কায়িত্ব-নামে এক কঠোর নিয়মে ব্যবস্থা করেন; তাহাদের এই নিয়মের সনাতনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহান্বিত হইলে মহা বিপদ; তখনই সৌধটি স্থাপত্যশিল্পীবিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইবে ।

তাহাদের মতে, আয়োনিক্—(Ionic) বিভাগান্তর্গত স্তম্ভগুলির গাত্রস্থ পল্লিগুলির উপর যে চতুর্ভুজসংখ্যক ঋজু—(fluting) ক্ষোদিত করিবার নিয়ম আছে, তাহার দুই একটি সংখ্যার হ্রাস হইলেই সৌধটি একেবারে গ্রীক্ রীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূমধ্যসাগরের জলে নিমজ্জিত হইবে । এই প্রকার বিধি-

নিষেধের ব্যবস্থার মূলে পুরোক্ত স্থাপত্য-শিল্পীচর্চা স্বল্পশরীরে বর্তমান থাকিলেও, শিল্পীচর্চাটিকে মিথ্যাচারে পরিণত করা হইয়াছে; কেন না, শিল্পীচর্চা

২৪ সংখ্যার স্থলে ২৫ সংখ্যা দেখিলে কখনই ভ্রমে মর্শ্বাহত বা ক্রোধে উদ্ধত হইয়া উঠিবে না । কারণ, ঋজুর সংখ্যা গণনা করা তাহার কার্য্য নহে । এই

স্থাপত্য-শিল্পীচর্চায় এক একটি বিভিন্ন রীতি বা Styleর সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু আবার ইহার প্রবর্তকদিগের অন্যান্য অভ্যাচারে বা অসহিষ্ণুতায় অনেক স্থলে Style বেচাবী প্রাণহীন কাঠপুতলিক-বদশ প্রাপ্ত হয় । আমাদিগকে দেখিতে

হইবে যে, কোন অংশটির লোপ বা পরিবর্তন সাধিত হইলে রীতিটিবও পরি-

বর্তন হয় । উদাহরণের স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের উড়িয়া প্রদেশীয় শাখা বা বিভাগের কথা ধরা যাক । এ বিভাগান্তর্গত বিমানের শেখর কখনও বিগত

দ্বিচোত্র আকারে (Pyramidal) দৃষ্ট হয় না; শীর্ষক-নিকট ইহার বক্র বা

Curvilinear হইয়াছে, এবং তাহার উপরে গ্রীবার ন্যায় এক নাকুল্ল অংশ

উঠিয়াছে । সন্দিরায়তনটি অনেকটা মল্লধারদেহসদৃশ । উড়িষ্যার স্থাপত্যে আর

এক বিশেষ এই যে, বিমান বা গর্ভগৃহ কখনও স্তম্ভের উপর স্থাপিত নহে ;

পুতরাং স্তম্ভবিহীনত্বও ইহার বিশেষত্ব । এই প্রকারের কতিপয় বিশেষত্ব আছে ।

কিন্তু যদি কেহ কোনও বিশেষত্ব Styleর দোহাই দিয়া ইহার গ্রীবা-নিম্নে

বক্রতাকে এক অপরিবর্তনীয় নিয়মে বাঁধিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার

সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে ; কেন না, আমি কতিপয় বর্ষ ধরিয়া এ বিষয়ে যথেষ্ট আলো-

চনা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই বক্রতার মধ্যে কোনও নিয়ম নাই । লিঙ্গেশ্বর

স্বাভাবিক, মুক্তবল প্রভৃতি মন্দিরের শেখর-শীর্ষের বক্রতায় সমতা দৃষ্ট হয় না। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, যে স্থাপত্য-শিল্পীচর Styleর প্রবর্তক, তাঁহার অত্যাচারে আবার ইহার বিশেষ ছরবহা; বাহ্য ইহার নিজস্ব নহে, যাহাতে ইহার কোনও বিশেষ স্ব স্বিকৃতি হয় না, তাহা লইয়া এত বিধি-নিষেধের অবতারণা করিলে আসল জিনিসটি বিকল হইয়া পড়ে।

পূর্বে অলঙ্কার-সম্পাদন দ্বারা সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির কথা উক্ত হইয়াছে। অলঙ্কার দ্বারা শোভাবুদ্ধি সর্বাধিক সম্ভবপর নহে। মনুষ্যদেহ লাভবানবিহীন ও কর্কশ হইলে, তাহা যেমন অলঙ্কার দ্বারা কননীয় প্রাপ্ত হয় না, তেমনই যে সৌন্দর্য্য আকৃতি ও স্থাপত্যশিল্পগত সৌন্দর্য্য নাই, অলঙ্কার তাহার কি করিবে? তাহারও প্রতি ব্যবহৃত ভাষা যদি পক্ষ কঠোর হয়, তাহা হইলে তাহা মনুষ্য-মন্দবোজমা দ্বারা কোমল করিবার সহজ চেষ্টা করিলেও ব্যর্থ হইবে; বরং মনুষ্য-যোজনা তীক্ষ্ণ শব্দবোজনার ন্যায় মর্দনশীল আঘাত করিবে। একটা রুচিবিহীন কন্যার বাটীর সর্বাঙ্গ যদি অলঙ্কারে আবৃত করা যায়, তাহা হইলে কেহই মনে করিবেন না যে, বাটীর অধিকারী মহানন্দ অনেক অর্থব্যয় করিয়াছেন বলিয়া। তাহার বিকৃত কচি মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত; বরং তাহার বিকৃত রুচির সহিত তাহার ধনগর্ভ দর্শকের চিত্তে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক কবিবে। তাহার অর্থব্যয় যতটুকু আত্মপ্রাণের পশ্চাতে ধনগর্ভরূপ রাহুলের মদগর্ভ ও স্নানপ্রসঙ্গ চেষ্টা দর্শকের চক্ষে বিষম পীড়া ও মনে ঘৃণার ভাব উদ্ভিজ্জ করিবে। বাস্তবিক, অর্থব্যয়-সর্বসময়ে ত্যাগ-জ্ঞানের হুচনা করে না; নিত্য নৈনিত্তিক দামাঙ্গি-অনুষ্ঠানে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, ব্যয়বাহুল্য অনেক স্থলে অর্থ-সরিনার পরিচায়ক। এ-স্থলে বলিয়া রাখি যে, অনেক স্থলে ইহা আত্মত্যাগেরও পরিচায়ক বটে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যে গৃহ মন্দিরায়তন প্রভৃতিতে সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি না হইয়া হ্রাসই সংঘটিত হয়। অত্যধিক ব্যবহারে মন্দিরে পৈণীগুলি যেমন নিশ্চেজ হইয়া পড়ে, সেইরূপ অনেক প্রকারের সৌন্দর্য্য-সমাবেশে মানব-মনও নিশ্চেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। মনের বসাবাসনও এক ভৌতিক ব্যাপার, এবং শক্তি-সাতত্য নিয়মামুসারে (conservation of energy) এই রসাবাদন রূপ ব্যাপারের মূলগত শক্তিও পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং মনের ক্ষমতা কোথায় যে, সে সমস্ত অলঙ্কারগুলিকে এক সুসংবদ্ধ, শাস্ত্রীয়ক একক স্বরূপে (Integral-whole) পরিণত করিয়া তাহার রসাবাদন করিবে।

সমগ্রলিখ্য সমষ্টিকে কখনই মূল্যের একক সমতার উপভোগ করা যাইবে না। এই

এই অসমতার প্রাচুর্যনিবন্ধন দর্শকের চিত্তে এক বিসদৃশ অমূল্যর ভাবের উদ্ভব হয়। ইহা সৌন্দর্য্যবাহুতির ভূতভাষ্যবাহী (Physical) ব্যাখ্যা।

ইহার আরও অনেকগুলি দিক আছে;—যেমন ইহার সহিত অধ্যাত্মবোধের সংঘর্ষ। ইহার আভাস সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে।

এই সংক্ষেপে আর একটি বিষয়ের কথা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। এমন

অনেক প্রকারের অলঙ্কার আছে, বাহ্য বাহিরের আলোক, বাহিরের স্পর্শ সহ

কবিতা দ্বারা না। মনসী-অঙ্গের শোভাবুদ্ধিকারী অলঙ্কারের কথাই প্রথমে

চিন্তা করা যাক। সাংসারিক নিত্য কার্যের নত সংঘর্ষের মধ্যেও মনসী

বল্লভ শোভাভঙ্গি; কিন্তু বল্লভের পরিবর্তে যদি মনসীকাক্ষ্যবৃত্ত কণ্ঠহার-

মূল্যের কোনও অলঙ্কারের সমাবেশ করা হয়, তাহা হইলে শোভার বুদ্ধি না হইয়া

ভাঙ্গা হইবে বলিয়া মনে হয়। যে প্রকারের অলঙ্কার উৎসব-সময় ভিন্ন অঙ্গ

বিশেষে পোটিকার মধ্যে সংক্ষিপ্ত হইবার উপযুক্ত, এবং বাহ্য সাধারণতঃ-বাবস্তব

উপযুক্ত নহে, তাহা যেমন শোভা-বুদ্ধি বিষয়ে তেমন সহায়তা কবে না;

যেমনহ শিল্প-কার্য-বরণ অলঙ্কার সম্পাদিত করিলেই যে কোনও আয়ত্তনের বহিঃ

শোভা বুদ্ধির আশা করা যাইতে পারে এমন আশা-সম্ভব নহে। বাস্তবিক মহি-

মত এই যে প্রাচীন প্রথমচরিত্রের মনসী নিরীক্ষণকালে কার্ণিশের নিম্নে

অতিশয় নিম্ন-বর্ণিত ভাষ্যের বোঝনা দেখিয়া আমার মনসী

বোধ মত বোধ হইয়াছিল। এ ভাষ্যের সমাবেশ ওরূপ অনাবৃত, সাধারণ-

মত চক্ষুর গোচরীভূত স্থানে সার্থক বলিয়া বোধ হয় না; ইহা-অতিশয়

বিস্ময়জনক। মণ্ডপমধ্যস্থ স্তম্ভের গায়ে ইহা শোভা পায়। এ হিসাবে

মণ্ডপবিভেদ, কেদারেশ্বরের মন্দির বেদুড়ের মন্দির অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। এ

সমস্তকমে বলিয়া রাখি যে, সেন-বংশীয় বিজুবর্দ্ধন নরপতির সময় চালুক্য-

মন্দির স্থাপত্যের যে শৈলীর উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও শিল্পবাহুলামুক্ত ভাষ্য-

মন্দির বিশেষ প্রবর্তনা দৃষ্ট হয়। ইহার প্রবর্তক জননাচার্য্য স্থাপত্যো বিশেষ

কর্ম সম্পাদন করিলেও, অলঙ্কারপ্রাচুর্যের অবতারণা করিয়া মূল উদ্দেশ্যে

নিমিত্ত চটাইয়াছিলেন। এ রীতি দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে নাই; জাবিষ্-

কৃত চালুক্য স্থাপত্যের কোণায়ও এ প্রকারের অলঙ্কার-বোঝনা দেখা যায়

না। শেষবর্তী বিজয়নগরের নরপতিদিগের দ্বারা-প্রাচুর্য্য-স্থাপত্যের অনেক

বিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু পূর্ণোক্ত বাতি গৃহীত হয় নাই।

জিন্দোদোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্যারীচাঁদ মিত্র । (ক্ৰী. ১৯০৬)

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতির জীবনেও তেমনই সময়ে সময়ে ঘটনা-পরিবর্তনে নতুন ভাবে-আবির্ভাব হয়; সে ভাব-প্রবাহ-অতিক্রান্তপর্বত-প্রতিরোধ-প্রাবল্যের মতই বহিরা-বায়-পুরাতনের পরিবর্তন করিয়া নূতনের প্রবর্তন করে। সাম্প্রতিক, বঙ্গদেশীয়, জ্ঞানসম্বন্ধীয় পরিবর্তনে এইরূপ ভাব-প্রবাহের কারণ দক্ষিত হয়। শিল্পে ও সাহিত্যে তাহার চিহ্ন থাকে। বাছালায় ইংসাজের আগমন এইরূপ নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাহালা সেই ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহাদিগের অন্ততম। দেবানন্দ-মহাদেব যেমন অচামধ্যে মন্ডাকিনীধারা ধরিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত চাঞ্চল্যকে প্রকাশিত করিয়া ষোড়শিতার তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ইহাও তেমনই নূতন শিক্ষার ও সভ্যতার অবশুস্বাভাবী ফল নূতন ভাব জন্মে-ধর্মিক তাহার চাঞ্চল্য প্রশমিত করিয়া তাহাকে দেশের হিতকর কার্যে প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

আমরা তাহাদিগের উৎসাহের আধিক্য ও কৃত কার্যের বাহুল্য দেখিয়া বিস্মিত হই। তাহারা সংবাদপত্র, সভা, সমিতি প্রভৃতির সাহায্যে দেশ-সংস্কারের চক্কা আরম্ভ করেন; তাহারা দেশে সমাজসংস্কারের সুচনা করেন, তাহারা দেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করেন; তাহারা এই দেশে-নূতন বাছালা সাহিত্যের সৃষ্টি করেন। কৃষি, শিল্প, সমাজতত্ত্ব, সকল বিষয়ের আন্দোলনই তাহারা করিতেন; তাহাদের কর্মপ্রাপ্ততাই তাহাদিগের জন্মে অসাধারণ উৎসাহের উৎস উৎসারিত করিয়াছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র-কলিকাতা-পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারী ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীমন্ত শিবনাথ শাস্ত্রী-মহাশয় লিপিয়াছেন,—“তাঁহাতে যেমন সাহিত্য-সংস্কার, তেমনই বিদ্যাসংস্কার দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি এক দিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ানের কর্ম করিতেন, অপর দিকে তাহার বন্ধু ভারতচাঁদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিদ্যাবানিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ ব্যবসায়-আমদানী ও রপ্তানীর কার্য করিতেন। * * * এক দিকে যেমন বৈদ্যিক উন্নতি, অপর দিকে ভেদনি-বদেদের হিতসাধনে য্ননোযোগ। বৌদনে বাণিজ্য-সুস্থকর রায়সোপাল, রায়তল্ল প্রভৃতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সাধারণ

জ্ঞানার্জন সভা'র সভ্যরূপে উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রোফা-
বহাভেও সোসিরাঙ্গ সার্বেশ এসোসিয়েসন, এগ্রিহাট কল্‌চুরাল সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট
চারিটেবল সোসাইটি, স্কুলবুক সোসাইটি, পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা-নিবারক
সভা প্রতিষ্ঠা বহু সভাসমিতির সভ্য ছিলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন,
তাঁহা নহে, তাঁহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল সভ্যর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পরিশ্রম
করা। আমরা অনেক সময় আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া ভাবিতাম, ক্রিয়াক্রমে তিনি এত
সভাতে বোগ দিয়া হৃদয়-মনের সহিত সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে
পারেন। ১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যরূপে মনোনীত
হন। এই পদে দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের
চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * * তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র
উজ্জ্বল তৎসমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিমণ্ডলে মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণ্য
ছিলেন। * * প্যারীচাঁদ প্রথমে তাঁহার বন্ধু রসিকচন্দ্র মল্লিক ও রামগোপাল
বোম্বের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রচারিত 'জ্ঞানদেবণ' নামক দ্বিভাষী
পত্রিকাতে লিখিতেন; তন্নিম্ন ইংলিশম্যান, কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতি ইংরাজ-
সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্বদা লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজীতে যাহা ডেবিড
হেবাবের জীবনচরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও গ্রাণ্ট সাহেবের জীবন-
চরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। * * * তাঁহার সহধর্ম্মণীর প্ররশোক হইলে
তিনি অনেকটা সমাবে নিঃশিষ্ট হইয়া পড়েন; এবং প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে
মনোনিবেশ করেন। * * তখন সফল প্রকাব আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলো-
চনাতে তাঁহার বালকের জ্ঞান উৎসাহ দেখিতাম। আমাদেরকে সর্বপ্রকার
আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চাতে সর্বদা উৎসাহিত করিতেন, তাঁহার কাছে বসিলে
অনেক আনন্ড লাভ করা যাইত।

তিনি ডেবিড হেবার, রামকমল সেন ও কোন্‌স্টানটিনো প্রাট—এই তিন
জনের যে জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন, সে সকল সমসাময়িক ইতিহাসের উপা-
দানে পূর্ণ, এবং বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস-লেখকদিগের—বাঙ্গালার উন্নতির
স্বল্পপরিপূর্ণকারীদিগের—অবজ্ঞাপাঠ্য। দেওয়ান রামকমলের জীবনচরিতে তিনি
ডাক্তার উইলসনের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহাতে বিলাতে রামমোহন
রায়ের জীবনান্তকালের দুঃখকথা বিবৃত হইরাছিল। রামমোহনের সেক্রেটারী
স্কাওল্ড আর্নট তাঁহাকে প্রাপ্য টাকার জন্য বিব্রত করিয়াছিলেন, এবং রাম-
মোহনের বিলাতে প্রকাশিত রচনা যে তাঁহার, সে কথা প্রচার করিয়া দিবেন

বলিয়া ভদ্র দেখাইয়াছিলেন। তিনি নীচ লোকের সঙ্গে পড়িয়া স্বাস্থ্য ও কৃষ্টি হারাইয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিলাতে অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন;—
 ‘Ram Mohun died of brain-fever; he had grown very stout, and looked full and flushed when I saw him. It was thought he had the liver, and his medical treatment was for that and not for determination of the head. It appears also that mental anxiety contributed to aggravate his complaint. He had become embarrassed for money, and was obliged to borrow of his friends here in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary, importuned him for the payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Ram Mohan, if not paid, to do what he has done since his death, claim as his own writing all that Ram Mohan published in England. In short, Ram Mohan got among a low, needy, unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late, which preyed upon his spirit and injured his health.’

প্রায়শ্চিত্তাদির কর্মবল জীবনের সকল কার্যের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধুত শ্রীযুত দ্বিবালা শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা হইতে তাঁহার কার্যবাহুল্যের পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার নবকে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা তাঁহার বঙ্গাল-স্থায়িনী কীর্তি—বঙ্গালা ভাষার সংস্কারচেষ্টার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গুত্বাসংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রকে লিখিয়াছিলেন—পায়ীচাঁদ যুরোপীয় ও ভারতীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে সংযোগ-সেতু ছিলেন। তাঁহার বিরোধে সেই সেতুর বিঘোপে উভয় সম্প্রদায়ই হুঃখিত হইবেন। ভারতবাসীদিগের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তিব সন্তুল-গরল তাঁহার দিত অর্থ-সাহায্য ছিল? কিন্তু তিনি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ অবহেলা করিয়া কেবল ধর্ম্মের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়সে তিনি স্বর্গগে একটি গাঠনোত্তী-প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্ত্তন বদ্ধর সহযোগিতায় প্রতিদিন প্রত্যুষে গাঠনিক বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই লাপন বা বিচার বিভাগে চাকরী পাইতেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি কেউ

লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। লাইব্রেরী হইতে অতি সামান্য পারিশ্রমিক লইয়া তিনি লাইব্রেরিয়ানের কার্য করিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টাই লাইব্রেরীতে সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যগণ, সুপ্রীম কোর্টের জজ ও ব্যারিষ্টারবর্গ, কলিকাতার ব্যবসায়ীবা ও দালালেরা সমবেত হইতেন। পারী-চবণের নাম তাঁহাদের সকলেরই পরিচিত ছিল। কেহ নূতন সংবাদ জানিতে চাহিলে লাইব্রেরীতে আসিলেই পাইতেন। তিনি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও বাজের পথ দেখাইয়াছেন। বনি বাঙ্গালীরা তাঁহার মত বুদ্ধি, দৃবদৃষ্টি ও সাধুতা সহকারে ব্যবসায় ব্যাপারে ব্যাগ্রত হইলে তবে স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতি অনিবার্য। তিনি সর্ববিধ সংকল্পসাধনোপযোগী ক্ষমতাসালী ও সংকল্প-সাধনতৎপর ছিলেন। তাঁহার রচনা এতই সুপরিচিত যে, সে সকলের সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। তিনি বহু সভাসমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভূপালা ও প্রজার কল্যাণকামিনায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান জমীদার-সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাঁহার সংস্থাপিত সেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটীর এক অংশ। যে সময় বাঙ্গালার কেবল বাঙ্গালার নহে, পবস্ত সমগ্র ভারতের রাজ-নীতিক বঙ্গমন্ডলে নূতন-জ্ঞে, ব্যবসায়-উদ্যোগচেনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন অভিনেতা ই-বাঙ্গলগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময় বাঙ্গালার মানসিক দৈন্ত বাঙ্গালার শিল্পে ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। উপযুক্ত উপাদানের অভাবে আমরা ভংকালীন চিত্রশিল্পের পরিচয় দিতে পারিলাম না। কিন্তু যে স্থাপত্যে সভ্যতার স্বরূপ নির্ণীত হয়, সে স্থাপত্যে তখন বাঙ্গালীর মানসিক দৈন্তের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। বাঙ্গালার সহজে-নমনীয়-বংশের বাহুল্য ও গৃহনির্মাণে বহুল প্রয়োগ বাঙ্গালার স্থাপত্যে বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার করিয়াছিল। বাঙ্গালার পুৰাতন স্থাপত্য-নিদর্শন অধিক নাই। রাজনীতিক-রিপ্পন, অধিকারি পরিবর্তনে, মুসলমানের পুরাকীর্তিনাশচেষ্টায়-সে সব নিদর্শন হুমুভ হইয়াছে। তাহার উপর আবাব এ দেশের জল-বায়ু ও বৃক্ষলতার ক্রতবর্দ্ধন পুরাকীর্তি-রক্ষার সঙ্গে অসুস্থ নহে। এইরূপ বহু কারণ সম্মুখে বাঙ্গালার পুরাকীর্তি হুমুপ্রাপ্য হইয়াছে। কিন্তু ১৮২১-খৃষ্টাব্দে ও তাঁহারও পূর্বে নির্মিত বিষ্ণুপুত্রের মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কেবল তাহাই নহে। এ দেশের মুসলমান শাসনকর্তাদিগকে এ দেশের শিল্পী নিযুক্ত কবিত্তে হইত বলিয়া, গোড়ে ও পাঞ্জুরায় সে সব গৃহ এখনও বিদ্যমান, সে সকলেও

হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য সপ্রকাশ। আর সেই দৃষ্টই বাঙ্গালার মুসলমান স্থাপত্য বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইতে পারে নাই। কিন্তু এ দেশে হংবাধ-
শাসন-প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রধানতঃ রাজনীতিক কাৰণে দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল,

তাহা শিল্পের উন্নতির পক্ষে নূতন স্থষ্টির পক্ষে কোনরূপেই অমুকুল নহে।
সেই স্তম্ভ তখন স্থাপত্যে কেবল সজ্জাভারে পীড়িত হইতেছিল।

কৃষ্ণনগরের মন্দিরে ও কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ
প্রকাশিত। স্থাপত্যে যেরন, ভাস্কর্য্যেও তেরনই তখন কেবল প্রসাধনের

বাহুল্য। খৃষ্টর অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালা প্রত্নশিল্পের স্তম্ভ সমগ্র ভারতবর্ষে
বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। “হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত

মূর্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।” আবার, “রামপাল দেবের রাজকাল
হইতে গোড়ায় ভাস্করশিল্পের পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল।

লক্ষ্যমণ্ডলের নদে গোড়ায় শিল্প উন্নতির অভি উক্ত গোপানে আরোহণ করিয়াছিল।”
যে বাঙ্গালার ভাস্করগণ নূতন নূতন ভাবের বিকাশ স্বন্দর মূর্তি-রচনায় সিদ্ধ

ছিলেন—যে বাঙ্গালার ভাস্কর-কার্য্য এখনও মূর্তিকাতল ও পৃষ্ঠরিণীর্ভ
হইতে উদ্ভোজিত হইয়া আয়াদিগকে বিম্বরাবিষ্ট করিতেছে—সেই বাঙ্গালার তখন

আর ভাস্করকার্য্যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় নাই—আছে কেবল প্রমাণের
প্রাবল্য। তখন কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারিগণ মহারাজ কুম্ভচন্দ্রের প্রবর্তিত পুন্ডর

স্বস্ত্যঙ্গমূর্তি গঠিত করিতেছে—দেবদেবীর মূর্তিতে ধ্যানগত ভাব-
বিকাশ অপেক্ষা সামান্যজ্ঞার অধিক মনোযোগ দিতেছেন।

আর সাহিত্যে? সাহিত্যে তখন ক্ষমতাশালী লেখকের অভাব আর
গোপন থাকিতেছে না। প্রাচীন বাঙ্গালা গল্পের সন্ধান আনরা এখনও পাই

নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কথা বলিতে পারি না যে, সে-কালে বাঙ্গালার
গল্পে গল্প রচিত হইত না। তবে সে-কালের কবিকীর্তিও পরিচয়ের অভাব

নাই। আর কবিতা বোধ হয় গল্পকে ছুঁইয়া রাখিয়াছিল। কাশীরাম চন্দ্র
ও কুস্তিবাগ, এই দুই জনকে ধাহা বা অনুবানকমাত্র মনে করেন, তাহারা

ইহারা যে দুইটা বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সে দুইটা বিষয়-ভাবের
সাধারণ সম্পত্তি। তাহাদের মহাভারত ও রামায়ণ অঙ্কুরণ বা অঙ্কুরণ

নহে—মৌলিক প্রথম বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার স্থষ্টি। কাশীরাম, কুস্তিবাগ, মুকুন্দচন্দ্র
বনরাম—সকলেই কবি; কেহই অমুকরণকারী বা পঞ্চলিপ্যকারী নহেন।

তাহাদের প্রতিভা “দুর্গ-মর্ত্য যবাতলে—প্রচণ্ড অশ্বতলে” কাব্যের উপযুক্ত

সংকল্পে সংগ্রহ করিয়া কবিকল্পনায় নুতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাহাদের কাব্য “সাগরবৎ—সুদয়োধিত বিলোল তরঙ্গমালার সংস্কৃত, হরস্ব-

সাগরবৎ স্রব্বাদি বাতানস্তাড়িত।—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার

অনন্ত আলোকচূর্ণপ্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার বৃক্ষরাশি,

ইহার মধুগীতি সাহিত্য-সংসারে ছন্দিত—সাগরোধিত বাসরাশি—যেমন

ক্রমাগতই উদ্ভিত হইয়া নানা আকার-ধারণ করিয়া মিশিয়া গিয়া আবার

সাগরেই স্রিণিয়া যায়, তাহাদের কল্পনা তেমনই ক্রমাগত উঠিয়া—ভাসিয়া—

মিশিয়া—চলিয়াছে—কেবল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা—খনির সন্ধান

পাইরাছেন—অরাধে রত্নরাশি ছড়াইয়া গিয়াছেন। তাই সকল রত্ন সমান

উজ্জ্বল—সমান পরিদ্রুত—সমান মূল্যবান নহে—কোনখানি কেবল রত্নে

পরিণতি লাভ করিতেছিল—কোনখানির দীপ্তি সমুজ্জ্বল। তাই তাহাদের

রত্নের প্রাচুর্য্যে আমাদের বাহ্যব্যবোধে শ্রান্তি অনুভূত হয়। কিন্তু তাহারা

সকল কাব্য। তাহাদের কল্পনা এমনই প্রবল যে তাহা আত্মপ্রকাশের জন্য

যে দীর্ঘ ঘটনা-ধরম্পরার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা পথ-হারাইয়া

ফেলি। কিন্তু ইংবান্ধ প্রাধান্ত-সংস্থাপনের অরবাহিত পূর্ব কবিরিগের সৈকত

বন্দনা কোথায়? ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কবি—কিন্তু পূর্ববর্ত্তদিগের

কল্পনার জলনায় তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—সঙ্কীর্ণ। তাহাদের ভাবের অভাব

আবার পূর্ণ হয়। তাহারা ভাবপ্রকাশের জন্য কাব্য রচনা করেন না—ভাব

প্রকাশ করিয়া প্রকাশের চেষ্টাই করেন। তাই ভাবের প্রসাধনে তাহারা অধিক

মনোযোগ দেন। উভয়ের ‘বিতাহবদন’ পাঠ করিলে দেখা যায়—উভয়ে একই

আদর্শ লইয়াছিলেন—একই পুৰাতন ভাব আপন আপন ভাষায় ব্যক্ত করিয়া

ছিলেন। এরূপ অবস্থায় ভাষা ভূষণভারে পাণ্ডিত্য হয়—তাহার স্বচ্ছন্দগতি

ক্লান্ত হয়—তাহার বাতাবিক সরসতা শুকাইয়া উঠে। কবিরঞ্জন বামপ্রসাদের

কথায়—কোনও সমালোচক সত্যই বলিয়াছেন—“অনুপ্রাসের ছটা, অপ্রচলিত

শব্দের ঘটা, দূরায়ম প্রভৃতি দোষ, আর হিন্দী ও পারসী কথার বাড়াবাড়ি ও

এইরূপ অপ্রচলিত ভাষায় বর্ণনার আধিক্য হেতু অনেক স্থলে অর্থ সাহস্রবোধ্য

নহে।” শব্দমন্ড্রে ভাবত সিদ্ধবিদ্ধ। সুতরাং তিনি এ সব দোষের ঘৃণাবর্ত্ত

অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই। তাহার

ভাষার ভাষা সরল—সরস—সমোহন। কিন্তু তাহার কাব্যের ভাষা অশ্লবিশ্য।

ভাবভের বর্ণনা যে স্থলে সরল—

“কোণে রাণী ধার রড়ে

আঁচল ধরাব গড়ে

আলুখালু কবরী-বন্ধন;

চক্ষু ঘুরে যেন চাক

হাতনাড়া ঘন ডাক

চমকে সকল পূরজন।”

রামপ্রসাদের বর্ণনা সে স্থানে হ্রস্বাধ—

“নহে সুখী সুখী নিরাধি নন্দিনীরে।

অসুখর অধর অধর পড়ে শিবে।

তারাহারা তারাকারা ধারা শতশত।

গোয়ুগে গলিত ধারা তুড়া নিষ্ঠারগত।

বিগলিত কুন্তল-জলদপুঞ্জছটা।

নিরানন্দ পতি মন্দ প্রিন্সিয়া বরটা।”

অর্থ বুঝিতে অভিধান খুলিতে হয়—গন্দঘর্ষ হয়। পাণ্ডিত্যপ্রভুরগের—

কমনীয় কবিতা কুহুম নিষ্টি হইয়া যায়। ভারতের ভাবা হ্রস্বাধ নহে—

কিন্তু তাঁহাব রচনার ভাবপ্রাচুর্যের অভাব সর্বত্র সপ্রকাশ। তিনি পূর্ণক

করিস্থিতির অবশ্যে ভাবায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আর কেহ তাঁহার অনুকরণ

করিতেও পারেন না। তাই সমসাময়িক কবিদিগেব মধ্যে ভারতচন্দ্রের

প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু ভাবাই কবির সর্বসম্পদসার নহে। যে কবি ভাষা

সম্পদের অধিকারী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাবার ভাণ্ডার অধিকৃত করেন, তিনি

জগতে চিরস্থায়ী কীৰ্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় নেকপ কবির অভাব

পোপন করা অসম্ভব। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ—এই দুই বিভাগে যশস্বী।

কিন্তু তাঁহাদিগের সমসাময়িক কবিদিগেব কবিতা বাস্ত্যাতাড়িত শুষ্ক বৃন্দগের

মত কোণায় উড়িয়া পিয়াছে। আজ সেই সকল কবির নাম বিস্মৃতির

অতলতলগত—রাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে অনেক যত্নে—অনেক চেষ্টায়

তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। সে পরিচয় সংগ্রহ যে সম্ভব হইত

সেই ক্ষেত্রে “বটতলা” ছিল বলিয়া।

তখন দেশ অরাজক। তাঁহার পর পলাসীক্ষেত্রে ভারতের ভাগ্য-পরিবর্তন

হইয়া গেল। তখন অশান্তির স্থানে শান্তি সংস্থাপিত হইল; অরাজকতার

পরিবর্তে শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে আদিল—নূতন চাব

নূতন শিক্ষা, নূতন সভ্যতা, নূতন অধিকার। ভান্ডারবর্ষের প্রোক বহুলাল

যথেষ্ট শাসনে অভ্যস্ত ছিল—এখন রাজার কাছেরে আনোচনা করিয়া

অধিকার পাইল—রাজনৈতিক অধিকারের আবাদ পাইল। সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা তাহাদিগের সম্মুখে উপনীত হইল—তাহারা পার্শ্বব সম্প্রদায়কে সমাদর করিতে শিখিল—উন্নতির সোপান বলিয়া গণিতে লাগিল। তাহারা যে নূতন-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইল তাহা বহুশতাব্দীর সাহিত্যসংবিগনের সাধনায় পুষ্ট—নানা দেশের সাহিত্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ। তাই ভাবতবাসীরা নূতন আদর্শের অহুসরণে ও অমূলবোধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা নূতন আদর্শের উজ্জল্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাচীন আদর্শ পরিহার করিতে লাগিল। তখন ইংরাজী পঠন পাঠন হইতে লাগিল, সকল-দিকেই ইংরাজের অঙ্ক-সম্মুখগমন হইতে লাগিল। ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঁচাবে, ব্যবহারে, বিস্তার দেশের জনসাধারণের যে পার্থক্য জন্মিতে লাগিল তাহার ফলে দেশের এক সম্প্রদায় মেধাবন্ত্বগীতা রজনীর ঘন অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল।

সুখের বিষয় অল্পদিনেই বাঙ্গালীর ভ্রম-বুদ্ধি। সে-সকল ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভ্রম প্রথমে বুট্যাছিল প্যারীচাঁদ মিত্র তাহাদিগের অন্যতম। তাহার কাব্যে, যে যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালীরা আহারে, বিহারে, বেশে, আচারে দেশীয় প্রথা-সম্বন করাই গৌরবজনক মনে করিতেন সেই যুগেও তিনি প্রকান্তভাবে সমাজশাসন অবহেলা করা সম্ভবত—মনে করিতেন না। রাজনারায়ণ বসু বহানয় তাহার ‘আত্মচরিতে’ লিখিয়াছেন—ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পলের নিষ্পত্তে তিনি—গাটের বিজাদ-তরগীতে সম্মিলনে গিয়াছিলেন—“আমি কিছু আহার করিতে গমন করিয়াছিলাম; কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) একাক্ষরক্কে ইংরাজের তরগীতে জলযোগ করিতে নিবেদন করাত্তে আমি তাহা হইতে বিরত হইলাম।” বাঙ্গালী বুদ্ধিল—“সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনও মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কসিন্ কালে বুঝিবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কল্প উদ্ভূত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না।—এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কল্প দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে—সুখায়—সামাজিক বিবেচ্য কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।”

তখন বাঙ্গালার দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল—বাঙ্গালী গদ্যের প্রতি তাহাদের মনোযোগ অকুণ্ঠ হইল। কারণ দেশমধ্যে সর্বত্র—সমাজের সমস্ত-বে—ঐশ্বর্যমির্শিষে—শিকাকিত্তিরেব লক্ষণ্য সাহিত্যের প্রয়োজন;

মহাসাহিত্য ব্যতীত সে কাব্য সম্পন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু তাহার পুস্তক বাঙ্গালা গল্প গঠিত হইয়াছে—সংস্কৃত হইতেছে। বাগবান বহু রচিত 'লিগিমালা' পুস্তকের ভূমিকার গল্প সাহিত্যের আরম্ভকথা লিপিত আছে—

‘সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কৰ্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিধাতা পবন-ব্রহ্মের উদ্দেশে নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।—

এ হেনুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গদেশ কার্যক্রমে এ সময় অস্তোত্ত দেশীয় ও ষাণ্মীর ও পর্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাবেশ হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও—এই স্থানে। এখন এ অস্থি-অধিপতি ইন্দ্রাজয় মহাশয়ে। তাহার এদেশীয় ভাষা অবগত নহিলে স্বাক্ষর ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না, ইহা শুনে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চণ্ডন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ববিধ কার্য ক্ষমতা পাইলেন। এতদ্বারা এ ভূমীর বাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রহণ করিয়া লিগিমালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল। প্রথম ধারা দুই তিন অধ্যায় তাহার প্রথমতো রাষ্ট্রাঙ্গণ অল্প রাজ্যাদিগকে সেরেন তাহার প্রভাস্তর পূর্বক দ্বিতীয় রাজ্যসিং-আগন-সচিব লোককে অল্পজ্ঞাও বিধি ব্যবস্থা ক্রম দান ইতি প্রথম ধারা। দ্বিতীয় ধারা সামান্ত লেখাপড়া।—সমান সমানীকে লগ্নুকে এবং লগ্নু ওরুকে প্রভু কর্করকে এবং অক্ষমালা এই মতে পুস্তক লেখা যাইতেছে। ইহাতে অস্তোত্ত বিদ্বান লোকের স্থানে আমার এই আকাঙ্ক্ষা যদি আশায় রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কল্যাণিত ক্রমে কলিত হইয়া থাকে তাহা অল্পপ্রহরক দৃষ্টিমাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হইলেন কোরুন কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।—

মানব স্বজন বিধি করিল-বধন।

সেই কালে বড়বিপুল কৈল নিয়োজন।

অতএব ভুল ভ্রান্তি আছে সর্ব জনে।

মানব লক্ষণ-বসু বায়রান ভণে।

শতাদিত্য বসুবর্ষ পুস্তক্রেষ্ঠ মাস।

পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।”

সুতরাং এই গল্প সৃষ্টির গৌরব এ দেশে ইন্দ্রাজয়ের। এই সময় এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যের উপর ইন্দ্রাজয়দিগের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; সংস্কৃত সাহিত্যের সমাদর হইয়াছে। সংস্কৃত-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের দ্বারা

যখন বাঙ্গালী গল্প সংস্কৃতও হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়
সুপ্রসিদ্ধ—

“একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর দিকে খ্যাতনামা অক্ষয়-
চন্দ্র, এই উভয় বৃগ প্রবর্তক মহাপুরুষের প্রাণে, বদভাষা যখন নবজীবন
লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃতবহুল হইয়া দাঁড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়
অক্ষয় বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাবাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-ভাষাভারগী লোক ছিলেন ;
সুতরাং তাহারা বাক্যলোকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন, তাহা সংস্কৃতের অলঙ্কারে
সমৃদ্ধ হইল। অনেকে এগুলি ভাষাতে প্রীতিলভ করিলেন বটে, কিন্তু
অধিকাংশ লোকেব নিকট, বিশেষতঃ সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট
ইহা অপ্রাণোক্ত, কঠিন ও দুর্বোধ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে সময়ে

শ্রীচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র
সমিলিত হইয়া এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাস্যহাসি হইত। ঈশ্বরচন্দ্র
শ্রীমতের ‘সংবাদ প্রভাকর’র আশ্রয় পত্রেও সেই উপহাস-বিজ্ঞপ্ত প্রকাশিত
হইত। অক্ষয় বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, “জিগীষা” “জিহ্বীবিষা”
প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও শিক্ষিত
লোকের বাটীতে যাইতাম, তখনই পাইতাম “জিগীষা” “জিহ্বীবিষা” প্রভৃতি
শব্দের সহিত ‘চিচ্চামিষা’ শব্দ যোগ করিয়া হাস্যহাসি হইতেছে।”

আমরা এই দুই জনের অমূল্যকরণ করিতেন, তাহাদের ভাষা আরও রসহীন
শক্তিহীন হইতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—“এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা
এবং সংস্কৃতানুকরণিতাহেতু বাঙ্গালী-সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল
বাঙ্গালী-সমাজে অপরিচিত হইয়া গেল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই
বিষয়ের নূলে সূচনার্ঘ্যত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত।
সংস্কৃতিতে পটু ভাষার সহিত দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি
সমঝিলেন, বাঙ্গালীর প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না ?
যে ভাষায় সবলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় ‘আলালের ঘরের
সুলাল’ প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন
সংস্কৃত ভাষার মূলে আঁধার-বারি নিবিল হইল।”

প্যারীচাঁদ যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন—তাহার প্রথম তুর্গ্যনিবাদের ধ্বনি
হইল, ‘মাসিক পত্রিকায়।’ ইহার প্রতি সংখ্যার প্রথমে দিখিত থাকিত—“এই
পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায়

আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হর, তাহাতেই প্রত্যাব সকল রচনা
বিলম্ব পড়িতে পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে এই
লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহা
এক আনা মাত্র।

এই কয় ছত্রেই পাঠক “আলালী” ভাষার ভণ ও দোষ উভয়ই
পাইবেন—“ভণে”র সঙ্গে লেখককে “প্রস্তাব” “লিখিত” প্রভৃতি শব্দ
করিতে হইয়াছে। তাই যিনি উভয় ভাষার সময়ে সর্বভাবপ্রকাশ
নানোন্নত বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি
“বাঙ্গালা আক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ ভাষা। তাহার অভাব পূরণের
হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্ত্ত করিতে হইবে। কর্ত্ত করিতে হইলে
মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত
ভাষা; ইহার রচনা শব্দ ভাষার হইতে বাহা চাও, তাহাই পাওয়া
দিতীয়তঃ, সংস্কৃত শব্দ নাইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে; বাঙ্গালার
মন্ডা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতের নিকট। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে
নাইলে অনেক বুঝিতে পারে; ইংরাজী বা আরবী হইতে নাইলে কে
‘মাধ্যাকর্ষণ’ বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকে
‘জ্যোতিষ’ বলিলে-ইংরাজী বাহারা না বুকে, তাহারা
অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে
গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিম্নোক্ত অর্থ বাঙ্গালা শব্দ
তদাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার বাহারা করেন তাহাদের
তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।”

বিক্রোহ প্রচলিত ব্যবস্থা বিনাশের প্রয়াস—সুতরাং তাহাতে উচ্চ
—প্রাক। টেকচাঁদী ভাষাতে সেই উচ্চ আলভার চিহ্ন আছে। প্যারীচাঁদ
পরবর্তী রচনা হইতে সে চিহ্ন মুছিয়া বাইতেছিল। কিন্তু টেকচাঁদী
একমলে বিঘ্ন বিকোভ উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি “মাসিক পত্র
‘জ্ঞানালোচন’ প্রভৃতিতে যে বাঙ্গালা লিখিয়াছিলেন তাহা নীরস
ছিল। “মত সুরগী ও টেকচাঁদী-বাঙ্গালা একফালে প্রচলিত হইয়া
গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল।” হারদানাথ বিদ্যাসাগর
পণ্ডিতগণ এ ভাষার নিন্দা করিতে লাগিলেন। রামধি
এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি তাহার ‘বাঙ্গালা ভাষা ও

বিষয়ক প্রস্তাবে' দিখিলেন—“আলালের ঘরের দুলাল বল, হতোম পেচা বল,

আলালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্কের সহিত পাঠ করিয়া আনন্দ-করিতে

পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে

পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ

নহে, ঐ ভাষায়ই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ

করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের

পুস্তকনির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন

পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন

না। কেন পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে,

একরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নূর এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা

বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা স্তম্ভদার বিশেষ

মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা

না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, একরূপ ভাষার গ্রন্থ রচনা করা

উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া

অনবরত মিঠাই-মুগা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে

আদার কুটি ও কুমড়ার খাটা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না,

সেইরূপ কেবল বিভাঙ্গাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার

পরিবর্তন করণার্থে মধ্যে মধ্যে অপরিবিধ—রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের

অবশ্যক। কলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানা প্রকার, তাহাদের রুচি

সেইরূপ নানা প্রকার; একবিধ রচনা পাঠে সর্ববিধ পাঠকদিগের রুচি

নিরীতি হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে, অতএব ভাষার মধ্যে নানা প্রকার

রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক আমাদের বিবেচনার

হাস্য-পরিহাস আদি লঘু বিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারী

হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্যে বিভাঙ্গাগরী ভাষা

সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।”

ইহার উত্তরে বঙ্গিমচন্দ্র ‘বঙ্গদর্শনে’ দিখিলেন—

“আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ভাষার

মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া একরূপ ভাষা ব্যবহার

করিতে পারে না। বুদ্ধিগাম্যে, ভাষার মহাশয়ের বিবেচনার পিতা-পুত্রে

বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কণোপকণন করা কর্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা

হইতে পারে না। এই আইন চলিবে বোধ হয়, ইহার পর তিনি সে

মাতার কাছে থাকিব-চাহিবায় সময় বলিবে, "হে খাতা, খাতা দেখি

এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবাদার করিবার সময় বলিবে, "হি

শাহিকা মদীয়া।" জায়রজ মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে

লজ্জাবোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না।

তিনিও তাঁহার ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গলা

সমাসী পরস্পরাবিত্তাসে তাহাদিগের মাথা মুড়াইয়া-দেন। তাহার

এবং বিজ্ঞান অধিক বিজ্ঞা উপার্জন করে, এমন বোধ হয় না।

কেন না, আমাদের স্থল বুদ্ধিতে ইহা উপলব্ধ হয় যে, যাহা

না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষাস্ত হয় না। আমাদের

বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। জায়রজ মহাশয় কেন

ভাষাকে শিক্ষাপদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন। তাহা আমরা

জানিয়া দিব করিতে পারিলাম না। বোধ হয় বাল্যসংস্কার তিন

কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাহার বীভরণের কারণ নহে। আমরা

নিশ্চিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্থায় যে ভাষার বাণীলা বিষয়ক প্রভাব

লিপিগাছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে

তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদী

রঙ্গরস আছে, জায়রজে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, পিতা

পুত্রে একত্রে বসিয়া অসমুচিত-স্থে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পাণ্ডা

জাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালা দেশে পিতা

একত্রে বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিন্তা অধ্যাপক অতীত

না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার সহিত কীৰ্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

তাইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে

জাহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত

সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।"

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" গণ্ডে "বাঙ্গালা সাহিত্য" মূল্যে এক

প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখকের নাম ছিল না। কিন্তু তাহা

কেনা বলিয়া চলিত। তাহাতেও প্যারাগ্রামকে বাঙ্গালা

নব্বাৎক বলা হইয়াছিল। "It was reserved to Tukaband Thakur

to deal the first blow to this insufferable pedantry and all

honour to the man who did it." * * He vigorously excluded from his works, except on very rare occasions, every word and phrase that had a learned appearance. His own works suffered from the exclusion, but the movement was well-timed. * * His success was eminent and well-deserved."

আমরা বলিয়াছি, তাঁহার পূর্বের বাংলা পুরাতন আদর্শানুগ—নীরস। তিনি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, তাহাতে ইচ্ছা-কল্পিত শব্দ-বর্জনের চেষ্টা করেন। সে ভাষা বিদ্রোহের ভাষা।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের পুত্রকে প্যারীচাঁদের পুস্তকগুলি একত্রে করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে বলেন। যখন প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় (১২৯৯

বঙ্গাব্দ) তখন তিনি "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান" নির্দেশ করিয়া এক প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন,—“বাঙ্গালা সাহিত্যে

প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।” সাধারণের বোধগম্য ভাষা সাহিত্যে অতি অধিক ব্যবহৃত হয়, সাহিত্যের দ্বারা দেশের ভিত্তি মজল হয়—এই

সমীচীন মত ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“গদ্য বস্তু সুখরোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

“প্রাচীন কালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাবন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালার সচরাচর পুস্তকরচনা সংস্কৃতের দ্বারা পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না,

এমন কথা বলা যায় না, কেন না, হস্ত-লিখিত গদ্যগ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা

কেনে-বলা যায় না। মুদ্রাবন্ধ সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের

প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর বে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন

ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুব্রজের ব্যবহার্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের

ব্যবহার্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিম্নে বাঙ্গালীকালে ভাষাভাষা অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথো পুস্তক লিখিত

জানিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অথ কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না।

তাহারা কদাচ 'ধৰ্ম্মের' বলিতেন না, — 'বদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না — 'শর্করা' বলিতেন। 'ধি' বলিলে তাহাদের রসনা অন্তঃস্থ হইত,

'দ্বাদশ'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'দ্বুতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, —

'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, — 'রস্তা' বলিতে হইবে।

ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চাহকার করিতে হইবে।

আমি দেখিয়াছি, এক জন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ সুখে

আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানেন না, স্তম্ভরাং অধ্যাপক

মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গভুগোল পড়িয়া

গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তদে

তাহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা ভগ্ননই বিদগু হইত, কেন না।

কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীৰুদ্ধি হইত না।

“এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ইন্দুৰচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়-

কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী

হইলেও ভক্ত হুর্কোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি

স্নেহময় ও মনোহর। তাহার পূর্বে কেহই এরূপ স্নেহময় বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে

পারে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সংস্কৃত-

প্রাধান্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূৰে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায়

ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যায় নাই

এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং

বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রাচ্য

আব্দক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায় মনোহারিতার বিমুক্ত হইয়া কেহই

আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই

বাঙ্গালা সাহিত্য পূৰ্ণমত সঙ্গীর্ণ পথেই চলিল।

“ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটনাছিল।

সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্গীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোদিক

সঙ্গীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের

বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা

ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রস

করিত না, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু

তাঁহার পুস্তকলা ও নীতিবাস বনবাস সংস্কৃত হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরাজি হইতে

এবং বেতান-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আব সকলে তাঁহাদের অনুকাৰী এবং অনুবর্তী। বাঙ্গালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিবে হস্ত প্রসাধন করিতেন না। অগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরীর সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যেব পক্ষে ইহাব অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিজ্ঞানাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু ইহা কবিরাজিগণ, তাহা সমবেদ প্রয়োজনানুযায়, অতএব তাঁহাবা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসাব পাত্র নহেন; কিন্তু সন্যস্ত বাঙ্গালী-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

“এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কৰ্ত্তব্যমান হইত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূৰ্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিন্নবশেষের জন্ত সন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনাদের রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’ নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’ বাঙ্গালা ভাষা-চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ কবিত্তে পারেন, কিন্তু ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আব কোনও বাঙ্গালী গ্রন্থের দ্বারা প্রদত্ত হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

“আমি এমন বলিতেছি-না যে, ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’র ভাষা আদর্শ। উহাতে গান্ধীধ্বজ এবং বিপ্লবের অভাব আছে; উহাতে অতি উন্নত ভাব নাই, নীচল সময়ে, পবিত্র কল্পনা বাক্য কি না, সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম বাঙ্গালী দেশে প্রচলিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দর ও সরল এবং যে সর্বজন-স্বায়-গ্রাহিত। সত্যতত্ত্বায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্বল, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় ভাষাশুদ্ধির কাদম্বর্য্য অবলম্বন, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’ ইহাব কেহই আদর্শ ভাষার রচিত নহে। কিন্তু ‘আলালের ঘবের ঢুলাল’র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা গ্রন্থ-বিষয়-ভেদে একেব প্রবলতার ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ বাঙ্গালা গল্পের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গল্প যে উন্নতির পথে বাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার পথপ্রদর্শক প্রথম কাব্য। ইহাই তাহার অক্ষয় কীর্তি।”

চন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। সহসা—“কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই স্থপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই সোণেরকাঁওলি, সেই সব দ্বন্দ্বক-ভুজানো-কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আবার প্রাথমিক বর্ষের মত “সমাগতো-রাজবহুসতধ্বনিঃ”। এবং মুম্বলধারে ভাবনাবশে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী এমনন্ত নদী নিবরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।”

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ বোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। অগ্রহায়ণ।—প্রথমই শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত একখানি ছবির প্রতিমূর্তি। চিত্রকর কবির দ্বীলনাধার—

“মুখ্য যেমন আলোক বাগ্মি,

না তেনে রাত কটায় সন্ধ্যা,

তেনেই তোমার আশায় আশা করি আমি আছে ছেয়ে।”

বেখাষ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ছবিখানি আশাপ্রব। ইহা ভারতীয় হইলেও, চিত্রকলার বিদগ্ধনান নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। বসন্তকুমার এই চিত্রে উদ্ভট ও অদ্ভুত রীতির প্রভাব অনেকটা অতিক্রম করিয়াছেন।—ইহাই প্রকৃত প্রথম। শ্রীগুণদাস সরকার ‘পল্লীর বৈয়াক্তিক উন্নতি ও পল্লীসংস্কার’—এবং দেশের জীবন-মরণের সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন।—আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র বর্গ হইতে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবেন।—বাঁহা বা সরকার মহাশয়ের অভিভাষণে পল্লীর প্রসঙ্গ, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ায় কথা দেখিয়া বিহবিল্য উঠিয়াছিলেন, বিজ্ঞপ্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতামতই ‘ভারতী’র কৃষ্ণে প্রতিফলিত হয়। সেই সম্প্রদায়ের মুখপত্রে এই প্রেরণ প্রবন্ধেব অবতারণা দেখিয়া মনে হইতেছে, যুগধর্ম্ম অনতিক্রমণীয়। প্রেরণ লিখিয়াছেন, ‘ম্যালেরিয়ার প্রতিফলন-(?)’-কলে সরকার ও জেলা বোর্ড হইতে বহুবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। গ্রামবিশেষের স্বাস্থ্য-অগ্রদূতের জন্ম—ডঃ ডেন প্রকৃতি-কমিটিয়া। সাহায্যে ম্যালেরিয়া এবং মলেকের দ্বারা হইতে গ্রামবাসী-(?)-এর উদ্ধার পায়, সে বিষয়ে উৎসাহ প্রার্থনাহা প্রবন্ধ হইতেছে। কোথাও বা ডাক্তার বেন্টলি (Dr. Bentley) কর্তৃক অনুমোদিত Beneficacione প্রণালী বঙ্গের ঘলে পল্লীর বিবাক আবর্তনমি দুই। কেলিবার ব্যবস্থা হইতেছে।—উৎসাহ প্রসঙ্গ হইতেছে বটে, এ প্রবন্ধেও ক্রমাগত প্রদানের ফলে তাহা হিম্নায়ের মত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও সত্য; কিন্তু শুধু উৎসাহে পল্লীসংস্কার কেন কোনও সংস্কারই সম্পন্ন হয় না। ‘অর্থনাহা’ও ‘প্রবৃত্তি’ না হইতেছে, এমন নহে। কিন্তু দেশের পরিদর্শন, জনসংখ্যা, ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা, বিস্তৃতি ও ভীষণতা, এবং ভবিষ্যৎ দেশবাসীর শৌচনীয় অবস্থার অনুপ্রাণে তাহা যে সমুদ্রে পান্য-অর্থ্য। এ বিষয়ে ‘আন্তরিক চেষ্টা’ রিপোর্টে যতটা প্রকাশ পায়, কার্যক্ষেত্রে তাহার অভাবে তাহা ততটা প্রকাশ পায় না।—এই অগ্রহই এই অকর্ম্মণ্য ও উৎসাহ-মামলো পরিপূর্ণ রিপোর্টগুলি ম্যালেরিয়া-রোগীরা যত্ন-বিস্তার নীলশিখরপ্রতি চক্ৰ-চন্দ্রদোশের মত বিগট হইলেও, আমাদের মনে ভ্রমের—বিষাদের—হতাশাবাই স্পষ্ট করে। উৎসাহের বা আশার স্পষ্ট কবিতা পায়ে না।—‘বঙ্গবন্ধু’র পল্লীর

দ্বাত্রিংশত্তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অ্যানী বেসান্টের অভিভাষণ ।

প্রতিমিথি ভ্রাতৃগণ! পুত্রগণ!

ভারতবাজার নব্বিশ্রেষ্ঠ দান সভ্য সভ্যই এই জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী। আমার অগ্রে যিনি যখন এই সম্মানের অঙ্গনে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনিই মোডন ভাষায় আগমন ধৃতবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ধর্মের জননীর পূর্ণ ব্রহ্ম, ত্রিভুজ ও সম্রাটের জাজ্জামান নিদর্শন—কাবণ, যদি যে বৎসর এই আসন অধিকার করেন, তিনি সেই বৎসর জন্ত ভারতমাতার তিত্তিত্ত সেবকাগ্রণী। কিন্তু আমার পূর্ববর্তীগণ যদি বা যোগ্যভাবে নিজেদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিতো পাবিয়াছিলেন, আমি কি ভাবার আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব—আমার শ্রুতি ও তাঁহাদের অপেক্ষা শতগুণে অধিক। কনগ্রেশনের ইতিহাসে এই প্রথমবার আগমারা এমন ব্যক্তিকে সভানেত্রী নির্বাচিত করিয়াছেন, যে নির্বাচনের সময় রাজপুত্রদিগের বিবাগভাজন ছিল, এবং দেশের শান্তির পরিপন্থী বলিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ ছিল। যখন আমি আগমন অগমনিতি ছিলাম, তখন আপনাবা আমাকে সম্মানের ছিব্বীটে ভুক্ত করিয়া ছিলেন; যখন আমি দিকৃতি ছিলাম, তখন আপনাবা আমার সত্যতা ও সন্তোষে বিশ্বাস করিয়াছিলেন; যখন আমি আমলা-মজিব স্তরতাপে পরাভূত ছিলাম, তখন আপনাবা আমাকে নেত্রী বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন; যখন আমি যৌনগ্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষা অসমর্থ ছিলাম, তখন আপনাবাই আমার পদসেবা করিয়াছিলেন, এবং আমার জন্ত মুক্তি জয় করিয়াছিলেন। আমি অতিক্রম করিয়া একবিধাঙ্গ জননীর সেবা করিয়া যত্ন হইতেছিলাম—আপনাবা জগতের নন্দন আমাকে নেত্রীরূপে বরণ করিয়া এই উচ্চসন দান করিলেন। আমার এত কি ব্যগিতা আছে, যজ্ঞারা আপনাদের বর্ণ পরিশোধ কবিতা কি ভাবনা আপনাদের দত্তবাদ দিব। স্বাক্ষা যখন এত দীন, তখন কার্যে তাহা প্রকাশিত হউক। আপনাদের এই প্রতিনিধন আমি জননীর সেবাদ নিমোজিত করিব। আমার জীবন তাঁহার দ্বারা উৎসর্গ কবিতা। আমার সর্বশ্রম হাতুনি

সেখানে বিবেচন করিলাম—আমর, কেবল নাহো নয়, কতকটা বাবা বোধগা
করি—‘বন্দে মাতরম্’।

ভারতের ভাগ্যচক্রের এই সন্ধিক্ষেপে আমার নির্বাচনে হয় ত একটা সার্ব-
কতা আছে। সত্য বটে, জন্মত ভারতসন্তান হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটে
নাই—কিন্তু উত্তরমুদ্রবর্তী সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ আমার জন্মস্থান, পশ্চিমের মধ্যে—
শ্রীশ্রী স্বাধীন প্রতিষ্ঠান-সমূহের নিবাস : অনেকেই জানেন যে, প্রাচীন যুগে
আর্য্যজাতির যে সকল শাখা য়ুবোপভূখণ্ডে উপনিবেশ রচনা করবে, তাহার
অপনাদের এসিয়াস্থ দ্বারীভূমি হইতে স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার বীজ সঙ্গে লইয়া
লিগাইয়া। পরবর্তী কালে সাকুনান গ্রামসমূহে আমরা যে স্বাধীনতাসন দেখিতে
পাই—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকবিগের মতে, তাহার পূর্বরূপ এই প্রাচীনভূখণ্ডে।
তাহার আরও বলেন যে, ইংরেজ শক্তির যে বরণীয় স্বাধীনতা, তাহা স্বায়ত্ত
স্বাধীন প্রাচীন আর্য্য ‘পল্লীসমাজ’-রূপ বীজের ফলবান বৃক্ষমাত্র।

ইংলণ্ডের পল্লীসমাজে ঐ স্বাধীনতার বিকাশ নরমান-বিজয়ে বিপর্য্যস্ত
হইবার উপক্রম হইয়াছিল—যেমন এখানকার পল্লীসমাজের যুগসংস্কৃতি স্বাভাব্য
হইয়াছিল কোম্পানীর শাসনে দৃষ্টপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ড ঐ নরমান-
সিদ্ধান্তে কলিমা এক স্বাভাব্য জিন্দগিরি দ্বারা হইলেন, এবং স্বাধীন
পারলামেন্ট গড়িয়া তুলিলেন। এখানেও স্বায়ত্তশাসনের সেই পুরাতন বীজ
কনগ্রস-রূপে এবং পরে মোনটের-দীর্ঘ-রূপে অঙ্কুরিত হইয়া এখন—হোমরুল
রূপে পুষ্পিত হইতেছে। যে ইংলণ্ড মিডল্টন, ক্রমওয়েল, সিড্‌লী, বার্ক,
পেইন, শেলী, উইলবারফোর্স ও মার্ভেলের জননী, যে ইংলণ্ড ম্যাটসিনী, কসম্ব,
স্ট্রপটকিন, টেপেনকেব আত্মরাজ্যী, যে ইংলণ্ড গারিবল্ডীর আবাহনকর্তা,
যে ইংলণ্ড অত্যাচারের—খেঁচাচায়েন শত্রু, যে ইংলণ্ড স্বাধীনতার উপাসিকা—
আজ আমি সেই ইংলণ্ডের এডিল্‌-রূপে আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আজ
এখন ভারতবর্ষ আপনার পায়ে ভ্রম করিয়া দাঁড়াইয়াছে—আত্মাকারী জনসং-
গে নয়, কিন্তু স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্বাধীনতাকামী আশ্রিত মহাশক্তি-রূপে—আজ
যখন ভাবতসমাজী আত্মাধীন সেবিকা-রূপে নয়, কিন্তু সহকারিণী নবী-রূপে
বৃটানিয়াম সহিত মিলিতে প্রস্তুত—আজ এই মহাদিনে আমি মেহে প্রতীচা
কিন্তু প্রাণে প্রাচ্য, ইংলণ্ডের ছবি। কিন্তু ভারতের পুত্রিকা—আমি বৃটেনব
ও ভারতের মহামিলনের সূত্রী-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এ মিলন জন্মের
মিলন, খেঁচাচাত মিলন—প্রভুর মিলন নহে। সেই জন্ম এ মিলন দাবী

মিলন, এ মিলন—বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ইহা প্রেমের ভক্ত—সংসারদিগের
‘রাখী’—ইহাতে উভয় জাতিরই কল্যাণ—ইহা উপর ভগবানের আশীর্বাদ
বর্ণিত হইয়াছে।

শাস্তিধামে।

জানতের প্রধান জননাঙ্গ দানাদাই নাগবোজী ইহাম-ছাড়া দিয়াছেন।
আজ বাহারা দিব্যধামে থাকিয়া ভাবতের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন।
অভ্যুদয়ের সহায়তা করিতেছেন, তিনি তাহাদের অগ্রতম।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাড়ে, এ. ও. হিউব, হেনরী কটন, ফিল্ডের
মেহেতা এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে—বাহারা কবি সিউনবারনের জীবন
স্বাধীনতা-নৌকের এবতার, বাহামের—

‘হে মানব! পূজ চিবদিন

স্বাধীনতা আর ইহাদেয়ে।

তোমার, আমার, মানবের তরে

দীপ্ত শিখামণি সবার শিরে ধরে’

(বারী) আলোকিত পথ দেখাইলা নবে

স্বাধীনতা-দেবী অখলিন!

পারে যেন লভিতে তাহারে।’

—দানাদাই সেই-সকল অগ্রতবাজীদিগের অগ্রতম। স্বার্থ গুতিবচনে নানি

তাঁহার স্বতির কি সম্মান করিতে পারিব? তাঁহার কীর্তীই তাঁহার স্মৃতিবা

করিতেছে—তাঁহার প্রত্যাত নাকসেবাই তাঁহার অনখব মহিমা।—তাঁহার

অনন্দের সাক্ষ্য ও অগ্রত দেশপ্রীতির অঙ্গুরণ—কিন্তু যদি আমরা তাঁহার পদে

অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতার গুণ পরিশোধিত হইতে

পারিবে—ভবেই সেই স্বরাধ আমরা অচিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব—

যে স্বরাজ্য প্রার্থনার জন্ত সেই মহাগুরু-উৎসর্গ ছিদ্দন, কিন্তু জগৎ-নেত্র

দেপিতে পান নাই—বাহা দিব্যধাম হইতে দিব্যচক্ষু তিনি শীঘ্রই রেখিতে

পাইবেন।

মুক্ত ও মুক্তপূর্বের সমর-ব্যয়।

যে মহাপুরুষের আবেশে জাতির পর জাতি আকৃষ্ট হইতেছে, সেই

একন চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। যেদপ সত্যকৃত্তানে সর্বদা-প্রকাশন

কর হইয়াছে ভাঙতে রত কালে এই মহানদের দিনটি চিহ্ন, বর্ধমান হিন্ন
 অপর্যাপ্তক ভাঙার পূর্বনির্দেশ দেয়। তবে বাঙালীদিগের দৃষ্টিতে নয়,
 আধ্যাত্মিক চোখে দেখিলে আরও সচেতন, এ যুদ্ধের শেষফল নিশ্চিত
 কাৰণ, এ যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য—যেহা তত্বেব এবং এক আতি কড়কলান
 আতির উপর প্রভুত্ব স্থাপনের অধিকারিত্ব-প্রদর্শন ও বিদ্যোৎসাহন, যা
 প্রত্যেক আতির ও (আত্মীয় ন্যায়গণের অনিবার্য) প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাভা-
 বিক ও আত্মবিকাশের বিধিত অধিকার আছে, সুদূর ভিত্তিতে সেই
 অধিকারের ব্যবস্থাপন। সেই শব্দ যে সঙ্কলিত হেচ্ছা-তত্বেব দীর্ঘায়ুতন

অনুকূল (যে ভগ্নে একের ধান্যগণের মঙ্গলজনক যোগেব কর্তা), এবং অদ্বৈত
 আদিকের সাংঘাতিক আঘাত তত্বেব দীর্ঘায়ুতনব অনুকূল (যে তত্বেব এক
 আত্মীয়-সম্প্রদায় সমস্ত আত্মিক নিগূড়ক করে), সেই সমস্ত শক্তির
 মঙ্গল কলিবে তত্বেব দ্ব্য-ব্রহ্মণ্ডের আত্মতন (জগদী ও অজগীয়) কেন্দ্র
 হইয়াছে—যেন প্রকাশে বাবে লেখা হইয়াছিল।
 আত্ম, আত্মিক চিত্তভূমিতেই নবীনের প্রতিষ্ঠা হয়।

যে সকল দ্রবীষিত বর্ধমান সভ্যতার উচ্চসোধকে ধ্বনিগণী কবিদ্যে,
 আত্মিক উচ্চতর ভিন্ন নবগণের মর্ত্য-মহাদ-ভিত্তি হইবে এবং আত্ম,
 আত্মিক বর্ধমান আত্মিক ও কথ—সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।
 আত্মিক উচ্চতর ভিন্ন যেন অকাল-সক্তি দ্বারা যুদ্ধের বিবর্ত-নির্দিষ্ট পরিণাম
 প্রাপ্ত না হয়। বি পূর্বে, বি পশ্চিমে, যেহা তত্বেব ও আসনা-তত্ত্ব সমুদ্রে
 দিনে হইতে হইবে, এবং পাছে ভাঙার দণ্ড বীজ হইতে ভবিষ্যতে অল্প
 হইতে হয়, সেই সভ্যতা বীজ কলিবা ওত্বেব এই তত্বেব মানুষের ঢাক হইবে
 হইতে হইবে। সত্যবাদী কবিতে হইবে যে, তাহাদের এমন প্রিয়তম ব্যক্তি
 যে যুদ্ধে যে ক্ষেত্রেও স্বাধীন আত্মিক দ্ব্যতত্ত্ব বীজ দীর্ঘায়ুতন—আত্মিক বা
 আত্মিক উচ্চতর ভিন্ন দ্ব্যতত্ত্বের অধিকার সম্পদ ও সফলতার ভাণ কবে, কিন্তু
 পশ্চিমে যে প্রাণী গণতত্ত্বের কদম্বিক নিষ্কাশন নিশ্চয় পৰাভূত হয়।
 অতএব কদম্বিক তাহাদের অসমর্থত্ব স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত করিতে হইবে—
 যেন আত্মকেই তাহাদের বাহ্য চাকচিক্যে ও আত্মতত্ত্ব সফলতায় প্রতাবিত
 না হয়। তাহাদের উপযোগিতার দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন তাহারা কার্য
 অক্ষমতায়, বাচিশব অযোগ্য—তাহাদের যুদ্ধ অনিশ্চিত।

বুটন যে যুদ্ধে অসমর্থ হইতেন, সে দিনের কথাও এক কলি আত্মিক

দ্বারা সুরক্ষিত স্বাধীনতা বশবাস্তব জ্ঞান। সে সময় তিনি যে সবকিছু ঘোষণা
 ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভাবতবর্ষে এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্গত
 উৎসাহের তাড়িত প্রবাহিত হইয়াছিল। তাহার বিধা না করিয়া, স্বাধীনতা
 ইচ্ছার সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। তখন তাহার কল্পে প্রাচীন ইংরেজ
 স্বাধীনতা বংশী সুরিনা তাহাদের সন্দেহস্রোতে প্রতিধ্বনি ত্যাগিয়াছিল।
 সবলেই মুক্তার্থ অগ্রসৃত ছিদ্র—কেবল গর্ভ হাল্ফডেনের প্রতিভা ও বর্ষের
 ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র প্রাদেশিক চম্, এবং গর্ভ হার্ভিংয়ের ক্রিষ্টাব্দে
 অভিযানের সন্ত পেশত ভারতীয় কোজ বর্ষমুখে নিষ্কিন্ত হইয়াছিল।
 ক্ষুদ্র বাহিনী কাণবিলম্বের অস্ত্র যুক্তিতেছিল; ফ্রান্সের স্বাধীনতা
 শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য যুক্তিতেছিল; এক পদ এক পদ
 হস্তা মুহূর্ত গণিতেছিল। এমন সময় ভারতীয় সেনা ফ্রান্সের তুমিতে
 ক্রিয়া বাহমুখে অগ্রসর হইল, এবং ইংলণ্ডের অবসর সৈনিক-পক্ষমতেন
 সুখচিত যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল, ব্রিটিশ-বাহিনীর প্রতিদান
 স্থগিত করিল। অচিরে ইংলণ্ড ও ভারতের মিলিত বাহিনী এনে
 ব্যর্থ বচন! করিল, যাহার পশ্চাতে দুই বৎসর ধরিয়া তাহার
 (খ্রীষ্ট দেশের অধিবাসী বীষেবা অনেক সময় আবহু তুর্বা-কন্দনে
 হইল) মৃত্যুপথে যুদ্ধাছিল, কিন্তু কখনই শত্রুর নিকট হাতসমর্পণ

ও মন্দীভূত হইল, এবং তাঁহাদের উৎসাহে অবসান আসিল। ফলতঃ এই দুই মহাজাতিকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এমন অমূল্য সুযোগ ব্যর্থ হইয়া গেল।

বুলাবস্তের কিছু পরে অসি বাহন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, যত দিন ইংলণ্ড কূটনীশ্চর না হইবেন, যে, স্বেচ্ছাতন্ত্র ও আদলা-তন্ত্রের—শুধু ইউরোপে নয়—ভারতবর্ষেও অবসান করিতে হইবে, ততদিন যুদ্ধের শেষ হইবে না। কলিকাতার সম্রাটশ্য বিশপ মহোদয় স্বাধীন-জাতি-মুক্ত সংসাহসনসহকারে সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাতন্ত্র অল্প রাখিয়া ইউরোপে তাহার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করা সিংহাচার্য্য। এখন এই ঘোষণা সুস্পষ্ট ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজ্যের লক্ষ্য—স্বরাজ-স্থাপন, এবং অচিরে সেই স্বরাজের বহলাংশ প্রদত্ত হইবে। এখন গত বর্ষে লক্ষ্যো-লিপিবদ্ধ সংস্কার সমূহের প্রদান দ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে, তখনই যুদ্ধের অবসান সমীপবর্তী হইবে। কারণ, স্বেচ্ছাতন্ত্রের মৃত্যুনিশান ঘোষিত না হইলে এ যুদ্ধের অবসান নাই।

সত্য বটে, ভারতবাসীর সহানুভূতির প্রথম উৎসাহ কতক মন্দীভূত হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার হীনবহার দিকে তাহার চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—কি কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে, তাহার আলোচনা আমি পরে করিতেছি। এই মন্দীভাবের জন্য কিন্তু ভারতবাসী দায়ী নহে। সে মহা হট্টক, ভারতবর্ষ যুদ্ধ বিষয়ে যে প্রভূত সাহায্যদান করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার অপলাপ করিবার উপায় নাই। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে যুদ্ধান্তের বহু পূর্বে হইতে ভারতবর্ষ—প্রথমতঃ নিরাপত্তে, এবং ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের পর কংগ্রেসের নিরন্তর আশ্রিত স্বেচ্ছা—সতত-বর্ধমান সমর-ব্যয়ে ভারত বহন করিয়াছে। ইহার জন্ম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের সমবার-প্রণালী (Amalgamation Scheme), নীমাত্তের পারে বিবিধ যুদ্ধের খরচ এবং সর্বদা সফরকারী নীমাত্ত-ও-প্রত্যন্তগামী সমর-ভিমানই দায়ী। ঐ সকল অভিযানে ভারত-বর্ষের ফোনও স্বার্থসিদ্ধি হয় নাই। তথাকথিত সাম্রাজ্যিক হুবিধার জন্যই ঐ সকল অভিযানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৫৯ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরে ভারতীয় সেনা ৩৭টি যুদ্ধ ও অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিল—১০টি যুদ্ধ ও ২৭টি অভিযান। ১৮৬০ ও ১৯০০ খৃষ্টাব্দের দুইটা চীন-যুদ্ধ, ১৮৮৪—৬ খৃষ্টাব্দের ভূটান-যুদ্ধ, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের আফগানিস্তান-যুদ্ধ, ১৮৭৮—৯ খৃষ্টাব্দের আফগান-যুদ্ধ, এবং কাবুলে প্রেরিত দল

গণের হত্যায় পত ১৮৫২—৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আফগান-যুদ্ধ, এবং তাৎক্ষণিক
ফলে সতত সঞ্চারণীল 'মৈজানিক' সীমান্তের অমেষণে ভারতের 'সিদ্ধান্ত-
সীমান্তের অগ্রগমন; (কোন বর্ডেন, এই উপনকে পশ্চিম সীমান্ত সিদ্ধান্তের
যেখা হইতে সুলিম্যান পর্বতের পশ্চিম উপত্যকা, এবং পেনাবার হইতে
কোয়েটা অবধি অগ্রসর করা হইয়াছিল); ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মিসরীয় যুদ্ধ,
মহাতে ভারতবাহিনী বিশেষ পৌর-অর্জন করিয়াছিল; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের
তৃতীয় বঙ্গা-যুদ্ধ, যাহার ফলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ব্রহ্মদেশ ভারত-সাম্রাজ্য-
ভুক্ত হইয়াছিল; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এবং পুনশ্চ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত-বিজয়-ফলে
এই সংক্ষিপ্ত তালিকা। পূত্র-বৃদ্ধ-বা অভিযানের সংখ্যা ২৭। ১৮৫০-খৃষ্টাব্দে
সুপ্রভর সীতানা অভিযান, এবং ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সীতানা-অভিযান; ১৮৫০
খৃষ্টাব্দে নেপাল-ও-সিকিম অভিযান; ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিকিম অভিযান; ১৮৬০
খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুয়ল যুদ্ধ; ১৮৭১—২ খৃষ্টাব্দে লুদাইবিলগের
বিরুদ্ধে অভিযান; ১৮৭৪—৭৪ খৃষ্টাব্দে ডাফলাদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে
নাগালিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কাফরীসীদিগের বিরুদ্ধে, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে
বঙ্গা পার্শ্বীয়দিগের বিরুদ্ধে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাজিবা ডাফলাদিগের বিরুদ্ধে,
১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আফগানিগের বিরুদ্ধে, এই অকেই জোয়াব উপত্যকায় অভিযান
এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই উপত্যকার দ্বিতীয় অভিযান। ১৮৮৮—৯ খৃষ্টাব্দে পুনঃ
নিকিনের বিরুদ্ধে অভিযান, হুঞ্চ-পর্বত অভিযান, এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের
পার্শ্বীয় অভিযানের বিরুদ্ধে অভিযান, ১৮৯০ অব্দে দ্বিতীয় হুঞ্চ-পর্বত অভিযান,
এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মদিপুর যুদ্ধ, ১৮৯১
খৃষ্টাব্দে লুশাই যুদ্ধ, এবং মিয়ানমার-উপত্যকার অভিযান, ১৮৯৪—৬ খৃষ্টাব্দে
চিঙ্গল অভিযান, এবং ১৮৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে গুরুতর তিম-অবস্থায়, ১৮৯৭
১৯০০ ফোক নিপ্ত ছিল। এই দীর্ঘ তালিকা—বাহা আদি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে
শেষ করিতেছি, তাহার দেবভাগে সীমান্তে আর তিনটি অভিযান ১৯০১
খৃষ্টাব্দে মাদুদ-যুদ্ধ, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাবুল অভিযান, এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পাক-
কাবুল তিব্বত অভিযান। এই সকল ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে সন্দেহ-
গামরিক বায়-বুদ্ধির কারণ বুঝিতে পারি। এই সনে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাদুদ-ও
মাইগ্রানে ভারতসেনা-প্রেরণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা (যাহা কতকটা দেশ-
অভিনয়ের মত প্রতীত হইয়াছিল) এবং কমলীতিবারণের দ্বন্দ্ব-প্রায় ২০০০০০
পাতিও যুদ্ধ। এই সকল হতাবিগ্রহে অধিকাংশই ভারতীয় প্রয়োজনে ১৮৮০

সাম্রাজ্যের প্রয়োগে শাসনক হইয়াছিল, এবং তাহাদের ব্যয়ভাব-বহনও বিকল্পে
নবীন সহস্র ভাণ্ড-গব্বনে-টাই আগুতি করিয়াছিলেন, যদিও দুই এক জন
বেঁটাকি বউলাত কদাচ ক ঐক্যে মূলে উৎসাহ দিয়াছিলেন । আমার বিশ্বাস,
সিপাহে যে তালিকা প্রস্তুত হইল, তাহাও সম্পূর্ণ নহে ।

এ অবধি ভারতের শাসনভাব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া ইংলণ্ডের
রাজশক্তির অধীন হইয়াছে, তদনধি এই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা
সদর নামগ্রী ও কাণড়। রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর
স্বাধীন ভারতবর্ষকে এই ব্যবহার হইতে অনেকটা রক্ষা করিত ; কাবণ,
কোম্পানীর জেদ-ছিল যে, তাহার অর্থে পুষ্ট ভারতসেনা ভারতের স্বার্থ ও
শুশ্রূষার ভিন্ন প্রযুক্ত না হয় ।

এইরূপে সাম্রাজ্যের প্রয়োগে ভারত-বাহিনীর নিয়োগের ফলে কেবল যে
ভারতের প্রভুত আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, তাহা নয়, ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানও
বিশেষ খর্ব হইতেছে ; কাবণ, ভারতীয় সদর-মিতানে ভারতের বৌদ্ধ-জাতি-
বর্ণের সামাজিক মূল প্রভুতি পূর্ববৎ চবিত্তার্থ হইবার সুযোগ বা অবসর লুপ্ত
হইতেছে । সাম্রাজ্যে দেখিতে পাই যে, মহারাজা ভারতশাসন অঙ্গীকার করিবার
সময় বৎসর পবেই গজ-আহন পান করিয়া সহস্র-জাতিতে নিবস্ত্র করা হইল —
তাহার ক্রম-রূপ ভারতে পশু ও ক্রীন্দ্র আবির্ভূত হইল, এবং তথাকথিত
মান-নিম্ন জাতিদিগকে এবং অতিসমরপ্রিয় অতএব অবিদ্বান জাতিদিগকে
শেষ-বিতরণে প্রবেশ করিতে না দেওয়াতে বংকট-সংগ্রহের ক্ষেত্র ক্রমশই উদ্ভব-
হইয়া হইল, এবং তাহার ফলে—বালগী ও রাজ্যসী—মাহারা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পা-
নীর প্রধান নিভবস্থল ছিল, তাহাদের দৈনিক অবনতি ঘটতে লাগিল ।

এই সময়ে পটাবো শেষ্ঠতা যাহার উন্নত সাব-মাইকেল ওডামার সেদিন
একটা উৎকট ঝোঁক দিয়াছিলেন, সে শ্রেষ্ঠতা ব্রিটিশ রাজনীতি ও রাজ্যপ্রণালীর
কৃত্রিম ফল, এবং পটাবো বালগী বংকট-সংগ্রহের চৌকান বিকলজা—মাহার
সময়ে তিনি অবজ্ঞাচক অহুজ্জিত করিয়াছিলেন, তাহাও সেই নীতি ও
প্রণালীতেই ফল, যাহার জন্ত বালগী, মালগী ও মাহারা বালগী-মিতানে
এবং হইয়াছে । সাম্রাজ্যে কিন্তু প্রণালীও লভ কর্তব্যে কৃত খামখেয়ালী
বৃদ্ধভবে অসহনীয় অপমানের ফলে আবার বালগীর বেগা দিয়াছে । এই সময়ে
গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—“সাম্রাজ্যবাদের নিশ্চয় ও অসংকট
অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কাল্পনিক বাস্তবিক অসংখ্য সমস্ত ভারত চকিত ও

যুগপিত হইয়াছে * * সমস্ত ভারতবাসী আজ ব্যঙ্গালীকে নিকট বিশেষ-
ভাবে স্নানী ।'

এই সম্বন্ধিত বীণা বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ
পাইয়াছিল—যতদিন তাহারা মেছুবুন্দের শাসনাধীন ছিল, ততদিন ইহা অদেখি
ও বন্ধকটে নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু পরে সেই নারী ছিন্ন হইলে উহা ষড়ঞ্জ, ওড়-
হত্যা ও ডাকাতির আকার ধারণ করিল। নব্য ইটালীতে ফ্যাটিনী, নব্য
এবং নব্য স্মিয়ার কোপটকিন ও টেপনেকের মনোভেদ প্রকৃষ্ট হইয়াছিল।
বাঙ্গালী যুবক-আশাভঙ্গ হইতে যে অপবাদে উদ্ভব হইল, তাহা তাহাদের
নির্দিষ্ট হইল কাম্বী ও দ্বীপান্তর।—তাহার কুফল বর্তমান যুদ্ধের সময় সর্ভ হইয়াছে
ও সর্ভ কারমাইকেলকে ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে স্বকলও যে ব-
নাই, তাহা নহে। বাঙ্গালী যুবকের পুঙ্খলীয়া দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও মানস, এত
বাঙ্গালীর প্রচণ্ড জলপ্রাবলে ও হুর্জিহ্ননিবারণে প্রকটিত উল্লাস ও আত্মত্যাগ
আশ্চর্যপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ঐ বীষেই পরিণত ফল। বর্তমান যুদ্ধে
তাহারা যে সাহায্যদান করিয়াছে এবং করিতেছে—তাহাদের দ্বারা সমুদ্র
সাহক-বাহিনী (ambulance Corps) এবং সমুদ্রগামী বাহিনী-সমূহ
নতন সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া মেসোপটেমিয়ার অক্লান্তভাবে সেবাদান—সংগঠন
নিযুক্ত হইবার জন্য ১০০ সৈনিক-লইয়া বাঙ্গালী পণ্টন গঠিত এবং অগণিত
করিবার জন্য আরও ১০০ রিজার্ভ-রচনা, এবং নব নব-সংকট-সংগ্রহ—ঐ সময়ের
সাধেই আমরা রূগবানের মঞ্চলহৃত দেখিতে পাই—বাহাব দ্বারা
অকল্যাণের ভিতর হইতে কল্যাণকে নিষ্কাশন করেন, এবং দ্রোহ-বাত প্রকট
দেবায় নিষেধিত করেন।

ইংলণ্ডেও আমরা এইরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করিয়াছি। এক মন ফর-
কাম্বন্ধ হইয়া 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' অর্জন করিয়াছে। রাজনীতিক অধ্যয়ন
বা রাজপুরুষদিগের মনেহে বাহায়া এখন কাবাগারে-বা জন্তরীণে আবদ্ধ আছে
এই সময় যদি তাহাদের প্রত্যেককে যুদ্ধক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের সেবা করিতে
সুযোগ প্রদত্ত হয়, তবেই স্বার্থ রাজনীতিজ্ঞের কার্য্য করা হইবে, এবং তাহাদের
প্রতিও প্রকৃত করুণা প্রদর্শিত হইবে। ইহাদের আধিকাংশই তরুণ যুবক;
যদি দরকার মনে হয়, তাহাদের লইয়া স্বতন্ত্র পণ্টন গঠিত হউক, এবং
প্রতি-প্রশ্নে দুটি-বাণী হউক, কিন্তু তাহাদিগকে তাহাদের অধ্যয়ন-
করিবার ঐরূপ অবসর দেওয়া অবশ্যকর্তব্য।

শ্রমোৎসাহ বৃদ্ধিবিধিৰেব ফলে এবং অত্যন্ত কাৰণে (ক্ৰমশঃ তাহাব উল্লেখ
কৰিতেছি) ভাৰতীয় যুদ্ধে যে দুৰ্ভিক্ষ ব্যৱতাৰ অৰ্পিত হইয়াছে, তাহাতে এতটা
প্ৰগতি উৎপন্ন হইত না, যদি ভাৰতবাসী নিজে নিজৰ উপৰ-ঐ ভাৰ চাপাইত,
এবং ভাৰতকে সাম্ৰাজ্যৰ যোৱা-শিৰাৰ আখড়ায় পৰিণত কৰা হইয়াছে,
তাহাব দ্বাৰা ভাৰতবাসী নিজে উপকৃত হইত। কাৰণ, অত্যন্ত ক্ষেত্ৰেৰ স্থান
এ ক্ষেত্ৰেও ভাৰতবাসী সাম্ৰাজ্যৰ বোকা বহন কৰিয়াছে, অথচ সাম্ৰাজ্যৰ নক্তি
উপাধীনতাৰ ভাগী হইতে পাৰে নাই।

সেৱাহা-ইউক, ইহা লক্ষ্য কৰিবাব সময় যে, যে পৰিবৰ্ত্তনৰ ফলে ভাৰতীয়
সময়-বিভাগেৰ ব্যৱতাৰ এতটা বাড়িয়া-উঠিয়াছে, এবং দুৰ্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাব
নাম—“ব্ৰিটিশ-ৰিলিফ” তথাগী। এই প্ৰণালীৰ সাৰস্বৰ্থ এই যে, বিলাত
হইতে সৰ্ব্বদা যুদ্ধ কালেৰ স্ত্ৰী-পুৰুষী সৈন্ত এ দেশে আনীত হয়, এবং যেন
তাহাদেৰ শিক্ষানবীণি শেষ হয়, অমনই তাহাদিগকে বিলাতে ফেরত পাঠাইয়া
অন্ত নূতন সৈন্তদল আনিদানী কৰা হয়। তাহাব ফলে, ঐ সকল শিক্ষিত সৈন্ত

আকাৰ সমুদায় সুবিধা ও লাভ ইংলণ্ড ভোগ কৰেন, এবং তাহাদেৰ শিক্ষা,
কথাবাত ও অত্যন্ত সযত্ন ব্যৱ-ভাৰতবাসীকে বহন কৰিতে হয়। এক কথায়
ভাৰতবাসীকে ব্ৰিটিশ সেনাব শিক্ষাক্ষেত্ৰতপে ব্যবহাৰ কৰা হয়। এ সম্বন্ধে
সিননাৰ সমব সমিতি বলিযাছেন—“ব্ৰিটিশ সমব-বিভাগে সম্প্ৰতি যে স্বল্পকালি
প্ৰথা (short-service system) প্ৰবৰ্ত্তিত হইয়াছে, তাহাব ফলে এক দিকে
ভাৰতবাসীৰ ব্যৱতাৰ বাড়িয়াছে, অন্ত দিকে ভাৰতপ্ৰবাসী ব্ৰিটিশ সৈন্তেৰ কাৰ্য্য-
কাৰিতা-ক্ৰম হইয়াছে। এ কথা অমনা বলিতে বাধ্য যে, এই প্ৰণালী
প্ৰবৰ্ত্তিত কৰিবাব সময় ভাৰতীয় কৰ্ম্মতাদিগেৰ স্বাৰ্থেৰ প্ৰতি আদৌ দৃষ্টি কৰা
হয় নাই। এ উক্তি খুব সঙ্গত উক্তি। কাৰণ, এই স্বল্পকালি প্ৰথাৰ ফলে

ভাৰতবাসী বৰ্হ ব্যৱে সংগৃহীত ও শিক্ষিত ব্ৰিটিশ সৈনিকেৰ ‘সার্ভিস’ ৫ বৎসৰ মাত্ৰ
ভোগ কৰে—আব বাহা কিছু লাভ ইংলণ্ডেৰই হয়। ইহাব ফলে কয়েক
বৎসৰেৰ মধ্যেই ইংলণ্ডেৰ ‘বিজাৰ্ড’ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং ভাৰতেৰ ব্যৱে
সংগৃহীত ও শিক্ষিত সৈনিকেৰ সংখ্যা চাৰি লক্ষ হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভাৰত-ৰক্ষী সৈন্তেৰ সংখ্যা ছিল ১০০০০০; আব খেতাব
সেনাৰ সংখ্যা ছিল ৬৫০০০। ১৮৮৫ হইতে ১৯০৫—এই দুড়ি-বৎসৰেৰ মধ্যে
অনেক পৰিবৰ্ত্তন সংঘটিত হইল, এবং ১৯০২ খৃষ্টাব্দেৰ শেষে লৰ্ড কিচনাৰ
খেলিট হইলেন, তখন তিনি সমব-বিভাগেৰ অনেক সংস্থাৰ কৰিলেন। এই

প্রমুখ ইহাও বক্তব্য যে, অধিক্রমে সামগ্রিক উপাদানে—যাহা ভারতের কাব্য-
ধানার প্রস্তুত করে উচিত ছিল, এবং যাহা করিলে সম্ভবব্যয় যাহা ভারতের কাব্য-
হইতে পারিত, সেই সমুদায় প্রাকৃতিক বাহ্যে ইংলও হইতে আনিদারী করা হইত।

সম্প্রতি যুদ্ধের প্রয়োজনবশতঃ ভারতীয় কল-কারখানার গোলাগুলি প্রস্তুত
প্রস্তুত হইতেছে-বটে ; কিন্তু ইহা ব্রহ্ম-পূর্বে ভারতের জন্য উচিত ছিল। এবং
করিলে ভারতের অর্থহানি না হইয়া সমৃদ্ধি হইতে পারিত। যুদ্ধের মত লক্ষ্য

হইয়া রাজপুত্রেরা ভারতের খনিজ সম্পদের অল্পসম্পদে প্রেরিত হইন।

যুদ্ধের পূর্বেই এই বিষয়ে চিন্তাশ্রম করিলে ভাল হইত। তখন না তখন
অর্থগীকে ভারতের খনিজ-সম্পদ লুণ্ঠন কবিতো দেওয়া হইয়াছিল। তখন
সম্পদ থাকিলে ভারতবাসী নিজে এই খনিজ-সম্পদে সম্পন্ন হইতে পারিত।

ভারতকে সম্প্রতি না ভাবিয়া যদি অংশীদার-রূপে স্বীকার করা হইত
ভারতও সমৃদ্ধ হইত, সাম্রাজ্যও নিরাপদ হইত। (ভারতীয় বণিকের

জাগরণের প্রসঙ্গে-এ বিষয়ের আবাব আলোচনা করিয়া-) এখন যদি
আশা করি যে, যুদ্ধের সময় যুদ্ধসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য প্রত্যেক দেশে
দিত হইত, সুদূর পথ পথসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য সেই সাহায্য দিতেন, তবে

দ্রব্যাদি করা হইত ? সে যাহা হউক, সম্ভব-ব্যয়-বৃদ্ধির যে সমস্ত কারণের উল্লেখ
করিলাম, তাহার ফলে সম্ভব-বিভাগের ব্যয় লক্ষ লক্ষ বাড়িয়া গিয়াছে, এবং
সেই ইংলও ২৫০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে, সে-কেনেডা ভারতের ব্যয়

১০০০০০ পাউণ্ড ; কিন্তু কেনেডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যত বনী রাজ্যে ব্যয়
বিভাগের ব্যয় ১৫ লক্ষ ও ১২০ পাউণ্ড নাই। (জাভা-এ-কণা অধীকার

করি না যে, ইংলও নৌবিভাগের অস্ত্র-৩১০০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছে
কেন ; সে স্থলে ভারতবর্ষের নৌবিভাগের সাহায্যদান ৫ লক্ষ পাউণ্ড নাই ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কন্‌গ্রেস এই নিমিত্ত বর্ধমান সম্ভব-ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
যুদ্ধ উপস্থাপিত করিয়াছে, কিন্তু কন্‌গ্রেসের বাণী বাজেনা ও হস্ত-দান-দ্রব্যাদি

দ্রব্যাকাজার বিজ্ঞপ্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অথচ জাহাজ আমনি
ভারতীয় প্রকার-মধ্যে যাহা বর্ধনশীল ও সর্বাধিক লাভজনক
ইহা সেই ভারতীয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়েরই উদ্ভিদ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম

কন্‌গ্রেসে জীবন্ত পি. রসিয়া নাইলু দেখাইয়াছিলেন যে, ভারতের
বিভাগের ব্যয়—যাহা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১৩৩০০০ পাউণ্ড ছিল, তাহা
খৃষ্টাব্দে বাড়িয়া ১৩৯৭৫০০ পাউণ্ড হইয়াছে। এই সময়ের প্রায় ৬৬ টি

বিশ্বাছিলেন যে, এই ব্যয়-বৃদ্ধির জ্ঞান কার্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দেব সমবার প্রণালী (amalgamation scheme) । তিনি আরও দেখাইয়াছিলেন যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ কোটি পাউণ্ড দ্বারা ব্যয়ে ২৫৪০০ জন সৈনিক নিয়োগ করিত । কিন্তু মহারাণী ভাৰত-সাম্রাজ্যেব তার লাইবাব পৰ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৮১০০০ সৈনিকের জন্ত ১১৭০০০০০ পাউণ্ড ব্যয় পড়িত । এই ব্যবস্থাব প্রধান কারণ ছিল ইয়ুবোণীয় পণ্টনেব মহাবতা, নৌ-যাত্রার ব্যয়বিকা, এবং সবজান, রসদ, পেন্সন, ছুটীৰ ভাতা ইত্যাদি । এই সকল ব্যয়েব অনেক দক্ষা দেখাই ভারত গবৰ্ণমেণ্ট তাপত্তি কবিরাহিলেন, এবং ইহাও অভিযোগ কবিরাহিলেন যে, এই সমবারপ্রণালীজনিত অধিকাংশ খবচ সাম্রাজ্যেব প্রয়োজন-বহিত, তন্মিষয়ে ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই । এ আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই । দৃষ্টান্তবরূপ বলা বাইতে পাবে যে, ভাৰতবর্ষকে বৎসর বৎসর হোম-ডিপোৰ জন্ত ৭ মাত লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইয়াছিল । এ 'হোম' অবস্থা ভাৰতবর্ষে বহু, ইংলণ্ডে । সেই হোনে বিশ হাজাৰ হইতে বাইশ হাজাৰ বৃটিশ সৈনিক বাস করিত, কিন্তু তাহাদের পণ্টন এ দেশে থাকিত বলিয়া এই সকল হোমের ব্যয় ভাৰতবর্ষকে দিতে হইত ।—এলা সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় আরও অনেক অবৈধ ব্যয়েব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন । কুতূহলী পাঠক তাঁহার সেই স্থলর-ক্ষেত্রে পাঠ করিতে পাবেন ।

ফ্রেণ্ট সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, “ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ অবস্থানেব পৰ ইংরেজ জাতি সাক্ষাৎসদ্বন্ধে ভাৰতীয় শাসনেব দায়িত্ব গ্রহণ কবিরাহিল । কিন্তু এ কথা অস্বীকার কবিরাব উপায় নাই যে, আমরা এই দায়িত্ব এমন নৈজাবে শাসন কবিরাহি যে, অনেক ক্ষেত্রে নূতন শাসনপ্রণালী পুরাতনেব রূপনার অগ্রকৃত । সে সময়ে যাব বিষয়ে স্বাধীনভাৱে নিকাশ লওয়া হইত । এখন সে প্রথা প্রায়ই উঠিয়া গিৰাছে ।”

মহারাণী সাক্ষাৎসদ্বন্ধে ভাৰত-শাসনেব তার গ্রহণ কবিরাব কিছু পয়ে তিস-রেণী সাহেব পাৰ্লামেন্ট সভায় বলিয়াছিলেন যে, “সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি ভগবানের অচিন্ত্য বিধানে ভারতের শাসনভাৱ যে ইংবাজ জাতিৰ উপৰ হস্ত হইয়াছে, তাহাকে একটা মহান দায়িত্বপূৰ্ণ ত্রাসস্বরূপ নিবেচনা কবা উচিত ।” এই উক্তিৰ প্রতি লক্ষ্য করিয়া ৪র্থ কনগ্রেসে ডক্টর ইউল সাহেব বলিয়াছিলেন যে, “মনে হয়, যেন পাৰ্লামেন্টের অধাধিক ৬৫০ জন সভ্য এই ত্রাস ত্রাসকণ্ঠা ভগবানের হস্তে ত্যাগ কবিরাহেন, ভগবানই যেন তাহাৰ সংৰক্ষণ করেন ।” জ্ঞান হয়, এমন

সময় আসিয়াছে যখন আনাদিগকে মনে বাধিতে হইবে যে, ভগবান তাহারই সাহায্য করেন, যে নিজেকে সাহায্য করে।

বৎসরের পর বৎসর কনগ্রেস সমন্বিতভাবে ব্যয়-বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে আশ্রয় করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরের ব্যয় প্রতিবাদের পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে যখন

পাউণ্ড ব্যক্তিগত গেল, তখন কনগ্রেস উহার প্রতিবাদ করিয়া দেখাইলেন যে, এখন দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনদেশে বহুসংখ্যক গোরা সৈন্য পাঠান সত্ত্বেও ভারত নিরাপদ ছিল, তখন নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনে এত অধিক গোরা সৈন্য রাখা হইতেছে। পর বৎসর কনগ্রেস-প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, ভারতের

বর্তমান সময়-ব্যয় ভারতকে অন্তর্বিগ্রহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নয়, পরজাতির ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-নীতিব পরিপূষ্টির জন্য। উক্ত প্রয়োজনসমূহ সাম্রাজ্যের সময়-ব্যয়ে অতি অল্পই সাহায্য করে। কিন্তু ভারতবর্ষে দুই ভারতীয়-সৈনিকের নয়, বৃটিশ সেনাবলি প্রায় এক-তৃতীয়াংশের গুরু ব্যয় বহন করিতেছে। সাম্রাজ্যের সমন্বিত-প্রয়োজনে ভারতের সাহায্যের যখন পরিমাণ কমিবে, তখন এই সব কথা-স্মরণ রাখা-উচিত।

১৯০৪ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কনগ্রেস বলিয়াছিলেন যে, ভারত তখনকার সামরিক ব্যয়ভার বহন করিতে অক্ষম, এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই আবেদন করিয়াছিলেন যে লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর প্রয়োজনে যে এক কোটি পাউণ্ড-মুদ্রার করা হইয়াছিল, তাহা শিক্ষার জন্য এবং রাস্তাদিগের ভার-লাঘবের জন্য ব্যয় করা হউক।

বৃটিশ সময়-আফিস ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের স্বত্ব যে ব্যয়ভার চাপাইয়া আসিতেছিলেন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কনগ্রেস তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, ভারত-রাজস্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সামরিক প্রয়োজনে ব্যয় করা হইতেছে, এবং তাহার ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিস্তার রাখা হইতেছে।

লর্ড কিচেনারের সংস্কার-প্রণালীর কালে ভারতসেনাকে অহরহ-অভিযানে লগ্ন প্রস্তুত রাখা হইত, এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঐরূপ প্রস্তুত সৈন্য সংখ্যা ছিল—৭২ হাজার গোরা সৈন্য সনৈত ২৪৭০০০। যেহেতু ভারতবর্ষ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু অর্থব্যয়ে ভারতের সেনাকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত রাখা হইয়াছিল, সেই জন্যই যুদ্ধের প্রভাতে স্রাস্তে বৃটিশ সেনার নব্বটনময় ভাব

গবমেণ্টের জরুরী সাহায্যের জন্যে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমস্ত-ব্যয় ছিল ২০০ ০০০০ পাউণ্ড। ১৯১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে এই ব্যয়ের অঙ্ক ২১০ ০০০০ পাউণ্ড ও ১৯১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে বজেটে ২১০ ০০০০ পাউণ্ড প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও কুল হইবে না।

এই অতিবিস্তৃত ব্যয় সম্বন্ধে বড়-সিটি বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভারের কাব্য-আছে। ভারতীয় সমস্ত-ঋণের জন্ত (ইংলণ্ডে প্রাপ্ত ট্রেজারী বিল বাদে) অন্যান্য ৩২০০ ০০০ পাউণ্ড ইতিমধ্যেই আদায় হইয়াছে—আরও আদায় হইতেছে। এই সমস্ত-ঋণের টাকা বিলাতে পাঠান হইতেছে। ইহা ভারতের প্রতিশ্রুত ১০০০ ০০০০ পাউণ্ড বিশেষ সাহায্যের অংশমাত্র। বুটিং-গবমেণ্টের পক্ষে ভবিষ্যৎ ও মেনোপটেমিয়ার যে সব সাময়িক খরচ হইতেছে, সমস্ত-ঋণের টাকা তাহাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বড়-সিটি বলিয়াছেন—

“ভারতের সমস্ত-ব্যয় বজেটের অঙ্কে অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। বজেটের সঙ্ক, তখন অবধি যতদূর জানা ছিল, তাহারই অনুপাতে ধরা হইয়াছিল।

কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ফাঙ্কিল ব্যয়ে কেবল-যে বজেটের অঙ্ক এক কোটি পাউণ্ড ব্যয়িত হইবে, তাহা নহে; তাহার উপর এ পর্যন্ত সমস্ত-ঋণ-দাবী দক্ষ-সমস্ত অর্থই নিঃশেষিত হইবে। ভারতবর্ষই বুটিং সাম্রাজ্যের প্রাচীন অর্থকেন্দ্র। সেই জন্ত ভারতের ও মেনোপটেমিয়ার সমস্ত-ব্যয়ের উপর ইংলণ্ড, উপনিবেশ, এবং নিজস্বাভ্যাসমূহকে ভারতবর্ষ যে গম-পট, চামড়া ও অন্যান্য-পণ্যদ্রব্য দ্রব্যবাহ-করিতেছে, তাহাও ভারতকেই টাকা আদানিত করিতে হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষকে পূর্ব-আফ্রিকা ও পারস্য দেশকেও প্রচুর পরিমাণে অর্থ যোগাইতে হইতেছে, এবং কয়েকবার সিংহল, মাঝীচীপ ও

নিগারেও মুদ্রা ও অন্যান্য-দ্রব্য পাঠাইতে হইয়াছে। অবশ্য, এ সব সাহায্য আমবা-বিশ্রাম্যে দিতেহি না। কিন্তু সে মূল্যের টাকা এখন ভারতে আমদানী হইতেছে না, তখন তাহার অবশ্যস্বার্থী ফল আমাদের বর্তমান পুঞ্জীর অপচয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বারের-অংশে বাহা ফাঙ্কিল হইবে, প্রচলিত কদের দ্বারা কিছুতেই সেই ফাঙ্কিলের পূরণ করিতে পাবা যাইবে না। অতএব নূতন ট্যাক্স

নিশ্চিত বসিবে। এই ট্যাক্স-তাহার উপর বসিবে? অসম্ভব নয় যে, যে সকল জনসাধারণ সরকারী ও বেসরকারী হেতুসেব-সহিত হস্তান্তর করিয়া স্বদেশেব-বিপণ্ডিত করিতেছেন, তাহাও এই সকল নূতন বাক্সের-অধিগণে-ভরসা হইবেন, এবং স্বাতন্ত্র্য অর্থ-ব্যয়ের উপর স্বাতন্ত্র্য প্রতিনিধিসভাব (মেম্বার-সভাব)

গতিনিষিগণও বণাযোগ্য আসিন পাইবেন) হাত খাকা উচিত, ইহা তাহাব
ঠেকিয়া শিখিয়া বুঝিবেন।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড হাডিং (ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার
প্রতি উদার সহানুভূতিব অল্প বীহার স্মৃতি এ দেশে সম্মানিত হইয়াছে) বিগত
১৯৩০ জুলাই প্যারিসমেন্টের লর্ড-সভায় বর্তমান যুদ্ধে ভারতের সাহায্যমান সম্ভব
চেষ্টাকার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধের পূর্বকালীন ভারতের
সামরিক রাস্থের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, 'নিকলসন' কনিষ্ঠের নির্দেশ
দ্বারা বার্ষিক ১৯২৫০০০০ পাউণ্ড ভারতীর সমর-ব্যয়ের সর্বোচ্চ হাব নির্দিষ্ট
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎপরে ১৩ বৎসরের মধ্যে ১১ বৎসব ভারতবর্ষে ঐ অঙ্কের
অতিরিক্ত খরচ কবিয়াছিল, এবং তাহার শাসনের শেষ-বৎসরের বজেটে উ
ব্যয়ের হার ২২০০০০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ ১৩ বৎসরের জায়ের
৪৮০০০০০০ হইতে ৫০০০০০০০ পাউণ্ডের বেশী ছিল না—কেন্দ্র এক
বৎসব ও কোটী হইয়াছিল। ভারতের—ঘোট আয়ের অল্পপাতে সমর-ব্যয়ের
পবিত্রাণ কব, তবেই ভারতবর্ষ যুদ্ধে কতটা ত্যাগবীকাব কবিয়াছে, তাহা
প্রমাণ পাইবে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অগষ্ট বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ
মাসের সেপ্টেম্বর মাসের প্রাবস্তে ভারতবর্ষ হইতে তিনটি 'ডিভিসান' (দুইটি
পদাতিক সৈন্তের ও একটি অধারোহী সৈন্তের 'ডিভিসান') ফ্রান্সে প্রেরিত
হইল। নভেম্বর মাসে অধারোহী সৈন্তের আন একটি 'ডিভিসান' তাহাদের সহিত
প্রাপ্ত হইল। লর্ড হাডিংয়ের ভাষায়, 'প্রথমোক্ত সৈনিকগণ বৃটিশ-বাহিনীর যে শ্রম
স্থান পূর্ণ করিয়াছিল, অল্প কেষ তাহার পূরণ করিতে পারিতেন।' লর্ড হাডিং
যেদের সহিত বলিয়াছিলেন—'সেই বীর-পদাতিক সৈন্তের অল্পমাত্রই জীবিত
আছে।' সভাই তাহাদের গৃহদ্বার আজ শূন্য; কিন্তু যে স্বাধীনতা-অঙ্গ তাহা
ফ্রান্সে প্রাপ্যপাত করিয়াছে, তাহাদের বন্দধরণ-সে স্বাধীনতা নিশ্চয়ই ভোগ
করবে। ভারতের সীমান্ত-বক্ষাব অল্প আব তিনটি ডিভিসান অচিরে প্রেরিত
হইয়াছিল, এবং ঐ-সেপ্টেম্বর মাসে এক মিশ্র ডিভিসান পূর্ব-আফ্রিকায়, এবং
নভেম্বর ও নভেম্বর মাসে আর দুইটি 'ডিভিসান' ও একটি অধারোহী সৈন্ত
নিশ্চয়ই প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় পদাতিক
সহাচরীপে, আর এক ব্যাটালিয়ন ক্যাম্বিকনে, এবং দুইটি ব্যাটালিয়ন পান্ড
উপসাগরে প্রেরিত হইয়াছিল। এ দিকে অল্প অল্প সৈন্তেরা সিংটাই-অবস্থায়
জাপানিদিগের সহায়তা করিয়াছিল। এইরূপে ১৯৩০ ভারত-সৈনিক-দল

পারে প্রেরিত হইয়াছিল। এই সময়ে সৈন্তের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ভারত-
বর্ষ যোগাইয়াছিল। তা ছাড়া যুদ্ধের প্রথম কয় সপ্তাহে ভারতীয় অস্ত্রাগার
হইতে ৩ কোটি টোটা, ৬০০০০ বন্দুক ও ৫৫০এবও অধিক অতি উৎকৃষ্ট-কামান
ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিং বলেন যে, 'ইহা ব্যতীত প্রচুর পরিমাণ-সরঞ্জাম অর্থাৎ তাঁবু, বুট,
ত্বিন, পোষাক ইত্যাদিও ভারত হইতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং
বিলাতের সমস্ত আফিসের নিত্য নূতন আবদার যোগাইবার পক্ষে চেষ্টার কোনও
কটী হয় নাই। মোটের উপর এ কথা বলিলে অভ্যুক্তি হইবে না, যুদ্ধ-যোদ্ধার
গণ প্রথম কয় সপ্তাহ ভারতবর্ষকে নিঃশেষে দোহন করা হইয়াছিল।' যদিচ লর্ড
হার্ডিং এ কথা বলেন নাই, কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধে যেমন-
যেমন সৈন্তকর্ম হইয়াছে, অমনই তাহাদের শ্রুত স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে; সেই
পূরণকারী সৈন্তের সংখ্যা ৩৫০০০। নতুন-রংগট ও অস্ত্র-সৈন্তের গণনা
করিলে ১১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ অবধি অন্যান্য ১০ লক্ষ ভারতীয় সৈন্ত বর্তমান-যুদ্ধে
মদ্রাজে অবতীর্ণ হইয়াছে। তা' ছাড়া ভারতের বায়ে শিক্ষিত ও সজ্জিত
৫০০০ গোরা সৈন্ত ভারত হইতে যুদ্ধস্থলে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার বিনি-
ময়ে কয়েক মাস পরে ৩০টি টেরিটোরিয়ারি ব্যাটেলিয়ন ও ২৯টি ব্যাটারী
ভারতবর্ষকে দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের 'সাজসজ্জা ও অস্ত্র-শস্ত্র সংস্কৃত হইলে
পর, এবং শিক্ষানবীশদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে পর, তবে তাহারা ভারত-
সীমান্তে, কিংবা মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়।'।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শুরুর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত
ভারত-সীমান্তের রক্ষাকার্য্যও সুকল ব্যাপার ছিল না। এ সময়ে লর্ড হার্ডিং
বলিয়াছেন—অনেক দিন পর্যন্ত আফগানিস্তানের ভাব অনিশ্চিত ছিল; যদিও
আমি আমাদের মিত্ররাজ আর্মীর ব্যক্তিগত সততা সম্বন্ধে কখনও সন্দেহান
হিলাম না; কিন্তু আমাব ভয় ছিল, পাছে পার্শ্ব-জাতিদিগের মধ্যে যেহাদের
প্রচাৰ সফল হইয়া, কিংবা আফগান-প্রজার মধ্যে ঘর্ষিতাব চেষ্টা উদ্ভিন্ন
আর্মীরকে বিপ্লবিত কবে। * এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে স্থলে
যুদ্ধের পূর্বে তিন বৎসর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে উল্লেখযোগ্য কোনও বিগ্রহ হয়
নাই, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর
মধ্যে এই প্রদেশে ৭টি গুরুত্ব আক্রমণ ব্যাহত করিতে হইয়াছিল। ১৯১৫
খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এবং শেষে সমস্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষদিগকে দুইটি জয়

যড়ব্রহ্মের প্রতীকার-কল্পিতে হইয়াছিল—প্রথমতঃ ক্যানেরা ও মার্কিন দেশ হইতে ১০.০০ লোক পঞ্জাবের কয়েকটি ঘাটি হইতে অধিকাংশ-করিবার সংকল্পে ভারতবর্ষে উপনীত হয়। পরে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর-মাসে বাহালা প্রদেশে তাহা একটা অল্প-মুড়কব্রহ্ম সংবাদ পাওয়া-গিয়াছিল, এবং তাহার জন্ত-হলে লেট চাকর ও জলে বন্দরবন্দার আয়োজন-কল্পিতে হইয়াছিল।

লর্ড হার্ডিংকে-বিলাতের-ও এ দেশের-সৈন্য ও ইউনিয়নিষ্ট সংবাদ-প্রদ-প্রতীক-আক্রমণ সহিতে হইয়াছে—বিলাতে মেসোপটেমিয়ার-সমিতির মন্তব্যের-অনু-ক্রমে-এ দেশে ভারতবাসীর পক্ষসমর্থন-জনিত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বিবেচন-কল্পে ভারতবাসী কিন্তু তাহাব প্রতি-নিষেধে-অন্ধাবিশ্বাস-লিপিবদ্ধ করিয়াছে : লর্ড হার্ডিং ইহাতেই সম্ভট থাকিতে পারেন।

মেসোপটেমিয়া-সমিতি-কৃত ভারত-প্রেলিভ-অঙ্গ-তত্ত্ব-বিশ্বাচার-এ-দিকে-আলোচনা-নাই করিয়া। লর্ড হার্ডিং নিজের ও ভারতের-কলকল্প-করিয়াছেন, কিন্তু-আজ পর্যন্ত কেহই-আমলা-তত্ত্বের-ফলন-কল্পিতে-পারেন-না। এ-প্রসঙ্গে-অঙ্গ-করা-দল-নয়-যে, ১৮৭৮—৯ ও ১৮৭৯—৮০ খৃষ্টাব্দের-আকগান-যুদ্ধে-আমলা-তত্ত্বের-অসারতা-আরও-চমৎকার-রূপে-প্রমাণিত-হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের-কেন্দ্র-বাসী-নামে-সম্ভাবিত-সমর-ব্যয় ৪০ লক্ষ-পাউণ্ডের-বিশী-হই-না, এইরূপ-স্থির-করা-হইয়াছিল; এবং-রয়েটে-বাসের-উৎস-কাজিগ-আর ২০ লক্ষ-পাউণ্ড-ধরা-হইয়াছিল। ঐ-খৃষ্টাব্দের-৮ই-এপ্রেল-ভারত-গবর্নমেন্ট-সংবাদ-দিয়ে-যে-‘সমর-ব্যয়-বড়-ভীতি-প্রদ-বজ্রটে-নির্দিষ্ট-সংখ্যার-অনেক-অধিক-’

১৩ই-এপ্রেল-গুনা-গেল-বে, তিন-বাসের-মধ্যে-অত্যধিক-সমর-ব্যয়-কল্প-কাজি-কল্প-বিল ১৩ কোটি-হইতে ৯ কোটির-নীচে-নামিয়াছে। পরে-২২শে-এপ্রেল-লাইট-সাহেবের-নিকট-সংবাদ-আসিল-যে, ‘ফাজিল-ত-দুহের-কথা-অনান-৪৮ কোটি-টাকা-ঘাটি-পড়িতেছে।’ ঐ-প্রকৃত-ভুলটা-সমর-জনিত-বৈদ্য-কল্প-কর্ম-করিয়া-ব্যাঘ-রাটয়া-গিয়াছিল, এবং-সেই-জন্ত-প্রাচ্য-মহা-সম্ভাবিত-ভীতি-বিভ্রান্ত-করা-হইয়াছিল, এবং-নিয়মিত-খরচের-ভার-বহন-করিবার-অঙ্গ-কল্প-হইয়া-ধবা-পড়িয়াছিল। দেখা-গিয়াছিল-যে, প্রকৃত-প্রভাবে-কল্প-টাকা-ব্যয়-হইয়াছিল, কর্তৃপক্ষ-তাহা-জানিডেন-না—আর-ব্যয়-পরিমাণ-কাগজে-কল্প-অঙ্গ-কল্প-ছিদ্র, তাহাই-জানিডেন-না। ব্যয়ের-অঙ্গ-‘আমানত’-বলিয়া-নিবিত-হইয়া-ছিল; যদি-এই-আমানত-জাদীয়ে-কোনও-সম্ভাবনা-ছিদ্র-না। পরে-প্রকাশ-হইল-যে, হিসাব-বিভাগের-কর্তাদিগের-অনবধানতায়-ঐ-কল্প-ঘটিয়াছিল। এ-দেশে

করাতে প্রতিষ্ঠার পর—ভগবান্ না করন—যদি এরূপ একটা ছবিটনা বটে, তবে ভারতীয় কর্মচারীদের লোমহর্ষণ অধোগত্যের প্রতি তখনকার “ইংলিশম্যান” ও “মাস্টার মেন” যে কঠোর কটাক্ষ করিবেন, তাহা ভাবিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড শ্রবণী নিম্নুকনিগের আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া ভাব্যতবর্ষের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। এই সকল নিম্নুকনিগের আশঙ্কা এই যে, পাছে ভারতের সাহায্যের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডকে কৃতজ্ঞতার পড়িতে হয়, পাছে তাহার ফলে ভারতের প্রতি জাভা ব্যবহার করিতে গিয়া ভারতকে স্বরাষ্ট্রের অধিকার দিতে হয়। লর্ড চেমসফোর্ড প্রতি সংঘত ভাবায় তাঁহার ব্যবস্থাপক-সভার সম্মুখে বিগত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ যুদ্ধ-সম্বন্ধে কি কি সাহায্য দিয়াছে, তাহার বিবৃতি করিয়াছিলেন। লর্ড হাডিংয়ের আমলেব প্রশংসা দিয়া আনি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।—“যখন যুদ্ধ বাধে, তখন ভারতীয় সৈন্তবিভাগের ৪০৯ জন গোরা অফিসারের মধ্যে ৫০ জন ছুটি লইয়া বিলাতে ছিল। ইংলণ্ডের সমস্ত অফিস তাহাদিগকে যুরোপেই যুদ্ধার্থে বাখিয়া দিগেন। তাহা ছাড়া যুদ্ধ-প্রারম্ভের পর ভারতবর্ষ হইতে আজ পর্যন্ত ২৫০০ জন যুদ্ধযোগ্য অফিসারকে টানিয়া লইগেন। এ গণনায় যাহারা নিজ নিজ ব্যাটালী বা সৈন্তদিগের সহিত বিন্যেয়ে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদের কথা হইল না। এই ব্যাটালী যুদ্ধের অবশ্যস্তায়ী অপচয় পূরণ করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্তেব সেনাধ্যক্ষের বিশার্ভ, বাহা—৪টা আগষ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৪০ জন মাত্র ছিল, তাহা বাড়াইয়া হাজার করা হইয়াছে। ভারতীয় সৈনিকের সংখ্যা হ্রাস ত করা হয়ই নাই, বরং অনেক বাড়ান হইয়াছে। অখাবোহীর সংখ্যা শতকরা ২০ জন, এবং পশাভিকের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন বাড়িয়াছে, এবং যুদ্ধারম্ভের পর যে সকল সংকট সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৪টা আগষ্ট সমস্ত ভারত-সৈন্তেব যে সংখ্যা ছিল, তদগুণে বেশী।” লর্ড চেমসফোর্ড বখার্ব ই নিয়াছেন—“অতএব প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতীয় ফৌজ সাম্রাজ্যেব এক প্রধান সহায়ক (asset)। যখন যুদ্ধ সম্মুখে ভারতবর্ষের সাহায্যেব তোল করা হইবে, তখন যেন এ কথা মনে রাখা হয় যে, ভারতীয় ফৌজ একটা হুগুং-হুগুট ব্যাপার নয়, কিন্তু স্থচিরকালকলিত অশিক্ষিত অসমজিত বাহিনী। এই ফৌজ প্রস্তুত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষকে অনেক কাল ধিয়া বৎসর বৎসর বহু অর্থ ব্যয় কবিতে হইয়াছিল।”

সম্যক প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন (এবং লর্ড চেমসফোর্ডের অল্পজিত জনশক্তি-
 স্মৃতিব উদ্দেশ্যও ইহাই) তাহা হইলে, ভারতীয় জনগণের স্বদেশে মনুষ্যোচিত
 অধিকার থাকা আবশ্যিক। বর্তমান যুদ্ধের প্রধান শিক্ষাই এই যে, যদি
 সাম্রাজ্যকে নিরাপন্ন করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষকে হোমরুল দিতেই হইবে।
 যদি যুদ্ধের পূর্বে ভারতের জনশক্তির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করা হইত, তবে বোধ হয়
 যুদ্ধই বাধিত না। কাবণ, কাহাব এত সাহস যে, ইংলণ্ড ও ভারতের সংযুক্ত
 শক্তিকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্তু কত দিন ভারত-পক্ষীয় জাতি
 থাকিবে, তত দিন তাহার জনশক্তির প্রকৃষ্ট প্রয়োগ সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষ
 কিরূপে একটা বিপুল সেনার ব্যয়ভার বহন করিবে, যদি সেই সঙ্গে তাহাকে
 গোরা সৈন্যের ব্যয়, তাহাদের বাতায়নের ব্যয়, বিলাতে উচ্চদরে সরঞ্জাম-
 পরিষেব ব্যয়, এবং ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে সেই সরঞ্জাম রপ্তানী করিবার
 ব্যয় বহন করিতে হয়? ভারতবর্ষের পক্ষে ইংলণ্ডে গোরা সৈন্যের শিক্ষানবিশীর
 ব্যয়-ভার বহন করা সম্ভব নহে—বিশেষতঃ যখন সেই সকল টমসনিক ও বংসবের
 অধিক ভারতবর্ষে থাকে না। ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে
 নোহবেন-বিপুল কাঁড়ি জমাইয়া রাখিবে, এবং নিজে অর্থক্লে সঙ্কুচিত হইয়া
 থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর-ধিকা-জাতি কষ্টসংগ্ৰহ হইতে যুদ্ধের ব্যয়ের
 দানা ২৭০০০০০০ পাউণ্ড কর্ত্ত দান করিবে। প্রবণ রাখিবেন যে, এককর্ত্ত-
 দান বৃহৎ সমর-স্বর্ণ-আদানের পূর্বের ঘটনা। আনি একবার বিলাতে বক্তৃতায়
 নিদ্রাহিলাম যে, যদি ভারতের রাজত্ব চাও, তবে ভারতকে স্বাধীন কর।
 স্মৃতি আরও বলিতে চাই যে, যদি ভারতকে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে লাগাইতে
 চাও, তবে ভারতবাসীকে স্বাধীন কর। ভারতবাসী যখন দেখিবে যে, ভারতীয়
 জনগণ অর্থ ভারতবর্ষেই থাকে, এবং ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, ভারত-
 বাসীরা শিক্ষার ও তাহাদিগের দক্ষিণ উপকর্ষের জন্য ব্যয়িত হয়, এবং তাহার
 বাণিজ্যের উন্নতিতে এবং নব নব শিল্পের উদ্ভাবনে নিয়োজিত হয়, তখন ভারত-
 বাসীরা নিজে-উপর ব্যয়ভার স্থান করিবে। শান্তিতে সমৃদ্ধি এবং যুদ্ধে
 জয়-উদ্ধার জন্য ভারতবর্ষের যেমন ইংলণ্ডকে প্রয়োজন, তেমনই ইংলণ্ডের
 ভারতবর্ষকে প্রয়োজন। মর্টেণ্ড সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে
 যুদ্ধের জন্য শান্তিকালে স্বাধীনতার প্রয়োজন। অতএব বলিতে চাই যে,
 ইংলণ্ড ও ভারত দুই দেশের পক্ষেই যুদ্ধের শিক্ষা-এই যে, ভারতবর্ষকে হোমরুল

অন্যভাবে এই সভার কার্যক্রম সহজ সরল ব্যবস্থার প্রণয়ন প্রয়োজন
নবান্নের সময়ের সিংহাসন ও উপহার দিও এই প্রমোদ্য মনোহর করিতেছি।
আমাদের বিশিষ্ট আশা ও বিশ্বাস এই যে, ভবিষ্যৎকালে নবান্নের সহযোগিতায়
শ্রদ্ধা ও কৃতিত্বের পুষ্পাঙ্গি উৎসব চরণে উপস্থিত হইবে।

ভারতীয় নবজাগরণের নিদান।

ভারত নবজাগরণের উদ্যোগে দুটিটা উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ আরও
আসন্ন নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনজনিত উদ্যোগবিশেষ, যাহা
সম্রাটের আদেশের প্রভাবে, ইংল্যান্ড, জাপান এবং আমেরিকার
সম্মেলন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহা এ সময়ে বলা হইতে পারে।
এই উদ্যোগে বিশ্বাস করিব না। কিন্তু ভবিষ্যৎকালে ইংল্যান্ড, জাপান ও
আমেরিকা ইহঁদের সহযোগিতায় এই নবজাগরণ ও নবান্নের প্রভাব
সম্প্রদায় তাহাদের উদ্দেশ্যে।

(১) প্রথমঃ প্রশিক্ষণ উদ্যোগ।

(২) দ্বিতীয়ঃ শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন দ্বারা উদ্যোগ।

(৩) তৃতীয়ঃ আভিবিগের (প্রতিষ্ঠা) দ্বারা বিশ্বাস করিব।

— (৪) নবজাগরণের উপায়।

(৫) নবজাগরণের প্রাচীন দান অধিকারের চেষ্টা।

(৬) জনসাধারণের সুবিধা।

ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে যে বহুদূর ভাব-বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা
উল্লেখ্য হইয়াছে, যে স্বাভাবিক, স্বাভাবিক, আনন্দজনক ও সাম্প্রদায়িক
উঠিয়াছে, উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাব-মহাকাব্যই। ইহঁদের মধ্যে
প্রথম সর্বপ্রথম উল্লিখিত হইয়াছে : কিন্তু আমাদের ভাব-বিপ্লব
প্রাচীন নবজাগরণের আশা ও দেশ-ভক্তি বোধ।

(৭) প্রশিক্ষণ উদ্যোগ :—

প্রথম নবজাগরণের প্রাথমিক উদ্যোগ এ দেশের আভিবিগের
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইহঁদের আশা ও দেশ-ভক্তি বোধ।
প্রথম নবজাগরণের প্রাথমিক উদ্যোগ এ দেশের আভিবিগের
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইহঁদের আশা ও দেশ-ভক্তি বোধ।

ভারতবাসীর দৃষ্টিতে যে নূতন জাতি আকাজ্ঞা লাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা সমস্ত
প্রাচ্যের বিপ্লবাত্তর ভাবপরিম্পদের বাতনানাত্র এবং শাসন-কার্যে ভারতবাসীকে
অধিকতর উৎকৃষ্ট কনিয়া এই আশা আকাজ্ঞার গূণ করা আবশ্যিক, তখন আমি
বিস্মিত হই নাই। কিন্তু বর্তমানে ভারতের মধ্যে যে প্রেরণা দৃষ্ট হইতেছে, যদি
ইহাকে প্রাচ্য জাগরণের অনুরূপ বলিয়া মনে করা যায়, তবে বুঝিতে ভুল করা
হইবে। এশিয়া জাগরণ জাগতিক উদ্বোধনের একাংশ। এই উদ্বোধন এই
জগৎব্যাপী যুদ্ধের ফলে অত্যন্ত গতি লাভ করিয়াছে। জগতের গতি এখনও
গণতন্ত্রের অভিমুখে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন আমেরিকার উপনিবেশসমূহ ইংলণ্ড
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই ব্যাপারে ইহার আরম্ভ, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের
ফরাসীবিপ্লবে ইহার পরিণতি। বলা বহুলা যে, ইহার মূলে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতি
এবং রুসো, টমাস পেইন ও ফরাসী বিপ্লবকোষ-কর্তাদিগের চেষ্টার ইয়ুরোপের
মানসিক দাসত্বের অণুনোমন। গ্রীচো, জাপানে প্রত্যন্ত পৰিবর্তন এবং
কৃষিাব সহিত যুদ্ধে জয়লাভ, চীনে মাকু রাজবংশের অধঃপতন এবং চৈনিক গণ-
তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, পারস্যের অভ্যুদয়প্রযুক্ত (যাহা রুশিয়া ও ইংলণ্ডের হস্তক্ষেপে এবং
প্রভাবক্ষেত্রের (spheres of influence) স্থাপন দ্বারা বাহ্যত হইয়াছিল, এবং
পারস্যের ন্যায় স্বাধীনতাকে ধরু করিয়াছিল) এবং সর্বশেষে রুশ রাজ্যবিপ্লব
এবং ইয়ুরোপ ও এশিয়ার কসীয়গণতন্ত্রের সম্ভাবনা—এই সমস্ত মিলিত হইয়া
ভারতের পূর্বতন ভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। ভারতবাসী এখন
হিমালয়ের পর্বপারে এশিয়ার নক্ষের উপর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতিসমূহের বিস্তার
লক্ষ্য করিতেছে। খেচ্চাচারী দ্বার বা চীন সম্রাটের বিপুলবাজ্যদেশ এখন অধি-
ভারতের প্রতিবাসী নহে। ভারত এখন আর এই সকল অত্যাচার-পীড়িত
জাতিসমূহের দুরবস্থায় সহিত নিজের সৌভাগ্যের তুলনা করে না। ১৯০৫
খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যখনও এদেশে খেচ্চাচার প্রবল হয় নাই) ভারতবর্ষ প্রতিবেশী
দেশের তুলনায় সৌখিন্যশালী ছিল। কিন্তু এখন হইতে যতদিন না ভারতবর্ষে
স্বাভ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসী প্রতিবেশীদিগের অবস্থায় দীর্ঘাঘিত
হইবে, এবং এই তুলনা ভারতের অশান্তিকে প্রবলতর করিবে।

কিন্তু যদিচ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে, (আমি বিশ্বাস করি, ইহা নিশ্চি-
ত) তাহা হইলে সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ যে স্থান অধিকার করিবে,
তাহাতে তাহার স্বাধীন হইলেই চলিবে না, তাহাকে সবল হইতে হইবে। কারণ,
এশিয়ার শক্তিগুণের যেমন যেমন আকাজ্ঞা ও বিরোধ বৃদ্ধি পাইবে, তেমনি

ভারতবর্ষ যে কেবল সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বভেদ্য গ্রাসিত থাকিবে, তাহা নহে, ভাষ্যভেদ্য প্রতি অল্প জাতিবা লৌলুপ দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। ইয়াং সাহেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী—এক কথায় কামধেনু। এশিয়ার মধ্যে যদি ঐ ধারণা প্রবল হয়, তবে কে জানে—প্রাচীন স্বাধীন বণিক ও বিধামিজের মধ্যে কামধেনু লইয়া যেকোন বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেইরূপ তাবত বর্ষের খামিষ দইয়া বিবাদ না ঘটবে। অতএব, কি স্থলপথ কি জলপথ, উভয় পথে ভারতের আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া আবশ্যক। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অবগ্রাস্তারী বিরোধের কথা নাই বলিলাম, (যদিও দেখিতেছি, আপান ইতিমধ্যেই ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সঙ্কটমশা করিয়া তুলিতেছে, যে হেতু ভারত আত্মরক্ষায় অসমর্থ) কিন্তু এশিয়ার অধিবাট হইবার জন্য, প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্বলাভের জন্য, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপপুঞ্জের স্বাধিকার জন্য বিরোধ-বিসংবাদ ইত্যাদি সম্ভব ?

অগ্নানচিত্তে এই সকল গুরুত্ব সম্ভাবনার সম্মুখীন হইবার জন্য সাম্রাজ্যের মধ্যে এমন ভারতবর্ষ থাকা চাই, যাহা স্বাধীন, সমাজ, সম্বল, এবং সমৃদ্ধ। বেনল সে, আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলে চলিবে না; কিন্তু উপনিবেশসমূহকে বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়াকে (যাহার জনসংখ্যা ক্ষুদ্র, কিন্তু যাহার জনহীন ও অরক্ষিত ভূমি বিস্তৃত) সাহায্য করিতে সমর্থ হওয়া আবশ্যক। কেবল এক ভারতবর্ষেই এমন প্রভূত জনশক্তি আছে, যাহার সাহায্যে এশিয়ার বৃটিশ-সাম্রাজ্য সুরক্ষিত হওয়া সম্ভব।

আদর্শদর্শিতার ফলে বৃটিশ রাজত্বের ছায়ার স্বরাজ-প্রাপ্ত সমস্ত স্বাধীন ভারতবর্ষকে দইয়া কয়েকটি স্বাধীন জাতির সাহচর্যে এক বিশাল যুক্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রত্যাবাস ঘটতেছে, সে আদর্শদর্শিতা পাপ অপেক্ষাও ভীষণ। তাবত প্রবাসী ইংরেজ-সম্প্রদায় তাবতেরে আপনাদিগের স্বার্থের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় জনসংখ্য ভবিষ্যতে অপর জাতির আক্রমণ হইতে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে ? তাবতবর্ষ স্বাধীন ও সম্বল হইলে তবেই তাহার সুরক্ষা।

যাহারা আপানী সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাহারা জানেন যে, এই যুক্তের সমাপ্ত

তাহা বা অসঙ্কোচে প্রতীতির সম্বন্ধে তাহাদের প্রবল পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং পব এই দুই দুরাকাঙ্ক্ষা দুর্দমনীয় জাতির মধ্যে মৈত্রীস্থাপন আরো বিচিত্র নহে। আপান তাহার সৈন্তবল ও নৌবল অসুদূর দইয়া এই যুক্ত-ব্যাপার হইতে নিষ্কাশিত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাণিজ্যবল অতিশয় উৎকর্ষভাৱ করিবে। অতএব বুদ্ধিমান স্বাধীনতাকের ব্যবস্থামতে ইংলণ্ডে উচিত যে, আপান

আপেক্ষা ভারতবর্ষকে অধিক বিশ্বাস করা। প্রায়শঃ চাই যে, এশিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য স্বাধীন ও সম্ভব ভারতীয় প্রজার স্বাধীনতার মূঢ় ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত হউক। সে সাম্রাজ্য যেন সম্ভাবিত ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীর সনতরূপ বহুতর উপর নির্ভর না করে। কারণ, আন্তর্জাতিক মিত্রতা (ত্রিগুণ) স্বাধীন উপর প্রতিষ্ঠিত; তাহাব ভিত্তি-ভূমি বালুকা, প্রস্তর নহে।

ভারতপ্রবাসী ইংবাজের অনেকেরই ধারণা এই যে, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এই স্বার্থের পরিমাণ ৩৬৫৩৯০০০ পাউণ্ড ছিল) ভারতে ইংবাজের প্রভুত্ব অত্যাধিক। কিন্তু যদি ইংবাজ জাতির আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে ৬৮৮০৭৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, এবং আফ্রিকাতে ২৬৯৮০৮০০০ পাউণ্ড খাটিতেছে, কৈ সে সকল দেশে তাহাব প্রভুত্বহাপনের দাবী করে না? তবে ভারতবর্ষে টাকা খাটাইতেছে বলিয়া তাহারা কেন প্রভুত্বের দাবী করিবে? “ভারতবর্ষ আমাদের সম্পত্তি, আমাদের প্রয়োজনে ইহাব বিনিয়োগ কবিবে”, এই ভ্রান্ত ধারণা ইংবাজকে পরিত্যাগ কবিতে হইবে। “ভারতবাসী আগার বন্ধ, আনার সনকস, ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্য, আমাদের মতই একটি স্বতন্ত্র জাতি, সাম্রাজ্যের অংশীদার, পবতন্ত্র নহে”, এই ভাবই ইংবাজকে অতঃপর পোষণ কবিতে হইবে।

জাপান, চীন এবং এশিয়ায় রুসিয়ার যে গণতন্ত্রের প্রেরণা উঠিয়াছে, ভারতের তরীতে তাহাব প্রতিধ্বনি বাধিতেছে। কেহ যদি মনে করেন যে, এ তরঙ্গ ভারতের তটে আঘাত কবিবে না, তবে তিনি ভ্রান্ত।

(খ) বিদেশী শাসন ও সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন বিষয়ে

অন্যত্র আলোচনা।

কিন্তু এশিয়ার আগরণ ভিন্ন অন্যত্র কারণও ভারতবর্ষে কার্য্য করিয়াছে। ইয়ুরোপে ইংলণ্ড, স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিপক্ষে এবং স্বাধীনতার সুপক্ষে দণ্ডায়মান হই-
য়াছে, অথচ কিছুদিন পূর্বেও ভারত সম্বন্ধে তাহার ভাব অনিশ্চিত ছিল। এক
জন আনি বলিতেছিলাম যে, ইংলণ্ড একটি স্ববর্ণস্বয়োগ হেলায় হারাইয়াছে।
প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে বিশ্ববিশ্বাস কবিয়াছিল যে, ইংলণ্ড জাতিনির্ধিষে
সকলের স্বাধীনতারক্ষার জন্যই যুদ্ধ করিতেছে। পার্লামেন্ট সভায় শান্তি
প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, গত অক্টোবর মাসেও এক্ষিৎ সাহেব বলিয়াছিলেন যে,
মিত্ররাজ্যসমূহ শুদ্ধ স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছে। স্বাধীনতার কমে

তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ফ্রান্সে হাহাতে এলসেস লোবেন পুনঃপ্রাপ্ত হয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলিয়াছিলেন যে, পরাধীনতার নিগড় একেবারে চূড়ান্ত। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, এই নিগড় এলসেস লোবেন অপেক্ষা অধিক কষ্টকর হইবে? জাতীয় সম্মানের কয় প্রতিফলক? এলসেস লোবেন হান্সা-জাতি উভয়ই ধর্ম্মে কর্ণে ও স্বাতিতে এক। এ দেশে কিন্তু তাহাব বিপরীত। যখন যেমন যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, ভারতবাসী ধীরে ধীরে অনিচ্ছাব বুদ্ধিতে গাঢ় হইয়া, বেচ্ছাচারী প্রতি যে বিবেচনা, তাহা কেবল পশ্চিম ভূগোলে অনুষ্ঠিত বেচ্ছাচারকে লক্ষ্য করিয়া; আব পরাধীনতার যে চূড়ান্ত অপমান, তাহা কেবল বেচ্ছাচারিত্বের পক্ষে প্রযোজ্য। ইহাও বুঝিল যে, মরণ দেশেই স্বাধীনতার বাটী হইবে, কেবল ভাবতের ভূমি শুধু থাকিবে, এবং উপনিবেশ সকলকে মরণ অধিকার দেওয়া হইবে, কিন্তু ভাবত রক্তহস্তে দিবিবে। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রাজপুত্রেরা যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তাহাতে আবর্তনকারী যেন ইচ্ছা করিয়া বান দেওয়া হইল, এবং অবশেষে স্পষ্টতঃ স্বেতসাম্রাজ্যের প্রস্তাব হইতে লাগিল। এই সাম্রাজ্যের হস্তী কষ্টে থাকিবেন, বেতজাতি-পক্ষাঘাত, এবং কৃষকায় জাতিদের সম্বন্ধে খেতানদিগের তত্ত্বাবধানে চিরস্থায়ী নাবালকত্ব দিষ্ট হইল। অবশ্য সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং ভয়ে বধেই কাবণ দেখা গেল। সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের জন্য আলোচনা চলিতে লাগিল; কিন্তু তথায় ভাবতের স্বাধীনতা নির্দিষ্ট হইল না। উপনিবেশদিগকে অংশিকরূপে গ্রহণ করা স্থির হইল। কিন্তু কেহ কি ভারতবর্ষ চিরদিন পরাধীন থাকিবে? খোলা তত্ত্ব থাকিতে থাকিতে বনার-ল মাঝে উপনিবেশদিগকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। ভারত কি দেশে এই সুযোগ হারাইবে? ফ্রান্সে, ফ্রান্সে, গ্যালীপোলীতে, এলিয়া-মাইনে, চীনে, আফ্রিকায় ভারতীয় সেনা-স্বাধীনতার অস্ত্র যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিল, ভাবত কি সেই স্বাধীনতাব্য ভাগী হইতে পারিবে না। অবশেষে ভারতবাসী সুপ্রোথিত হইয়া ভাবতমাতার এক সুপ্রভের কণা কণা মিলাইয়া সমস্তের বলিয়া উঠিল, "স্বাধীনতা আমাদের বিধিগত অধিকার, যদি স্বাধীন হইতে চাই।" সে স্বরাঙ্গ-মণ্ডে দীক্ষা গ্রহণ করিল, এবং সাম্রাজ্যের মন্ডে তাহার যোগ্যস্থান দাবী করিল।

এইরূপে যদিও সে সাম্রাজ্যের অস্ত্র যুদ্ধ ভবিতে উদাসীন হইল না, এবং যদিও সে যুদ্ধসংক্রান্ত বিবিধ ব্যাপারে (হাসপাতাল-জাহাজ, সমর-বাহন, রেড ক্রস অফিস, এবং সুবহু সমর-ক্ষেত্রে) জলের মত অর্থ ঢালিতে লাগিল,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক পাতালায় তাহারে হাতাব মনো মনে, কাঁচিয়া উঠিল যে,
যদি না সে নিজেব দেশে তাহার প্রতিগা কবিত্তে গানত হাত! হইলে হয় ত
কতকাল নিম্নে তাহার কবিত্তে আও বর্ধ হইবে।

সত্যজাননিদেব পদবিশেষ—যাহা সাম্রাজ্য-বর্ত্ত-ব্যাপারের আলা-
চাল ও তাহার বেত হইয়াছিল, তাহাও তাবত গবমেণ্টকে প্রতিনিধি-প্রেমণের
তৎকালিণী ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভায় প্রতিবেদনার কাৰ্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু
শেখ মোস্তফা কাবণ হইয়াছিল, যেখানে যে দেশ নিজেব নিজের নির্বাচিত
প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল, সে স্থলে তাবতবর্ষের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন—
গবমেণ্টেব নিযুক্ত, আর নিকট দক্ষিণে ব্যক্তিগণ। যাহারা ঐক-
গাতিমি হইয়াছিল, তাহাদের সম্মুখে ব্যক্তিগত আপত্তির দ্বারা কাবণ
কি না। কিন্তু তাহাও গবমেণ্টেব নিযুক্ত প্রতিনিধি, বাবতপক-সম্প্রদ-
নিষ্ঠা উত্ত-ভক্তগণেব মনোনিষ্ঠ প্রতিনিধি নহেন, ইহাই তাগতিব দিষ্ট ছিল।

স্বাধীন-মতাব মাননীয় খান বাহাদুর গান্ধী সাহেব ১৮৯৫ খ্রিঃকের মার্চ
মাসেব এত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে মণ্ডলব ব্রহ্মজেনেব বন্দোপায়ার মহোদ-
য় তাহা সাহসকে সম্বোধন করিয়া যে উক্তি কবিয়াছিলেন, তাহা আমাদেব
গোণিধান-যোগ্য। তিনি কহিয়াছিলেন—“এই আশা ও প্রত্যাশাব অবস্থা
তাহাবক মহাত্ম্যেব সম্ভবা ধ্বংসাগা হয় নাই। ইনি সাম্রাজ্য-সমির্ভিত
স্বকাৰী প্রতিনিধি পাঠাইতে চান, নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইবাব এসম-
কবেন নাই। সবকাৰী প্রতিনিধি পাঠাইবাব সার্থকতা অল্প, হয় ত তাহাতে
আমাদেব অনিষ্ট ঘটতে পারে। কাবণ, আমি এ কং. বলিতে বাধ্য যে,
জনহিতাব কাংশ আমবা যে চক্ষে দেখি, তাহারা সকল সমুদে চক্ষে দেখেন
না। অনেক সময় তাহাদের মতি গতি আমাদেব কাৰ্থেব বিরুদ্ধ। এ কথা
ক্যান্ত তহীকায় কহি না যে, সাম্রাজ্য-পবিত্রেব মণ্ডলব এবং স্বাধীনতাবক
উপনিবেশ সমুদেব মন্ত্রিগণ সববেত হইবেন, কিন্তু ঐ সকল কংগ্রেসীতে এবং
আমাদেব কংগ্রেসীতে অনেক এতেন। তাহাদের কৃতিগণ প্রকৃতিগুণেব
নিষ্ঠায়েত প্রতিনিধি, সেই সেই দেশেব জন-সাধাবণেব মুখস্বাপ, এবং
তাহাদের কাণ্ডাবলগণেব ভক্ত প্রজাব নিকট দাগী; কিন্তু আমাদেব কংগ্রেসিগণ
নয়ন মাত্র সাধাবণেব গোবক, কাৰ্য্যে তাহারা আমাদিগেব প্রত্ন। আমি
কাণ্ড কহি যে, আপনাব হিতকাৰী শাসনেব গুণে আমাদেব এ অবস্থাব
কতিবদন হইল। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদেব পূর্বে প্রোদবচনা দেখা।

পাইবে না। কারণ, তাহা স্বপ্নদৃষ্ট, অপ্রাণিকার বা হঠাৎ দিগন্ত হইতে
গাবে।”

এ সাম্রাজ্য-পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গকে স্থানদান একটা যুগান্তকারী
ঘটনা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রতিনিধি ছিয়েন বটে; কিন্তু
ভারতের নয়, ভারত গবর্নেন্টের; এই থানেই প্রভেদ। কারণ, তাহাদের
সংযোগিগণ স্ব স্ব দেশেব প্রকৃত প্রতিনিধি। তথাপি তাঁহাদের কাণ্ডে আশংকা
নষ্ট। কারণ, তাঁহারা যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। যদিও ছোট্ট বিবরণে, অর্থাৎ
সাম্রাজ্যগত বিশিষ্ট স্বাধীন্যবিধান ও চুক্তিবদ্ধ কুলীর সম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য
আমাদের মনোমত হয় নাই, তথাপি আমরা আশা করিতে পারি যে, এই
পরিষদে ভারত-সম্বন্ধকে স্থানদানের ধরে ‘ছোট্ট ছোট্ট প্রবেশ ও ফাল হইয়া
নির্গত হইবার’ প্রবর্তি সার্থক হইবে। অন্ততঃ তাঁহাদের সহযোগিগণ এখানে
কবিয়াছেন যে, যদিও ভারত পরাধীন বটে, তথাপি ভারতসম্বন্ধে তাঁহাদের
সম্পূর্ণ সমকক্ষ।

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পবলিক সার্ভিস কমিশনের মন্তব্যে তাহা
নৈরাশ্র ও বিরক্তির স্রষ্টা হইয়াছিল। অবশ্য, এই মন্তব্য অল্প যুগেব কথা, গভর্ণমেন্ট
আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমিশনের
সভ্যদিগের অধিকাংশের স্তরে ভাবভ্রমাসনে ইংরাজের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী ও
আবশ্যক, এবং ২০ বৎসর পরে ভারতবাসী সিভিল-সার্ভিস ও পুলিশ বিভাগের
কর্মচারি আনা মাত্র পূর্ণ পাইতে পারিবে। এই কমিশনের বন্ধন সাহায্য উত্তর
করিলাম, তখন সঙ্গে সঙ্গে বিচাৰগতি বহিম সাহেবকে ভারতবাসীর
হৃদয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপন না কবিয়া ফাস্ত থাকিতে পারি না। তিনি সুহৃদ
গাহকের পরিচয় দিয়া একক সমস্ত সমস্তের, অল্পমোদিত অন্তর্ব্যক্তি প্রত্যাহার
করিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষে কি প্রসঙ্গত প্রণালীনতে কর্মচারি নিয়োগ করা
উচিত, তাহা প্রদর্শন কবিয়াছেন।

এ সমিতিতে তিন জন মাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপালকৃষ্ণ
গোখলে রিপোর্ট-প্রকাশের পূর্বেই ভবলীলা গাঙ্গু কবিয়াছিলেন। ভারত
জানি, সমিতির অধিবেশনের সময় তাঁহাব স্বদেশবাসীৰ প্রতিনিধি রূপে ব্যবহার
করা হইয়াছিল, তাহার অপমান ও বেদনার উাহাব মূহুর আসন্ন হইয়াছিল।
বহিম সাহেবের কথা আমি পূর্বেই লিখিয়াছি। মাননীয় জেনারেল মহোদয়
রিপোর্টে স্বাক্ষর কবিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহার অনেকগুলি বাক্য

প্রস্তাবে সহিত একমত নহেন। যাহা হউক, এই সমিতির রিপোর্টকে আমরা পূর্ব-সমস্তরের ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। উহা প্রকৃততত্ত্ববিদেব অনুসন্ধানের বস্তু হইতে পাবে—সাধারণের উহাতে কোনও প্রয়োজন নাই।

এই সমস্ত কারণে ভাবতবাসী বাধ্য হইয়া বুঝিবাছিল যে, লগ্নতের মধ্যে তাহার অদৃষ্টেই চিরদানব্দ। ইংলণ্ডে ইংরেজ প্রভু, ফ্রান্সে ফরাসী, আমেরিকায় মার্কিন জাতি, উপনিবেশসমূহে ঔপনিবেশিকগণ প্রভু; কিন্তু ভারতবাসী কোথাও প্রভু নহে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল ভারতবাসীই ‘নিম্নবাসভূমে পরবাসী’। ‘বুটশেব জন্ম বুটন’—যদি এ কথা বল, তোমার উক্তি জাখা ও সহস্র; কিন্তু যদি বল, ‘ভারতবাসীর জন্ম ভাবতবর্ষ’, তবে শুধু অজ্ঞায় বলিলে, তা’ নয়, তুমি বাজ্রদ্রোহী। তোমার বলা উচিত, ‘সাম্রাজ্যেব জন্ম ভারতবর্ষ’; বরং গ্রাবও ভাল,—যদি বল, ‘ভাবতকে বাদ দিয়া যে সাম্রাজ্য, তাহার জন্ম ভাবতবর্ষ’।

ইংরেজেব পক্ষে স্বদেশীয় গণ্য-গ্রহণ ছুবুঝি ও স্বদেশ-প্রেমের ঘোষক, কিন্তু ভাবতবাসীৰ পক্ষে বিদেশী বর্জিত অস্বীকৃতি ও সাম্রাজ্য-জোহের গরিচারক। ভারতবাসীৰ পক্ষে এই বিধান যে, সে চিরদিন প্রাক্কলচিত্তে এখনকার মত—‘অধীনতায় আবহাওয়ায়’ (ইহা গোপালকৃষ্ণ গোপালের শব্দ) বসবাস করুক, এবং যে সাম্রাজ্যে সে সামাজিকের অধিকাৰবর্জিত, সেই সাম্রাজ্যের জন্ম গরী অশ্রুভর করুক। আর সাম্রাজ্যেব অন্তর্গত অপবাপব জাতিৰ পক্ষে এই বিধান যে, তাহারা সামাজিকের পূর্ণ অধিকাৰে অধিকারী হইয়া সাম্রাজ্যভুক্ত থাকুক। এইরূপে ঠিক যখন ইংলণ্ডেব প্রতি ভারতবাসীৰ বিশ্বাস বিলুপ্ত হইতেছিল, এমন সময় ন্যটেশ সাহেবের ভাবতসচিব-পদে নিয়োগরূপ আনন্দসংবাদ ভারতে ঘোষিত হইল, এবং ভারতবাসীৰ অভাব অভিযোগ পক্ষণে শ্রবণ কবিবার জন্ম আনাদের রাজপ্রতিনিধি নিমন্ত্রণ তাহার নিকট প্রেরিত হইল। নিবিড় অন্ধকারেব মধ্যে যেন আলোক-রেখা ফুটিয়া উঠিল, ইংলণ্ডেব সম্বন্ধে প্রশস্ত বিশ্বাস নব-জীবন লাভ করিল, এবং ব্রহ্মসমাগমের সম্ভাবনায় ভাবতময় আনন্দ-তুখ্য সাধিয়া উঠিল।

এইরূপে ভারতবাসীৰ সম্বন্ধে প্যামেণ্ট ও রাটশ গবর্নমেন্টেব ভাবান্তর হওয়ার ভাবতের ভাবেরও পরিবর্তন ঘটমাছে বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, স্বরাজ-ভাভেব জন্ম ভারতবাসীৰ দৃঢ় সংকল্পের কিছুমাত্র ফলপ্রসূ হইয়াছে। সন্নিব প্রস্তাব শুনিতে তাহার আপত্তি নাট, কিন্তু সে সন্নি

‘সম্মানদহিতা সন্ধি’ হওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে সম্মানের অর্থ—রাধীনতা। তাহা যদি না প্রদত্ত হয়, তবে এ দেশে আরও প্রবলতর আন্দোলন আরম্ভ হইবে।

(গ) শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানি।

আর্য্য-সমাজ ও খিওরফিকাল সোসাইটীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসহানিও বৃদ্ধিপাত হইয়াছিল। কারণ, উভয় সমাজেই লক্ষ্য ছিল—ভারতবাসীর হৃদয়ে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ-ভাবনা জাগৃত করা এবং তাহাকে অতীতের গোববে গোপনিত করিয়া বর্তমানে আত্মসম্মান এবং ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর আনয়ন করা। এই দুই সমাজের চেষ্টার ফলে সর্ব্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণসূহা ক্রমশঃ নিবারিত হইয়াছিল, এবং পাশ্চাত্য জাতির চিন্তা ও সভ্যতার মধ্যে বাহ্য উৎকৃষ্ট, তাহাই গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব বিশেষভাবে কার্য্য করিয়াছিল। তাঁহার মূলমন্ত্র স্বদেশপ্রেম, তাঁহার দেশাত্মবাগ, এবং তৎকৃত পাশ্চাত্য জড়বাদের অন্তিষ্কারিতা-প্রদর্শন ভারতীয় সমাজে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—“ভারতসন্তানগণ! আমি যে আজ ভাবিতে গৌরবের অতীতের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেকে অনেক বার আমাকে বলিয়াছেন যে, অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কেবল যে নিষ্ফল, তাহা নহে, তদ্বারা মানুষের অবনতি ঘটে। এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, অতীতই ভবিষ্যতের নিদ্রাণকর। অতএব, দূর অতীতের প্রতি—যত দূর দৃষ্টি চলে, দৃষ্টিশক্তি কব। অতীতের সনাতন ধারায় অবগাহন কর। তাহার পর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া অগমন কর, এবং ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জলতর কর। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত মহান ছিলেন, তাহা মনে রাখা চাই। কোন বংশে আমার জন্ম, কোন বংশে আমার ধর্ম্মনীতি প্রবাহিত, তাহার জ্ঞান থাকা চাই। আমাদের অভিজাত্যে, আমাদের গৌরবের অতীতে, বিশ্বাস থাকা চাই। সেই বিশ্বাস হইতে, গৌরবিত অতীতের সেই স্মৃতি হইতেই অতীতের অপেক্ষাও মহিমান্বিত ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে পারিব।” আর একটি উক্তি শুনি :—“আমি নিশ্চয় জানি, প্রত্যেক সভ্য দেশের লক্ষ লক্ষ—হাঁ, প্রকৃতই লক্ষ লক্ষ নব নারী ভাবতের বাণী শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—যে বাণী তাহাদিগকে মুদ্রার উপাসক জড়বাদ-দাননের বিকট গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করিবে। এখন নব্যতন্ত্রের সমাজসংস্কারকদিগের

মধ্যে অনেকেই বসিছিলেন। তখন গোলাবের গুচ্ছ ভাবিলি তাঁহাদের সাহায্য-
 চেপ্রাব মধ্যে কেহুই আত্মাশ্রয়কৃত বসবাসে বসিতে পারিলে না।”

পাশ্চাত্য গণ্ডিত ও সাময়িক-কৃত সমস্ত সাহিত্যের সন্নিধানও এই গ্রন্থের
সাহিত্য পরিসীমায় ছিল। তথাপি এই ভাব স্ববল অঙ্গসংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবৃত্ত
ছিল—মালাবরণের অধিগন্ত ছিলাম। বিদ্যুৎ যখন অস্তিত্ববাসী দেখিল, জাপান
যুদ্ধ বস পরাধীন হইল, একটি দূর প্রান্তে প্রতি এক স্তম্ভের পাশ্চাত্য সাদৃশ্য
বাহুত বসিল, যখন দেখিল, রুমী ও জননাথগণ দুর্জল ও অসুখসংবীত, তখন
পাশ্চাত্যের মন ও হৃদয় প্রতিদ্বন্দ্বিগণ দেখে যত সর্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত—
তখনই যেহেতু জাতিগত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাহাদের পূর্বতন বিশ্বাস আঘাত প্রাপ্ত
হইল। 'উত্তমান যুদ্ধে দক্ষণীয় চর্যাবহায়ে এই বিশ্বাস আরও দুর্জল হইয়াছে
এবং তাহাজন্ম সম্বন্ধে জন্মের মত-বাদ পটতঃ বিধাহীন। তাহার উপর
জাপানবাদের অধন দেখিল যে, ভবিষ্যনের সময় জন্মণেরা বিজিত দেশের প্রতি
কিঞ্চপ অভ্যাসের ফলে, এবং প্রতিজ্ঞাতের সময় পরিত্যক্ত প্রদেশকে যিকিঞ্চ
নিষ্কল্য কবে, তাহা নিসর্কারের শিকার হইল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড,
সার্বিয়া প্রভৃতিতে বতটা কার্যবরী হইয়াছে, তখন 'এসিয়া'র ভুলনায় যুক্তমান
ইসোরোপ অনেক প্রেমে, এই ভ্রূর দাবণ একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল।
দেশ' পের যে, ইসোরোপ যে স্তম্ভ ঠাণ্ডা বৃত্ত হই করে, তাহা বাহু চাখটিয়া-
মাত্র, তাহাব ধর্মও কেবল প্রাণ দিল বাহু অহুতানবাঈ। অতএব উমোদ্যোপের
ধর্মেরে স্তম্ভ ও জাতিগণের নিজেই তুপ সত্য করিয়া, এবং নিজে নৃতন ছেদন ও
ভেদনকারী যোগদাতা ক্রমেই উদ্যানে নিযুক্ত বিজ্ঞানকে দানদিকতায় পবিত্রত
দেখিয়া এশিয়া যদি নিজেদেব ধর্ম ও সভ্যতার পক্ষপাতী হয়, তবে কি তাহার
অপরাধী দণ্ডিতে হইবে?

কিন্তু যখন বিজয়হাট বৈদ্য-ভোলাহন আপদা আপদ এক দূরত্ব নিবিড়তায়
ভাঙে ভাঙতাবাসীর হৃদয়ে যোবন করিয়াছে। পাশ্চাত্যাদিগের মধ্যে ধর্মাত্ম
সমগ্রী, কৃষ্ণা তবদ্বয়ে ধর্মাত্মতা ও আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে সত্য উচ্চ আশ্রয়
ধোবন করেন, তাহাও সত্য। সম্বন্ধে, ধর্মাত্মগিরিগণ আত্মীয়তা সম্বন্ধে
মন্দে শান্ততাবাব হৃদয়ে আশ্রয় বিচারে। যুক্ত-প্রাচ্যের শাসনব্যক্তি
সাব কৃষ্ণে সে দিন যে ধর্মাত্ম ছিলেন, সে, আজ তিনি ভারতবাসীর মধ্যে
ধর্মাত্ম সারিও এ প্রত্যাহীন তাব সে বৈতেন, তাহাও ধর্মাত্ম বৈতেন
কিন্তু তাহা বৈতেন সে দিন, তাহা বৈতেন নহে। অনেক বৈতেন ধর্মাত্ম

ভারতবাসীগণ উপযুক্ত বাকপুরুষ-কৃত প্রতিজ্ঞা ও শপথভঙ্গের মনস্তাপে
 ক্লান্ত হইতেছিল। তাহার উপর এ দেশে রাজনৈতিক নির্যাতন অসংখ্য
 চলিয়াছে; আর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে সকল কঠোর আইন প্রচলিত হইত,
 এই কয়েক বৎসরে তাহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশ বাড়িয়াছে, এবং যথিত
 শক্তির পবিত্রতা ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য ইয়োরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, তথাপি
 এ দেশে ঐ নির্যাতন-নোতির সংকোচ না হইয়া প্রসারিত হইতেছে।
 এই সকল কারণে ভারতবাসীর সন্দেহ ঘনীভূত হইয়াছে। যদি এই সন্দেহ
 দূর করিতে হয়, তবে সরাসরী সাহসের সহিত রাজনীতিজ্ঞদিগকে দীর্ঘ
 প্রত্যাশিত সংস্কার-প্রণালীর আবর্তন করিতে হইবে। রাজনীতিক ছিলালোড়ান
 আর কাল নাই; এখন বিজ্ঞতার সহিত বিশিষ্ট পরিবর্তন কবিস্থার সময়
 আসিয়াছে।

যে সকল ব্যাপারের সহিত প্রজার স্বাধীন-স্বচ্ছন্দতার নিকট-সম্বন্ধ, সেই সকল
 ব্যাপার সম্বন্ধে ইংরেজ-শাসিত ভারত কিরূপ মনঃকলিত অগ্রসর হইতেছে,
 এবং তাহার তুলনায় কোনও কোনও ভাবতীয় মিত্রবাক্য কিরূপ দ্রুততা
 গতিতে উন্নতি কবিয়াছে, এ ঘটনাত ভারতবাসীর বিশ্বাসহানির অন্ততন
 কারণ। ভারতবাসী লক্ষ্য করিয়াছে যে, তাহার স্বদেশীয় রাজা ও মতিবৈব
 নেতৃত্বে ঐ উন্নতি সাধিত হইতেছে। সে দেখিতেছে যে, মহীশূরের প্রতিনিধি
 সজায় গৃহীত মন্তব্য সকল বিশিষ্টভাবে বিবেচিত হইতেছে, এবং দণ্ডাস্তর
 প্রণয়ন হইতেছে, এবং বুঝিতেছে যে, আগাদের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ
 অপেক্ষা ঐ সভার সভাগণ—আইনভংগ না হউক—কার্য্যতঃ বেশী অধিকার
 পাইয়াছেন। সে দেখিতেছে, ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার হইতেছে,
 নূতন শিল্পের পোষণ হইতেছে, পল্লী-সমাজ স্বায়ত্ত-শাসনে এবং নিজের দাবি-
 বহনে উৎসাহ পাইতেছে, স্বতরাং সে বিস্মিত হইতেছে যে, এ কি অপরূপ যে,
 ভারতবাসীর পক্ষত ইংল্যান্ডের দক্ষতা অপেক্ষা কার্য্যকরী হইয়াছে।

হয় ত মোটের উপর ভারতবাসীর পক্ষে ভারতীয় শাসনই সর্বোত্তম।

(দ) ভারতীয় বণিকদিগের জাগরণ।

যে সকল শক্তিপুঞ্জের সমন্বয় নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিয়াছে, তাহাব
 মধ্যে বোধ হয় ভারতীয় বণিকদিগের বাজনৈতিক জাগরণ সকলের অপেক্ষা
 সর্বত্র ও শ্রুত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বোম্বাই শিল্প-সম্মিলনে বার দোবার টাউন

শিল্প ও শিল্পীজীবন প্রাচীন কাল হইতে বিস্তারিত। এই সকল কার্যে গান্ধীজী
 আসেন। বড় দিন দাঁড়ি বসিফরসা হু হু বাপার জেইয়া নিশান দিয়া গান্ধীজী
 বসেন। হিঁদী ও হিন্দীভাষা প্রবৃত্তি উদ্বোধন, এবং বসিফরসা হু হু বাপার
 কোম্পানীর প্রবেশ করা সম্ভাব্য—যত্নসহকারে কার্যপ্রসার দাঁড়া
 তাই। এই সকল কার্যে গান্ধীজী সচিব। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায় যে গান্ধীজী
 সব সময়ই বসিফরসা হু হু বাপার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিলেন, এবং যখনই
 গান্ধীজী বসিফরসা হু হু বাপার হইল, গান্ধীজী ঐ সকল কার্যসমূহে কোন
 সুপারিশ করেন নাই। যে সকল শিল্পী বাবদার্থী গান্ধীজী হইতে
 জাহাজ হইতে, যত্নসহকারে পর সেই সকল প্রসার এই সকল কার্যসমূহ
 হইতেই বসিফরসা হু হু বাপার উদ্বোধন হইলে গান্ধীজী টাংকা দিয়া
 বাতাস করে। গান্ধীজী কোনও কার্যে সহায়তা করিলেন না। যুবক কলে যে সকল
 শিল্পের প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা হইল, গান্ধীজী যুদ্ধের আঁচিলার ওপর
 বসিফরসা হু হু বাপার বসিফরসা হু হু বাপার প্রসার না হইয়া দক্ষিণ
 দক্ষিণ হইল। যখন যুদ্ধের প্রস্তাব গান্ধীজী বাতাস করে মনে হইল, তখন গান্ধীজী
 সেই আঁচিলার নিষেধক কোনও উপায় করিলেন না। তাহা হইলে এই
 হইল যে, ও দিকে টাংকা দেন। দ্বিতীয় হইতে টাংকা পাঠান যত্ন করিল,
 সেই সময় সমস্ত বসিফরসা হু হু বাপার আঁচিলার করিতে গেলেন। এ
 দ্বিতীয় কার্যে গান্ধীজী হু হু বাপার বসিফরসা হু হু বাপার প্রচুর কোম্পানী
 সহিত কোম্পানীর বসিফরসা হু হু বাপার করিলেন। কোনও কোনও যুগে তাহা
 দ্বিতীয় মূল্য বাতাস টাংকা পরিবর্তে বুন-বণ্ড (war bond) হইতে কার্য
 হইলেন। যখন, এই সকল হু হু বাপার বিভিন্ন বসিফরসা হু হু বাপার
 প্রসার করিলেন। কোম্পানীর প্রসারী ও স্থায়ী বসিফরসা হু হু বাপার
 সহিত এই সময়, বড় দাঁড়ি বসিফরসা হু হু বাপার জাহাজ আঁচিলার
 সহিত। তামি নেদী পরিচিত। সহিত। মাল্যে প্রেসিডেন্সী ব্যাংক
 হু হু বাপার প্রসার প্রসার করিতে, এবং ঐ ব্যাংক দ্বারা প্রসার
 মধ্যে দেশীয় যৌক আসেন না থাকতে, বাল্লী প্রসার বসিফরসা হু হু বাপার
 অসিফরসা হু হু বাপার হইয়াছিল। সশ্রমে সশ্রমে কোম্পানীর প্রসার
 হু হু বাপার ১০০০ বসিফরসা হু হু বাপার প্রসার বাল্লী প্রসার
 কার্য, বসিফরসা হু হু বাপার প্রসার হু হু বাপার প্রসার বাল্লী প্রসার
 প্রসার বসিফরসা হু হু বাপার প্রসার হু হু বাপার প্রসার হু হু বাপার

কিন্তু কোম্পানীর কাগজের দয়্য ঘাটতি হওয়ার দরবরে মনে গামেন্টের স্থান
সম্বন্ধেও আভ্যন্তরীণ উদয় হইয়াছিল।

গোলকবোগের আর একটি কারণ হইয়াছিল এই যে, কয়েক বৎসর ধর্ম্ম
ভারতবর্ষ জমী ও খনি প্রভৃতি নিয়মিত বিদেশীয়েরা হস্তগত করিতেছিল
কিন্তু গবর্নেন্ট সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন।

পশ্চিম উপকূলের নারিকেলের মালার ও নারিকেল-ছোবড়ার ব্যবসায়
ভারতবাসীর হস্তগত হইয়া অর্থগীর হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং কয়েক এই ব্যবসায়
খনি অর্থগীর কলমুক্ত হইল, তখন ইহা ইংল্যান্ড বণিকের গ্রাসে পড়িবার উপক্রম
হইয়াছিল। সুতরাং বিষয়, টাটা এণ্ড সন্স কোম্পানী মোহনদাসের অগ্রদূত হইয়া
ব্যবসায়টাকে বিদেশীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিলেন। দশ বৎসর পূর্বে 'মোন

জাইট (monazite) নামক খনিজ দ্রব্যের কারবার (গোলাপুতি প্রভৃতি
কারবার ইহা একটি উপাদান) জর্ম্মণেরা একচেটিয়া করিয়াছিল। ভারতীয়
জর্ম্মণের খনির অধিকাংশ জর্ম্মণীর হস্তগত হইয়াছিল। অমার্জিত চামড়া বস্ত্র
গরিমাণে জর্ম্মণীতে রপ্তানী হইত। অথচ দেখা গিয়াছিল যে, মহীষুরে ভারতীয়
কারবারের ইউরোপ অপেক্ষা এই মার্জিত ব্যাপার সূচকরূপে সম্পন্ন হইত, এবং
অল্পমাত্র সাহায্য পাইলে এই চামড়ার ব্যবসায় খুব একটি লাভজনক ব্যাপার
পরিণত হইতে পারিত। তাহা না করিয়া গবর্নেন্ট নিজের নির্দিষ্ট দ্বারা প্রচুর
পরিমাণ অমার্জিত চামড়া খরিদ করিতে লাগিলেন, এবং সেই চামড়া মার্জিত
করিয়া শিরদ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন।

এই সেক্টরের ভাবিখে বড় লাট সাহেব ভারতীয় ব্যবসায়িক-সভায় যে বক্তৃতা
করিয়াছিলেন, তৎপ্রদক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন যে, “ভারতীয় চামড়া-পারিষ্কার
বিষয়ে প্রচুর অর্জার দেওয়া হইয়াছে।” তিনি আবও বলিয়াছিলেন যে, চামড়া
মার্জিত নষ্ট হইবে যে সকল গরীমা করা হইয়াছিল, তাহার কল সম্ভবজনক হইয়াছে,
এবং এই ব্যবসায়ের সফলতার সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়াছে। তিনি আশা করিয়াছিলেন
যে, যুদ্ধের পর চামড়া মার্জনের ব্যবসায় প্রচুর প্রসার লাভ করিবে। কিন্তু
ইতিমধ্যে যুদ্ধের নির্দিষ্ট হাবে চামড়া খরিদ হইবে, এই হুঁস প্রচারিত হওয়ায়
চামড়া-ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, কেবল যুদ্ধকালে ব্যবহারের দর
নষ্ট, ইংলণ্ডের জনসাধারণকে সস্তা দরে চামড়ার দ্রব্য যোগাইবার জন্য নির্দিষ্ট
হাবে ইংলণ্ডের সমর-আফিস এই দেশে চামড়া খরিদ করিতেছেন। তাহা
জিতানা করি, জনসাধারণকে বৃট্ট যোগানব সহিত সমর-আফিসের কি সমর?

কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে নয়, যুদ্ধোত্তর প্রয়োজনেও কি ভারতকে শোষণ করিতে হইবে? যখন ইংলণ্ডের মহাজনদিগের অর্থে নয়, ভারতের ব্যয়ে, বিশেষজ্ঞেরা চাংড়া-সংস্কার সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন, তখন তাহাদের পরীক্ষা-সকল জ্ঞান ভাব-তববই সম্পত্তি হওয়া উচিত, এবং ভারতীয় প্রজাব সমৃদ্ধিসাধনেই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ইংরেজ বণিক ও ইংবেজ কারখানার মালিকদিগেরা উহা দ্বারা শ্রীবুদ্ধি হইতেছে।

যুদ্ধের ফলে ভাবতের বিপুল স্বভাবজাত সম্পদের সদ্যদহার করিবার পক্ষে গবর্নমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেদিন বড়লাট নাহেব বলিয়াছেন যে, ভারতকে স্বাবলম্ব করিবার জন্ত, এবং বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের উপর ভারতের নির্ভর হ্রাস করিবার জন্ত এই সকল সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত। আমরা সর্বান্তঃকরণে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করি। ভাবতবাসীরা অনেক দিন হইতে এই কাঁই বলিতেছিল, কারণ, ভারতবর্ষের আবহাওয়া ও মাটির এতই বৈচিত্র্য যে, আমাদের যে কিছু প্রয়োজন, সমস্তই এ দেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে, এবং খৃষ্টীয় সম্রাট শতাব্দীতে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ফিলিপিনোর সাহেব হালা বলিয়াছিলেন, এখনও আমাদের ভূমির উচ্ছিষ্ট দ্বারা সমস্ত পৃথিবী পবিতুষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু প্রথমতঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তাহার পর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট, এবং সম্প্রতি শোষণশীল সাম্রাজ্যপন্থা বণিক-সম্প্রদায় দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষ কেবল কাক-কাঁচের উপযোগী উপাদানমাত্র বোকাইবে। সেই উপাদান বিদেশে রপ্তানী হইবে এবং বিদেশী কারখানা—এই কারখানা আমাদের অন্তর্গত দেশে স্থিত হইলেই ভাল হয়—পণ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়া আমাদের আমদানী হইবে, এবং ভারতবাসী তাহাই খরিদ করিবে। অনেক দিন ধরে একমলে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের সমৃদ্ধি-হানি সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী রাজ্যের অদ্ভুত প্রসার দৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের বর্তমান রাজপ্রতিনিধি যদি ভারতীয় কলকারখানার শ্রীবুদ্ধিসাধন করিতে পারেন (‘ভারতীয়’ অর্থে ভারতবর্ষে স্থিত ইংরাজী কলকারখানা নয়) তবে তিনি চিরদিনের জন্ত ভারত-বর্ষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের সমক্ষে সাহস্য দিতে আমরা এক জন বলিয়াছেন যে, ভারতের উচিত,—ভারতবর্ষের বাহিবে ব্যবহারের জন্য চাহেব দ্রব্য উৎপন্ন করা; অর্থাৎ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহা বলিতেন, ভারতবর্ষ অপরের কারখানার উপাদান বোকাইবার জন্ত একটা আবাসে পরিণত

হউক। যথেষ্ট যদি প্রচেষ্টা হয়, তাহা হইলেই তাহা হইতে পারিবে।
 মুসলিম অভিজ্ঞতা স্বরূপ কবিরা আমাদেয় হাতছাড়া উপস্থিত হইয়াছেন।
 একথা ভুলিব না যে, এক শতাব্দী পূর্বে এখানকার প্রৌঢ়ের বয়স
 গিয়াছিল, কিন্তু সেই পৌর উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন ইহা হইল না।
 তদন্ত কায়দা এই যে, তখন ইংলণ্ডই জগৎব্যাপী পৌর-প্রাচীর।
 হইতেন। সে স্বভাবতই এই ক্ষেত্রে প্রতিকূলী আসিতে পারিত।
 গবে টাটা বোম্বাই পৌরসংস্থা উদ্ধার করিয়াছেন—আজ উদ্ধার হইয়াছে।
 টাকার স্থলে ১১৮০ টাকার বিবাহিত। গাটরা একটি পৌরসংস্থা
 খুলিয়াছেন, এবং টাটার ইচ্ছাভেদে এক কাটতি যে, উদ্ধার পৌরসংস্থা
 পাবিতেছেন না। এই চাপার যদি ১০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইত, তাহা হইলে
 সংসদ ধরিয়া পৌরসংস্থা ভাঙতবলে প্রাপ্তিও থাকিত।
 কলিকাতার নগর আনুষঙ্গিক ইংলণ্ডের মুখোদয় বহির্ভূত হইত।
 অতএবই ত আমবা নূরন কানখানা খুলিতে পারিতেন না, এবং
 লাভাইতে পারিতেন না, এবং ইংলণ্ডের অনেক নগরসংস্থা
 কিছুকাল ধর্মীয় বাজারে যে অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও
 পারিতেন না।

বড়লাট সার্ভের মেন্সিণ যথার্থই বলিয়াছেন—“এ দেশে পূর্বে
 কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহা কল্যাণ কখন হইয়াছে, যাহা চেষ্টা হইয়াছে।
 আরও বলিয়াছেন—“বৈজ্ঞানিক কৃষিকর্ম সম্বন্ধে পরীক্ষা
 এবং উত্তরকৃত্য কর্তৃক গনিমিত্তি বাহাদুর।
 দলভাও হইয়াছে জাহাতে যেন হয় যে, অতীত শিল্প—নিশ্চয়।
 দ্বিতীয়ে এক প্রাচীন প্রবর্তন করিবার দায় জামিতা।
 ইহা দল্য করিবার বিষয় যে, বৈজ্ঞানিক কৃষিসম্বন্ধে
 হুদে ভারতের প্রয়োজনে না, ইংলণ্ডের প্রয়োজনে।
 প্রকল্প, ব্যবসায় চাকর এবং অভ্যন্তরীণ চাকর (float staff)।

ব্যবসায়। বাণিজ্যের চাহিদা দৃষ্টি—নিম্ন ও উচ্চ।
 গাংরা বাহিতেছে না। অতএব ভারতের বৃষ্টিপাতের ফল—এই
 দীর্ঘকাল ধর্মীয় হউক। এ ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদেয়
 হইয়াছে। যে ইংলণ্ডের আমাদের কল্যাণ হইয়াছে।
 গণিতান হইতে ত কখনও দেখি না।

হইয়া নিজের ক্ষতি করিয়া বিদেশের প্রয়োজন যোগাইবার কল আপনাকে উৎপন্ন
ক্রমের প্রকার নির্ধারণ করিয়াছে।

সাহা হউক, যুদ্ধের একটা স্বকল এই হইয়াছে যে, ভারতীয় জননায়ক-
গণের চেষ্টায় এত দিনে বাহা হয় নাই, আজ ভারতের শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে
গবর্নমেন্টের মনোযোগ অকুণ্ঠ হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে শিল্প-কমিশন নিযুক্ত
হইয়াছে, এবং গোলা বাকব প্রভৃতি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনে
শিল্প সম্বন্ধে সংহত চেষ্টা আবদ্ধ হইয়াছে। ভারতীয় বণিকদিগকে সতর্ক
ধাকিতে হইবে, যেন শিল্প সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট-কৃত এই সংহতি ও সাহায্যের ফলে
ঔহাদের বর্তমান শোচনীয় তাঁবোরাব অবস্থা আরও শোচনীয় না হয়। তাহা
যাহাতে না হয়, গবর্নমেন্ট যাহাতে আশাদেব নিজস্ব হয়, তজ্জন্ত শাসন-শক্তিতে
ঔহাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। ভারতীয় বণিকদিগের মধ্যে আজ যে
জাগরণ দৃষ্ট হইতেছে, ঐক্য সম্ভাবনাব আতঙ্ক তাহার প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত-
স্বরূপ দেখুন—কুমিল্লাত পণ্য-লব্ধ আসেব উপর কব-ধায়া কবা হইয়াছিল।
তা যদিও কুমিল্লাত পণ্য, কিন্তু চা-কবেরা প্রধানতঃ ইংরেজ বলিয়া অনেক দিন
পণ্য চায়েব বিক্রয় লব্ধ আর্থ উপর কর ধায়া হয় নাই। যদি এই নীতিই
অনুসৃত হয়, এবং ভারতীয় অর্থে পুষ্টি পণ্য-শিল্পের পোষণ দ্বারা ঐ ঐ শিল্প
বিদেশীয়দিগের হস্তগত হয়, তবে ভারতবাসীর ভাগ্যে ইংরেজ হাউসওয়ালার
অধীনে তেরাণীগিরি ভূবাসগিরি ইত্যাদি ভিন্ন স্বাধীন সওদাগরী কখনও জুটিবে
না, এবং দিন দিন প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষীরমাণ বেতনই তাহার জীবিকার সম্বল
হইবে।

যদি ভারতবাসীরা এখনও আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হইতে পাবে, তবে শিল্প
সম্পর্কে ভারতের ভবিষ্যৎ নৈবাশাসন নহে। এ সম্বন্ধে টোজার সাহেব তাঁহার
“ব্রিটিশ ইন্ডিয়া বণিজ্য” (British India and its trade) নামক গ্রন্থে
এইকণ লিখিয়াছেন,—

“ভূলা ও পাটজাত পণ্যব্রহ্মের পবিশাণ এখনই অল্প নাহ; উহার প্রসা-
বুদ্ধির এখনও ক্ষেত্র বহিয়াছে। এ দেখে চিনি ও তামাক যথেষ্ট উৎপাদ
হইতেছে, কিন্তু উহাদিগের চাহে ও তৈয়াবীতে সবমোছাবিত নৈজ্ঞানিক প্রণালী
অবসরিত হওরা উচিত। তৈল-শস্যের রপ্তানী না করিয়া উহা এ দেশেই ভাস্কান
উচিত, আব কাপাসের বীজ—গাহাব এখন যথাবৎ ব্যবহার হইতেছে না, তাহার
সদ্যব্যহার হওরা উচিত। চামড়া, ও খোলস বাহা এখন প্রচুর পবিশাণে রপ্তানী

করা হক, তাহার সংস্কার ও মার্জিত অনেক পৰিমাণে এ দেশেই হইতে পারে।
 রেশমী ও পশমী দ্রব্য, যাহা এখন এ দেশে প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই
 মোটা জিনিষ; ইয়া ও মঙ্গল মাল প্রস্তুত করার সুযোগ আছে। রেশম
 কোম্পানীরা নিজের গাছী এ দেশেই প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু চাকা, নেমি, অপর
 প্রভৃতি লোহ-দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হয়। সম্প্রতি এ দেশে ইস্পাত অল্পই
 প্রস্তুত হয়, এবং যদিও লোহা ঢালাইয়ের কারখানা এবং কল প্রস্তুত কবিবার
 কারখানার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে বটে, কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র ষ্টিকার মতন।
 কল ও যন্ত্র প্রায়ই আমদানী করিতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ কুবক ও কারিকর
 মোটা বকমের যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। উহার স্থানে ভাল কারিকরের তৈয়ারী
 মঙ্গলবদ যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব। উৎকৃষ্টতর তৈল মাড়িবার কল ও চরকার যন্ত্র
 কাটিভি হইতে পারে। কাগজের কল ও ময়দার কলের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িত
 পারে। তা ছাড়া খেলাইয়ের কল, বাড়ি, মড়ি, জুতা, জিন, রাশ, বাড়ি, টেক-
 মড়ি, ফ্রিনি ও গফ্রিনি রং, তড়িত-উপকরণ, কাচ, কাচের দ্রব্য, চামড়া
 সিন্ধু, কচানা, চাউন, মাড়, দিরাশলাই, ল্যাম্প, বাতি, সাবান, গিলেল, চুবি-
 কাটি, হার্ডওয়্যার (hard-ware) ইত্যাদি তৈয়ায় করিয়া বিক্রয় কবিবার
 প্রস্তুত কেন্দ্র এ দেশে পড়িয়া রহিয়াছে।” ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে,
 ভারতদ্রব্য দ্বারাই ভারতবর্ষের অভাব পর্যাপ্তরূপে মিটিতে পারে, এবং যে
 পূর্ববঙ্গের মত উদ্বৃত্ত জিনিসও বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। পক্ষান্তরে
 ভারতের আমদানী দিন দিন বাড়িতেছে, এবং যে প্রকারে রপ্তানী চলিতেছে,
 তাহাতে ভাবতবর্ষের উচিতমত সমৃদ্ধি হইতেছে না।

যুদ্ধের পূর্বে আমদানীর হার জনশঃই বাড়িতেছিল; যুদ্ধের স্তব্ব হইতে উহা
 জনশঃ কমিতেছে—নিম্নের তালিকা হইতে এ বিষয় দৃষ্ট হইবে।

খৃষ্টাব্দ	মোট আমদানী	সূতী ও পশমী মাল
১৯১১-১২	৯০৩৮৩২০০ পাউণ্ড	২৮৫২২১০০ পাউণ্ড
১২-১৩	১০৭৩৩২৪২০	৩৫৫৩৬০০০
১৩-১৪	১২২১৬৫২০৩	৩৮৭৫৮০০০
১৪-১৫	১১২৫২৬০০	২৮৬৪৩০০০
১৫-১৬	৮৭৫৬০১৬১	২৫১৭৫০০০

ইহাও পূর্বের পাঁচ বৎসরের অঙ্ক হইতেও আমদানীর হ্রাসের হাব দেখা
 যাইবে।—

খ্রীষ্টাব্দ	টাকা
১৯০৬-৭	১৩৫০৮১৬৭৬
৭-৮	১৬২৭১১১২৩৪
৮-৯	১৪৩৮৯৭৫৭৯৬
৯-১০	১৫৫৪৮৩৬২১৪
১০-১১	১৬৯০৫৭২৭২৯

কিন্তু আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী ব হার বেশী দেখা যায়। সেই জন্য যুদ্ধের ফলে পাওয়া টাকা আদায়ের গোল বাড়িয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ	পাউণ্ড
১৯১১-১২	১৪৭৮৭৯০৬০
১২-১৩	১৬০৮৯৯২৮৯
১৩-১৪	১৬২৮০৭৯০০
১৪-১৫	১১৮০২৩৩০০
১৫-১৬	১২৮০৫৬৬১৯

ভারতীয় বণিকগণ জাপানী ব্যবসায়ের অতি দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়াছে। তাহারা জানে, জাপানী গবর্নমেন্ট আমদানী-শুল্ক ও অর্থসাহায্য দ্বারা ঐ ব্যবসার পুষ্টিসাধন কবে। নিজের দেশে তাহাদিগকে জাপানী প্রতিনিধীর সহিত যুক্তিতে হয়। এ অবস্থায় যদি তাহারা স্বরাজ চায়, তবে কি তাহা বিশ্বাসের বিষয়? তাহারা দেখিতেছে জাপানী পণ্যে তাহাদের বাজার পূর্ণ, এবং জাপানীরা ঐ দাল কমতি দরে বিক্রয় করিতেছে। এ অবস্থায় হোমরুল না চাহিয়া তাহাদের উপায় কি? হোমরুল হইলে তাহারা সংরক্ষণ-নীতি (protection) অবলম্বন করিয়া বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক বসাইতে পারিলে। ইতিরোপীয় বণিক-সভা—তাহারা ভারতবাসীর সম্পর্কিত রাজনীতিক বিষয়ে সর্বদা উদাসীন—সেই সকল সভার আকস্মিক অভ্যুত্থান দেখিয়া ভারতীয় বণিকগণ বেশ বুঝিয়াছেন যে, তাহাদের ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পাছে তার ভবাসীর হস্তে শাসন-শক্তি হস্ত হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াছেন। কারণ, ঐক্য হইলে খৃস্টীয় সম্পদ-শতাব্দীর নগণ্য বণিকগণ যে দিন ভারতবর্ষে প্রভু হইয়াছিল, তদবধি তাহারা যে অজ্ঞান সুবিধা ও সুযোগ ভোগ করিয়া আসিতেছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার খর্বতা হইতে পাবে। সমানে সমানে যুদ্ধে তাহারা অভ্যস্ত নহ, কাজেই ঐক্য সম্ভাবনায় তাহারা গম্ভীর হইয়াছে। তাহারা বিশিষ্ট সুবিধা

চার—ছায়া ও গায়েব তাহার বিরোধী, কিন্তু সমানে সমানে প্রতিসাম্যতা অপেক্ষ তাহাদের বেশী ভাষা হোমফুল বজ্রটকে। সেই জন্ত তাহাদের এত রোষ, এত আতঙ্ক। সেই জন্তই ভারতপ্রানী ইংরেজের স্বার্থবাদী জন্য সাব হিউ ব্রে ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বের চিন্তাশক্তি চাহিয়াছেন।

ভারতীয় বণিকগণ বেশ জনস্বপ্ন করিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধের পর এ বাণিজ্য-বৃদ্ধি বাধিবে, সেই যুদ্ধে তাহাদের পরাভব অনিবার্য। যদি না ইতিমধ্যে তাহারা নিজের দেশ শাসন করিবার শক্তি নিজের হাতে লইতে পারে। ইউরোপীয় চেম্বার অফ কমার্স ও ট্রেড এসোসিয়েশনসমূহের সভাপণ যদি ভারতের ব্যবসায় ও শিল্প বাণিজ্যের হস্তা কস্তা করেন, তবে ভারতীয় বণিক ও ব্যবসাদারগণ অধ্যপাতে যাইবে। এত দিন তবু ইংরেজ বণিকগণ সংস্থা ভাবে কার্য্য করিত না। তথাপি গবমেণ্টের ইংরাজী ব্যাঙ্কের প্রতি পক্ষপাতের জন্য ভারতীয় বণিকগণকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইত। ইহাও উপর যদি তাহানিকে বিদেশী কর্তৃক অল্পশ্রুতি ও নিয়ন্ত্রিত সংস্থা-শক্তির সহিত দৃষ্টিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সর্বনাশ স্থনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে জে, ডব্লিউ. রুট সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন :—“বর্তমান ব্যবস্থায় সমান হারে শুল্ক নসাইয়া যদি ইংলণ্ডকে ভারতের অন্তঃশিল্প ও বহির্বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে অসম্ভবীয় অপরোধ করা হইবে। * * এ কথা মনেও ভাবিবেন না যে, যদি ভারতের শুদ্ধ-গত বিধিব্যবহার তাব ইংরেজ আইন-কর্তাদের করাস্তত বণিক হইত, তবে ইংরেজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐ বিধি ব্যবস্থা প্রণীত হইত, ভারতের শুদ্ধ-গত ও বাণিজ্য-গত বিধি-প্রণয়নে অচাৰ্য্য ভারতের প্রতি ঐতিহ্য ইচ্ছা হইয়াছিল।”

রুট সাহেব যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন, ভারতীয় বণিকগণ তাহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ঐ বিপদ-নিবারণের জন্যই তাহারা হোমফুল পক্ষপাতী হইয়াছেন।

ভারতীয় বণিকগণ ইহাও বুঝিয়াছেন যে, শাসন-গত শাসক ভিন্ন শুদ্ধ-গত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। শুদ্ধ-গত স্বাভাব্যে বরণ করা এবং শাসন গত স্বরাজকে প্রত্যাখ্যান করা মুক্ততার কার্য্য। ভারতীয় রাজস্ব-সচিবের প্রত্যক্ষ বন্দন বজ্রট-প্রণয়নের সময় তাহা আসিলে, তখন তিনি শিল্প, শাস্ত্র ও জলাশয়-বান্ধা সম্বন্ধে ব্যয়ে অল্প অনেক বাড়াইবেন; কাপড়, জীপ বাদে কাপড় খাওয়ার উন্নতি হইবে, শক্তির বিকাশ হইবে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

হইবে। তখন রাজ্যের হইতে বেল-নিষ্কাশণের ব্যয় নির্বাহিত না হইয়া স্বর্ণলব্ধ অর্থের দ্বারা ঐ প্রয়োজন সূত্রিক হইবে। যেতনৈব হার কমাইয়া ও অন্যত্র ন্যয়-সংলোচ করিয়া শাসনের ব্যয় লঘু করা হইবে। (লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দশ বৎসরে আমাদের শাসন-ব্যয় ষোল কোটি বাড়িয়াছে।) আয়েব অয়ে ভূমির উপর কর কমান হইবে, যেন কৃষক স্বীয় শ্রম দ্বারা স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারে। যে সকল পণ্য ভারতের একচেটিয়া (যেমন পাট ও নীল) তাহার রপ্তানীর উপর উচ্চ হারে কর বসান হইবে। ভারতের প্রয়োজন অনুসারে বিদেশী আমদানীর উপরও শুদ্ধ বসিবে; এবং রাজকীয় সাহায্যপুষ্ট পণ্যের উপর ঐরূপ শুদ্ধের হার খুব উচ্চ হইবে। বিদেশী মস্তের উপর শুদ্ধের হার এত উচ্চ হইবে যে, যেন উহার আমদানী বন্ধ হইতে পারে। (১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে আমদানী-কৃত মদের দাম ছিল ১৮৯৮১৬৬৬।) এই বৎসর ভারতে তিন কোটি টাকার খাজসামগ্রীর আমদানী হইয়াছিল। বিলাসের সামগ্রী বলিয়া উহার উপরও উচ্চ হারে শুদ্ধ বসান হইবে। পাঁচ বৎসবে চিনির আমদানী দশ কোটির স্থলে ১৪ চৌদ্দ কোটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাহাতে বেশী চিনি উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য আমদানী-কৃত চিনির উপর উচ্চ হারে শুদ্ধ বসাইতে হইবে। সুতী বস্ত্রের আমদানী ৩৭ কোটির স্থলে ৪১ কোটি হইয়াছে, এবং বেশনী বস্ত্রের আমদানী ১৬ স্থলে ২৬ হইয়াছে; অর্থাৎ উভয় জিনিসই ভারতে উৎপন্ন হওয়া উচিত। সম্প্রতি সমর-ব্যয় কমান চিনিলে না বটে, কিন্তু ক্রমশঃ প্রাদেশিক সেনা গঠিত হইবে, এবং এ দেশেই বৃহৎ ম্যুজার্ড স্থাপিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যেরূপ হইয়াছিল, এখানেও কিছু দিনের জন্য গোরা সৈন্য রাখা হইবে, কিন্তু ‘বল্লকালি’ প্রণালী রহিত হইবে, এবং বিলাতে যংকট-সংগ্রহের ব্যয়-হার হ্রাস করা হইবে।

ভারতের অর্থগত অবস্থার যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলাম, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে,—কেন ভারতীয় বণিকগণ জাগরিত হইয়াছেন, এবং কেন তাঁহারা হোমকলের দলে প্রবেশ করিতেছেন।

(৬) ভারতীয় নারীগণের জাগরণ ।

প্রাচীন আর্য সভ্যতায় নারীগণের স্থান বেশ উচ্চ ছিল। অনেক বিবাহ কবিয়া গৃহিণী হইতেন—ভগবান মনুও ভাষায় গৃহেব স্ত্রী হইতেন। কেহ কেহ অন্তরে থাকিয়া প্রজ্বাদিনী হইয়া শুদ্ধচিন্তায় জীবনযাপন করিতেন। প্রাচীন

যুগে রাণী দময়ন্তী—অল রাক্ষস হত্যাক্রীড়ায় উন্নত হইলে সচিবেরা সেই সংকটে
 ধায়ার পরামর্শ নাইয়াছিলেন; গান্ধারী, যিনি ব্রহ্মাতি ও ব্রাহ্মত্ব ভূপতিগণের
 মণ্ডলীর মধ্যে যদাঙ্ক গুপ্ত জ্যোত্স্বিনকে হিতবাণী শুনাইয়াছিলেন; আধুনিক
 মনে চিতোরের রাণী পদ্মাবতী, মারবাদের মধুর স্ত্রী-কনি মীরাবাই, টোড়ার
 বীর-মারী তারাবাই, আমেদনগরের রক্ষাকর্ত্রী চাঁদবাই, ইন্দোরের এসিফ
 রাণী অহল্যাবাই—এই সকল এবং আরও অসংখ্য নারীর ইতিহাস ভারতবর্ষের
 শ্রেষ্ঠতাব যথেষ্ট নিদর্শন।

কেবল বিগত ১৮ পুরুষ ধর্ম্মী ভারত-নারী আর স্বামীর পার্থক্য-কি
 নহেন—জনহিতবাক্য কার্যে আর স্বামীর সহায়তা করেন না। এখনও তাঁহারা
 পতিপুঞ্জের উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব করেন, কিন্তু সহায়দাত্রী হইবার জন্য
 বিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের নাই। হুশিক্ষা তাঁহাদের নধ্য হইতে
 কখনই তিরোহিত হয় নাই, তবে পতিপুঞ্জ ইংরাজি-শিক্ষিত গম্ভীর আদর্শ
 চর্চা করেন নাই—সেই জন্য পুরুষের শিক্ষা ও নারীর শিক্ষার মধ্যে প্রভাবভেদ
 একটা ব্যবধান গঠিত হইয়াছে, তাহার ফলে তাঁহারা পুরুষদিগের ব্যাপকতায়
 জীবনের সহিত আপেকার মত আর সহায়ভূতি কবিত্তে পারিতেছেন না।
 এক দিকে স্বামীদিগের লক্ষ্যস্থল প্রস্তুত হইতেছে, অন্য দিকে স্ত্রীদিগের লক্ষ্য
 স্থল সংকীর্ণ হইতেছে। স্বামীনিগেয মধ্যে ধর্ম্মহানি হওয়াতে তাহার প্রতি-
 ক্রিয়ায় কলে স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অমুদার ও অজ্ঞানবিক হইতেছে। পুরুষের
 মত স্বামী আর স্ত্রীর ধর্ম্মশিক্ষক নাই। স্ত্রীকে এখন ধর্ম্মশিক্ষার জন্য প্রেরণ
 হইতের শরণাপন্ন হইতে হইতেছে। তাহার ফলে ধর্ম্ম এখন নগ্ন ভিত্তিতে
 গণিত হইয়াছে, এবং জ্ঞানের শুভ জ্যোতিতে আলোকিত না হওয়াতে ঐ
 ধর্ম্ম সহজে কুসংস্কারে ও ভাবহীন-ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অবনত হইতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন ধর্ম্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা
 অনুষ্ঠানের স্থলপাত হয়, তখন ঐ চেষ্টার সহিত ভারতবর্ষমণ্ডলী যথেষ্ট সহায়ভূতি
 দেখাইয়াছিলেন। কাষণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবের
 উত্তীর্ণ হইয়া যুবকদিগের ক্ষমতা যে নাস্তিক্যের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল, ঐ অনুষ্ঠান
 দ্বারা তাহার প্রতীকারের সভাবনা ছিল। বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় ঐ অনুষ্ঠানই
 সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষমণ্ডলীর মধ্যে একটা দেশব্যাপী আগ্রহ ও অহুসার উদ্বেজিত
 করিয়াছিল।

তাঁহাৰ পর ভারতের বাহিরে ভারতবাসীৰ নির্দ্যাভল দেখিয়া তাহাৰ চেষ্টা

শ্রাবসিদ্ধ সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। গবেষণা দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় বিবাহের পবিত্রতাব উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল, তখন সেই আত্মাচারের প্রতিবাদ কবিবার জন্য তাঁহাবা দলে দলে বাহির হইয়াছিলেন।

বদ-ভদ্র বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের ভীষণ অসন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিল, এবং ঠাহারদিগের সহিমুখী হইবার অত্যন্ত নিদান হইয়াছিল। যখন এক চব্বসপন্থী সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজদোহেব ঐ অভিব্যক্তি হইয়া কাবাদেও দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তখন ৫০০ শত বঙ্গনারী তাঁহাব মাতাব সহিত সাক্ষাৎ কবির্য দুঃখনিবেদন দ্বাৰা নয়, অভিনন্দন দ্বাৰা আপনাদের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ছিলেন। ইহাতেই সদবংশজাত বঙ্গনারীর হৃদয়ের পরিচয় জানা যায়।

চুহিন্দক শ্রমজীবীদিগের দৃষ্টশ্য হইয়া যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তদ্বারাও ভারতরমণীগণ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কারণ, উহার সহিত নারী জাতির মান অপমান জড়িত ছিল, এবং ঐ উপলক্ষে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বড়লাটের নিকট দরবারও করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, ভারতীয় নারী জাতির জাগরণের বোধ হয় উহাই প্রধান কারণ। কিন্তু ইহার উপর আর একটা গভীরতর কারণ বিদ্যমান ছিল। ভারতনারীর কল্যাণের ক্ষমতার অন্তিম সীমা বাকী থাকিয়া উঠিয়াছিল। সে বাকী স্বাভাবিক বাকী, নিজের দেশে রাণী হইবার জন্য ভারতনারীর সহায় হইবার আহ্বান-বাকী তাহাদের হৃদয়ে ধনিত হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের গুহ-পানে পৃষ্ট, রমণীর পূর্ণ আদর্শের উল্লেখই অনুরোধিত ভারত-হৃদয়গণ ভারত-স্বাধীনতার বৃহৎ চেষ্টায় উদাসীন থাকিতে পারেন নাই, এবং গত বৎসরে স্বদেশ-প্রেমের সন্ধুষ্টিত অগ্নি—বাহ্য বহু দিন তাঁহাদের হৃদয়ে ধিকি ধিকি জলিতেছিল—এবং যে দৃষ্টান্তে তাঁহারা প্রাণেব সহিত ভালবাসেন, সেই ধর্মের প্রভাবহানিদর্শনে প্রবীণ বোম্বাই বিদেশী শাসনের প্রতি সহজাত বিবাহের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে এক অপূর্ণ জাগরণের সঞ্চার করিয়াছিল। ফলতঃ বহুসংখ্যক ভারতীয় নারীর সহানুভূতি-লাভের ক্ষমতা হোমরুল-অনুষ্ঠানের শক্তি দশ গুণ বর্ধিত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা উহা-ব-মধ্যে রমণীস্বলত তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ ও নিঃস্বার্থ বীৰ্য্য আনয়ন করিয়াছেন। আমাদের হোমরুল লীগের ভারত-রমণীগণই প্রেষ্ঠ বংকট ও বংকট-কর্তা। যাক্স-বমণীরা আজও গর্বে করেন যে, যখন পুরুষদের শোভাযাত্রা রাজাস্থায় স্থগিত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের

শোভাবাহী বহা হয় নাই, এবং মন্দিরে মন্দিরে অমুষ্ঠিত তাঁহাদেরই পূজা পড়িয়াছে।
আবদ্য ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিল।

প্রথমতঃ ভারতের পুণ্যভূমির মন্দির সকলে, এবং সেই তবঙ্গ পল্লীভূমিতে
পৌহছিলে গ্রামস্থ মন্দিরসমূহে প্রদত্ত পূজা, প্রার্থনা ও মাধু গম্ভীর্যাদিগণ
শ্রদ্ধাশ্রী প্রচারাধ্যক্ষের ফলে ধর্মের সহিত স্বরাজ্য একতাস্থ্যে প্রতি-
হইয়াছে যে, ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষীয় ও ভাবভীর জনসাধারণের চক্ষে এখন
উজ্জ্বল সন্ধ্যা অছেদ্র। উচ্চ বর্ণের ভারতবর্ষীয় ও পল্লীবাসী নরনারীতে
স্বরাজ্যের পক্ষপাতী করিবার ইহাই এ দেশে স্থানান্তরিত উপায়। সেই লক্ষ্য
আমি বর্ণিতছিলাম যে, ‘স্বরাজ্য’ এই তিনটি অক্ষর এখন একটা মণ্ড-
পরিণত হইয়াছে।

(চ) সাধারণ জনশ্রেণীর আগরণ।

বর্তমান সময়ের ইহা আর একটা অতি বিশ্বকর ঘটনা। পূর্বে মাধু
গম্ভীর্যাদিগণ কর্তৃক যে প্রচার ও সমবেত প্রার্থনা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছে,
তাহার ফলে পূর্বে হইতই আগরণ আরক হইয়াছিল। কিন্তু এই আগরণ
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহুবর্ষব্যাপী নিয়ত প্রয়াসের দ্বারাই অধিক পরিমাণে সম-
পূর্ণ হইয়াছে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণ জনশ্রেণীর সহিত অসংশ্লিষ্ট নহে।
এ সম্প্রদায়ের মূল গল্পীজীবনের গভীর প্রদেশে নিহিত, ইহা আমবা জনে
আলোচনা করিব। ইহা স্বরণ রাখিতে হইবে যে, রায়ভরা ইংরাজী আন্দোল-
জানে না বটে, কিন্তু তাহাদের এক রকম বিজ্ঞ আছে। এই বিজ্ঞ স্বরণাতীত-
ফল হইতে প্রচারিত প্রাচীন কিংবদন্তী, উপাখ্যান, কাহিনী প্রভৃতির সাহায্যে
অঙ্কিত হয়। ভারতীয় রায়ত ধর্মপ্রাণ, কর্মবান ও ক্ষমাস্তরবাদের বিশাল
সে আনে, সে প্রশমলীল ও চতুর্ব। ‘সরকাষ’ কে, তাহাতে তাহার কিছু আসে
যায় না, তবে সরকারের যে কর্মচারী কর আদায় করিতে আসে, এবং তাহার
কর্মীতে হস্তক্ষেপ করিতে আসে, তাহার সম্মুখে তাহাকে বিশেষভাবে ভাবিতে
হইবে। প্রাচীনকালে পঞ্চায়েত গ্রামের সমুদয় কার্য পরিচালনা করিতেন,
তখন বারতব অবস্থা ভাল ছিল, সে সমুদয় চিত্তে দিনযাপন করিত, রাজ্য
কর-আদায়কারী আসিলে বা দৈন্তগণ গ্রাম আক্রমণ করিলে তাহার অবস্থা
কিছু ব্যতিক্রম হইত। এই সমুদয় ব্যতিক্রম, অনাবৃষ্টি বা বতাব মত, অবশ্যম্ভাব্য
প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। গ্রামে লুণ্ঠন হইলে, শত্রুরাজ্য গ্রাম আক্রমণ।

করিয়ে, প্রজাগণ ইহা বেশ অনুভব করিত যে, তাহাদের রাজ্য যেমন অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহা বাও সেইরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে; আর যে বর দংগুহীত হইতেছে, তাহা বা সুবিধা রাজ্যও যেমন উপভোগ করিতেছেন, তাহা বাও সেইরূপ উপভোগ করিতেছে। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এক চেষ্টন লৌহবস্ত্রের নিষ্পেষণে তাহার কুর্জরিত, পূর্বের শাসন-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থানে যে মনুষ্য মানবতার সম্বন্ধ-বন্ধন ছিল, এখন ভাঙিয়া তাহা নাই।

“হোমকনে”র কথা গ্রাম্যজীবনের মধ্য দিয়া রায়তকে স্পর্শ করিয়াছে—বর্তমান শাসন-ব্যবস্থা তাহাকে যে কত প্রকারে ক্লিষ্ট করিতেছে তাহা কৃষির অবস্থা-বর্ণনায় সময় নির্দেশ করিব। নির্দিষ্ট নগতি খাজনা দেওয়ার যে কড়াকড়ি বিধান, তাহাতে সে বিবস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে—“শস্ত্র বেমন উৎপাদিত হইবে, রাজাকে তাঁহার বংশ পরিনামগত আদায় দিব” এই বিধানের পরিবর্তে পুণঃ পুণঃ দ্রাবী মাপ ও খাজনা নির্দেশের ব্যবস্থায় বেশী খাজনা দিবার জন্য তাহাকে মহাক্ষয়ের নিকট টাকা ধাব করিতে হয়, এই ব্যবস্থায় সে তান্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাচীন পঞ্চায়েত-প্রথা আবার কিম্বা পাইতে চায়। সে চায় যে, তাহার গ্রামের সমুদয় কার্য তাহার ও তাহার গ্রামবাসিগণের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রাচীন সমাজের স্ননিপুণ সেবকগণের স্থান অধস্তন সাময়িকচারিগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এই সমুদয় রাজকর্মচারিগণের অত্যাচার হইতে সে পরিত্রাণ পাইতে চায়।

সাধারণ জনশ্রেণীর এই জাগরণ যে সমুদয় কারণের সাহায্যে সাধিত হইয়াছে, তাহার তালিক হইতে বোধ-সমিতির আন্দোলনের প্রভাব এবং নামে ও গ্রামবাসীর স্বাস্থ্যবিধান ও অন্যান্য সাধাবণের হিতকর ব্যাপার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের গ্রামে যাত্রারাতের প্রভাবকেও ধাব দেওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত মোবল্যাও ও শ্রীযুক্ত ইউসিং, “কোয়ান্টালি রিভিউ” পত্রে লিখিত, প্রবন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন;—

“প্রধানতঃ ধৌগসমিতির আন্দোলনের দ্বারা সমবেতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির যে উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছে, তাহার সহিত বর্তমান সময়ের কৃষকগণের মনোভাবের পরিবর্তন জড়িত রহিয়াছে। গত দশ বৎসরে যে সফলতা হইয়াছে, ইহাই তাহার স্থায়ী ফল, এবং ইহা বা কৃষির সংস্কার ও উন্নতিকামী, তাহার যে আত্ম-কণা আশায় বিশ্বাসের সহিত ভবিষ্যতের কল্পনা করিতে শরমত, এইটাই তাহার প্রধান চিন্তা।”

দেশের নান্য স্থানে সভাসমিতির কার্য এখন সমুদায়ের কথিত ভাষায় পরিচালিত হয়, অসংখ্যক বাখত দলে দলে এই সকল সভাসমিতিতে উপস্থিত হয়, এবং স্থানীয় ব্যাপার-সংক্রান্ত যে সমুদয় কার্যকরী আয়োচনা হয়; খাৎক, তাহাতে যোগদান করে। এখন তাহার আখ্যায় সহিত বৃদ্ধিতে আভাস করিয়াছে যে, এই যে বৃহৎ জাতীয় আন্দোলন, তাহা নাও ইহায় অংশ, এবং তাহাদেয়ও ভাল দিন আসিতেছে।

উপেক্ষিত জাতিসমূহও আশালোকের স্পর্শ অনুভব করিয়াছে, এবং তাহাদের নত-শির উত্তোলিত করিতেছে। এসেই অধিক হইতে অধিকতর স্পষ্টভাবে তাহাদের জননী জনভূমির গৃহপ্রাঙ্গণে তাহারা তাহাদের স্থান দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। কোনও কোনও আন্দোলন তাহারা আপনা-আপনিই স্বাধীন করিয়াছে, আবার কোনও কোনও আন্দোলন উচ্চতর জাতিগণের কাছ আঁকড়াইয়াছে। এই সমুদয় আন্দোলন তাহাদের মধ্যে একটা আশংকান-বোধ উদ্দীপিত করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা আজ জাগ্রত হইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহারা বহুকাল তাহাদের কর্তব্যকর্মে হেলা করিয়াছেন; এইরূপ বুঝিয়া তাহারা এই সকল উপেক্ষিত জাতিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এখন বৎসরের পর বৎসর এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে।

আজ উন্নত জাতিগণ বুঝিতেছেন যে, তাহারা যেমন কর্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই ফল ফলিয়াছে; তাই জ্বালের বিধানে সবকারী ও বেসবকারী ইউরোপীয়গণ এই সমুদয় জাতি বাহাতে "হোমরুল" এর বিরোধী হন; যে জন্ত তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই সমুদয় উপেক্ষিত জাতি এত দূর যে ঘৃণার সহিত ব্যবস্থিত হইয়াছে, সেই ঘৃণার উন্মেষ করিয়া তাহাদিগকে বল হইতেছে যে, যদি "ব্রাহ্মণ-শাসন" আবার ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহারা আবার সেই ভাবে বৃণিত হইবে। কুড়ি বৎসর আগ্রে এবং তাহারও পক্ষে আমি সাহসের সহিত হিন্দু-নরাজকে এই আসন্ন বিপদের কথা বিশেষ ভাষায় বলিয়াছিলাম। উপেক্ষিত জাতিগণকে অবহেলা করা হইয়াছিল—তাহার দৈখিতেছে যে, খৃষ্টান অথবা মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক, তাহাতে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর যে বিপদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে বিপদের কথাই আমি বলিয়াছিলাম। সেই অবধি কিছু কিছু কার্য হইয়াছে, কিন্তু যে নিম্নব্যপ্রয়োজন, যে দেশে

শিশুসাহিত্য হইয়াছে। সবস্তু তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, কেবল উচ্চতা জাতিগুলিই নহে; সকল জাতিই তুল্যরূপে অপরাধী। কিন্তু সে সাধনা ত সাধনা নহে, ইহাও হুঃখের কথা। বড়ই হুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে এখন বহুসংখ্যক লোক অতীতকেন্দ্রিয়। যাইতে ইচ্ছুক, এবং স্বদেশবাসী সকলের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য সমবেতভাবে কার্য করিতে ইচ্ছুক। মাতৃভূমির প্রত্যেক অন্তঃকর্তার—এখন এই সমুদয় উপেক্ষিত ন্যস্তানগণকে জননীবাধার গৃহে নিমগ্ন করিয়া লইয়া আসা একান্ত কর্তব্য।

শ্রীযুক্ত গান্ধীর সহায় অতি চমৎকার। জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির শাসন-সংস্থারের প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে অল্প এক অতি বৃহৎ আবেদন-পত্র প্রস্তুত হইল, এবং এই প্রস্তাবের তাৎপর্য সর্বত্র বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া লোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইল। এই চেষ্টার দ্বারা অতি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক প্রচারকার্য সম্পন্ন হইয়াছে। সকলে বুঝিতে পারে, এমন সাহিত্য খুব বিস্তৃতভাবে বিতরণ করিয়া মাত্রাজ প্রদেশে ক্ষেত্র বেশ সুন্দররূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রচার-সমিতি সবত্র প্রদেশে দেশের প্রচলিত ভাষায় হোম-সংস্কারের সরল ব্যাখ্যা সর্বত্র প্রচার করিয়াছে। গত বৎসর এই ভাবে গ্রামে গ্রামে কার্য করায় এই ফল হইয়াছে যে, প্রায় দশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্বাক্ষর দুইটি করিয়া লওয়া হইয়াছে, কাজেই “হোমরুল”র পুরুপাতী বহুসংখ্যক লোকের নাম আমাদের নিকট আছে—এই লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইবে, এবং ভবিষ্যৎ স্বাধীনতালভের জাতীয় বিরাট দল গঠিত হইবে।

ভারতবর্ষ কেন ‘হোমরুল’ চায় ?

দুইটি কারণে ভারতবর্ষ ‘হোমরুল’ চায়। একটি কারণ অন্তর্যম, তাহা প্রাণের কথা; আর একটি কারণ অত্যন্ত নরম, কিন্তু খুব গুরুতর। প্রথম কারণ এই যে, স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির জন্মসিদ্ধ দাবী; দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে যাহা সর্বপ্রথম স্বার্থ, এখন তাহা ভারতবর্ষের সমগ্র ব্যক্তিগত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের করতলগত, এবং ভারতবর্ষের নিজের সম্পদ, তাহার নিজের যে সমস্ত প্রধান প্রধান অভাব, তাহা পূরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমরবিভাগের জন্য ভারতের যে অর্থ ব্যয় হয়—ভারতবর্ষের জন্য নহে, সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে,—তাহার তুলনায় পৌরাসিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্যয় কত নগণ্য ?

(১) অন্তরঙ্গ হেতু।

(ক) জাতি কাহাকে বলে ?

প্রত্যেক জাতির আত্মসম্মান ও মহত্বের জন্য স্বায়ত্তশাসন আবশ্যিক। বৈদেশিকের শাসন দ্বারা জাতিকে বিকলাঙ্গ করে, তাহার চরিত্রকে অবনত করে এবং তাহার শক্তিকে ধ্বংস করে। অঙ্গ-আইনের দ্বারা কি না অনিষ্ট ঘটনা আছে? জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজা রামপাল সিংহ বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-শাসনে দেশের যে সমস্ত সুবিধা হইয়াছে, তাহা এক দিকে, আর অঙ্গ-আইনের অনিষ্টকারিতা আর এক দিকে রাখিয়া ওজন করিলে ঐ অনিষ্টকারিতাই অধিক হইবে। অঙ্গ-আইন ভারতের নৃশংসকে হুঁসল ও বিস্তৃত করিয়াছে। রাজা রামপাল সিংহ আরও বলিয়াছিলেন, “এই বিধান আমাদের প্রকৃতিকে অবনত করিয়াছে, নিয়তভাবে আমাদের সাময়িক শক্তিকে চূর্ণ করিয়াছে। সৈনিক ও বীরের জাতিকে ভীকৃত্যব মসীজীবী মেঘপালে পবিণত করিয়াছে। আমরা এই বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারি না।” মাহুদ সর্কদা অঙ্গশত্রু লইয়া চলা ফেরা করিতে পারে না বলিয়া যে একদম হইয়াছে, তাহা নহে; ইংলণ্ডেও কেহ সর্কদা অঙ্গ লইয়া বেড়ায় না—কিন্তু দেশবাসীর অঙ্গ-ব্যবহারের অধিকার কাড়িয়া লওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। স্বাধীনতা ব্যতীয়েকে কোনও জাতি বা কোনও ব্যক্তিবিশেষ তাহার শক্তির পূর্ণ বিকাশ-সাধন করিতে পারে না। ভারতবর্ষ ছাড়া এ কথা সর্বত্রই স্বীকৃত। ম্যাটসিনি যথার্থই বলিয়াছেন—“অগদীশ্বর তাহার চিন্তার একটি লিপি প্রত্যেক শিশুর দোলনার উপর লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেইটাই তাহার জীবনের বিশিষ্ট পথমার্গ। তাহার অপলাপ হইতে পারে না। অর্থাৎ তেঁাহার বিকাশ না হইলেই নয়।”

কারণ, জাতি বলিতে কি বুঝায়? এক একটি জাতি ব্রহ্মরূপ আদিত্যের একটি ফুল্লিঙ্গ—পূরমেঘের একটি একটি বিশিষ্ট অংশ জগতের মধ্যে নিঃসৃত হইয়া বহুগুণ্যক নরনারী ও শিশুকে এক জনসংঘে গ্রন্থিত করিয়া এক একটি আভির্ভূত শরীর গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যেক জাতির গুণসমূহ, তাহার শক্তি-সমূহ, এক কথায় তাহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা তাহাব প্রাণভূত সেই ঐশ-জীবনের অংশের উপর নির্ভর করে—সেই ঐশ-জীবন উহাকে আকতিমান করিতেছে, বিকশিত করিতেছে, বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছে, এবং উহাকে

একত্রে পবিত্র করিতেছে। জাতীয় জাতির ইচ্ছাশক্তি—একটা বিশেষ ভাব আশ্রয় করিয়া পৃথিবীর সেবা করা, যে বিশেষ ভাব রাখা করিবার জন্য ইহার প্রকৃতিগত বিশিষ্টতাব প্রয়োজন আছে—সেই বিশেষভাবে বিশ্ব-মানবের সেবা করাই জাতীয় জীবনের উপযোগিতা ও সার্থকতা। ইহাকেই মাটিনি তাহার “বিশিষ্ট পরমার্থ” বলিয়াছেন—জাতির জন্মকালেই ঈশ্বর তাহাকে সেই কর্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন। ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের পরমার্থ; পবিত্রতার ভাব পারম্পর্য, বিজ্ঞান মিশরের, সৌন্দর্য গ্রীসের, বিধি ঘোমের বিশিষ্ট পরমার্থ। কিন্তু মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ সেবা করিতে হইলে প্রত্যেক জাতি নিজের স্বাভাবিক অল্পবর্ধন করিয়া বিকাশ লাভ করিলে, নিজের জন্মবিকাশ-স্বাধীনতার ব্যবস্থা তাহাকে নিজের হাতেই লইতে হইবে। সে যাহা—ঠিক তাহাই, হইবে, অল্প কিছু হইবে না। একটা জাতির যাহা বিঘ্নমানবকে দিবার আছে, তাহা সম্পন্ন হইবার পূর্বেই সেই জাতির বিশিষ্ট জাতীয়তা যদি বিকৃত বা বিকাশে বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সমগ্র বিশ্বেই ক্ষতি।

(খ) স্বায়ত্তশাসনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

এই কারণে কোনও জাতি যখন স্বাধীনতার জন্ত বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, তখন সেই আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র স্বাধীনতা হইতে উদ্ভূত অধিকৃত স্বত্ব-সন্তোগের অধিকার লাভ করিবার দাবী নহে। এমন কি, তাহাও যদি হয়, তাহা হইলেও তাহাতে কোনও দোষ নাই; কারণ, স্বত্ব বলিলে জীবনের গুণতা বুঝায়, এবং সেই পূর্বভার উপযোগে একটি স্বাধীন দাবী। কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের দাবী বিশ্বমানবের সেবার জন্য নিজের প্রকৃতিব বিকাশসাধনের দাবী। এই দাবী অন্তরতম আধ্যাতিকতাব দাবী—নিজের যাহা সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ, তাহাই বিবক্ষে দান করিবার যে স্বেচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। কাজেই বিপদনাশি ইহাকে দমন করিতে পারে না, অকুটী ইহাকে ভীতিভয় করিতে পারে না, অকিঞ্চন স্বত্ব-সন্তোগের প্রলোভন ইহাকে তাহার স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করাইতে পারে না। পৃষ্ঠার ধর্মশাস্ত্রের একটা উক্তি—কিছু অল্পবর্ধন করিয়া এ সমস্তে প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় যে, সে তীত্র আকাঙ্ক্ষার সিদ্ধি হইতে করিয়, বলে, “একটা জাতি যদি সমগ্র পৃথিবী লাভ করে, কিন্তু

তাহার বিনিময়ে তাহার আত্মা হারান, তাহাতে তাহার মাতা ক'র তাহার শাস্ত্রার বিনিময়ে একটী প্রতিশ্রুতি কি দান করিবে? জুধ কই তাহা, বাহু তাহার মর্জিত স্বাধীনতা পাই, ভোগ বিলাসের সঙ্গী দাসকে প্রয়োজন নাই। "হোমরুস"-আন্দোলনের ইহাই প্রাণের কথা—কাজেই ইহাকে দমন করা যাব না, বিনাশ করা যায় না, ইহা সনাতন ও চিরন্তন। দক্ষতার যোজ্যেই এ সাম্রাজ্য-ভঙ্গ—তাহার অসম্ভব দাবী—কখনই ছাড়াইতে পারা যাইবে না।

(গ) জাতীয় বিকাশের অবরোধ।

দেশবাসিন্যের মননিনি জীবন পর্যবেক্ষণ করিতে, প্রত্যেক পুরুষ, প্রত্যেক স্ত্রী ও প্রত্যেক শিশুর চরিত্র যে বৈদেশিক শাসনের দ্বারা তদুপরি ও ছর্ব্বালীকৃত হইতেছে, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।—এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারত-বাসিগণ বড়ই বেদনার সহিত ইহা অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন।

সমকালী কার্যে দেশবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা-এতদে গোপাল কন্দলো বলেছেন—“বর্তমান শাসন-পদ্ধতির ফলে আমাদের জাতি দেশ-বাসিন হইয়া রহিতেছে। চিরজীবন আমরাই হীনতার আদর্শকেই দেখা-বাস করিতে হইতেছে। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রাচীনতম, তাঁহাদের মধ্যে নত হইয়া চরিতে হইতেছে—নহিলে শাসননীতির প্রয়োজন কি হইত।

উর্দ্ধমুখী প্রেরণা ইংলণ্ডের ইটন বা হার্ভার্ড বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে গান—এবং যাহার প্রভাবে এক দিন এক জন গ্রাভটোন, বা জন নেলসন, বা এক জন ওয়েলিংটন হইবে, এই উচ্চ আশা তদুপরিই পড়িতে থাকে। আমাদের তাহাতে অধিকার নাই।

বর্তমান শাসন-পদ্ধতির অধীনে আমাদের মনুষ্য যে পবিত্র উদ্দেশ্যে চলিতে সমর্থ, আমরা সে উন্নতি লাভ করিতে পারি না। ভারতবাসিন্যের জাতিসমূহ নৈতিক জীবনের যে মহত্ব অনুভব করিতে পারে, আমাদের তাহা অনুভব করিবার উপায় নাই। একেবারে অস্বাভাবিক কালে আমাদের পক্ষে শাসনের স্বতন্ত্রতা, আমাদের যুদ্ধ কলিয়ার স্বতন্ত্রতা নিশ্চয়ই তদুপরিই পড়িতে থাকে; তাহার পর পরের জন্ত কাঠ কাটা আর জল তোলাই হইবে। আমাদের ওখানে চিরস্থায়ী হইয়া উঠিবে।”

দাননীর শ্রীযুক্ত ভূপেননাথ বসুও ঠিক এই ভাবেই বলেছেন—
“আমরা-ভারত শাসনপদ্ধতি, যাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা প্রণীত হইয়া

চ্যাপ্তি—যদিও মজি ওয়াশিংটন চ্যাপ্তি ফেল্ডহুত, যাবতীচ চ্যাপ্তি ওব
 তাই দেব উইলিং, এই চ্যাপ্তি ওয়াশিংটন চ্যাপ্তি ওব
 মোকদ নক চ্যাপ্তি ওয়াশিংটন চ্যাপ্তি ওব
 দিতো—নাথ ষাণ্ডাইটে হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 ষাণ্ডাইটে চ্যাপ্তি ওব হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি

কুসংস্থি বয়োদেব ছায়াগণের প্রেই চর্ড সলসবীর উপদেশবানী এই
 প্রসঙ্গে হুচ ষাণ্ডাইটে, —শাসন ও শাসিতের মধ্যে যে মধ্য, সেই সর্বত্র যদি
 শাসিতের হীনতাবোধ ও দনতাপের দ্বারা কলুষিত হয়, তাহা হইলে সে
 শাসন-ব্যবস্থা কখনই স্থিতিশীল নিৰাপদ নহে। যাহাও এ দেশ ছাড়িয়া
 ভাবভরণে গমন করিতে হইতেছে, তাহাও ক্রমে জানি এই উপদেশটুকু
 বিশেষভাবে মুক্তি করিয়া দিতে চাই, তাহা যদি ঐ ভাবে কাজ করে, তাহা
 হইলে তাহাও ইংরেজের হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি

এই বিশেষ বর্ণনা ও পুনঃ পুনঃ বর্ণনা আসিতেছে। ভারতবাসিগণের
 আত্মদানবোধে দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া, ইহাও ঐ বিচার আবণ্ড বাড়িয়াছে।
 কিন্তু তাহাও এ দেশে সত্যগোপনই প্রেরণের বদ্বিধা বিবেচিত হয়।”

কর্তার বিচারের এই অবস্থা পাঠকগণের শিক্ষাদান হইতেই আরম্ভ হয়।
 শিক্ষার একতর ইংরেজ ও ভারতবাসী শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়,
 কাজেও তাহাই। চারিদিক দেখিতে পান, এতম ধর্মীয় ভারতবাসিগণের
 অতিক্রম-শক্তি ভূতীয় শ্রেণীর জনগণকে বিদেশী ঈশ্বরপাতিতেছে। বিদেশী
 তির তাহাও বহুদেব অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি
 হুচ ন. সিদ্ধা তামবা অধ্যাপ্তে বাইতেচি, বর্মান্তি

প্রকৃত কব। ইহার উদ্দেশ্য নহে, বেশ পোষ-মানা সমস্যা কৰ্মচারী শ্রেণী
করাই ইহার উদ্দেশ্য। উন্নত তেজস্বিতা, সাহস, আত্মসম্মানবোধ এ সকলে
উৎসাহ দেওয়া হয় না। বেশ পোষ-মানা 'গো-বেচার' হওয়ার ঙ্গাই ছা-
দিয়ে যথেষ্ট বেশ ভাষা ও বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের জন্ত পদার্থবোধ,
দেশহিতৈষণা, উচ্চাভিলাষ, এ সমস্ত বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হয়; তাঁর
বর্ষীয় আদর্শসমূহের পরিবর্তে বিলাতী আদর্শসমূহের গুণ-কীর্তন করা হয়;
বৈদেশিক শাসনের সুফল এবং নিজেদের কার্য-পরিচালনায় ভারতবাসীর
অক্ষমতা—সকল সময়েই উপস্থিত হয়। এই প্রকারে যে সমুদয় বাস্তব শিক্ষা
করে, তাহা যথেষ্ট বড় হয়, তখন তাহা যথেষ্ট মতলব-বাক্স ও চাক্ষুস হইয়া পড়ে,
ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহারা যখন দেখে যে, তাহাদের জাতিসমূহ
উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিফল হইতেছে, তখন অত্যন্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে, এবং সাধারণের
স্বার্থ-সুবিধা সম্বন্ধে আরো বিবেচনা করে না।—তাহারা যখন এই কথাটা
তাহাদের হৃদয় যখন কোমল থাকে, সেই সময়ে তাহাদের হৃদয়ে এমন কার্য
মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হয় যে, তাহারা সেই জিনিসটা অমূল্যবই করিতে পারে
না, যাহাকে এসকিথ সাহেব "বৈদেশিক শাসনের অসহনীয় অবস্থান" ব
লিয়াছেন।

(ঘ) ভারতবর্ষের দাবী।

এই শাসন ভাল কি মন্দ, ইহা আরো বিচার্য্যই নহে। ইংলণ্ড ইংরাজ
শাসনের সাফল্য অপেক্ষা জর্জরিত জর্জর শাসনের সাফল্য চেব বেশী। জর্জর
ভাল থাইতে পাইত, তাহাদের আমোদ-প্রমোদ ও বিজ্ঞানের অবকাশও বেশী।
ইংলণ্ড অপেক্ষা সেখানে দারিদ্র্যের পেষণও কম। কিন্তু তাই বলিয়া কি ইংলণ্ড
ইংরাজ ইচ্ছা করে যে, ইংলণ্ডের যত বড় বড় পদ জর্জর আশিয়া দখল করুক?
কেন তাহা করে না? কারণ এই যে, বৈদেশিক শক্তির দাসত্ব যতই ভাণ হউক,
স্বাধীন মানবের জর্জরিত আত্মসম্মানবোধ ও বহু-বোধ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী
না হইয়া থাকিতে পারে না। বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে বিষ্টার এসকিথ বলিয়া
ছিলেন,—এ প্রকারে অবস্থা "ধারণাতীত এবং অসহনীয় হইবে।" অতঃ
তাহা হইলে এই পদ্ধতি এ কালে এই ভারতবর্ষে একমাত্র "ধারণাযোগ্য" পদ্ধতি
হইল কিরূপে? কেন সমুদয় ভারতবাসী কর্তৃক ইহা 'অসহনীয়' বলিয়া অনুভূত
হইবে না? কারণ এই যে, শিষ্টকাল হইতে এই ভাবের মধ্যে লালিত পানি

হওয়া, 'সাহো নোকেরা স্বাভাবতঃই আমাদের অপেক্ষা বড়', এই ধারণা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট এই হইয়াছে যে, ইহা স্বাধীন মানবমাত্রেরই সাবল্য ও আত্মত্ব হইবার যে সহস্রাত অধিকার, তাহা হইতে ভারতবাসিগণকে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয় পরিচ্ছদ, ভারতবর্ষীয় বাস, ভারতীয় জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, ভারতীয় আচার-নিয়ম, এ সমস্তই নিম্নস্তরের দৃষ্টিয়া বিবেচিত হয়; ভারতের মাতৃভাষা ও ভারতের সাহিত্যের দ্বারা লোকে পণ্ডিত হয় না। ভারতবাসিগণ ও ইংরেজগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লন যে, প্রত্যেক জাতির যাহা স্বাভাবিক অধিকার, ভারতবাসীদের তাহা নাই। ভারতবাসিগণ তাহাদের দেশের শাসনের সমগ্র অধিকার দাবী না করিয়া দেশ-শাসনে আর একটু বেশী অধিকার ভিক্ষা কবে, এবং তাহাদিগকে কিছু বর বা সুবিধা দিলে ইংরেজ আশা কবে যে, তাহারা কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। যেন যুটেনেবই অধিকাৰ—সে যি দিবে। সমস্ত ব্যাপারই উদ্ভাস্ত, বিপর্যস্ত ও অযৌক্তিক। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, ভারতের চক্ষু খুলিতেছে। ভারতের অধিবাসিগণের মধ্যে এখন লক্ষ লক্ষ লোক 'উপলব্ধি' করিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ, নিজের দেশে মানুষমাত্রেরই যে স্বাধীনতার অধিকার, তাহা তাহার আত্ম, তাহার নিজের দেশের কাজকর্ম পরিচালন করিবার অধিকার তাহার আছে। 'আমি ভারতবর্ষ জাহ্নু পাতিয়া বলিয়া বরভিক্ষা করিতেছে না, এখন আমার উপর দাঁড়াইয়া তাহার অধিকার দাবী করিতেছে। আমি এই সব প্রচাৰ কবি বলিয়া ভারতপ্রবাসী ইংবাজেরা আমাকে ভুল বোঝে, এবং আমাকে রাজদ্রোহী বলে; আমি এই সব শিক্ষা দিয়াছি বলিয়াই আজ আমি এই জাতীয় মহানীতিব সভানেত্রী।

মনে হইবে যে, এ ভাষা বড় তীব্র; কারণ, স্পষ্ট সত্য কথা ভারতবর্ষে সাধারণতঃ বলা হয় না। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রত্যেক ইংবাজ নিজের দেশের জন্ত এইরূপ অল্পভব কবে, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বদেশের জন্ত এইরূপ অল্পভব করা উচিত। এই সেই স্বাধীনতা, যাহার দ্বারা মিত্রশক্তিগণ যুক্ত করিতেছেন—ইহাবই নাম প্রজাতন্ত্র, ইহাই এ যুগের কালশক্তি। ইহা ঠিক তাঁহাই, যাহা প্রত্যেক প্রকৃত ইংবাজ যেমন দাবী করিবে, ভারতবর্ষে এমনই ইহা ভারতের জাতি দাবী বলিয়া অনুভব করিবে। ভারতবর্ষে ফল এই অধিকার পাইবে, তখন ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের নথক-বন্ধন পরস্পরের প্রতি প্রেম ও

সেবা-বিনিময়ের স্বর্ণতন্তুতে পরিণত হইবে—বৈদেশিক দাসত্বের গোহরজু ভাঙা ধসিয়া পড়িবে। আমরা একত্র পাশাপাশি বাস করিব, এবং কাজ করিব, কোনরূপ অবিশ্বাস বা অপ্রীতি থাকিবে না—একই দক্ষ্য লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন কাজ করে, তিক সেইরূপ। আর সেই মিলন হইতে সর্বোৎসাহ শক্তিমূল সাম্রাজ্যের বা গণতন্ত্রের উদ্ভব হইবে; পৃথিবী তেমনটি কখনও দেখে নাই; আর ভগবানের ইচ্ছায় সুসমর হইলে তাহারাই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে।

(২) গোণ হেতুসমূহ।—(ক) সাফল্যের পরীক্ষা।

‘হোমরলে’র জ্ঞাত এখন যে দাবী করা যাইতেছে, তাহার গোণ কারণগুলি সংক্ষেপে সরল ভাষায় এই ভাবে বলা যায়।—“বর্তমান শাসনপদ্ধতি গোণ ব্যাপারসমূহে এবং ইংরাজের স্বার্থসংপৃক্ত বিষয়ে সুখলগ্রস্থ হইলেও, যুগ্য ব্যাপারে, অর্থাৎ যাহার উপবে দেশের লোকের সুখ, জীবন ও সুখ নির্ভর করিতেছে, সে সমুদয় ব্যাপারে সফল নহে।” বাহিষের ব্যাপারগুলির প্রতি চাহিয়া—যেমন বাহ্য শুল্কনা, ডাকনর, টেলিগ্রাফ—অবশ্য যে স্থলে রাজনীতির আন্দোলনকারীদের কোনও সম্বন্ধ নাই—সেই সব ব্যাপার—এবং রাজস্বের গোহবল প্রভৃতি দেখিয়া, বৈদেশিক ভ্রমণকাবিগণ—একটা অদ্ভুত দেশ দেখিবার প্রত্যাশায় এ দেশে আসিয়া—বিস্মিত হন, এবং প্রশংসা করেন যতঃ, কিন্তু তাঁহারা যদি দেশবাসিগণের জীবন দেখিতেন, মাসে ২৫ টাকা বেতনভোগী জীবনসংগ্রামে বিব্রত ও সন্তান-সন্ততিব শিক্ষার জন্ত ব্যাকুল কেরাণীমূলকে দেখিতেন, মিনে একবার কবিয়া, থান—এই প্রকারের মনজীবীগণকে যদি দেখিতেন, যে কুটীরে তাহারা বাস কবে, সেই কুটীরসমূহ যদি দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তা করিবার হেতু পাইতেন। আর শিক্ষিত লোকেরা যদি অসন্তোষে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তীর অসন্তোষ দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এ সমুদয় বেশ স্পষ্ট ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—

“এ দেশে ইংরেজশাসনের যে বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার প্রাথমিক সর্গ-সমূহের মধ্যে একটি এই যে, ইহাকে ক্রমিক উন্নতিমুখী শাসনব্যবস্থা হইতে হইবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক চিন্তাশীল লোক—তিনি যে সমাজেরই হউন—এ কথা স্বীকার করিবেন। এখন আমি এই শাসনব্যবস্থা উন্নতিমুখী

কি না, এবং ইহা ক্রমিক উন্নতিযুক্ত কি না, তাহা নিরূপণ করিবার দায় চাৰিটি প্রমাণ প্রয়োগ কবিত্তে অমরোধ করিতেছি। প্রথম প্রমাণ, যাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই,—সমুদ্র জনশ্রেণীর নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সরকার কি কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? অবশ্য এই সমুদ্র বলিতে আমি আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার সেই সব উপায়গুলি ধরিব না, যাহা সরকারকে নিম্নের অভিজ্ঞতার জন্যই প্রবর্তন কবিত্তে হইয়াছে—তবে সেগুলি আনুমানিকরূপে জনশ্রেণীর উপকার করিয়াছে—যেমন রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ও এই প্রকারের অন্যান্য ব্যবস্থা। সর্বসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির উপায় বিধান বহিতে আমি ইহাই জানিতে চাই যে, শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার কি করেন? স্বাস্থ্যরক্ষার দায় কি করেন? কৃষির উন্নতির দায় কি করেন? ইত্যাদি। ইহাই আমার প্রথম প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ বাহা আমি প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা এই—আমাদের স্থানীয় বাণিজ্যের পরিচালনার অধীকৃত নিউনিঙ্গিপাসিটি ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে আমাদের অধিকার বাড়ানো দেওয়া সম্বন্ধে সরকার কি করেন? তৃতীয় প্রমাণ এই,—যে লিট-পরিষদে রাজ্যশাসনের নীতি স্থিৰীকৃত হয়, সেই পরিষদে সরকার আমাদের কি অধিকার দেন? গরিবের যামাদের বিবেচনা করিতে হইবে, ভারতবাসীরা কত দূর পর্যন্ত সরকারী কর্মের উচ্চপদের অধিকারী?”

(৭) গণতন্ত্রের পরিবর্তন আবশ্যিক—সরকারী কর্মচারীগণ।

এগুলির—গোখলের প্রমাণ এবং প্রমাণগুলি—সমাধান ভারতবাসীগণ নিজেদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে কবিত্তে পারে। কিন্তু এই সমস্ত পরীক্ষার দ্বারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে, এই কথাটা এখানে বলা দরকার যে, এখানে মানুষের নিন্দা করিবার দরকার নাই, ইংরাজের জায়গায় ভারতবাসীকে বসাইতে হইবে না, সমগ্র পদ্ধতিটাই বদলানো দরকার। দায়িত্ববিহীন শক্তি হাতে পাইলে খুব ভাল লোকও খারাপ হইয়া যায়, ইহা একটা খুবই সাধারণ সত্য। যেমন বার্নার্ড হাউটন বলেন যে, “দশাশি শক্তি অনেক উন্নততর সংস্কারকেও কলুষিত করে।” সরকারী কর্মচারীগণ বেশ সরল প্রাণেই এই বিশাশে আসিয়া উপস্থিত হন যে, যাহারা এই পদ্ধতি বদলাইতে চায়, তাহারা রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিতে চায়। রাজ্য জানিতে উৎসাহ নিজেদেরই বৃদ্ধি, কাজেই উৎসাহের সমালোচনা করিলে তাহা

রাধাগোহ বসিয়া বিবেচিত হয়। এই প্রকারেই বটনা ইতিহাসে সুপরিচিত—
ভারতবর্ষে ইতিহাসের কেবল পুনরাবৃত্তিই হইতেছে। পূর্বোক্ত লেখকেরই কথা উদ্ধৃত করিতেছি। আমি আমার নিজের কথায় এলার চেয়ে
তাঁহার কথায় থাই বেশী সঙ্গত মনে করি—আমাব বাহা মত, তিনি ঠিক
আমাই প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমি যেমন পক্ষপাতভূত বলিয়া বিবেচিত হই,
তিনি অবশ্য সেদিক বিবেচিত হইবেন না। উক্ত লেখক মধ্যমশিল্পী ভাব
নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

“তিনি (সরকারী কর্মচারী) বহু বৎসরের অভ্যাসে ফলে কার্যাবিব্যক্তি-
প্রেরণ, বিচারণা দাখিল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যে বেশ হ্রদশক্তি হইয়াছেন। এই
কাজগুলি তাঁহার মস্তিষ্কবৃত্তির চান্দা-পোড়েন বলিলেও হয়। তাঁহার নিজে
কোনও ধারণা নাই, কেবল অপরকে ধারণার প্রতিবিম্ব আছে। অপরিচিত
কোনও সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইলে তিনি তৎপ্রতি বিরক্তি ও অস্বস্তি ভাব প্রকাশ
করেন।” কাজ হাতে করিয়া সর্বদা কাজ করিতে কবিতা বলের সন্ধানটাই
কাজ ও কালের চাকচিক্যময় স্বর-প্রত্যয়গুলির শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমন্বয়ময়
চালনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা যিনি মনে করেন—তিনি তাঁহার এই প্রবাসকে
আমি কি দেবা করিতে পারেন? তিনি প্রতিজ্ঞারূপে হইয়া বসিয়া থাকেন।
যেন তাঁহার এই বিশিষ্ট কালের চাকার দয়গুলি বেশ উজ্জল ও দৃঢ় থাকে, এবং
নিঃশেষে কাজ করে, এবং চাকার ঘূর্ণনের ব্যতিক্রম হইতে উৎপন্ন কোনরূপ
কোণাকল যেন একেবারেই না হয়। কাজেই কিছুদিন পরে তিনি জাপিসের
জানালার সোজা ছিদ্র দিয়া যে সমগ্র জগৎ দেখিবেন, ইহা মোটেই অস্বাভাবিক
নহে। কাজেই যখন কোনও নূতন প্রস্তাব সম্মুখে তাঁহাকে দস্তাবেজ প্রকাশ
করিতে হয়, তখন সেই প্রস্তাব জনসাধারণের জীবনের পথে বিরূপ প্রত্যয়
বিস্তার করিবে, তাহা সমুখে রাখিয়া তিনি বিচার করিতে পারেন না। আমায়
তত্ত্বের-ইহাতে কি-সুবিধা অসুবিধা হইবে, এবং তাহাদের প্রতিপত্তিরই বা কিরূপ
হ্রাস বৃদ্ধি হইবে, তাহাই সমুখে রাখিয়া তিনি কবিতা কবিতা বর্ণনা
সেকালের মঠাধ্যক্ষের মত অথবা ইংলণ্ডের বাঁটা গ্রাম্য/জমিদারের মত তাঁহার
সাধারণ জনগণের প্রতি একটা কক্ষপাত ভাব থাকে, এবং তাহাদের মস্তকের
সাধারণভাবে মনোযোগী হইবার তাঁহার ইচ্ছা ও আগ্রহও থাকে,—যদি তাহারা
কোনরূপ নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ না করে, যদি তাহারা নিজেদের
প্রতিষ্ঠার জন্য কোনরূপ চেষ্টা না করে, এবং তাঁহার ও তাঁহার জাতির দক্ষি

কোনরূপ বিচ্ছিন্নতাচরণ না করে। এই যে সূত্র, ইহার অনেক তাৎপর্য আছে। নিজের সিদ্ধান্তকে একরূপ ভগবানের বিদ্বান্তের মত বিবেচনা করায়, এবং তিনি নিজের যে আমলা-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত, সেই আমলা-তত্ত্বকে একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান-রূপে বিবেচনা করায়, বাহিরের সাধারণ লোক যতক্ষণ নিজ নিজ কর্তব্য নীরবে ও শান্তভাবে পালন করে, বাজ্যের বড় বড় ব্যাপার লইয়া কিছু না বলে—ততক্ষণ তিনি তাহাদের প্রতি মনন। রাজ্যের বড় ব্যাপার সম্বন্ধে কথা কওয়া তাহাদের পক্ষে অতি ভয়ানক অপরাধ। সরকারী কর্মচারিগণের কার্যের মঙ্গল সমালোচনা আবণ্ড গভীবন্তর স্থান স্পর্শ করে। কোনও কর্মচারীই তাহা বাক্যন্তন কর্মচারীকে কোন সমালোচনাই সহ্য করিতে পায়েন না—সাধারণ লোক ত গভীর বাহিরে অন্ধকারে অবস্থিত, তাহারা ত তাহার মতে তাহার অধস্তন কর্মচারীদেরও সম্বন্ধ নহে। আচ্ছা, তাহা হইলে যখন সাধারণ লোকে দায়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে যে, এই উন্নতনাম আমলা-তত্ত্বের পরিশ্রম সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপার এই সর্বোত্তম জগতে ঠিক সর্বোত্তম মতে, তখন কেমন করিয়া দৈর্ঘ্যের সহিত তাহারা তাহা শুনিবেন? আর তাহারা যদি এমন কোনও সংস্কারের কথা উপস্থাপিত করেন, যাহা কখনও তাহা বা তাহার মন্ত্রদায়ের মনে উদ্ভিত হয় নাই, এবং যে সংস্কারের সহিত তাহার চিরপোষিত আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কি বলিবেন, তাহা বলাই বাহুলা। দেশশাসন করা এই আমলাগণের কাজ। শাসনের পবিত্র রহস্য কেবল তাহারাই দীক্ষিত। শাসন-যন্ত্রের রহস্যময় কর্মপ্রণালী কেবল তাহারাই বুঝেন। সাধারণ বাহিবের লোকে বড় জোরে বিনীতভাবে হুই একটা প্রার্থনা জানাইতে পারে, কিন্তু তাহা বশী নয়। বাহারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে, বা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে, তাহাদের মূর্ততা ও ভ্রান্তি তাহাদের দণ্ডেরই সমতুল্য। যেন কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহাদের শিক্ষকের নিকট চিরদিনের ব্যবস্থাপত্রের পরিবর্তন করিতে বলিতেছে, অথবা পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বদলাইবার জন্য অহরোধ করিতেছে। এই সকল কর্মচারিগণ মানবোচিত স্বাধীনতাকে বাজ্যদোষিতা বলিয়া মনে করেন; দেশে হুই রক্ত স্রোত খাটিতে পারে—এক বিদ্রোহী অথবা নিবীহ মেঘ, তাহারা ইহা ভিন্ন আর কিছু কল্পনা করিতে পায়েন না।”

এই আমলা-তত্ত্বের ফল সম্বন্ধে অন্ত্যস্ত উদ্ধৃত মত প্রথম পরিশিষ্ট প্রদেয়া।

(গ) বেসরকারী ইঙ্গ-ভারতবানী ।

এই সকল উচ্চ রাজকর্মচারিগণ যে জাতির লোক, সেই জাতিই অল্পসংখ্যক, কিন্তু শক্তিশালী এক দল লোক ভাবতবর্ষে বাস করায় সমগ্র ভারত ব্রিটিশ হইয়া গড়িয়াছে। ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা এ দেশে ১২২৯১২; আর ব্রিটিশরাজ্যের লোকসংখ্যা ২৫ কোটি ৫০ লক্ষ। আর প্রবলবিস্তারপরিমাণে ব্রিটিশ প্রভাবে প্রভাবিত দেশীয় রাজ্যেব লোকসংখ্যা ৭ কোটি। নাথায়গতঃ এই বেসরকারী দল রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননা; তাঁহারা অল্প কার্যে ব্যস্ত; কিন্তু জাতিব পক্ষে সত্য সত্য কল্যাণকর কোনও সংস্কারের কোনও আশা যখন ভাবতবাসিগণের হৃদয়ে জাগ্রত হয়, সেই সময়ে তাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এ বিষয়ে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—“শাসক জাতিব যে সমুদয় লোক অর্থোপার্জনের জন্য বিদেশে যায়, তাহাদিগকেই সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রমাণশাসনে সম্বৃত রাখা বরকার। তাহারা রাজ্যশাসনের প্রধান অন্তরায়সমূহের মধ্যে অন্যতম। উচ্চপদবীর প্রতিপত্তির অস্ত্রে মজ্জিত হইয়া, বিজেহুজাতি-হুমত ধূণাপূর্ণ দণ্ডের দ্বারা হৃদয় পূর্ণ করিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য শক্তির দ্বারা যে সমুদয় হৃদয়ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহারা সেই সমুদয় পোষণ করে, কিন্তু তাহাদের কোনরূপ দায়িত্ববুদ্ধি থাকে না।

এই ভাবে আর মন লয়েম লিখিয়াছিলেন,—“এই সমস্ত ব্যাপারে জাতিব পক্ষে কার্য করিবার পক্ষে বাবা ভারতসরকারের খুব বেশী। দেশের লোকদের সাহায্য করিবার জন্য যদি কিছু করা হয়, বা করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে চাষি দিগকে একটা অসন্তোষের দৃষ্ট দমন উপস্থিত হয়; সেই পক্ষেরই প্রতিদ্বন্দ্বি ইংলণ্ডে জাগ্রত হয়, এবং সেখানে সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। আমি সবরে সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গড়ি। ভাবেব রাজেন সকলেই জ্ঞানপরতা, মিতব্যবহার প্রভৃতি সাদৃশ্যবলীর পক্ষপাতি, কিন্তু এই সকল নিধান যখন এমন ভাবে কার্যে পরিণত করিতে যাওয়া যায় যে, তাহাতে কাহারও স্বার্থের আঘাত লাগে, তাহা হইলেই তাহাদের মত পরিবর্তিত হইয়া যায়।”

সদাজীব সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সমানভাবে ব্যবহার করার বিশাল সম্বন্ধে কীদ বলা—“কিন্তু ভাবতবর্ষে এই নীতিব প্রয়োগ করিতে গেলেই যে অসমস্যাক স্বৈরাচার উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছেন, সেই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে

প্রতিবাদ জাগিয়া উঠে। এই যেতাদি নশ্রাদ্য, এমন কি, শাসনব্যবস্থার সহিত
জাহেদেব কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, নশ্রাদ্য হিসাবে তাঁহারা যে উচ্চ, এইরূপ
দাবী করেন—অবশ্য ইহা অনেকটা স্বাভাবিক যে, যে দেশে জাতিভেদপ্রথা প্রবল
—সে দেশে শাসকগণের স্বতন্ত্রীয়গণ, লর্ড লিটন যাহাকে এক প্রকার যেতাদি
ক্রোধন বলিয়াছেন, তাহাই হইয়া পড়িবে, এবং ইহাও নিশ্চিত যে, কার্যতঃ জাতির
গর্ব ও পাণ্ডিত্য ন্যতাতাব অধিকার তাঁহাদের মধ্যে ‘আনরা উচ্চ’ এই প্রকারের
একটা ভাব জাগাইয়া দেয়। এই ভাবটি যখন আত্মপ্রকাশ করে, এবং উচ্চ-
কর্মচারী হওয়ার যে দাবি, সেই দাবিভাব-বহনের দ্বারা যখন তাহা কিছু
কোন হইয়া গড়ে, সে সময় ইহা বড়ই অশোভন, এমন কি, বিপজ্জনক হইয়া
উঠে। লর্ড উইলিয়াম বেটিন্সের সময় এই ভাবটা খুব বেশী রকম উদ্ভীষ্ট
হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে, যে দলের কথা বলা হইল, সে বন্ধে লোকসংখ্যাও
খুব বেশী ছিল না। আর, তাঁহাদের জেমন প্রতিপত্তিও ছিল না। কিন্তু
এখন ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী, এবং কলিকাতার ও লন্ডনের খবরের কাগজ-
গুলির সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাঁহারা তাঁহাদের জায়ের জালা অপরকে বেশ
উদারিতে পারেন।”

লর্ড বিপ্লবের সহায়ত্বীপূর্ণ শাসনের সময় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের
বিক্ষেপে জ্ঞানানুষ্ঠান আন্দোলন উপস্থিত হয়। আত্ম আবার সেই প্রকারের
নটনা উপস্থিত। আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজ মেল, কলিকাতার ইংলিশমান,
প্রমাণের পক্ষে নীরস ও লাহোবের মিডিল-মিগিটারী গেজেট, লন্ডনের সংবাদ-
পত্রের—টোরী ও ইউনিয়নিষ্ট সহযোগিত্বের নেতৃত্বে, এবং যে সকল সমকারী
ও বেসমকারী ম্যাংলো-ইন্ডিয়ান অকসব লইয়া ইংলণ্ডে বাস করিয়াছেন;
তাঁহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সভাগুলি অধুনা-প্রস্তাবিত সংস্কার-প্রস্তাবে
প্রবিশেষে বাধা দিতেছে। আনরা জানি যে, ইংলণ্ডে অধিবাসিবৃন্দের চিত্তের
উপর তাহারা ক্রিয়া করিতে না পারিলেও এই প্রতিবন্ধকতা, স্বাধীনতার জন্ত
এ দেশে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার এক অন্তরায়। ইংলণ্ডে যে এই চেষ্ঠা
বিফল হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ দেশে রাখার
আশাশে সংস্কার হইলেও তাহার ভাবের হ্রাস করিবার চেষ্ঠা করিবে,
এবং তাহা যাহাচে, বিফল হয়, তাহারও চেষ্ঠা করিবে। এই প্রকারে মিটো-
নর্দে সংস্কারের উপযোগিতা নষ্ট হইয়াছে, এবং এখন হইতে খুব সম্ভব না
হইলে জাতীয় সহাসমিতি ও মুসলমান-সমিতির প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া যখন
জাইন বসিত হইবে, তখনও তাহারা এইরূপ চেষ্ঠা করিবে।

(ঘ) ইংলণ্ডের উপর প্রতিক্রিয়া।

এই যে ইংরাজনীতিবিরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় শাসনপদ্ধতি, ইহা বাম ইংল্যান্ডে যে কি ভরানক অতি করিতেছে, তাহার বিচার না করিয়া নিরস্ত থাকি যাহা ন মিষ্টান বেসন দেখাইয়াছেন,—

“যেমন আমাদের স্বাধীন স্বাধীনশাসনপ্রাপ্ত উপনিবেশগুলি আমাদের একটা আশা ও উৎসাহ দান করিয়াছে, এবং স্বাধীনশাসন ব্যাপারে কৃতবুদ্ধি প্রভাব করায় ও স্বাধীনতা ও সাম্যের ভাব কল্পনের চারাব মত তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ও পোষণ করায় গ্রেটব্রিটেনেও জনশ্রেণীর মধ্যে মহাভিলাষ জাগাইয়া দিয়াছে, সেইরূপ যথেষ্টাচারের সহিত শাসিত আনাদের অধীন দেশগুলি যাহা সেই দেশের লোকের চরিত্র একবারে নষ্ট করিয়া দিতেছে। তাহাদের মধ্যে হীন ক্রীতদাসোচিত অভ্যাসসমূহ ধন ও উচ্চপদবীর প্রতি অত্যধিক প্রশংসার ভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে; এই ভাবগুলি মধ্যযুগের অভিজাত-তন্ত্রের বৈষম্যের কলুষিত নিদর্শনের দায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কবডেন আমাদের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশ জোরের সহিত এই প্রশ্ন উপস্থিত করেন: ‘যেমন গ্রীস ও রোম এমিয়ার সহিত সম্পর্কে আসিয়া আত্মদ্রষ্ট হইয়াছিল, সেই রূপ প্রাচ্যদেশে যথেষ্টাচারপূর্ণ যে সমস্ত রাজনীতিক বিধানের প্রবর্তন করা হইতেছে, সেইগুলি আমাদের দেশের শাসন-ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিয়া কলুষাঙ্গিক ও কলুষিত করিতে পারে, ইহা কি খুব সম্ভব নহে?’ এই প্রতিবাদ কেবল সম্ভব নহে, অবশ্যসঙ্গী। আমাদের সাম্রাজ্যের যথেষ্টাচারের সহিত শাসিত অংশের পরিমাণ যে পরিমাণে বাড়িতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশের অধিকতর সংখ্যক লোক আমাদের উগনিবেশে, আশ্রিত রাষ্ট্রে ও ভাবভ্রাম্রাজ্যে সৈনিক ও দেওয়ানী কর্মচারীর কাছ করিয়া যথেষ্টাচারের শক্তি ও তদুপযোগী হৃদয়বৃত্তিতে অভ্যস্ত হইতেছে; ব্যবসায়ী, নীলফর, চাকর, গৃহস্থিভাগের বড় ও ছোট কর্মচারী প্রভৃতির দ্বারা ইহাদের সংখ্যা আশঙ্ক্য বাড়িয়া যাইতেছে। ইহা বা মাধবন ইউরোপীয় সমাজের সুন্দর দৃষ্টান্ত সংস্কার বাহিরে এক উচ্চশ্রেণীর আতির মত কৃত্রিম ধীবন গঠন করিয়া দে চবির, চিঙা ও ভাব সেই বৈদেশিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহাই লইয়া দেশে ফিরিয়া আসে।”

যাহারা ইণ্ডিয়ান সিভিল-সার্বিসের লোক, তাহারা বিদেশী বক্তা এবং তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়; তাহারা পথ ধরন তাহারা দেশে ফিরিয়া যান, ওয়া

প্রশ্নেই যে, এখানে যে সমস্ত কলুষস্বর প্রভাবের মধ্যে থাকেন, তাহার কাজে তাঁহারা দেশেও বিদেশী হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা যখন তাঁহাদিগকে ইচ্ছা মাতের মত আমদানী করি, তখন আমাদের অল্পবিধা হয়; আবার যখন এখানে গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাদের দেশে চালান করি, তখন তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া-প্রবণ মনোবৃত্তি ও স্বভাবের জন্য তাঁহারা খেটব্রিটেন ও ভাবতবর্ষ উভয় দেশেই ক্ষতি করেন। ইহাব ফল উভয় পক্ষেই অসন্তোষজনক।

(ঙ) প্রথম প্রশ্নের প্রয়োগ ।

এখন গোথলের প্রথম প্রশ্ন প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এই আমলা-তত্ত্ব শিক্ষা, শাস্ত্র ও কৃষির উন্নতির জন্য কি করিয়াছে? আনি তথ্যগুলি স্ব-সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিব; কিন্তু এই তথ্যগুলি অকাটা।

শিক্ষা।—যে সমস্ত বালকবালিকা শিক্ষা পায়, তাহাদের হার সমুদয় লোকসংখ্যার তুলনায় শতকরা ২০.৮। মিষ্টাব গোথলে ছয় বৎসর পূর্বে তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার পর এই হার শতকরা ১.৯ বাড়িয়াছে। কিন্তু এই যে শতকরা হিসাব, ইহাও ভ্রমোৎপাদক শিক্ষাবিষয়ক বিশেষরূপণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বালকবালিকাগণকে চারি বৎসরের কম সময় পড়াইলে তাহারা ঐ সময়ে যাহা শিক্ষা করে, তাহা ভুলিয়া যায়। ১৯১৫—১৬ খৃষ্টাব্দের শিক্ষা-বিষয়ক সংখ্যা-তালিকায় (ইংরেজ-মাসিক-ভারতবর্ষ) আসবা দেখিতে পাই যে, ৬,২৩০,৬৬৮ বালক ও ১,১২৮,৩৬৩ বালিকা, একুনে ৭,৭৬১,০৩১ বালকবালিকা শিক্ষার্থী ছিল। ইহার মধ্যে ৫,৪৩৫,৫৭৩ নিম্ন প্রাথমিক পর্য্যন্তও পড়ে নাই। আবার ইহার মধ্যে ১,৪৮০,৬৬১ পড়িতেই গেথে নাই। সমগ্র সংখ্যা হইতে যদি এই সংখ্যাটিকে বাহ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র ২,০২৭,৪৫৫ বালকবালিকা এমন শিক্ষা পাইতেছে, যাহা তাহাদের কাজে লাগিবে—ইহাতে শতকরা হিসাবে ৮.৫ মাত্র। কি ভয়ঙ্কর কথা! ৫৫ লক্ষ বালকবালিকার বিজ্ঞানভের জ্ঞান যে টাকাটা খরচ হয়, তাহা ব্রহ্মোপাসাগরের জলে ফেলিয়া দিলেও চলে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষে, যে সমস্ত বালকবালিকার বিজ্ঞানগণে যাইবার বয়স, তাহাদের সমগ্র সংখ্যা শতকরা ২০.৪ অংশ বিজ্ঞানগণে যাইত।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাবে হাজরাছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ছিল। মাৰ্চ চার্লস উড ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যে শিক্ষা-বিষয়ক নিদেশপত্র প্রচার

করেন, তাহার দ্বারা শিক্ষাবিভাগ গঠিত হয়। শিক্ষাবিভাগ-গঠনের ৫৯ বৎসর
পরে এই ফল হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটা শিক্ষা-আইন প্রবর্তিত হয়।

যে সময়ে ইংলণ্ডের শিক্ষা অবস্থা যেদূর ছিল, এখন আমাদের অবস্থা তদনেকট
সেইরূপ। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রধানতঃ ধর্ম্মযাজকগণের অধীন বিদ্যালয়সমূহ
নির্ম্মিত সাহায্যদান আরম্ভ হইয়াছিল। ১৮৭০ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে
অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। বার বৎসরের মধ্যে ৩০.০
হইতে শতকরা ১০০ জন পড়িতে আরম্ভ করে। এখন ইংলণ্ড ও ওয়েলসের
লোকসংখ্যা চার কোটি, আর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ।

আপানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, যে সকল বালকবালিকা বিদ্যালয়ে দাইশার
বয়স আছে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২৮ জন অর্থাৎ আমাদের হার অপেক্ষা
শতকরা ৮ জন বেশী বিদ্যালয়ে যাইত। ২৪ বৎসর পয়ে এই হার ২২ এ
পরিণত হয়। ২৮ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক জখা
সার্কজনীন হইয়াছে। বয়োদার শিক্ষা অবৈতনিক, এবং অনেকটা বাধ্যতামূলক
মূলক; সেখানে শিক্ষা সার্কজনীন। ত্রিবার্ষিকে শিক্ষাপ্রযোগী বয়সের বালক-
গণের শতকরা ৮১.১ ও বালিকাগণের ৩৩.২ জন বিশাশিক্ষা করে। মহীন্দ্র
বালক ৪৫.৮, এবং বালিকা ২.৭। বয়োদারগণের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হ্রা হ্র
আনা ছয় পাই ব্যয় হয়। ইংরেজ-শাসিত ভারত তিন আনা ব্যয় করে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষার ব্যয় ৭৫ লক্ষ টাকা
বাড়িয়াছে। ভূমি-কর আট কোটি টাকা বাড়িয়াছে। সামন্তিক নিয়ম
ব্যয় তেব কোটি বাড়িয়াছে। মেওয়ানী আট কোটি বাড়িয়াছে। লৌহ-
মূলধন-প্রয়োগ ১৫ কোটি। (আমি গোথলের প্রদর্শিত সংখ্যা উদ্ধৃত
করিয়াছি।) গোথলে হিন্দব করিয়া বিক্রয়ের সহিত বলিয়াছিলেন যে,
দেশের লোকসংখ্যা যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলে আর এক শত পনের বৎসরে
প্রত্যেক বালক, এবং ৬১৫ বৎসর পরে প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে শহীব,
প্রিয়-প্রতিনিধিগণ। আমরা আশা করি, হোমরুলের অধীনে আমরা উচ্চ
আপনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইব। আমি বলিতে চাই যে, শিক্ষাদান-ব্যাপার
আমলা-তন্ত্র অনুপ্রয়োগী।

স্বাস্থ্য ও রোগচর্যা—প্লেগ, কলেরা, এবং সর্বোপরি ব্যাংকো-
প্রকোপবৃদ্ধি হইতেই, কি গ্রামে ও কি নগরে, স্বাস্থ্যক্ষণ অভাব প্রতীপন্ন হয়।
যে নগর কাবণে ভারতবর্ষের লোকের গড় পথনায় এত কম, অর্থাৎ ২৩.৫

বংস। এই স্বাস্থ্যসংস্কার ব্যবস্থার অভাবই তাহার অন্যতম। ইংলণ্ডে গড়ে
 পবনায় ৪০ বংসর। নিউজিল্যান্ডে ৬০ বংসর। ব্যাধির চিকিৎসা-বিধানের
 ক্ষমতা এই যে, পল্লী স্বাস্থ্যলণ্ডে বৈদেশিক চিকিৎসা-পদ্ধতিই বিপ্লবরূপে উৎসাহ
 পায়, দেশীয় পদ্ধতি কোনরূপ সাহায্য পায় না। সরকারী হাসপাতাল,
 সরকারী ঔষধালয়, সরকারী চিকিৎসক, সবটাই বৈদেশিক পদ্ধতির। প্রায়-
 কেন্দ্রীয় ও ইউনানী ঔষধ, হাসপাতাল, ঔষধালয় ও চিকিৎসকগণ সরকারের
 নিকট পরিচিতই নহে। জিবালু-রাজ্য ৭২টি বৈজ্ঞানিক নিয়মিত অর্থসাহায্য
 করেন। এই সময় বৈজ্ঞানিক ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দে ১৪৩৫.০০ জন রোগী
 চিকিৎসিত হইয়াছিল। এই সংখ্যা এলোপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত
 রোগী অপেক্ষা ২২০০০ অধিক, (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কার্যবিবরণী হইতে
 উদ্ধৃত) আমাদের সরকার দেশবাসিগণের ঔষধের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে
 পাবেন না। অথচ দেশের লোকের যে চিকিৎসা-পদ্ধতি পছন্দ করে, তাহার
 যে তাহাদের দেশের টাকায় সেই পদ্ধতির জন্য ব্যয় করিবে, সরকার তাহাও
 করিতে দিবে না। হোমকলেব অধীনে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয় পদ্ধতিই
 অপেক্ষাপাতে ব্যবহৃত হইবে। আমি স্বীকার করি, এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ
 অভাবপূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এবং প্রভূত আয়োজনগণ
 করিয়া থাকেন। কিন্তু অভাব এত অধিক, এবং তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প
 যে, আমাদের আমলা-তন্ত্র শাসন-পদ্ধতি যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে
 এ বিষয়ে সফলতা-লাভ অসম্ভব। দেশীয় পদ্ধতি-বর্জনের ফলেই এই দোষ
 ঘটনাছে। এই পদ্ধতি বর্জন করিবার পূর্বে তাঁহারা একবার রূপ-পূর্ণত
 পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই। ইহা হইতে প্রতিগম্য হইতেছে যে, স্বাস্থ্যসংস্কার
 ও যোগিচর্য্যের আমলা-তন্ত্র কার্যকর ও উপযোগী নহে।

কৃষির উন্নতি ।—১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীতে দেখা যায়, কৃষি-
 দ্বীপী লোকের সংখ্যা ২১ কোটি ৮৩ লক্ষ। ইহাদের জীবন দারিদ্র্য সর্ব-
 সাধারণের সুপরিচিত। ইহাদের ঋণ-ভার ক্রমাগত বৃদ্ধি বাড়াইতেছে,
 গত ত্রিশ বংসর কাল সার দীনশাওরাতা কর্তৃক তাহা আঘোচিত হইয়াছে।
 তথাপি ইহাদের ঋণ-ভার যত বাড়িতেছে, তত বাড়িতেছে। ভূমির
 কয় ২৫ বংসরে ৮ কোটি টাকা বাড়িয়াছে, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি। ইহা
 হাজা হাজার কয় আছে। লবণ-সুদ্র প্রভৃতি আছে। লবণ-সুদ্র নিত্যন্ত
 প্রিয় লোককেই ভীষণ নিগীড়ন করে। গত আন-ব্য-নির্দেশের সময় এই

গণ-স্বত্ব :— লক্ষ টোকা বাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দাবিরদ্রোহ অত্যন্ত
ফলবরূপ ক্রমবর্ধন। রীষের উপযুক্ত পুষ্টি হয় না; তাহাদের স্বাধীনশক্তি ক্ষীণ
হইয়া আসিতেছে। ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্য নাই।
পরমাণু কনিয়া যাইতেছে। শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ভয়ঙ্কর বাড়িয়া যাইতেছে।
গোপালকৃষ্ণ গোপলে “হুটবুদ্ধি” আন্দোলনকারী ছিলেন না। এ’ নিমিত্ত
আলোচনার যে সমুদয় সংখ্যা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়, ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি তাহারই
পুনরাবৃতি করিয়াছেন।—

“সাব উইলিয়ম হাটার এক জন মহানুভব ভারতপ্রবাসী ইংবাজ। তাঁর
কথা প্রামাণিক। তাঁহার মতানুসারে, ভারতে চারি কোটি লোক চিরকালের
দিনাচৈ এক বেণা মাত্র খাইতে পায়। সাব চার্লস ইলিঙ্গট আম এক জন
প্রামাণিক ব্যক্তি। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে সাত কোটি লোক উন্নত পুষ্টি
করিয়া খাওয়া যে কি প্রকাব, সংবৎসরের মধ্যে এক দিনের যত্নও তাহা
জানিবার অবকাশ পায় না। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের দাবিদ্র্য সত্যই
স্বংকল্প উৎপাদন করে। তোমরা এক শত বৎসর রাজ্যশাসন কামরার
পর দেশের অবস্থা যদি এইরূপ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কিছুতেই
নথিতে পার না যে, ভারতবাসিগণের বাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই তোমাদের
প্রধান উদ্দেশ্য।”

কখনও কখনও এইরূপ জবাবও দেওয়া হয়—“এই একই কথা বার বার
বলুন কেন? আমরা তাহা জানি।” আমাদের উত্তর এই যে, এই একই কথা
বার বার জনশ্রুতির জঠরে আঘাত করিতেছে, এবং এইরূপ অবস্থা ষট দিন
চলিবে, তত দিন আমরা এই অবস্থার মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে
পারি না। গোপলে দূরত্বের সহিত আরও দেখাইয়াছেন—এই শোচনীয়
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। কৃষিজীবীগণের মধ্যে জন্মগত
খাদ্যানিবন্ধন যে পুষ্টির অভাব, তাহার কোনও সংখ্যা বা গণনা পাঠাই না—

মিস্ত্রী জাহাজ নগরে গ্রাম্য কৃষকের জায় দলিত নগরবাসিগণের মধ্যে চিকিৎসা
সুকের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া এইরূপ মন্তব্য পাওয়া গিয়াছে যে, শতাব্দী ১৮
জন লোক পুষ্টিহীনতার কষ্ট পাইতেছে। দেহবৃষ্টির ক্ষীণতা, বাহ ও পদে
ক্লান্ততা, স্বাভাবিক উপর শোচনীয়রূপ আধিপত্যের অভাব,—যাহাব চক্ষু দেখে,
তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে না, ব্যাপারটা কি—তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারি-
বেন। যখন চারি দিকে এইরূপ অবস্থা চলিতেছে, তখন অসামান্য কল্যাণশক্তি
অভাব না থাকিলে মানুষ হুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে না।

গোবিন্দের প্রথম প্রণয় ভারতের হস্তশিল্পে প্রয়োগ করিয়া দেখা যায়।
 ছর্দল শিল্পশিল্পকে কত দূর সম্বল করা হইয়াছে, নূতন শিল্পের কত দূর প্রসার
 হইয়াছে, বাতায়নের জন্ত নদী ও খালগুলির কিরূপ যত্ন হয়, বন্দরে মাল আনিতে
 তাহার রপ্তানীর কিরূপ ব্যবস্থা হয়, নীল ও অশ্রুজল দ্রব্যের রপ্তানীর কারবার জরুরি
 বাসায়নিক রপ্তানীর প্রতিযোগিতা হইতে কিরূপ রক্ষিত হয়, এ সকলের আশে-
 চনাতেও এই একই উত্তর পাওয়া যায়। দেশের ধনাগমেয় উপাধিসমূহের কি
 প্রকারে পুষ্টি হইবে, সে বিষয়ে আমলা-তন্ত্রের উদাসীনতা অথচ আমাদের
 অজান্ত কষ্ট হইতেছে। জন্মণ জাতি এই সমস্ত উপাধির কতকগুলি দখল
 করিয়া বসিয়াছে; সে দিকে বহু ও মনোযোগ নাই, এবং এখনও জাপানীরা
 তাহাদের রাজশক্তির সাহায্যে, জন্মণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, ঠিক সেই
 পন্থা অবলম্বন করিতেছে; কিন্তু এই আমলা-তন্ত্রের তাহাতে কোনরূপ চেষ্টা নাই।
 ফলে জন্মণের পরিবর্তে এখন জাপান ভারতবাসিগণের স্বাভাবিক ও পুরুষা-
 ক্রমিক অধিকার কাড়িয়া লইতেছে।

সমুদয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন দেশে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পের উন্নতি হয়, এবং
 স্বভাবতঃই তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। 'আয়লওর
 ভীষণ দারিদ্র্য, এবং তাহার অধিকেকেরও অধিক অধিবাসিগণের দেশত্যাগ',
 গ্রেট-ব্রিটেন কর্তৃক তাহাদের উল্লেখ শিল্পনাশ ও একমাত্র কৃষির উপর তাহা-
 দিগকে নির্ভর করিতে বাধ্য করিবার প্রত্যক্ষ ফল। সেই একই প্রকারের
 প্রভাব হইতে এখানেও সেই একই প্রকারের কার্য ঘটিয়াছে—কিন্তু এখানে
 যাহা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ আয়লওর অপেক্ষা খুব বেশী। এখানে আর এক
 সমস্তাধঃ পরিবর্তন ঘটয়াছে, ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা নূতন—১৮৯১ ও ১৯০১
 খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর বিবরণ ভুলনা করিয়া ইম্পীরাইয়াল গেজেটের মত
 প্রকাশ করা হইয়াছে যে, "ভারতবর্ষে ভূমিশূন্য এক মল লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ
 বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা অর্থনীতির হিসাবে বিপজ্জনক।" "সাধারণ কৃষকগণ
 বৎসরের মধ্যে কেবল চাষের সময় জমিতে মজুরী করে, যখন জমীর কাজ থাকে
 না, তখন তাহারা সাময়িক কাজের জন্ত বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহে আসিয়া থাকে।"
 আয়লওর মজুরদের ইংলণ্ডে আসার কথা ইহা হইতে ঠিক মনে পড়িয়া যায়।
 অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রাচীন সময়ে গ্রামসমূহের কিরূপ ব্যবস্থা ছিল,
 তাহার উপর বিশেষ করিয়া জোব দিরাছেন। তিনি বলেন;—
 "গ্রামগুলি এখনও প্রায় নিজের অভাব নিজে পূর্ণ করে, এবং প্রত্যেকেরই

অর্থনীতির হিসাবে স্ব-তন্ত্র। গ্রামের লোক-মুহুর আহায়েব জন্ত যে খাদ্যের প্রয়োজন, গ্রামের কৃষকই তাহা উৎপাদন করে। কৃষকের কৃষকের জন্ত খাদ্যের কাণ্ড ও গ্রামের সমুদয় লোকের গৃহস্থালীর জন্ত তাহাদের প্রয়োজনীয় নৌহাতি প্রদানমুহ প্রস্তুত করে। সে গ্রামের লোকের এ সকল সামগ্রী দ্রবরাহ করে; কিন্তু বিনিময়ে টাকা পায় না। গ্রামের লোকেরা তাহাদের নিজের নিজের ভ্রম ও উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা তাহার অভাব পূরণ করে। কুস্তকার মাটির জিনিস বোগাম, তন্তুবাঁয় কাপড় দেয়, তৈলকার তৈল দেয়। কৃষকের নিকট হইতে এই সকল নিম্নী আপন আপন চিরন্তন পাওনা ফসলের অংশ পাইয়া থাকে। এই প্রকারে আদানপ্রদানের সমস্ত কার্য মুক্ত ব্যবহার না করিয়াও চলিয়া যায়। গ্রামের লোকের পক্ষে মুক্ত জিনিসটি দেবল সঞ্চয় করিবার মত মূল্যবান পদার্থ বিনিময়েব উপকরণ নহে। যখন তাহারা ধনী হইয়া পড়ে, তখন তাহারা উহা সঞ্চয় করে—হয় মুক্তাই সঞ্চয় করে, নয় ত সোনা-রূপার গহনা গড়াইয়া তাহা সঞ্চয় করে।”

দারিদ্র্যের ভাড়াই গ্রামবাসিগণ সহরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, তাই এই সমুদয় অবস্থা পরিবর্তিত হইতেছে। গ্রামবাসিগণ সহরে আসিয়া গ্রামের সহযোগিতা বা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাবের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা শিক্ষা করিতেছে। তাহাদের স্বস্বভাব বদলাইয়া যাইতেছে, বিশ্বাসের ভাব দূর হইয়া সন্দেহের ভাব জাগিতেছে; সহরের নিকটবর্তী গ্রামগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া সেই সকল গ্রামের সহিত দূরবর্তী গ্রামসমূহের তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। আর্থিক ও নৈতিক সর্বনাশের গতিবোধ করিতে হইলে আবার সেই স্বাস্থ্যকর ও আনন্দকর গ্রাম্যজীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে শাসনের মূল উপাদানরূপে পঞ্চায়ত-প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। সে সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিতেছি। গ্রামের শিল্প-সমূহের তাহাতে উন্নতি হইবে, এবং পরস্পরের সহিত আদানপ্রদানের সম্বন্ধযুক্ত বোধ-সমিতির দ্বারা গঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত সি. পী. বাসুদেবী আরার “বোধ-সমিতি ও পঞ্চায়ত” নামক তাঁহার ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলেন—

“এই যে সমস্যা, (গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাওয়া) ইহা নিবারণ করিবার, এবং গ্রামবাসিগণের নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়, বোধ-সমিতিসমূহের ভিত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বেশ ভাল রকমে পঞ্চায়ত প্রথা প্রবর্তন। তাহা হইলেই গ্রামের শিল্পসমূহের আবার উন্নতি হইবে, এবং

মজীব ও মুন্সীবাৰ সমাজশক্তিসম্পন্ন পুনৰায় উদ্ভব হইবে। ভাৰতীয় গ্রামগুলি
বন্ধন আৰু ঠিকমত পুনৰ্গঠিত হইবে, তখন সুবিকাশিত ও সহযোগিতাপূৰ্ণ নিঃ-
স্বার্থ-ব্যৱহাৰৰ অতি সুন্দৰ ভিত্তি নিৰ্মিত হইবে।” তিনি আশুও বধেন—

“পঞ্চায়েত-প্রথাৰ প্ৰবৰ্ত্তনৰ সহিত সাধাৰণতঃ বিবেচিত হ’ব না, এ প্ৰকাৰে-
আশুও অনেকগুলি কথা আছে,—গ্রাম্যজীবনৰ পদ্ধতিৰ পুনৰ্গঠনৰ সহিত
শোভনি বিভাজিত। তাহাদেৰ মध्ये সৰ্বাপেক্ষা আবশ্যক কথা—মেসেৰ ছোট
ছোট শিল্পৰ পুনৰ্গঠন। কি ইউৰোপে, কি ভাৰতবৰ্ষে, ছোট ছোট কৃষি-
ক্ষেত্ৰেৰ স্বংসেৰ সৰে সৰে ছোট ছোট হস্তশিল্পগুলিও স্বংস হইয়া গিয়াছে।
জাৰ্মেনৰ নত দেশসমূহে কৃষি বহলপৰিমাণে গ্রামেৰ শিল্পসমূহকে সাহা-
য্য কৰিয়াছে—এবং যো কৃষকদেৰ অল্প জমী আছে, তাহাৰা জীৱিকাৰ্জনৰ একট
শ্ৰেণীমূলক উপায়-ৰূপে শিল্পকৰ্মে যনোযোগী হইয়াছে। ভাৰতে গ্রাম্যজীবনৰ
যাংস কেবল যে একটা ৰাজনীতিক সমস্যা, তাহা নহে; ইহা অৰ্থনীতি এবং শিল্প-
ব্যৱহাৰও সমস্যা। ইউৰোপে সভ্যতাৰ তুৰঙ্গ সহৰ হইতে গ্রামে গিয়াছে—
কিন্তু ভাৰতবৰ্ষেৰ ব্যবস্থা ঠিক তাহাৰ বিপৰীত। এ মেসে সামাজিক জীবনৰ
ক্ষেত্ৰ আছে, নগৰে নহে। আমাদেৰ শিল্প মূলতঃ কুনিৰশিল্প ছিল, এবং
আমাদেৰ শিল্পিগণ এখনও কুটিলে থাকিয়া কাজ কৰে—বাণিজ্য-লগতেৰ সহিত
তাহাৰা অৱাৰিক পৰিমাণে সম্বন্ধশূন্য। সমস্ত জগৎ জুড়িয়া আমৰাৰ এপটা
চেলী হইতেছে যে, আমাদেৰ শিল্প ও পৰিশ্ৰমকে ভিত্তি কৰিয়া শ্ৰমেৰ সহযোগিতা ও
শ্ৰমবিভাগেৰ ব্যবহাৰ বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। এই কাৰণ হইতেই
শিল্পিগণেৰ সমবায়সঙ্ঘী, উদ্যান-নগৰ প্ৰকৃতিৰ উদ্ভব হইতেছে। এ সকলো
মূলে লক্ষ্য এই যে, সমাজ-তত্ত্ববাসেৰ ও সহযোগিতাব ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত হউক।
উৎপাদনকাৰী ও ব্যবহাৰকাৰীৰ মধ্যে ধন-বিভাগেৰ যে দাৰুণ বৈষম্য বিচক্ষণ,
তাহা দূৰীভূত হউক। ভাৰতবৰ্ষ চিৰদিনই ছোট ছোট কৃষকেৰ দেশ; এবং তাহাৰ
ফলে পাশ্চাত্যদেশে অল্পসংখ্যক কৰ্মকেৰ জনেৰ হাতে টাকা জমাি ধাওজাৰ যে
সমুদয় কুৰল ফলিতেছে, ভাৰতবৰ্ষে সে সকল কুৰল ফলে নাই। আমাদেৰ
মধ্যে সমাজসেবাৰ যে প্ৰগতি আছে, সেই প্ৰগতি এবং আমাদেৰ গাঁৱজীবনেৰ
যাহা মূল শিক্ষা, সেই শিক্ষা, এই উভয়ে মূলধনকে এক জাৱগাৰ জমিতে দের
নাই। এই কাৰণেই বৃহৎ আকাৰে ভাৰতবৰ্ষে কৰকাৰখানাৰ উন্নতি হয় নাই।”
কলকাৰখানাৰ সহৰে যে দাৰুণ দুঃখ ও দুৰ্দশা ঘটে, তাহা পূৰ্ণমাত্ৰায় গোপ
কৰিবাৰ পৰ ইংগণ এই সমুদয় পৰিবৰ্ত্তনেৰ আবশ্যকতা বৃদ্ধিতে আবদ্ধ
কৰিয়াছে।—এই সমুদয় পৰিবৰ্ত্তিত ব্যবহাৰ প্ৰয়োজন অত্যন্ত অধিক।

ইংলণ্ডের কোনও সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা এই ভাবে এক সঙ্গে বর্ণনা করেন—

“হিন্দাব কৃষিয়া স্থির হইয়াছে যে, তোমাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় পাউন্ড ৪২ পাউন্ড। আর আমাদের? সরকারী হিসাবে ২ পাউন্ড, আর বেসরকারী

হিসাবে এক পাউন্ড অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী। তোমাদের দেশে আনদার্লী

প্রত্যেকের প্রায় তের পাউন্ড, আর আমাদের ৫ শিলিং। তোমাদের ডাক-

ঘরের সেভিংস্-ব্যাঙ্কে নজুত আছে ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ পাউন্ড; তাহা ছাড়া

ঐষ্ট্রী সেভিংস্-ব্যাঙ্কে তোমাদের নজুত ৫ কোটি ২০ লক্ষ পাউন্ড। আর আমাদের

দেশের লোকসংখ্যা তোমাদের লোকসংখ্যার ৭ গুণ, অথচ আমাদের ডাকঘরে

মজুত আছে—কেবল ৭০ লক্ষ টাকা, এবং তাহারও অতি সামান্য কম দশ

ভাগের এক ভাগ ইউরোপের লোকের। তোমাদের যৌথ-কারবাবে হস্ত

প্রসূধন ১২০ কোটি; আর আমাদের ২ কোটি ৬০ লক্ষও নহে।—আবার এই

টাকারও অধিকাংশ ইউরোপের লোকের। আমাদের দেশের ৫ ভাগের ৪

ভাগ লোক কৃষিদ্বারী; আর এই কৃষি বেশ ক্ষতিগতি অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতের কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র; আবার তাহার উপর তাহারা অত্যন্ত শুল্ক

ভারগ্রস্ত; ফলে তাহারা জীবিতে মূলধন নিয়োগ করিতে পারে না, এবং তাহার

ফলে ভারতের কৃষি অধিকাংশই,—যেমন সার জেমস্ কেমার্ড প্রায় ২৫ বৎসর

পূর্বে দেখাইয়াছেন—ভূমি উর্বরতা-শক্তিকে হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। এক

একরে (তিন বিঘার) বেশ শস্য উৎপাদিত হয়, তাহার পরিমাণ প্রত্যহ কমিতেছে।

ইংলণ্ডে এক এক একবে ৫০ বৃশেল শস্য জন্মায়, আর আমাদের দেশে এক এক

একবে ৮১২ বৃশেল মাত্র জন্মাইয়া থাকে।”

গোখলের প্রথম প্রশ্নের অন্তর্গত যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহার

সমুদয়গুলিতেই এই আমলা-ভর্য্য এত দিন অল্পপযোগী প্রতিপন্ন হইয়াছে, এবং

এখনও তাহা সেইরূপ অল্পপযোগী।

(৬) ভারতবাসিগণকে একবার স্বযোগ দাও।

এ বিষয়ে আমরা যাহা বলি, তাহা এই,—দেশের সর্বসাধারণ জনশ্রুতির

শ্রদ্ধা, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিশোধনের ব্যবস্থায় তোমরা অকৃতকার্য হইয়াছ। জাপান

ও অন্যান্য জাতি নিজেব দেশেব যাহা করিয়াছে, তাহা কবিরার ক্ষমতা-ভা-

বাসিগণকে স্বযোগ দিবার উপযুক্ত সময় কি এখনও উপস্থিত হয় নাই?

নিশ্চয়ই এ দাবী অত্যাধা নহে। ইহা ভারতীয়গণ যদি বলেন যে, দেশের সর্ব-সাধারণ জনশ্রেণী তাঁহাদেরই বিশেষরূপ প্রতিপালনের পাত্র, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে না—শিক্ষিত সম্প্রদায় কেবল শক্তি ও গম চাহে, তাহা হইলে, আমরা তাহাদিগকে জাতীয় মহাসমিতির প্রতি দৃষ্টিপাত কবিত্তে অস্বরোধ করিব, এবং সেই মহা-সমিতির বক্তৃতা ও নির্দ্বাষণগুলির আশোচনা করিতে বলিব, সেই সকল বক্তৃতায় ও নির্দ্বাষিত মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইবে, সাধারণ জনশ্রেণীর প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভালবাসা ও তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান কত গভীর! দেশের দারিদ্র্যের প্রতি, বহু-হীন নৈরাত্মের প্রতি যে তাহারা সত্যমননে দৃষ্টিপাত করে, ইহা তাহাদের দোষ নহে। আচ্ছা, বিচারপতি শ্রীযুক্ত রহিম সাহেব কি বলেন, দেখা যাউক।—

“বহু কোটি ভাবতবর্ষীয় সাধারণ লোকের কল্যাণ অকল্যাণের প্রতিদিনই সম্বন্ধে যদি এইরূপ দাবী করা হয় যে, ভারতীয় সরকারী বা বেসরকারী লোক অপেক্ষা ইউরোপীয় রাজকর্মচারিগণই তাহাদের স্বার্থের যোগ্যতম প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এরূপ স্বীকারপূর্ণ মত দাবী যে কি প্রকারে উপস্থাপিত হয়, তাহা ধারণা কবাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ ভারতবর্ষের কৃষিক ভাষাসমূহ আয়ত্ত করিতে পারেন না; তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তাপ্রণালী সাধারণ জনশ্রেণী হইতে তাঁহাদের এত দূর পৃথক করিয়া বাধে যে, কেবলমাত্র অভিশ্রম অসংখ্যক লোক, তাহাদের অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে এই বাধার অতিক্রমে কৃতকার্য হইয়াছেন। পরন্তু শিক্ষিত ভারতবাসিগণের পক্ষে এই জ্ঞান সংস্কারজ, এবং ধর্ম ও সামাজিক রীতি,—ব্যহার প্রভৃতি পূর্ণ-দেশে এত প্রবল, সে সম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় একমতাবলম্বী হওয়ায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞান ও সহায়ত্বিত্ব খুবই সত্যোপেত; জড়বাদপ্রতিঃ ধারণা যে সকল দেশে খুব প্রবল, সে সকল দেশে এ প্রকারের দৃষ্টি (অর্থাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ) দেখিতেও পাওয়া যায় না।”

এ কথাও স্মরণীয় যে, শক্তিমত্তার অভাবেই যে আমলা-তন্ত্র বিস্তারিত হইয়াছে, এমন নহে। কারণ, ইংরাজ বণিক ও কণ্ডায়ালা ডাবলকোর্সে আপনাদের অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছে। তবে কথা এই যে, এই আমলা-তন্ত্র এই প্রকারের ব্যাপারে (অর্থাৎ দেশবাসিগণের কল্যাণ-সাধনে), আদৌ মনোযোগী নহে। রুস দেশের সাধারণ জনশ্রেণীর কিসে স্বত্বসমৃদ্ধি হইবে, রুস দেশের আমলা-তন্ত্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; অসাধারণ বিদ্য

বন্দীভূত হইয়া থাকিবে, কিসে তাহাণা নিয়মিতভাবে দেয় থাকিবে, সেই দিকেই তাহাদের যত্ন ছিল। আমলা-তন্ত্র সকল দেশেই এক প্রকার; সেই জন্যই আমরা এই পদ্ধতির বিরুদ্ধবাদী; কর্মচারিগণের বিরুদ্ধে নহি। ইংরাজ আমলা-তন্ত্রের পরিবর্তে ভারতীয় আমলা-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউন, তাহাও আমরা চাহি না। আমরা সিবিগ কর্মচারী দ্বারা শাসন, অর্থাৎ এই আমলা-তন্ত্রই দূর করিতে চাহি।

(ছ) অস্ত্রাস্ত্র প্রমাণের প্রয়োগ।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আমি কালবিলম্ব করিতে চাহি না। কারণ, সে সকলের উত্তর চোখের উপর পড়িয়া আছে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা-স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

লর্ড য়েওর শাসনকালে (১৮৬৯-৭২) এক-কেন্দ্রী শাসন-পদ্ধতি তাৎক্ষণিক প্রচলিত হইয়াছিল। কীন ইহাকেই 'হোমরুল' বলেন,—এবং তাহাশব্দই নীতি, টাকাকড়ির ব্যাপার বাদ দিয়া, অস্ত্রাস্ত্র ব্যাপারে লর্ড রিপণ কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল। কীন যাহাকে 'হোমরুল'র বীজ বলিয়াছেন, লর্ড রিপণ তাহাতে স্বাধীন-শাসন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন এই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গাল্য-দেশে একটি পরীক্ষাধীন ও সীমাবদ্ধ স্থানীয় হোমরুলের গৃহীত করিবার কল্পনা হইয়াছে। যদিও এককেন্দ্রী-শাসন ভাঙ্গিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত কমিশন বা তদন্তকারী মণ্ডলী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের মন্তব্য পেশ করিয়াছেন, তথাপি আজও সফল স্থানে যে-সরকারী ডেয়ারম্যান বা সভাপতির নিয়োগ হয় নাই। স্বতন্ত্রাং বেশ দেখা-বাইতেছে যে, দ্বিতীয় প্রমাণও এই আমলা-তন্ত্র অনুপযোগী।

তৃতীয় পরীক্ষা—সদস্য-সভায় কর্তৃত্ব।

মন্ত্রীদের ব্যবস্থাপক-সভার নির্বাচিত ভারতীয় সভ্যগণ দ্বারা করেন, তাহার প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক জন সদস্য বলিয়াছেন যে, তাহা গ্রহণনীয়। বড়নাটের ব্যবস্থাপক-সভাকে এক জন সদস্য "একটি বড়দের তর্ক-বিতর্ক-সভা" বলিয়াছিলেন। সম্প্রতি অনেকগুলি মন্তব্য নির্বাচিত দেশীয় সভ্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়াছিল; তাহার কোনওটি গৃহীত হইয়াছিল, কোনওটি পবিত্যক্ত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ব্যবস্থাপক-সভা

সময়ে প্রযুক্ত বিশেষণগুলি অসম্ভব নহে। নিষ্ঠো-অর্থো-সংস্কার সম্বন্ধে আমলা-
তন্ত্র এই শক্তিমত্তা দেখাইয়াছে যে, যে কন্যাশ্রমসাধন পার্লামেন্টের বিধানে
উদ্ভূত ছিল, আমলা-তন্ত্র তাহা এককালে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই
দ্বিতীয় পরীক্ষার প্রয়োগেও দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণকে শাসন-সমিতিতে
অধিকাংশ-দানের ব্যাপারেও আমলা-তন্ত্র অক্ষুণ্ণযোগ্য।

চতুর্থ পরীক্ষা—ভারতবাসিগণের সরকারী

কার্যে নিয়োগ—

কমিশনের মন্তব্য হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই মন্তব্য কার্যে
পরিণত করিবার অনিচ্ছা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমলা-তন্ত্রের দিক হইতে
কোনরূপ বাধা প্রদান করা আবশ্যক হয় নাই। কারণ, এই মন্তব্যে তাম্রা-
তন্ত্রের বাহা বিশেষ সুরক্ষা, তাহা সুরক্ষিত হইয়াছে।

গোখলেব পরীক্ষাসমূহের সহিত আমরা আর একটি পরীক্ষা যোগ করিতে
চাহি। সে পরীক্ষায় আমলা-তন্ত্র খুব গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইবে। সে
পরীক্ষা এই—রাষ্ট্র-পরিচালনের ব্যয়-বৃদ্ধি বিষয়ে আমলা-তন্ত্র কতদূর কৃতকার্য
হইয়াছে? বর্তমান বৎসরের খাজনার হিসাবে দেখা যায় যে, উহা ৮৬১২২৬০০
পাউণ্ড। খরচ,—৮৫৫৭২১০০ পাউণ্ড। সমগ্র সংগৃহীত ভূমিকরের আদায়ের
উপর ব্যয়।

দেশদানী বিভাগ বেতন ও অস্থায়ী ব্যয়	...	১২০২৩৬০০ পাউণ্ড
বিবিধ ব্যয়	...	৫২৮৩৩০০ ট
সাময়িক বিভাগ	...	২৩১৬৫২০০ ট
		৪৭৭৭২৫১০ ট

শাসনকার্যের এই যে অস্বাভাবিক ব্যয়-বাহুল্য, ইহাব সম্ভোচসাধন ভারত-
বর্ষের একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন; কিন্তু আমরা 'হোমরুল' না পাইলে তাহা
কিছুতেই হইবে না।

"হোমরুলের" দাবী করিবার বেগুলি গৌণ হেতু; সেগুলি স্বতঃই অত্যন্ত
গুরুতর; এবং সেগুলির পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত
দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই জাতিটা একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইবার
আশঙ্কা ঘটিয়াছে; এবং এই আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি-পাইবার একমাত্র পথ
—'হোমরুলের' অঙ্গমোদন। (এই দারিদ্র্য ইতিপূর্বেই দেনেব সোকেস

পরমাণু কমাইয়া দিয়াছে, মৃত্যুব হার বাড়াইয়া দিয়াছে, চারি দিকে রোগ-
বিস্তার করিয়াছে, ভূমিৰ উর্বরতা-শক্তিও ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে) । আমাদের
সাধারণ জনশ্রেণীর অবস্থা-পরিবর্তনের জন্ত কতকগুলি গুরুতর পবিবর্তন
অত্যন্ত আবশ্যক,—অপরিসীম । নতুবা অনাহার হইতে উদ্ভূত বাঁধুবিগ্ৰহ
অনিবার্য, এ কথা প্রত্যেক ইতিহাসজ্ঞ, যিনি ভারতবর্ষের সাধারণ জনশ্রেণীর
বর্তমান অবস্থা অবগত, তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন । এই যে
আর্থিক অবস্থা, ইহার কারণ অনেক । তাহার মধ্যে একটি এই যে, শাসন-
কর্তারা বৈদেশিক, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝেন না । পাশ্চাত্য দেশের উপযোগী
শাসনপদ্ধতি ছোর কবিতা প্রাচ্যদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে । প্রাচ্যদেশের নিজস্ব
প্রজাতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; আমলা-তন্ত্র-
পদ্ধতির প্রবর্তনের ফলে দেশের অধিবাসিগণ ব্যতিব্যস্ত ও অশান্ত হইয়াছে ;
কারণ, এই পদ্ধতি তাহাদের পক্ষে একেবারে নতুন, এবং ইহাতে তাহাদের
বিরুদ্ধিই উৎপাদিত হয় । যাহা হইয়াছে, তাহা নইয়া এখন আর কলহ করিয়া
শীত নাই—এখন পবিবর্তন আবশ্যক । যখন একটা অমুপযোগী শাসনপদ্ধতি
গূর্ণ হইতে খুব উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন দেশে আরোপিত হইয়াছে, তখন ইহা
নিফল হইবেই । গরীবেরাই যে বিদ্রোহী হয়, ইহা অত্যন্ত সত্য ; যে দুঃখ
তাঁহারা ভোগ করিতেছে, সেই দুঃখ যখন বিদ্রোহের দুঃখ অপেক্ষা অধিক নহে
কিন্তু মনে হয়, তখনই তাঁহারা বিদ্রোহী হয় । দেশের ভূমিৰ উর্বরতা-
শক্তি হ্রাস ও গ্রান্থাশিল্পের ক্ষয় নিবন্ধন কোটা কোটা মানবের যে সৈন্য-
রোশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দূষ করিবার জন্ত আমরা ‘হোমরুল’ চাই ।

শাসনসংক্রান্ত সংস্কার-সমূহ ।

ইহা তিন ভাগে বিভক্ত ।—

- (১) ভারত-শাসনের সংস্কার ।
- (২) প্রাদেশিক শাসনের সংস্কার ।
- (৩) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার ।

আমি এই তিনটি বিষয় বিপরীত দিক হইতে বিচার করাই সুবিধাজনক
মনে করি । তাহা হইলে, সমগ্র শাসনব্যবস্থা ভিত্তি হইতে গড়িয়া তুলিতে পারা
যাইবে ; এবং ইহা বেশ একটা জীবন-সম্পন্ন ও সুস্থজালাময় ব্যাপার বলিয়া
উপলব্ধ হইবে ; অংশগুলি কেমন অসঙ্গতিভাবে বিবাক্তিত, তাহাও বুঝিতে পারা

হাইবে। কিন্তু দ্রাস্তিনিবাসের দ্রুত প্রায়তেই বলিয়া বাধি যে, পতনবৎ
কনগ্রেস-লীগের সংস্কার-প্রত্যাবে যে পরিবর্তনসমূহ চাওয়া হইয়াছে, তাহা
অমুমোদিত না হইলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোনও ব্যবস্থাই সম্ভব হইবে না।
সেই সংস্কার-প্রত্যাবে বাহা চাওয়া হইয়াছে, তাহা সৰ্ব্বাপেক্ষ কম, আর জাতি
কমানো যায় না, কদাইলে সংস্কার আর 'সংস্কার' আখ্যা পাইতে পারে না।
জড় রিপণের সময় হইতে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথা বরাবর গৌলামিন হিয়া
সংস্কার করিবার চেষ্টা হইতেছে, এবং সে চেষ্টা বিফলও হইতেছে। তাহাও
ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভা সম্পূর্ণরূপে
প্রতিনিধি-সভা না হইলে, অর্থাৎ এক বাহালা দেশ ছাড়া অন্যদেশে যেরূপ মন
সভা আছে, সেরূপ সভা থাকিলে,—অর্থাৎ সভায় সরকারী ও সবকারী
নির্ধারিত সভার সংখ্যা অধিক, আর কার্যকরী সভায় হয় সকলোই ইংরাজ,
নত ও জন ইংরাজ, আর এক জন দেশীয় লোক,—আর এই এক জন
গোক কোনও আপত্তিকর ব্যবস্থার নিবারণে একবারে অসম্মত, কেবলমাত্র
শিথিলী দ্রুত থাকেন,—সেরূপ ব্যবস্থা থাকিলে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংস্কার
অসম্ভব। যেমন মস্তিষ্কে বাধি থাকিলে, বা মস্তিষ্ক অগুপ্ত হইলে, দেহ
স্বাস্থ্য থাকে না, ঠিক সেইরূপ;—কারণ, সুস্থ মস্তিষ্ক পরিচালন ও শাসন
কবিলেই তবে সুস্থ দেহ গড়িয়া উঠে। বৈদেশিকগণের দ্বারা ভারতবাসিগণের
ব নিজেদের দেশ শাসন করিবার আদৌ শক্তি আছে, গঠিত কার্যপরিচালনা
শক্তি তাহা বিশ্বাস করেন না। এই মণ্ডলী, সবকারী নিয়ম ও শাসন
ঠিক থাকিলে, এই চিন্তাতেই ব্রাহ্ম, দেশীয় সভ্যগণের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে কোনও
সংবাদই রাখেন না। এই যে 'দিদিমা'র শাসন, ইহাতে আসল চিন্তা
পড়িয়াছি। ইহা-ভারতীয়গণ যদি মনে করেন, আমিয়া শিও—যে দেশ কল্যাণ
শিওগণ এখন নিজে নিজে হামা টানুক, পাড়াইয়া উঠুক, হাঁটিতে চেষ্টা করুক,
পড়িয়া বাউক, এই প্রকারে পড়িতে পড়িতে দেহেব ভাবকেল ঠিক রাখিতে
শিখিবে। যদি তাহাবা চিবদিন দড়ীর সাহায্যে চলে, তাহা হইলে দে তাহা
পদব্র্ধ কখনও ঠিক হইবে না। এই স্থানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে,
যে কোনও বিভাগে ভারতবাসিগণকে সম্ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহারা
সেইখানেই স্কতকার্য্য হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনেব বর্ষব্যপ
অন্ততঃপক্ষে কনগ্রেস-লীগেব দাবীটুকু মঞ্জুর করিবার পূর্বে সরকারী চাপে স্থানীয়
স্বায়ত্ত শাসন হইতে সংস্কারকার্য্য আবৃত্ত করেন, এবং সেই স্থানে বা অন্য কোন

বিভাগে ঘাঘাতে সফলতা হয়, তাহারই দাবী করেন, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল সময়ের তালে তালে পদধ্বনি করিতেছেন,— প্রকৃত পক্ষে আদৌ অগ্রসর হইতেছেন না। আমি ভারত-সরকার ও ব্রিটিশ-সরকারকে অত্যন্ত সন্তোষভাবে ও সমিচ্ছার সহিত বলিতে চাহি যে, ভারতবর্ষে তাহার স্বত্ব দাবী করিতেছে, অধিকাংশ পাইবার জন্য ভিক্ষা করিতেছে না। ভারতবর্ষই বলিয়া দিবে, কিসে সে সম্ভব হইবে। আমার এই উক্তির সমর্থনে আমি গ্রেটব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী ঘাঘা বলিতেছেন, তাহারই দোহাই দিতেছি,— “কত কোনও কর্তাকে বলিতে হইবে না—“এই পর্য্যন্ত—আর না।” এ বিষয়ে গ্রেটব্রিটেনের প্রজাতন্ত্র আমাদের সমর্থন করিতেছে, সম্মিলিত আভিগণ (মিষ্টার এস্‌মুইথের ভাষায়)—“কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া” আমাদের সমর্থন করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র আমাদের সমর্থন করিতেছে। ব্রিটেন তাহার চিরাচরিত সংস্কার অস্বীকার করিতে পারে না। তাহার মনোব প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদগণের কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে না; এবং ইংলণ্ড জগতে যে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের উজ্জ্বল মুকুটমণ্ডিত রূপ, সেই প্রজাতন্ত্রের মুখে কলঙ্ককালিন্দ্য লেপন করিতে পারে না।

প্রজাতন্ত্রের অনুপস্থিতি ?

আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ আশঙ্কিত করা হইয়াছে, এবং আমরা এই আশঙ্কাসমানে এখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা এই যে, ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহ পাইবার সম্পূর্ণ অক্ষম; চিৎদিনই ভারতবর্ষ একচ্ছত্র রাজার অধীন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা ঐতিহাসিকগণের বাস্তব ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মত নহে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সিভিলসার্ভিসের সভ্যগণেরই কেবল এইরূপ মত। ‘হোমরুল’-সমিতিসমূহ ভারতের বড়লাট বাহাদুর ও মিষ্টার সর্গেণ্ডর নিকট যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত অভি সত্য কথাগুলিই কথিত হইয়াছে—

“ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র-শাসন একেবারে নূতন, এ কথা কোনও জ্ঞানবান লোকই বলিবেন না। মেনু ও অগ্ন্যস্ত্র ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে, প্রজাতন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলতঃ আর্য্যজাতির, এবং আর্য্যজাতির উপনিবেশ-শিক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ইউরোপে বিস্তৃত হইয়াছে। পঞ্চময়ে বা “গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র” ভারতবর্ষে অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল; গত

বৎস্কীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধাত্যে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । বর্ণ-বিভাগের মধ্যে এখনও তাহা আছে ; প্রত্যেক বর্ণ নিজের গভীর ভিতরে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্র, তাহার ভিতরে একই লোকের স্বাধীনতার মাইল ও দূরিত ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে । টাকায় এবং উপাধিতে সামাজিক সম্মান ভেদন নির্ভর করে না ; বিদ্যা ও ব্যবসায় সাপেক্ষ । ভারতবর্ষ তাহার স্বভাবের অন্তরে প্রজাতন্ত্র ; ভারতবর্ষ অতীতকাল হইতে যে সমুদয় প্রতিষ্ঠার গাইয়াছে, তৎসমুদয়, এবং এখনও যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান তাহার অধীন আছে, সে সমুদয়, প্রজাতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ।”

এ বিষয়ে স্মৃতিস্মিত ইংরাজের সাক্ষ্য আছে—সার জন লব্বেজ, আজ নভে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—“ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা পরিচালনা করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ, এবং স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন করিয়া প্রকৃতি তাহাদের হৃদয়ে গভীররূপে বিরাজমান । গ্রাম্য সমাজসমূহের প্রত্যেকটি এক একটি সাধারণ-ভাজ, এবং ভারতের প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে এগুলি মূল-পেছা স্থায়ী । আমরা ভারতবর্ষে যে স্থান অধিকার করি, তাহাতে কর্তব্য ও নীতি মশকে আমরা বেক্রপ ধারণাই পোষণ করি না কেন, দেশের স্বাধীনতা খটখট অংশ গন্তব্য—দেশের লোককে করিতে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য ।”

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সার বাস্টন ফ্রিম্যান লিখিয়াছিলেন—“ভারতবর্ষ সামাজিক কাজকর্ম কি তাহা পরিচালিত হয়, তাহা যিনি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, প্রতিনিধি-নিয়োগ ইহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি—কেবল নৃনারের বিধানের দ্বারা প্রতিনিধি-নিয়োগ নহে—ইহাদের পূর্ক হইতেই সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোক প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হয় । যখনই কোনও গোলমাল উপস্থিত হয়, এবং সবকারাবাহাদারকে কোনও কিছু জানাইবার আবশ্যক হয়, তখনই তাহারা এইরূপ কবে—তখনই তাহাদের মধ্যে এই ভাবে যে বিষয়ের আলোচনা হয় । যখনই সমাজের কোনও লোককে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তখনই সেই জাতির একটি সভা হয় । আমার মনে হয়, এ জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতিই এই ধরণের । যেমন প্রাচীন স্পার্টার জাতিদের ছিল—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লোকসমূহের সমাজ একত্র করিয়া প্রত্যেকের মত লইয়া কাজ করিত, ঠিক সেইরূপ ।”

মিষ্টার চিশহলম এনষ্ট বলেন—“আমরা যখন পূর্ক দেশের অধিবাসিগণকে শিক্ষাদান করিয়া মিউনিসিপ্যাল কাজেব জন্ত, এবং নৃনাসত্য শাসন-প্রণালী

অঙ্গ গা ভূমিয়ার কথা বলি, তখন জানিয়া ভূমিয়া যাই যে, মিউনিসিপ্যালিটি
 ত্রিনিদাদই পূর্ব-দেশের স্রষ্টা। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন—এই কথাটাকে খুব
 নিভৃতভাবে বুঝিলে ইহার অর্থ যতদূর ব্যাপক হয়, তাহার সমস্ত ব্যাপারটাই
 পূর্বদেশে যত প্রাচীন, এ দেশে ঠিক তত প্রাচীন নহে। দেশের অধিবাসিগণ
 যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, যাহারা পূর্বদেশের অধিবাসী, তাহাদের মধ্যে,
 পূর্ব হইতে পশ্চিমে, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে এমন স্থান নাই। যেখানে অসংখ্য
 স্বায়ত্ত-শাসন-ব্যবস্থা নাই। কেবল তাহাই নহে, আমাদের প্রাচীন মিউনিসি-
 প্যালিটিসমূহের মত তাহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত গ্রথিত—সমস্তগুলি
 একখানা জালের মত, কাজেই প্রতিনিধি-নির্বাচন-ব্যবস্থার কাঠামো একেবারে
 প্রস্তুত হইয়াই পড়িয়া আছে।”

এ প্রকারেব প্রমাণ-বচন আমি অসংখ্য উদ্ধার করিতে পারিতাম—কিন্তু
 উদ্ধার করিয়া কি হইবে? যাহারা জানী, তাহারা সকলেই ইহা জানেন—আর
 যাহারা অজ্ঞান, তাহাদের নিকট যতই ছোরে বলা হউক, তাহারা স্বীকার
 করিবেন না।

এই কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্যের পর আমি আলোচনা করিতেছি,—

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর সংস্কার।

(ক) সাধারণ বিধানসমূহ।

আমাদিগকে তিনটি ক্ষেত্রেব আলোচনা করিতে হইবে—(১) গ্রাম, (২)
 গ্রামগুচ্ছ—অথবা অধিক ব্যবধানবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের মধ্যে যে ভূমি
 আছে, সে ভূমিগোষ্ঠিও ইহার মধ্যে—ইহাই দ্বিতীয় ক্ষেত্র, (৩) খেলা—বাহার
 মধ্যে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন জালুক ও তহশীল আছে, তাহা ছাড়া সবকারী
 পতিত ভূমি ও বন আছে। প্রাচীনকালের গ্রাম-প্রতিষ্ঠার একটা অতি
 আনন্দকর স্থিতি ইহার মধ্যে আছে। প্রত্যেক গ্রামের শীর্ষস্থানে এক জন
 অধিষ্ঠা প্রধান থাকতেন; তাৎক্ষণিক গ্রামের এক একটি গুচ্ছের শীর্ষস্থানে তাৎ-
 ক্ষণিক উচ্চগদ্য এক জন প্রধান থাকতেন; একমতখানি গ্রামের শীর্ষস্থানে এক
 জন আরও উচ্চগদ্য ব্যক্তি,—এই প্রকারে দেশের বিভাজন সংখ্যা অবলম্বনে
 সমুদয় ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনেবা এই প্রণালীর নিয়মবদ্ধ আবোহপ্রণালী
 পছন্দ করিতেন; তাহারা সমীর ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা ভালবাসিতেন।

তাহাদের ভূমি বা সম্পত্তি থাকুক বা না থাকুক, গ্রামের অধিবাসী গৃহস্থমাত্রই
 প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকারী ছিলেন। কারণ, ব্যবস্থা এই ছিল যে, “যাহার

কল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, তাহা সকলের দ্বারাই বিচারিত হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থায় দেশের কাজে দেশের প্রত্যেক নাবীর ও প্রত্যেক পুরুষের অধিকার ছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাহার সক্তি সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ, যে সমুদয় ব্যবস্থার সহিত তাহার অতি নিকট সম্বন্ধ সেই সমস্ত ব্যবস্থার যে কেবলমাত্র প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকারী; কিন্তু আর এক দিয়া দেখিতে গেলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় সমস্ত দেশের শাসনেও তাহার হাত ছিল। আমাদের সঙ্গী-সভাতেও, কি প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভা, কি সর্বভারতীয় মন্ত্রণাসভা, সর্বত্রই, যেমন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়িবে, ততই প্রতিনিধি-নির্বাচনে সকলেই অধিকার পাইবে। আপাততঃ আমরা ইংলণ্ডের মতই প্রথমশ্রেণীর প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার দিতেছি। প্রাদেশিক মন্ত্রণাসভায় বাহারা সদস্য-নির্বাচন করিবে, তাহারা তালুক-বোর্ডের নির্বাচনকারীদের পর্যায়ভুক্ত।

তাহার পর, কর্তব্য ও শক্তিবিশেষের সময় এই ব্যবস্থা করি যে, যাহা কেবলমাত্র গ্রামের, তাহা গ্রামের সভার দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইবে, কিন্তু গ্রামের যে সমুদয় প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র গ্রামের নহে, গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যবস্থায় একটি অংশমাত্র, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেই বৃহত্তর ব্যবস্থায় যে মন্ত্রণাসভা, তাহার অধীন হইবে, এবং গ্রাম-সভাকে তাহার যতটুকু পবিচালনা করিতে হয়, ততটুকুই বহু গ্রামসভাকে বৃহত্তর সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ একটি বিদ্যালয় লইয়া আলোচনা করা যাউক। মনে করুন, শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, এবং তাহা প্রাদেশিকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, কলেজসমূহ, উচ্চবিদ্যালয়সমূহ, মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহ, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ এবং সাধারণকে হস্ত-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য প্রত্যেকের সহিত সংশ্লিষ্ট তহচিত শিল্পবিদ্যালয়, এবং যাহা-বা জীবিকার জন্য ব্যবসায় শিক্ষা করিবে, তাহাদের জন্য কারখানার বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে সেই গ্রামে যে ব্যবসায় আছে, সেই ব্যবসায়ের জন্য কারখানা থাকিবে। সম্ভবতঃ প্রত্যেক ফিন্যান্স (Revenue Circle) একটি করিয়া মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে; প্রত্যেক তালুকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় থাকিবে, অনেক ভানিকাই একটির বেশী থাকিবে, প্রত্যেক জেলায় একটি বা ততোধিক কলেজ

থাকিবে, এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি বা ততোধিক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে। কিন্তু গ্রাম্যপঞ্চায়ত কেন্দ্রমাত্র তাহার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্র দায়ী থাকিবেন, এবং দেখিগেন যে, যে সমুদয় বালকবালিকার ভবিষ্যতে আশা অক্ষুণ্ণ তাহার। ফিরকার মধ্যশ্রেণীৰ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়। এই প্রকারে এই বিদ্যালয় গ্রামের বাহিরের বিদ্যুততর জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে; কিন্তু তাহাদের শাসনের অধিকার কেন্দ্রমাত্র নিজেদের বিদ্যালয়টির উপর থাকিবে। তাহার। দেখিবে যে, সমস্ত প্রদেশের শিক্ষার যে অংশের ঐ গ্রাম বংশী, সেইটুকু যথাযথ পালিত হইতেছে।

(খ) পঞ্চায়ত।

স্বরগতীভকাল হইতেই ভারতবর্ষে গ্রাম্য-সমাজের অস্তিত্ব ছিল, এবং সেই সমাজে যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ ব্যবস্থাও ছিল, ইহা সকলেই জানেন। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থানে অনেক মিরিসিও কাগজপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার সাহায্যে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে গত শতাব্দী পর্য্যন্তও যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার একটা চিত্র আমরা গড়িয়া তুলিতে পারি। এই ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশে এখনও আছে। সার টমাস সন্থো কর্তৃক ব্যবস্থাপিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্যা বিধানের দ্বারা এই ব্যবস্থার প্রাণহানি হইয়াছে; ১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রাচীন ব্যবস্থা দিন দিন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুক্ত সি, পি, রামস্বামী আয়ারের যৌথ প্রস্তুতি হইতে পূর্বে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে, সেই পুস্তিকায় তিনি নিম্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

“কোটিয়ার অর্থশাস্ত্রের দশমখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, সাধারণের হিতকর অভ্যুত্থানগুলি গ্রামের লোকের। সমবেতভাবে গঠন করিতেছে, এবং রক্ষা করিতেছে। অধ্যাপক রয় ডেভিস বলেন, “বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের সমুদয় শক্তি সংঘ-বদ্ধ করিয়া মহলা ও পাছশালা নির্মাণ করিতেছে, তাহাদের নিজের গ্রাম হইতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা সংস্কার করিতেছে, এবং সাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যানও রচনা করিতেছে। (পি, ব্যানার্জি রচিত “প্রাচীন-ভারতে শাসন-পদ্ধতি” গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য)। এখনও মহীশূরে বহুগ্রামে গ্রামবাসিগণ প্রত্যেকে প্রতি গৃহেই অর্দ্ধদিনের ৩ বিশ্রম বিনা মজুরীতে সাধারণের হিতকর কার্য্যে দান করে, এবং এই প্রকারে যে কার্য্য হয়, তাহার সমষ্টি বিশ্রমজনক। যে সময়ে

অর্থশাস্ত্র মণ্ডিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, অর্থাৎ ষুটপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে—প্রাচ্যে
গ্রাম সাধারণ দেশ-শাসন-ব্যবস্থার একটি অভ্যাবগত অংশ ছিল—গ্রামই দেশ
শাসন-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সিংহলদীপে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে মুক্তিভে
দে পাওয়া যায় যে, সামাজিক ধর্মাদিকরণে ফৌজদারী বিচারও গ্রামবাসীরই করিত।
সে সমস্য়কাল গ্রামের লোকে যে কেবল শাসন-কার্যে সাহচর্য করিত, তাহা নহে,
বিচার-বিভাগের কার্যপরিচালনেও তাহারা সাহায্য করিত। রাজ্যের
গবর্নমেন্টের প্রশংসা করিয়া এ কথা বলা উচিত যে, সার্ব টমাস মন্রো সম্পূর্ণরূপে
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাস্ত্রাজের নোড সম
রেভিনিউ গত শতাব্দীর প্রথমার্শে গ্রামের প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সার্ব টমাস মন্রোর অভিপ্রায় মত কাহা
হওয়ার গ্রাম্য সমাজসমূহের প্রাণহানি হইয়াছে।”

মহীশূরের ১৯১৫-১৬ খ্রষ্টাব্দের শাসন-সংক্রান্ত কার্যবিবরণীতে ২৭০ পৃষ্ঠায়
“গ্রামের উন্নতিসাধন-ব্যবস্থা” প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, গ্রামবাসিগণ নগরে ও
পার্বীক শ্রমে ঐ বৎসর ৪৭০৮৩ টাকা দিয়াছে, আর রাজ-সরকার ৪৩৯৮৮
টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ—“ঐ গ্রাম্য-সমিতিসমূহ এই
কার্যে বরাবর বিশেষ আগ্রহের পরিচয় দিতেছে, এবং তাহাদের চেষ্টায় নাজেব
সর্বত্র সাধারণের হিতকর বহু কার্য, যেমন বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ, কুপানন,
রাস্তা-নির্মাণ, জঙ্গল-পরিষ্কার, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্য হইতেছে।”

ঐ বৎসর চারিটি জেলার গ্রাম্য-সমিতিসমূহের সম্মিলনী হইয়াছিল।
কার্যকারী সমিতিসমূহ কি করিয়াছে, তাহার হিসাব লইবার জন্ত, গ্রামের
অধিবাসিগণের অভাব অভিযোগ নির্ধারণ করিবার জন্ত, এবং গ্রামসমূহের
আর্থিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্ত, কি কি করা দরকার,
তাহার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্ত ও তাহা কি প্রকারে কার্যে পরিণত করা
যায়, তাহার উপায়-উদ্ভাবনের জন্ত এই সম্মিলনীসমূহের অধিবেশন হইয়াছিল।
গ্রামবাসিগণ আনন্দের সহিত সেই সামাজিক কার্যে যোগদান করে। কারণ,
এই সময়ের কার্য তাহাদের চিরাচরিত প্রথা-উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা গ্রামের
উন্নতির জন্ত সাননে বিনা মজুরিতে পবিত্র করিয়াছে, ও কাহা পূর্বেরই এম
হইল। প্রাচীনকালে সামাজিক বাধ্য-বাধকতা যে ভাব ছিল, তাহা এখনও
আছে এবং মহীশূরের রাজসরকার বুদ্ধিমানের মত ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন
ও যাহাতে ইহার উন্নতি হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামের লক্ষণ এইরূপ ছিল—এক জায়গায় অনেকগুলি বাড়ী—তাহার চারিদিকে অনেকখানি কর্ষিত ও অকর্ষিত জমী—প্রত্যেক অধিবাসীর নিজস্ব বাসগৃহ, উঠান ও বাগান। গ্রামে যে সকল সবকারী কর্মচারী ও শ্রমী ছিল, তাহারা গ্রামের কাজ করিয়া নগর কিছু পাইত না, তাহাদেব জমী দেওয়া থাকিত, এবং গ্রামের উৎপন্ন কনলের একটা অংশ তাহারা পারিশ্রমিক হিসাবে পাইত। গ্রামের কর্মচারীর মধ্যে—একজন মণ্ডল, একজন সরকার, একজন চৌকিয়ার (তাহাকে পুলিশের কাজও কিছু কিছু করিতে হইত) একজন সীমানাদর্শক বা 'অ' মিন, জলাশয় ও নদীনালাব একজন পরিদর্শক, একজন পুন্নাবি, একজন শিক্ষক, একজন জ্যোতিষী, একজন চিকিৎসক, একজন গায়ক, একজন কবি, একজন নর্তকী, একজন নাপিত, একজন রন্ধক, একজন গোপালক, একজন কুস্তকার, একজন কর্মকাব ও একজন হুত্বধর। যথার্থ নিরীক্ষিত সদস্তগণের দ্বারা গঠিত গ্রাম্য-সমিতি কর্তৃক গ্রাম শাসিত হইত এবং বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য শাখা সমিতি থাকিত। সমস্ত জমী সমাজের মৌখ ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাহাব নূতন বন্দোবস্ত হইত। প্রত্যেক গৃহস্থেবই তোট ছিল বলিয়া মনে হয়, তবে পঞ্চ বা সদস্তরূপে নিরীক্ষিত হইতে হইলে কিছু গুণের দাবকাব ছিল।

দুয়াট সপ্তম এডওয়ার্ড কর্তৃক ১২০৭ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত বিকেন্দ্রীকরণ তদন্ত-নদিতিতে (ডিসেণ্ট্রালাইজেশান কমিশন) ৫ জন ইংরাজ ও একজন এদেশেব লোক রনেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন। তাহার বিবরণীর তৃতীয় খণ্ডেব ১৮শ অধ্যায় ৩৯৩ প্যাবায় দেখিতে পাই,—

“ভারতবর্ষেব অধিকাংশ স্থানেই সরকারী শাসন-ব্যবস্থায় গ্রামই রাজ্য-তন্ত্রেব প্রাথমিক মূল উপাদান—গ্রাম হইতেই বৃহত্তর শাসন-ব্যবস্থা পড়িয়া উঠে।”

সেক্রেটারীয়ে সংগৃহীত প্রাচীন প্রমাণ হইতে গ্রাম ও তাহার প্রথমূলক বিধি, তাহার কর্মচারী, শিল্পী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি পূর্বোক্তরূপ বর্ণিত দেখিতে পাই। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, এই সমুদয় গ্রামে পূর্বে বহুল পরিমাণে দ্বারপ্রশাসন ছিল, কিন্তু “এখন বেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা, আধুনিক কবসংগ্রহণ ও পুষ্কিণেব ব্যবস্থা, যাতায়াতেব সুবিধা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেব উদ্ভব এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক প্রজাসম্বলবিধান প্রভৃতি—যাহা ক্রমশঃ উত্তর-ভারতবর্ষেব বিস্তৃত হইতেছে, তাহার কলে এই প্রায়ত্তশাসন এখন লোপ-

হইয়াছে। ইহা সর্বপ্রথম গাওঁদেব বাসী-তত্ত্বাবধায়ক উপাধীতে। গাওঁদেব
 নামে গ্রাম পরিচালিকা—অর্থিক, মণ্ডল, সরকার, প্রভৃতি কার্যাবলী
 প্রথমের দিকে, বেতনভুক্ত এবং পরবর্ত্তী কাঁড়ক পরিচালিত। এখনও
 কিছু গ্রাম সম্পর্কে খাদ্যায়ত্তর ভাব ও সাধারণ স্বার্থবোধ আছে।
 “গবমেণ্টের বেতনভুক্ত” এই কথাটিতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, গ্রাম
 পরিচালিত বি. প্রকারে ধর্ম্ম কথ্য হইয়াছে। বেতনভুক্ত হইলে যোক টাকার
 পরিচালীর ভূত্ব হইয়া পড়ে; আর নির কণ্ঠস্বাভা, তহনীলদার, ডেপুটি-বাই
 কলেক্টর প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারী প্রভিই অল্পগ্রহ ও পুঙ্খবোধের দৃষ্টি চাষী
 গ্রামের লোকের প্রতি বর্ষে। এই প্রকারে গ্রামের সেবক না হইয়া
 বীভক হইয়া পড়ে এবং গ্রামবাসীর প্রতি দায়িত্ববোধ—যাহা গ্রামবাসীর
 স্বার্থ—তাহা ধ্বংস হইয়া যায়।
 ইহা বীভক হইয়াছে যে, ইংরাজের শাসনাধীনে পঞ্জীমান্ন গ্রাম
 মিস্ত্রী গিয়াছে, তবে, এই কার্যাবিবরণী ছোবের দৃষ্টি সমুদায় কার্যাবিবরণী
 য, সেগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইত। দেখা যায় যে, কমিশনে কোন কোন
 গ্রামে প্রকাশ করিয়াছিলেন, “দেশের অধিবাসিগণের জি. ভেমন উচ্চ
 ও স্বাধীনভাবে আছে যে, তাহারা গ্রামে কথঞ্চিৎ স্বায়ত্ত-শাসনের
 উপভোগ করিতে পারিবে।” আমলা-ভরের দ্বারা প্রাণের কথা, তাহাও
 ইহা। সুতরাং সুতরাং কংসর, ধর্ম্ম গ্রামগুলি স্বায়ত্তশাসনে প্রতিষ্ঠিত
 হইত। আমলা হইয়া গিয়াছে, শাসনের কত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, কম
 মিস্ত্রী গিয়াছে, তথাপি তাহারা জীবিত ছিল। আর আশ্চর্য্য হইত যে
 কংসর ইংরাজ শাসনের অধীনে থাকিয়া নিজেদের কান চালাইতে অসমর্থ
 হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই হৈ। সাধারণ মনের কথা। যে শাসনকে উচ্চ
 রণা হয়, সেই শাসনের অধীনে এমন আশ্চর্য্য অধঃপতন কেন হইল ?
 আর কিছুই নহে, আমলাতন্ত্রের বাধা ছাড়া নিম্নের বন্ধনই এই কারণ।
 কিছু আমলাতন্ত্রের মনোমত হয় নাই, তাহাই তাহারা কাটিয়া হাঁটয়া
 রাখে। শাসনকার্যের জন্য গ্রামবাসীদের নিজস্ব বিধিব্যবস্থা ছিল, তাহাদের
 তাহাদের কাজকর্ম্ম ভালরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু কাংকলিত হইলে
 ভিত্তরূপ, সুতরাং গ্রামবাসীদের পদ্ধতি ধারাপ। একমাত্র দেশকলিত
 শাসন পুনর্কার সংনদ্ধ কাবিবে।
 যাহা হইল, এই কার্যাবিবরণী পদ্ধতি-পদ্ধতির উন্নতি চাহিয়া
 শাসন বল হইয়াছে :-

আমরা মনে করি যে যখন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, গ্রামে পঞ্চায়েৎ-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করিয়া আনন হওয়া উচিত, তখন অতঃপর জেলা অপেক্ষা অল্প আয়তনের দুগুণ হইয়া বোর্ড গঠন আবশ্যক; সেই জন্ত আমাদের ইচ্ছা, সর্বত্র জেলার অধীনে ছোট ছোট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হউক। সেইগুলি গ্রাম্য বোর্ড ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্ররূপ হইবে।”

ছঃখের বিষয়, এই বিপরীতে এমন একটি সঠক নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য হইতে সাধু হউক, ইহার সাফল্য একেবারেই অসম্ভব। কারণ, কার্য-বিবরণীতে প্রকাশ,—“ইহা একান্তাবশ্যক যে, পঞ্চায়েৎ-ব্যবস্থা সর্বস্বত্বোত্তীর্ণ হওয়ার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে ও তত্ত্বাবধানের অধীন থাকিবে। গ্রামের সমস্ত কার্যের পরিদর্শন এখন যেরূপ তহশীলদার ও মহকুমার কর্তার অন্ততঃ প্রধান কর্তব্য, পবেও তাহাই থাকিবে।”

একটা শিশুর হস্তপদ বদান কর, এবং তাহার পর তাহাকে বল যে, সে হাঁটিতে শিখুক। যদি সে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দাও। স্বাধীন শিশু আছাড় খাইয়া খাইয়াই দেহের ভারকেহে বক্ষা করিতে শিখে। শিশুকে বাধা রাখিলে সে চঞ্চলক্রিয়হীন হইয়া পড়ে, এবং কখনই হাঁটিতে শেখে না।

মাননীয় মিঃ টি, রক্তচাঙ্গির যে সুন্দর ব্যবস্থাটি মাদ্রাজের মন্ত্রণাসভায় প্রবর্তিত করিয়াব চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন, আমি আশা করি যে, ভাবতসচিব মহাশয় সেই ব্যবস্থা অনুপ্রাণন করিয়া আইনের দ্বারা পঞ্চায়েৎ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা স্থিরীকৃত করিবেন। আমি মিঃ রক্তচাঙ্গিরের সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ও মূল্যবান ব্যবস্থা গুলি ভাবতসচিবকে দিয়াছি। ইহা অসম্ভব নহে যে, তাহা মাদ্রাজে পরিচালিত হইয়াছে, তাহা পার্লামেন্টে গৃহীত হইবে।

পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি অন্ততঃ যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহা উদ্ধার করিলাম।

গ্রামের প্রয়োজনগুলি এই প্রকারে স্থাপিত হইবে। যদি সরকার হয়, তাহা হইলে উচ্চতর কর্তার নিকট পঞ্চায়েৎ তাহা বিভাগন করিবেন। গ্রামেব যাহা বক্তব্য, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রাম তাহা ব্যক্ত করিবে। আব তাহারা এখনকার মত পরমুখাপেক্ষীও থাকিবে না। গ্রামগুলি বৃহত্তর জীবনের সহিত সম্বন্ধ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পঞ্চায়েৎ গ্রামে বক্তাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আনিতে পারিবেন। গ্রামের লোক যাহাতে বিচার-বিতর্ক করিতে পারে,

তাহার ব্যবস্থা করিবেন, গ্রামবাসিগণের জন্ত আশ্রয়-প্রদান ও ক্রীড়া-
বন্দোবস্ত করিবেন। সমগ্র গ্রাম্যজীবনকে আবও উন্নত করিতে হইবে, নানাজন
ব্যবস্থার দ্বারা আরও প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আর এক কথা এই
যে, প্রত্যেক গ্রাম একটী গ্রামসঙ্ঘের অন্তর্গত থাকিয়া, অত্রাণ্ড গ্রামের সহিত
কোতাহার বোণ আছে, ইহা অনুভব করিবে, এবং এই প্রকারে বৃন্দাবন সংহত
জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গিতাবে বিবাজ করিবে।

গ্রাম যেমন সমগ্র দেশের শাসন-ব্যবস্থাকপ সর্বত্র ব্যাপ্তি, ওয়ার্ডগুলিও সমগ্র
দেশে সেইরূপ। গ্রামে যেমন পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সহরেও তেমনই
প্রত্যেক গৃহস্থের জোট গঠিয়া ওয়ার্ড-পঞ্চায়েৎ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যে
সমস্ত সহরের লোকসংখ্যা ৫ হাজারের অধিক, তাহার প্রত্যেকটীতে মিউনি-
সিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড-পঞ্চায়েৎ-সমূহ থাকিবে। যে সমুদায় সহরের লোক-
সংখ্যা ৫ হাজারের কম, তথায় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক পরিচালিত ওয়ার্ড
পঞ্চায়েতের হাতে কর্তৃত্বভাব থাকিবে। এই সমুদায় ওয়ার্ড-সভা সহরের ছোট
ছোট ব্যাপারগুলির ভার গ্রহণ করিবে। এখন এই সমস্ত ব্যাপার উপেক্ষিত হয়
কারণ, মিউনিসিপ্যালিটির উপর কালের ভাব এত বেশী যে, এগুলি তাহার
বখাষণ দেখিতে পাবেন না। প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভার
ইহাদের উপর থাকিবে। জজাল পরিষ্কার ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা, পয়-
স্কোচাগার পরিষ্কার বাধা, ভাড়ার গাড়ী ও অত্রাণ্ড গাড়ীর বিশ্রামস্থানগুলির
পরিবেক্ষণ, ঘোড়া ও অত্রাণ্ড পশুর মলপান করিবার চৌকাসসমূহের পরিদর্শন,
খাদ্যদ্রব্য-পরিদর্শন ও ভেজাল নিবারণ, স্থানীয় বিচারক নিযুক্ত করিয়া মোকদ্দম
নিবারণের উদ্দেশ্যে ফ্রাঙ্কের মত সালিসের সাহায্যে ছোট ছোট ঘামঘাম
নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, কাবখানা, কৃষ প্রভৃতির পরিবেক্ষণ, এই সকল কার্য
স্বভাবতই ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যাইয়া পড়িবে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি
আছে, সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি ওয়ার্ড-সমিতির হস্তে যে সমস্ত কার্যের ভার
প্রদত্ত হয়, সমস্ত মনে করেন, যে সমুদায় কার্যের ভার দিবেন।

(গ) তালুক বা তহসীল বোর্ড।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সোপান পরস্পরায় যাহা পরপরী সোপান ভান
পঞ্চায়েৎ ও জেলাবোর্ডের মধ্যবর্তী সমিতি। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ইহার নাম
বিভিন্ন হইবে। আষাঢ়ের নাজ্রাজে সমুদয় প্রদেশ ২৬টা জেলায় বিভক্ত; আর
এই ২৬টা জেলা ২২টা তালুকে বিভক্ত। সুবিধার জন্ত মালারন ভাবে এ

তাত্ক্ষণিক সর্ব-উষ্ট্র বলা বাইতে পারে। বিবেচনাকরণ কমিশনের কার্যনিবরণীতে এই নামটি ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহা হউক, এই তালুক বা মাজারের বাহিরে তাহার বাহা নাম, সেই স্থানগুলি, একটা বোর্ডের দ্বারা শাসিত হইবে। বিন্দুগীত এগুলিকে সর্ব-জেলা-বোর্ড বলা হইয়াছে, কিন্তু পঞ্চায়েৎ ও জেলা-বোর্ডের মধ্যবর্তী বোর্ড কর্তৃক শাসিত ভূখণ্ডের পূর্ক হইতেই তালুক বা তহশীল, এই নামটি থাকায়, তালুক বা তহশীল বোর্ড এই নামটি আপনা হইতে মনে আসে। প্রত্যেক তালুক বা তহশীলে যে বোর্ড থাকিবে, তাহার সদস্যগণ, তৎসামান্যীন ভূখণ্ডের পঞ্চায়েৎগণ ও ফিরকারি ভোট দাতৃগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। ভোট দিবার অধিকার সম্পত্তি দেয়িয়া নির্ধারিত হইবে, এবং সত্যে নামে তাহা সংশোধিত হইবে। পঞ্চায়েৎগণ সাধারণের কাজ কবিবার নিমিত্তে অবশ্য একটা ভোটের অধিকারী হইবেন, এবং তাহারই মিনি প্রধান ঠাণ্ডাকে তালুক-বোর্ডে পাঠাইয়া ঠাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ গ্রাসের যে যে বিশেষ স্বার্থ, সেগুলি বিরত করাষ্টতে পারিবেন। বিবেচনাকরণ কমিশন খুব জোবের সহিত বলিয়াছেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-পদ্ধতির বিধানে এই বোর্ড গুলি অত্যন্ত আয়ত্ব অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই বোর্ডগুলি হস্তে আবশ্যিক মত তথ্য ও উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হইবে, এবং তাহাদের বহুল-পরিমাণে স্বাধীনতা থাকিবে। মধ্যশ্রেণীর বিজ্ঞান, উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞান, গ্রামে আদর্শ বুনিফেক্স এবং সহবে কলাভবন বক্ষা করা, তালুক বা তহশীল বোর্ডের কার্য হইবে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যে-রাস্তা গিয়াছে, সেই মকল রাস্তা, দরকার হইতে বস্ত্রালা, দেওবা, গ্রামের বাহিরে কিন্তু তালুকর ভিতরে পয়ঃপ্রণালীর ও ফেনা খাল, এই সমুদয় ইহাদের অধীন থাকিবে। তাহারাই যৌথসমিতিসমূহ গঠন করিবে; যেখানে এ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেখানে গ্রামবাসিগণকে ভাড়া দিবার জন্য কৃষিকার্যের যন্ত্রসমূহ রাখিবে। শ্রমসঞ্চয় করিবার ডাঙা, গোপালন ও হস্ত সরবরাহের ভাণ্ডার, এবং বৎস-উৎপাদনের জন্য নূর ও বোটিক-উৎপাদনের জন্য অথবা ব্যবস্থা করিবে। আসল কথা, যেখানে কোষ-সংগতি নাই, সেখানে তাহা বা কৃষি ও শিল্পের স্বব্যবস্থায় ব্যবসায়িক বিধান সম্পন্ন করিবে।

(খ) জেলা বোর্ড।

আমাদের মধ্যে এমন অনেক রাজনীতিক সংস্কারক আছেন, তাহারা জেলা বোর্ড তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। আমি এখন যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জেলা-বোর্ডগুলি দখাই সদত মনে করি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের তৃতীয় সোপান—গ্রাম-দেশে জেলা বোর্ড-সমূহ, জাতি বড় বড় সহরে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ। অধীনস্থ তালুক-বোর্ডসমূহ ও তালুক-নাধারণ ভোটদাতারা জেলা-বোর্ডের সদস্য নির্বাচন করিবেন। পঞ্চায়ৎগণ নাধারণের কার্য করেন বলিয়া একটি দ্বিতীয় ভোটের অধিকারী তালুক বোর্ডের সভ্যগণও সেইরূপ আর একটি ভোটের অধিকারী হইবেন।

সনগ্র জেলার সহিত যে সমুদয় ব্যাপারের সম্বন্ধ, সেই সমুদয় ব্যাপার জেলা-বোর্ডের হাতে থাকিবে। তাহার। তালুক বোর্ডের সমুদয় কার্য পরিদর্শন করিবে, তালুক বোর্ডে বিচারনিপাতির বিরুদ্ধে পঞ্চায়ৎগণ কোনও আপীল করিলে, তাহা নিষ্পত্তি করিবে। স্থানীয় কবের কত অংশ তালুক আদালত করিবে, তাহা নির্ধারণ করিয়া দিবে; এবং প্রাদেশিক সভা ঘোষার জন্ত ধাং-মঞ্জুর করিবেন, তাহা কত অংশ কোন তালুক পাইবে, তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিবে। জেলা বোর্ড জেলার নাধারণ পূর্ত-বিভাগের জন্ত ইত্তিনীয়াব, তালুকের উচ্চ শ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্ত পরিদর্শক, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক প্রভৃতি, নিযুক্ত করিবে। সবকাবী রাজা, স্থানীয় বেল, খাল প্রভৃতি তহবিল হাতে থাকিবে। জেলার সদর-সহরে জেলাব আপিস আদালত প্রভৃতি এবং শিল্পবিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প প্রভৃতি-জন্ত কলেজসমূহ থাকিবে।

এমন কি, লর্ড রিপণেব সময়েও, স্বায়ত্তশাসনের তিস্তিস্বরূপ হই একটি নির্দল প্রতীষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। কীন বলেন, “হোমরুলের বীজ পূর্ব হইতেই ছিল, কেবল বে পলীগ্রাভেই প্রাচীন ও চিরাগত প্রতীষ্ঠানসমূহ ছিল—যাহাদের কথা সর্বদাই বর্ণিত হইয়া থাকে—তাহা নহে; ছোট ও বড় সহরে স্থানীয় সভা কর্তৃকই মঞ্জুর পরিদর্শন এবং রাস্তাগুলি ঠিক ঠাক রাস্তা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হইত।”

এই কয় বৎসর উন্নতি খুব কম হইলেও, কিছু উন্নতি হইয়াছে। যখন বোর্ডের সমুদয় সদস্যই নির্বাচিত সদস্য হইবেন, সভাপতিও নির্বাচিত হইবেন, এবং শাসিত ক্ষেত্রের উপর বোর্ড প্রকৃত কর্তৃত্বলাভ করিবে, তখন প্রগতিতে উন্নতি হইবে। “হোমরুলের” অভ্যাবশ্যক অংশকপে যখন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি হইবে, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, গ্রাম্য পঞ্চায়তেরা তুচ্ছমণ্ডোকা, বেতমাণ প্রভৃতি অপমানজনক শাস্তিসমূহ উঠাইয়া দিয়াছে, এবং গ্রামবাসীগণ সম্মানের বোগ্য স্বাধীন মনুষ্য-প্রাণ্য ব্যবহাৰ পাইতেছে। অধিকন্তু সুবিদ্যাজনক কেন্দ্রসমূহে কৃষিক্ষেত্র দেওয়া হইতেছে, এবং শিক্ষা ও পবীকরণ জন্ত কাল

কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বহীশূবে এই প্রকারের চিন্তা কৃষিক্ষেত্র
 আছে। উন্নততর কৃষিক্ষেত্রের জন্য, উপযুক্ত মাণ ও উৎকৃষ্ট বীজাদি
 বিদেশী ব্যতীত গণ্য করা যায়। বনবিভাগের আইনসমূহ পরিবর্তিত
 হয়েছে। এবং গোষ্ঠীকালে এখন গণ্ডারগণের জন্য ভূমি প্রস্তুত হইতে, সেইরূপ
 দ্রষ্টব্য হইবে। শেষ কার্যবিবরণিতে দেখিতে পাই যে, — বহীশূব রাস্তা দ্বারা
 ভাঙ্গা অস্তিত্ব সমূহ প্রাপ্তি পত্রসমূহ চারপাশের জন্য বনের অধিকাংশ ছাড়িয়া
 দেওয়া হইয়াছে। গোয়াল বনম অথবা, সেই অবস্থার উপযোগী প্রাচ্য বিধান-
 সমূহ প্রণয়নপূর্বক পরিচালনা করিবেন, অধিকবয়স্ক রাস্তাগণের মধ্যে যাহা-বা
 প্রয়োজ্য নিশ্চিত আছে, তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবেন। আর
 তালুকবার্ড, যেদ্রপ বলা হয়, সেইরূপ বীজবন্ধা, শস্যসঞ্চয়, কৃষিক প্রভৃতি
 ব্যবস্থা করিবেন। ছায়া ভাঙ্গা দিয়া লোকের ভাঙ্গা ব্যবহার করিবেন। ভাল
 বুঝিমান ছেলেরের বৃত্তি দিয়া, তাহাতে তাহারা ক্ষুণ্ণ হইতে ক্রমেই থাকিতে পারে,
 বা ভালরূপ কৃষিক্ষেত্র অথবা শিল্প শিক্ষা করিতে পারে, তাহার সুবিধা করিয়া
 দিতে হইবে। এই সমস্ত কথা কহা নহে, অস্তিত্ব সভ্যদেশে যেখানে হোমরুল
 আছে, সেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। জাপানের সমস্তের শিক্ষাবিস্তার
 অনুষ্ঠান—যাহা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হয়, তাহাতে তিনি আদেশ করেন যে,
 “আজ হইতে এমনভাবে শিক্ষা দিতা করা হইবে যে, কোনও প্রাচ্য একটিও
 অশিক্ষিত পরিবার থাকিবে না, এবং কোনও পরিবারে এক জনও অশিক্ষিত
 থাকিবে না।” আমেরিকাতে ইহার ২৪ বৎসর পরে, জাপানে, দিখালমে
 বহীশূব উপযুক্ত-বয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন বিদ্যালয়ে
 থাকিতেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যয় এখন দেশের লোকের দ্বারা চালিত হইবে,
 তখন জাপান যাহা করিয়াছে তাহাও তখন কেন তাহা করিতে পারিবে না? কারণ,
 এ কথাটা ভুলে চলিবে না যে, শিক্ষিত সম্ভ্রান্তের মূল তাহাদের পিতৃপিতা-
 মহোদয় প্রাপ্তি, এবং অনেক উজ্জীল কুটুম্ব ব্যয়ত। জাতিভেদ নহেও
 শাস্তাভ্যাসে অপেক্ষা এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যাহা অন্তর্নিহিত অনেক বর্ণা,
 এবং মহোদয় ও প্রাচ্যের অধিবাসিগণের মধ্যে সম্বন্ধও বেশ ঘনিষ্ঠ। রাস্তার
 পরিবর্তনের বুদ্ধিমান ব্যয়ত উচ্চ হয়; যাহা তখন বুদ্ধি নাই, সে রাস্তা
 থাকিবার কারণ। দেশবাসিগণের দ্বারা পরামর্শের এই যে সমস্ত সহায়ত,
 জাপান মহানতার দ্বিতীয় অধিবেশন হইতে তাহা অনেক মন্তব্যে আন্তর্জাতিকতার
 দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও তল হয় নাই। এখন আমেরিকা হোমরুল
 পুঙ্খবৎ এখন এই সমস্ত দ্রষ্টব্য ক্রমেই পরিণত হইবে।

(ঙ) স্থানীয় গবর্নেন্ট বোর্ড।

স্থানীয় শাসনপদ্ধতির মাধ্যমে উপর একটা স্থানীয় গবর্নেন্ট বোর্ড থাকিবে, ইহার কার্যসমূহ প্রাদেশিক মন্ত্রণালয় আইনের দ্বারা সীমিত হইবে। এই আইন ও এই আইনের সমর্থক অন্যান্য বিধানগুলি খুঁটাবেন নাকাল গবর্নেন্টের আইনের ধরণে হইবে। গত মাসে দিল্লীতে হোমরুল সমিতিসমূহের আবেদনপত্র ইহাই প্রস্তাবিত হইয়াছে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ইংলণ্ডের রাজকীয় স্বাস্থ্য-কমিশন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা এ স্থলে বেশ প্রযোজ্য। অবশ্য ঐ মন্তব্য তথাকথিত বিদেশ ভ্রমণের অনুরোধে এক জন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-কর্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, —

“এক জন পরিচিত ও বিশেষ শক্তিদ্বারা মন্ত্রী থাকিবেন; তিনি যে সমস্ত শাসনশক্তি কেন্দ্রস্থ করিবেন, অর্থাৎ নিজের হাতে রাখিবেন, তাহা হইলে পক্ষান্তরে, তিনি স্থানীয় শাসন-কার্যের প্রাণ-শক্তিকে ক্রিয়াক্ষিত করিবেন— কেন্দ্রকে কেন্দ্রস্থ চালকশক্তির বাহা কাঁধে ঠিক তাহাই করিবেন। সাহায্যের ক্ষমতা উপদেষ্টার দ্বারা দেশের যাবতীয় স্থানীয় গবর্নেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের কর্মসমূহ এই কেন্দ্রশক্তির শরণ হইবেন।”

ইংলণ্ডের স্থানীয় গবর্নেন্টের চারি দিকে যে সমুদয় অস্থবিধা, তাহার ভিত্তিতে কমিশনারগণ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আনন্দের সাক্ষ্যের দিগুনি সিগ্যালিটীর সত্যপতি যে নৈরাশ্রপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই বর্ণনীয়। —

“লোকদিগের ভীষণ ও দাসীভাব প্রকাশ বড়ই দুর্লভ। নিজের উপর ট্যাক্স বসাইতে সর্বদাই নীরাজ; কাজের বেলায় বিজ্ঞানের উপর তাহারও বিশ্বাস নাই। স্বাস্থ্যবিষয়ক বিধান ভঙ্গ করিয়া বাহাবা আনন্দ পায়, তাহাদের সংখ্যা খুব অধিক; এমন কি, বাহারা স্থানীয় ব্যাপারের কর্তা, এবং আইন অনুসারে বাহাতে কাজ হয়, ইহা সেখা বাহাদের কর্তব্য, তাহাদের মধ্যে অনেকেও এও বলেন।”

ভাবতপ্রবাসী ইংরাজেরা সম্পূর্ণ স্থানীয় স্বাস্থ্যশাসন নিজে নিজে করে। তাহারা যে অল্প কিছু দিরা বছর ধরিয়া তাহার পরীক্ষা চানাইতে চাছেন, ইহাও হেতুস্বরূপে এই সমুদয় বাধারই মোহাই দেন। ইংলণ্ড ও ইংরাজের সমুদয় এই সমুদয় বাধা বিজ্ঞান, অথচ তাহারা মনে করেন যে, এই সমুদয় বাধা আছে বহিরাই স্থানীয় সোকেস স্বাস্থ্যশাসনের শক্তিক সঞ্চালিত হইতে পারে।

সেই ব্যবস্থার বশবর্তী থাকিয়া কার্য করিয়াছি। কিন্তু আমাদেরকে এখন
সাধিতে হইবে যে, প্রাচীন যুগ ও নবীন যুগের যে সন্ধিকাল, সেই কালের জন্য
ঐ ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল। সেই যুগসন্ধিকালে দেশ যাহাতে সেই ব্যবস্থায় কার্য
করিতে পাবে, সে জন্য দেশকে প্রস্তুত করা আমাদের কর্তব্য। ব্যবস্থাপক-
সভার ১৯ জন সদস্য যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধের পর যে সমস্ত
সংস্কার হওয়া উচিত, তাহাবই কথা আছে। জাতীয় সমিতি ও মুসলমান
সমিতির ব্যবস্থাপত্র একটি সেতুর মত। বর্তমান অবস্থা হইতে, গত বৎসরের
জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যে যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, সে অবস্থায় পছন্দ হইয়া
সেতু। জাতীয় মহাসমিতির মন্তব্যের সে অংশ এই:—

“সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনকালে ভারতবর্ষ পবাধীনভাবে অবস্থা হইতে সশস্ত্র
শাসনাধীন রাজ্যসমূহের সহিত সাম্রাজ্যের সকল ব্যাপারে সমান অধিকার
পাইবে।” ইহাই এখন আমাদের আসন্ন লক্ষ্য। কংগ্রেসের ব্যবস্থাপত্র সন্ত-
ত্ব নীতি স্বীকৃত হইতেছে, তত দিন আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিতে থাকিব।
শেষ ব্যবস্থা অবশ্য এই থাকিবে যে, পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন শাসনে” ভারতবর্ষের সমস্ত
রাজ্যগুলি যথাযোগ্য স্থান পাইবে, এবং সাম্রাজ্যের মহাসভায় ভারতবর্ষের
প্রতিনিধিগণ বসিবেন। এই সমুদয় কথা আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্রে বাদ দিয়াছি।

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাগুলি কি করিবেন, এই সাধারণ প্রশ্নের উত্তরে
আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, জেলাবোর্ডকে টাকা সংগ্রহ করা তাহাদের
কার্য হইবে। জেলাবোর্ড আবার তাহাদের অধীনস্থ তালুকবোর্ড ও গ্রাম-
বোর্ডকে টাকা বিতরণ করিবে। সংগ্রহী টাকা কি ভাবে ব্যবহার হয়, তাহাতে
হস্তক্ষেপ করা হইবে না; তবে যখন খুব সুস্পষ্ট অনির্ণীত কার্য হইবে, তখন
স্থানীয় গবর্নমেন্টের সভাপতির হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। স্থানীয় স্বায়ত্ব-
শাসনকে যদি প্রকৃত কিছু কবিতো হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কাজ করিবার
ও ভুল করিবার স্বাধীনতাও দিতে হইবে। তবে ঐ ভুল যেন একেবারে
সর্বনাশের না হয়।

তাহাদের আর একটা প্রধান কার্য এই হইবে যে, তাহারা সমগ্র প্রদেশে
শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবেন। সাধারণের হিতকর যাহা কিছু, তাহা
পরীক্ষা বিষয়ে জেলা-বোর্ডগুলিকে সাহায্য করিবেন। এইরূপ কবিলে একই
বিষয়ের অনুসন্ধান পুনঃ পুনঃ করিবার যে ব্যর্থত্ব, তাহা নিবারিত হইবে।
এই প্রকারে মহীশূর-রাজ্যে ‘রাগী’-গাছ, ইক্ষু, চীনাবাদাম, আরেকা বাগান,

জ্বা, এই সফল সংক্ষেপে যে পর্য্যাপ্তগুলি হইয়াছে, তাহা সমস্ত রাজ্যেই উপকারে লাগিয়াছে। বড় ও ছোট কল, দ্রবিস্থনা, লাক্স-চাঙ্গন, বীজ-সাজান প্রভৃতি ব্যাপারের প্রদর্শনী-কার্য্য প্রাদেশিক কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক চালিত হইত। এই সমস্তই ভাল হইবে। তালের চিনি প্রস্তুত করিবার ও গুণোন্নতি সাধার যত্ন করিবার উন্নত পদ্ধতিসমূহের প্রদর্শনীও তাহাদের দ্বারা হইলে ভাল হয়। মহীশূরে এই সমুদয় পরীক্ষা দেখিবার জন্য বহুসংখ্যক রায়তের সমাগম হইত। বক্তৃতা ও চলিত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ বিতরণ-কার্য্যও সেখানে হইত। ছয় প্রকারের নূতন লাক্স প্রবর্তিত হইয়াছিল, এবং ভাড়ায় থরিদ পদ্ধতিতে বিক্রীত হইয়াছিল। ধাতুদ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, ছত্রক-তন্তু ও কীটতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা ও সুসজ্জিত কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারের দ্বারা ইংরাজীকরণে অধ্যুগিত হয়। অভিজ্ঞতা-সাতের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিভাগের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। মহীশূররাজ্যে রায়তগণ এই সত্য উপদেশ সাগ্রহে শুনিতেন, রিপোর্টে ইহা পড়িয়া খুব আনন্দ হয়।

একটি ভাবিতব্যীয় রাজ্যে ভাবতীয়গণ তাহাদের স্বদেশবাসিগণের জন্য কি করিয়াছে, তাহা জানাইবার জন্যই আমি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। ধারার ক্ষতি, ইহাতে তাহার সাহায্য পাইবে, এবং বৃদ্ধিতে পারিবে যে, যোমকল বলিতে সমুদ্রি বুঝায়, হ্রদেব নহে।

পর্য্যায়-ক্রমিক স্বায়ত্তশাসন ।

সম্প্রতি দেশে এক নূতন হাইকোর্ড ব্যবস্থা প্রসঙ্গ গজাইয়া উঠিয়াছে। এ অল্প পূর্বে ইহাতে ইচ্ছা-ভাবতীয় সংবাদপত্রসমূহে বেশ যত্নপূর্ব্বক প্রাথমিক আভাস হইতেছিল। ইহা পর্য্যায়ক্রমিক স্বায়ত্তশাসন নামে পরিচিত। ইউরোপীয়গণ সাগ্রহে ইহার সমর্থন করিতেছেন।

এই ব্যবস্থা প্রণালী দুই দল কর্তী খাড়া করিতে চায়। এক দল এখন যেমন আছে, তিফ ন্যেইকপ হইবে; অর্থাৎ, দেশের লোকের নিকট তাহাদের দায়িত্ব থাকিবে না। টাকা-পত্র উপর অর্থাৎ প্রকৃত শক্তির উপর তাহাদের সম্পূর্ণ বর্ত্ত্ব থাকিবে। আর এক দল দায়িত্ব-সম্পন্ন, — মন্ত্রণালয়ের প্রাণশূন্য ছায়ামেহেব মত। তাহারা মন্ত্রী নিরীকচিত হইবে, সবকালের এক বা ততোধিক বিভাগ শাসন করিবে, এবং আসল গবর্নেন্ট যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে ক্রমে অধিক ক্ষমতা পাইবে; অর্থাৎ সরকার যদি অপছন্দ করেন, তাহা

হইলে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে। শিল্প ও স্বাস্থ্যবজ্জার মত আবশ্যিক বিভাগ তাহাদের হাতে দিয়া, তাহাদের পক্ষান্তর নাহাতে নিশ্চিত হয়; আসল গবর্নেন্ট তাহার ব্যবস্থা সহজেই করিতে পারেন; কারণ, এই দুই বিভাগে খুব বেশী টাকাব দরকার। এই দুই বিভাগের ভার দিয়া আসল গবর্নেন্ট বলিবেন যে, সবকারের এখন টাকাব খুব দরকার, তাহাও তোমরা বেশী টাকা মঞ্জুরী পাইবে না। তখন এই দায়ী কর্তার দলকে অযোগ্য বলিয়া খিলাব দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া চলিবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের শিক্ষা মনে রাখিতে হইবে—কারণ, তাহাও এই প্রকারের ব্যবস্থার একটা পরীক্ষা। দুইন ব্যবস্থার আসল গবর্নেন্ট যে স্থান অধিকার করিবেন, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারিগণও ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া যাহেন। অতঃপর, আসল গবর্নেন্ট এই দায়ী কর্তাদিগকে গোণ অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক বিভাগগুলির ভার দিয়া, তাহাতে তাহাদের কাঁচা হাত পাকাইতে যথেষ্ট পারেন। কাজেই যদি তাহাবা বিফল হয়, তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, এবং দেশ তাহাদের প্রতি উদাসীন হইয়াই থাকিবে। এই ব্যবস্থাব বিচার আরও অনেক আপত্তি আছে। ঋণী চাহিলে বেয়ন পাথব দেওয়া, ইহা ঠিক তেমনি। মূল আপত্তি এই যে, যখন ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে, এখন তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাধীন করিয়া রাখা হইবে। ভারতবাসিগণের শক্তির উপর আশ্রয়-ভ্রমের যে স্বভাবসিদ্ধ গভীর অবিশ্বাস, ইহার মধ্যে তাহা নিহিত—ইহার মধ্যে আবও ভয়ানক স্পর্ধা এই রহিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে শিশুর মত হাতে ধরিয়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা করিয়া চলিতে বলা হইতেছে। কারণ, অল্প জ্ঞান জাতি চাহিতেছে যে, সে ভারতবর্ষ শাসন করিবে, এবং তাহাব ক্ষমজিত ভোজনপাত্র হইতে যখন খুসী তখন স্বাধীনতা 'গুঁড়া লাড়া' তাহাকে ফেলিয়া দিবে। ইংলণ্ড ও মন্ত্রিসভা শক্তিপুঞ্জ সমুদয় জগতের সম্মুখে যে সত্যকথনীর যোষণা করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রত্যেক নীতির বিরুদ্ধ। জাতীয় মহাসমিতি একটি হুনির্দিষ্ট সংস্কারের ব্যবস্থা চাহিয়াছে—তাহাব ধাঁধা আসল তথ্য তাহা প্রতীকৃত না হইলে কংগ্রেস কিছুতেই নিরস্ত হইতে পারবে না। আমরা আবও অধিক চাহিতে পারি, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কাঁচা চাহিতে পারি না। স্বাধীনতার সংগ্রামে জাতিসমূহ 'ক্রমশঃ' অগ্রসর হয়, পিছু হটে না।

প্রতিনিধি-প্রেরণ।

আমার বোধ হয়, আপনাদের ব্যবস্থাপনা অন্তিমের প্রকারে বাধে গিয়াছে

কবিবাব উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টে অ ইনের প্রস্তাব উঠিলে তদীয় আলোচনায় স্মৃত্য
আমরা ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহাদের উপর
এইরূপ আদেশ দিবেন যে, তাঁহারা যেন মূল স্মৃতিগুলি অটলভাবে ধরিত্তা থাকেন।
অর্থাৎ প্রধান ও প্রাদেশিক ন্যায়দাপক-সভায় নির্বাচিত সভ্যের বিশিষ্ট
সংখ্যাাদিকা এবং বাজকোষের উপর প্রভুত্ব বিষয়ে তাঁহারা যেন অটল থাকেন।
এই দুইটা ক্ষমতা যদি না দেওয়া হয়, তবে প্রস্তাবিত সঙ্কাবেব আলোচনা
নিষ্ফলোত্তর হইবে। যদি এই দুইটা দেওয়া হয়, তবে অব্যক্ত বিষয় যুক্তিতর্ক
চলিতে পারে।

যদি এই স্মৃতি প্রতিনিধিবর্গ প্রেরিত হন, তাহা হইলে আমরা এখান হইতে
তাঁহাদের সমর্থন করিবার জন্য সব জোরে আন্দোলন করিব। এইরূপ বলা
এইটা থাকে যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংলণ্ডেই সংগ্রাম করিতে হইবে।
আমাদের যাহা দাবী, তাহা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ইংলণ্ডের সম্মুখে ধরিতে হইবে,
এই ভাবেই হইয়া সত্য। কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ হইবে এইখানে; কারণ, ভাবতবর্ষ দৃঢ়-
ভাবে যাহা সম্মুখে দাবী করিবে, ইংলণ্ড আইন প্রণয়ন করিয়া দেইটুকু নাকি
দিবে। শক্তিশালী শ্রমজীবী-সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্মতিসূচক ভোট দিয়া আমাদের
সাহায্য করিবেন। আমরা যে স্বাধীনতা-লাভের জন্য রতনসংকল্প, এইখানেই
কোনোদিককে আমাদের কাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা।

যে নতুন শক্তি দেশের লোকের হাতে দেওয়া হইবে, যাহাতে সেই শক্তির
সদ্যবহার করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে
বিশেষরূপ সাহায্য না করিলে চলিবে না। সে জন্য প্রত্যেক প্রদেশের যাহা
কথিত ভাষা, তাহাতে কল চালাইতে হইবে। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষায়
সাহায্যেই তাহাদের জ্ঞানে অসুস্থতি ও মস্তিষ্কে চিন্তার সৃষ্টি সম্ভব।

দীর্ঘ হউক, আর বিলম্বই হউক, অবশ্য দীর্ঘই বাঞ্ছনীয়, সমস্ত প্রদেশ-
গুলির সীমা কথিত ভাষায় হিসাবে পুনর্গঠন করিতে হইবে। বাজকার্কেই
ভাষা কিছুদিনের জন্য ইংরাজী ও প্রাদেশিক ভাষা এই উভয়ই থাকিবে,—
যেমন কানাডার কোনও কোনও অংশে ফরাসী ও ইংরাজী উভয় ভাষাই
ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলেই সমুদয় লোক জাতীর সাধারণ জীবনে তাহাদের
ভাষা পূর্ণরূপে ভাগ করিতে পারিবে।

আমাদের আসন্ন সনদ নব্বকে আমার বক্তব্য এই যে, আমবা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে প্রার্থনা করি যে, ১৯৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পার্লামেন্ট অট্টোলিয়া সাধারণ-চত্বের ধরুণে তারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা আইন পাশ করুন—তাহাতে যেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে—একাত্তর না হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বে ঐ আইন আনগে আসিবে। মধ্যবর্তী এই পাঁচ বা দশ বৎসবে ইংলণ্ডের নহিত সংশ্লব অক্ষুণ্ণ রাখিবা (যেমন উপনিবেশ সমূহে আছে), শাসনশক্তি ইংরেজের হস্ত হইতে তারতবাসীর হস্তে হস্তান্তরিত করা হইবে।

এই হস্তান্তর কার্য ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবে। প্রথমতঃ কনগ্রেস ও মোসলেম লীগের অমুমোদিত সংস্কার প্রণালীর অনুরূপ কোন প্রণালী প্রবর্তিত কবিয়া ভোট দিবার অধিকার বিস্তৃত করিতে হইবে। ঐ প্রণালীর আনল কথা এই যে, কার্যকারী সমিতির একাধি ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সভাগণের ভোট দ্বারা নিযুক্ত করা হইবে, নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের রাজকোষের উপর কর্তৃত্ব থাকিবে, এবং কি, প্রাণেশিক কি মার্কসদেশিক—সর্বত্র ব্যবস্থাপক সভার জাহানিগের সংখ্যাধিক্য থাকিবে।

আমবা প্রথমে প্রতিনিধি নির্বাচন চাহিয়াছিলাম—ইহাতে নাকি প্রভুদ না হইগেও প্রভাব হয়। বিদ্য কার্যে দেখা গেল উহা অকিঞ্চিৎকর। এখন আমবা ভারতশাসন কার্যে অংশীদার হইতে চাই। গবর্নমেন্টের সভাভঙ্গন (dissolution) ও 'ভিটো'র (veto) ক্ষমতা থাকিবে; আর প্রকৃতি-পুঞ্জের রাজকোষের উপর প্রভুত্ব থাকিবে। ইহাই দ্বিতীয় ক্রম—সমরক্ষণময়ব শান্তিধারি ও সহযোগিতা। তৃতীয় ক্রম হইবে, পূর্ণাঙ্গ হোমরুল বা স্বরাজ— ১৯২৩ বা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বর্তই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা মোসলেম লীগেব নিবট বিনষ্ট মাশবোর প্রত্যাশা করি।

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি এইরূপ হইবে,—

(১) সমস্ত ব্যবস্থাপক-সভার ন্যূনতম সদস্য নির্বাচিত সদস্য হইবেন।

(২) ইহারা সরকারী কাছ করেন, তাঁহারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন, কিন্তু নির্বাচনের প্রার্থী হইতে পারিবেন না; যতদিন তাঁহারা লাভ-জনক সরকারী পদে নিযুক্ত থাকিবেন, ততদিন তাঁহারা কোনও রাজনীতিক আদায়বাদে যোগ দিতে পারিবেন না। অবশ্য, ইহারা পেঙ্গা-প্রাপ্ত ও অবসর-প্রাপ্ত কর্মচারী, তাঁহারা ইহাে মধ্যে ধর্তব্য নহেন।

(৩) প্রধান ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক-সভাসমূহে একটিনিমিত্ত 'চেষ্টা' থাকিবে।

(৪) রাজা যেমন তাঁহার স্বকীয় অধিকারে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্য হইতে, এবং স্বয়ং, বড়নাট ও ছোটনাট নিয়োগ করেন, এবং অধিকাংশ প্রয়োজনীয় রাজ্যের যিনি প্রধান সচিব, তাঁহার অনুমোদনে কাজ করেন, সেইরূপ রাজ্যে সদস্য-সভাব এক জনকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আদেশ করিবেন—এই মন্ত্রিসভাব প্রত্যেক সভা প্রিভি-কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সভা হইবেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভা-রূপে সাধারণ ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন এবং সেই সাধারণ ব্যবস্থাপক-সভার যদি তাঁহাদের উপর বিশ্বাস নাই, এই ভাবের মস্তব্য গৃহীত হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্রিসভা পরিবর্তিত হইবে।

(৫) ভারতবর্ষ-রক্ষার জন্য সৈন্যদল ও নৌবিভাগ, সাম্রাজ্য প্রতিনিধি বলিয়া বড়নাটের অধীন থাকিবে, এবং ভারতবর্ষের কব হইতে তাহাদের গণ্য নির্বাহিত হইবে। সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে কি দিতে হইবে, তাহা সময়-পরিধে ও ভাবত সবকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৬) বাণিজ্যার্থ নৌবিভাগের গঠন, নিয়ন্ত্রণ, ও আনুকূল্যদানের ভার ভারত-সাম্রাজ্যের হস্তে থাকিবে, এবং অন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও যুদ্ধের পক্ষ সকল দেশের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে। (৩) (৪) (৫) মন্তব্য সম্বন্ধে আদি আয়ত্ত বলিতে চাহি যে—

(৩) প্রস্তাব সম্বন্ধে অনেক ভর্তুকি উপস্থিত হইবে। কিন্তু ইহা না বুঝিলে চলিবে না যে, ভারতবর্ষে স্বার্থের ও মতের বোঝা বৈচিত্র্য, তাহাতে তাড়াতাড়ি আইন-প্রণয়ন, যাহা দ্বারা করা বিত্তীয় গণনা-সভার কাহা, তাহাও সম্ভাবনা নাই। গভর্নর কর্তৃক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকারও কোনো ব্যবস্থা 'ভিটো' করিবার অধিকার ভারতের মত স্থিতিশীল দেশে যথেষ্ট সংকল্পের কার্য করিবে।

(৪) ইংলণ্ডে ক্যাবিনেটের কোনরূপ বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ভিত্তি নাই। রাজা মন্ত্রি-সভার সহযোগে অর্থাৎ রাজা ও তাঁহার প্রিভি-কাউন্সিলের গণ বাধ্যশাসন করেন। দ্বিতীয় জর্জ ইংল্যান্ডে তাহা জানিতেন না; কারণই তিনি কাউন্সিলের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এখন ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাব কমতাব উন্নতি হইতে লাগিল। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক সদস্যকে প্রিভি-

কাউন্সিলাবের উচিত মপথ নইতে হয়। মন্ত্রিসভা সেইরূপ গেলেও মন্ত্রিগণ প্রীতি-কাউন্সিলার থাকেন; যখন রাজ্যসংক্রান্ত বিপীষ্ট বিষয়ের আলোচনা হয়, কেবলমাত্র সেই সময়ে মন্ত্রণাসভায় আহুত হন। রাজ্যের অধিকারকে আনন্দের অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; অথচ মন্ত্রিগণ যাহাতে এ দেশের সাধারণ ব্যবসায়িক-সভার নিকট দায়ী থাকেন, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) প্রস্তাবিত “ভারতীয় সৈন্ত”র অর্থ,—ভারতবর্ষের অধিনাসিগণের দ্বারা গঠিত সৈন্তদল। ইহার কার্যকারিগণও ভাবতবর্ষের লোক হইলেন। ইংরাজ সৈন্ত তাহাব অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা হইলে, ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড অর্থ-ব্যয়ের দায় হইতে বিদ্ধক্লিষ্ট হইবে। এখন বিদেশী সৈন্ত অল্পদিন কাজ করিয়া বিলাতে ফেরত যাব; তাহাদের যাতায়াতের খরচ যোগাইতে হয়, বিলাতে ডিপো রাখিতে হয়, এবং সৈন্ত সংগ্রহাদির জন্য অনেক ব্যয় করিতে হয়। ভারতীয় সেনা প্রাদেশিক টেরিটোরিয়াল ও বৃহৎ বিজ্ঞানের দ্বারা গঠিত হইবে।

ভারত-সচিব।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ চিরদিন ভারত ইতিহাসে একটি শ্রবণীয় বৎসর হইয়া থাকিবে, কারণ, এই বৎসবে ভারত সমস্ত ইংলণ্ডের শাসননীতির হঠাৎ পবিত্রীকৃত হইয়াছে। এই পরিবর্তন এত দ্রুতগতিতে হইয়াছে যে, ইহার শীঘ্রতায় বিস্মিত হইতে হয়। কারণ আমরা—যাহারা এই পবিত্রীকরণের দৃষ্ট প্রবন্ধ করিগছি—আমরাও ইহাতে বিস্মিত হইয়াছি। বিগত ২০শে আগষ্ট গত বৎসবের কংগ্রেসের প্রথম দাবি—দুহাতঃ না হইলেও অঙ্গপতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা চাহিয়াছিলাম যে একটি রাজকীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হউক, কারণ ঐক্য করিলে বেশ শ্রুশোভন ও চিত্তাকর্ষক হইবে এবং আনন্দের সন্ধান। আরও জনপ্রিয় হইবেন। তৎপবিত্রীকৃত বিলাতের মন্ত্রিসভা রাজকীয় অঙ্গুষ্ঠার ঘোষণারূপে রাজ্যদেশ দিক্কাপিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে পবন মন্ত্রণার ভারত রাষ্ট্রসচিব অন্তান্ত খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাব শুভাগমনের কি ফল হইবে এখনও বলা যায় না। তবে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রীযুক্ত বড়লাট ও ভারত-সচিব উভয়েই ভারতের প্রতিনিধিবর্গের বক্তব্য মিত্রভাবে ধৈর্যের সহিত শুনিতেন। বর্তমান আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কোন লোকমতকে

প্রত্যাহ্বান করা হয় নাই। গোকদাও তিলক, মহাত্মা গান্ধি এবং আসাম
বক্ষ্যও আমবা সম্পূর্ণ বলিতে পাইরাছি। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের প্রদান
সদস্যদিগকেও ঐরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। হোমরুল লীগের সম্বন্ধেও বেশ
লম্বাবহার করিয়াছেন।

অবিধাৎ দেবতার হস্তে। পূর্বাবধি তাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা ক্ষত আছে,
তাঁহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাদের প্রভাব
আমাদের অবিরোধিত নাই। কিন্তু ভগবানের শ্রমবিচারে আসবা বিশ্বাস করি।
আরও বিশ্বাস করি যে, যে সকল ইংরাজ তাঁহাদের অশেষ চিরন্তন চান।
অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পক্ষাঘাতন করিবেন। ইংলণ্ডের শ্রম-
জীবী-সমবায় কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সহিত যে, ভাড়াভাবে প্রতিনিধি
বিনিময় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ ও ভারতীয় গণতন্ত্রের
নথীতে ভাড়াভাবে প্রকট নিদর্শন। হোমরুল লীগ অগামী মাসের বার্ষিক
শ্রমজীবী-সম্মিলনে মিটার ব্যাপ্টিষ্টকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং
শ্রমজীবী-সমবায়ের প্রতিনিধি হইয়া মেজর গ্রেহাম পোল এম্পেয়ে আনিয়াছেন।
আমি আশা করি যে, কংগ্রেস ও শ্রমজীবী-সম্মিলনে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাই
বেন এবং সমবায়ের প্রতিনিধিকে সাদর-স্বাগত করিবেন। এইরূপে ইংলণ্ড
ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে গ্রহি রচিত হইবে, তাহাতে উভয়ের মিশন প্রতিষ্ঠিত
হইবে। এই জন্ত এবং ভারত-সচিবের ভারত-আগমন জন্ত ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একটা
গণনীয় বৎসর হইল।

অন্তরীণে আবদ্ধ-ভাড়াগণ ।

এই উপলক্ষে মুসলমান জননায়ক মহম্মদ আলী ও সৌকজ জাঙ্গীরা অগ্নি
শক্তিতে আমরা গভীর হৃৎ প্রকাশ করিতেছি। স্বদীর্ঘ ৩১ বৎসর কাদ
তাঁহাদের রাজনীতিক জীবন স্তম্ভিত বহিয়াছে—এবং অন্তরীণে তাঁহারা জীবনে
মরণ হস্ততব করিতেছেন। তেজস্বী স্বদেশ-প্রেমিকেব পক্ষে ইহা অপেক্ষা
প্রাণিকর ও অপমানজনক দণ্ড হইতেই পারে না। যদি মানিয়া দাওয়া যায় যে,
তাঁহারা গুরুতব অপরাধে অগরাবী তাহা হইলেও সেই অপরাধের যথেষ্ট
প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমরা তাঁহাদিগকে নির্দোষ বলিয়া বিশ্বাস করি এবং
তাঁহাদের স্বদেশে আসার জন্ত তাঁহাদিগকে সম্মান করি। আমরা অগ্নি তাঁহাদের
পদপ্রান্তে আমাদের তত্ত্বিপূর্ণ সম্বন্ধনা উপহার দিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই
জানি যে, যখন তাঁহারা কারাগার হইতে মুক্তিলাভ হইয়া স্বগ্রাম্যতির হৃৎ

পাইবেন, তখন তাঁহাদের এই পার্থক্যব্যাপী স্বর্ণাভোগ দ্বিতীয় আকারে পরিণতি পাইবে।

আমাদের দলাদলি।

ভারতবর্ষের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি যাহারা দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমাদের রাজনীতিক সংঘ-বন্ধ কখনোই আত্মগত ভেদসাবনের প্রবৃত্তি খুব বেশী। বিপক্ষ দল আমাদের প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা না দিবার ইহাকেই হেতু বলিয়া নির্দেশ করেন। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, এই আত্মভেদ হয় বলিয়াই প্রজাতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। অনেকের নিকট এ উক্তি প্রেহেলিকাব মত মনে হইতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আমাদের জাতির মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, এবং অনেক প্রকারেও মত আছে। আমরা স্বাধীনতা-ভাষার জন্ত চেষ্টা করিতেছি। আমাদের এই জাতির মাঝে উপর এক সবকার আছে; সমস্ত ক্ষমতা ও সমুদয় প্রকৃষ্ট তাঁহার অধিকৃত; এই সবকার, যাহাকে অতিরিক্ত পরিবর্তনের পক্ষপাতী বলিয়া বিবেচনা করেন, শাসনবিভাগের হুঁমের জোরে তাহাকে চূর্ণ করিতে পাবেন। যে সকল বিধানে সবকারের এই শক্তি ধর্ম হইতে পাবে, সেই সমস্ত বিধানকে ব্যর্থ করিবার জন্য যে দল বা যে লোক সাহায্য করিতে প্রস্তুত সবকার সেই দলকে বা সেই লোককেই আপনার করিয়া লন। দলাদলির কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে কি না, সবকার তাহা স্বভাবতঃ পর্যবেক্ষণ করেন, এবং সে লক্ষণ দেখিতে পাইলেই দুর্বলকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া সবকারে দমন করেন। ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যাপারটাকে “ভাবত-বিজয়” বলিত, সে ব্যাপারটাও এই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। লর্ড লিটন যখন ভাষিতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, তখন একটি দস্তখত যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট এইরূপ আদেশ আসিয়াছিল—“যুদ্ধের যদি কোনও উপলক্ষ নাই থাকে, তাহা হইলে তুমি অবশ্য অবশ্য একটা গড়িল তুলিবে।” সেইরূপ যদি দলাদলির কোনও লক্ষণও না থাকে, তাহা হইলে একটা গড়িয়া তোলা হয়। দাদাভাই নৌরোজীকে এখন ইংলণ্ডের মহাসভার প্রেরণ করা হয়, তখনও, এইরূপ কৌশল প্রয়োগ হইয়াছিল। মিষ্টার ভাননাগরীকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাড় করা হইল, এবং এক জন প্রতিক্রিয়াপন্থার দ্বারা এক জন তেজস্বী সংস্কারবাদীকে সবাইয়া দেওয়া হইল। রাজনীতিক অবস্থা ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর শাসন্যকর হইতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা বলুন। স্বভাবতঃই আমাদের জাতির মধ্যে ইহারা দুইটি স্বাভাবিক দল, তাহাদের উভয়ের উপরে যে সরকার আছে, তিনি খুষ্টান। তিনি তৃতীয় দল। এই দলই তৃতীয় পক্ষের রূপ লাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এই দলই হিন্দু মুসলমানে দলাদলি দাঙ্গা ইত্যাদি। কিন্তু, দেশীয় রাজ্যসমূহে, যেখানে শাসন কর্তা হয় হিন্দু, না হয় মুসলমান, এবং তাঁহাকে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়কেই শাসন করিতে হয়, সেখানে এরূপ হয় না। এই দলই কলিকাতায় ও লন্ডনে হিন্দু মুসলমানে বহু বিতর্কের পূর্ব-দে সখোর একা হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এত চেষ্টা।

সমাজের মধ্যে যাহারা অভিজ্ঞ ও দূর্বদর্শী, তাহারা সংঘ-বদ্ধ হইয়া যে একজন রাজনীতিক শীর্ষাংশায় উপনীত হইয়েন, যাহারা সেই সকল সিদ্ধান্ত বাধ্য আপনাদিগকে বাধ্য বলিয়া বিবেচনা করেন না, এ প্রকাষেব কতক লোক প্রত্যেক সমাজে চিহ্নিত থাকিবে, এবং এই লোকগুলি-উৎকোচের লোভ বা ভয়ের তাড়নায় সরকারের কার্যের সমর্থনের জন্য একদল বিপ্লব ও দারিদ্র্যহীন লোক সংগ্রহ করিয়া দেয়। (এ যে উৎকোচ বা ভয়, বেসরকারি হইলেও সরকারী লোকের দ্বারা প্রণোদিত) এইরূপ করিয়া লোকগুলি মাথ্রদায়িক পৃথক ও বিশেষ সুবিধা পাইবার আশা কবে।

এই প্রকার মাজাজে ব্রাহ্মণবিরোধী দলের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের কয়েক শত লোক লইয়া একটা সভা আছে, আশ তিনখানি খবরের কাগজ আছে। যে যাহা হউক, বিচক্ষণ নেতা দেওয়ান বাহাদুর কেশব পিলাই এর নেতৃত্বাধীনে একটি খাটী অত্রাঙ্গণ-সভার উদ্ভব হওয়ায় এই সভা মলিন হইয়া গিয়াছে। শেখোক্ত সভার কয়েক সহস্র অন্তরঙ্গী সভ্য হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-বিষোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য, বড় বড় সরকারী চাকুরী যোগাড় করা তাহারা আশা কবে যে, 'হোমরুল' আন্দোলনের নিন্দা ও সরকার বাহাদুরের প্রশংসা দ্বারা, তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ আরও আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে—হোমরুল-জুকুরকে মারিবার দল যে কোনও প্রকাষেব লাঠিই প্রশস্ত।

এই সমস্ত দলাদলি দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। যত দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ দারিদ্র্যহীন শাসন-যন্ত্রের অধীন থাকিবে, তত দিন এ প্রকাষেব দলাদলি বাহ্যিকভাবে ছবির মত আবিলুত ও তিবোহিত হইতে থাকিবে।

যখন বিজাতীয় তৃতীয় পক্ষের উপর শাসনের কর্তৃত্বভার থাকিবে না, তখন জাতীয় সম্প্রদায়গুলি তাহাদের লক্ষ্যের পার্থক্য সম্বন্ধে রাজনীতিক দৃষ্টিতে অস্ব-রূপে সংহত হইয়া যাইবে। শক্তির ব্যবহার কবিত্তে পাইলে একটা দায়িত্ববোধ জন্মিবে; এবং দায়িত্ব হইতে সুবিবেচিত সংঘম জন্মিবে।

যুগান্তিকালেব এই সকল গোলযোগ ও কলহকে আমরা খুব বড় করিয়া দেখি, এবং তাহাব ক্ষতি কবিবাব প্রকৃত ক্ষমতা অপেক্ষা সে সকলকে অত্যন্ত গুরুত্ব বসিয়া মনে করি। আমরা 'হোমকল' লাভ করিলে এগুলি তাহাদের প্রাথমিক রূপ ধারণ করিবে।

খণ্ড সংস্কার।

জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিল হইতে এ পর্যন্ত যে সমুদায় খণ্ড সংস্কারের খবর কবিয়াছে, আমি আব সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলিব না। তাহাদের মধ্যে যেগুলি বেশী প্রচেষ্টানীয়, সেগুলিব একটি পৃথক তালিকা প্রদত্ত হইবে। জাতীয় মহাসমিতিব নেতৃগণের মধ্যে তথাকথিত একই দাবী কবিয়া পুনঃ পুনঃ দ্বন্দ্ব হইয়া পড়িয়াছেন, এবং এখন অল্পকাল কবিতেছেন যে, 'হোমকল' উপর যত শক্তি কেন্দ্রীভূত করাই উচিত। কাব্য, একদান দেশের লোক শক্তি-লাভ কবিলেই তাহাব অপকৃষ্ট আইনের হস্ত হইতে পরিব্রাজ পাইবে—এবং ভাল আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

জাতীয় ব্যবস্থাপক সভা জাতীয় মহাসমিতিব মন্তব্যগুলি গ্রহণ কবিবে, এবং দেশের অবস্থার পরিবর্তনানুসারে যেগুলি যেভাবে প্রয়োজ্য, সেই ভাবে আইন কবিবে। স্বাধীন ভাষ্যতবর্ণ শাসন ও বিচার-বিভাগ পৃথক কবিবে, রাজস্ব-সংগ্রাহক, নিচাব ও পুলিশ কর্মচারিগণকে স্বতন্ত্র কবিবে, এবং নিম্ন আদালতকে শাসনবিভাগের অধীন না রাখিয়া হাইকোর্টের অধীন করিবে—শুধু আইন প্রবর্তিত কবিবে, সর্বত্র ছুটির বিচার প্রচলিত কবিবে—বিদেশ-প্রবাসী ও বিদেশে উপনিবিষ্ট ভাষ্যতবর্ণিগণকে বক্ষা কবিবে, জমী-বন্দোবস্তের বেশ সামান্যতক ব্যবস্থা কবিবে, ভাষ্যতবর্ণ শ্রমধর্মের শৃঙ্খলাসাধন ও উন্নতি-বিধান কবিবে, কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এদেশেই পর্বীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন কবিবে, শাসনপ্রথা এমন ভাবে পুনর্গঠিত কবিবে, যাহাতে জাতিতে জাতিতে যেমত থাকিবে না; সামরিক কলেজ করিয়া, ভারতসন্তানগণ যাহাতে সম্রাটের বশিষ্ঠ পাব, তত্ক্ষণ সুশিক্ষা দান কবিবে।

বৈধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যত বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে,—যে সমুদায়

দেখা ও বক্তৃতা কোনরূপ অপরাধের প্রবেশনা করে না, বা কোনরূপে মানহানির আইনও লঙ্ঘন করে না। এমন সমস্ত রচনা ও বক্তৃতা যে সব আইনের দ্বারা দলন করা হইতেছে, সে সমুদয় সভ্যদেশের অনুপযুক্ত বন্দিরা একেবারে উঠাইয়া দিবে। শাসনকর্তার বিচার বা করিয়া কেবল গুপ্ত পুলিশের অভিযোগ ও সন্দেহ নূলে এখন যেমন কারারুদ্ধ করিতে, দেশান্তরিত করিতে, বস্ত্রশূণ্য করিতে, অস্ত্রবীণ করিতে, দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে পারেন, তখন তাহাদের সেকপ কবিস্বার ক্ষমতা থাকিবে না। নিজের অপরাধ কি, জানে না, এখন লোক রোশভোগ করিবে না; প্রকাশ্য বিচার ও আত্মসমর্থনের সুযোগ ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা বাড়িয়া লওয়া হইবে না। শাস্তিপূর্ণ রাজনীতিক প্রচেষ্টা, শোভাযাত্রা, পতাকা, সভা প্রভৃতিতে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ-কমান্ডারী হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। নোটকথা, মাগ্নাকার্টা ও ব্লি অব রাইটস্ এর দ্বারা মানবের যে সাধারণ ও প্রাথমিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, ভাঙ্গতবধ শূন্যবার তাহা ভোগ করিতে পারিবে।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানব এবং অত্যাচার সভ্যদেশের মানবের সমকক্ষ হইবার কি আনন্দ, তাহা চিন্তা করুন। দমন-নীতির বিষবায়ুনিমুক্ত ভাবভেদে ধায়সেবন কি আনন্দের, তাহা চিন্তা করুন। প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় ও সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, ইহা জানান কি আনন্দ! নিজে জানিলাম না, অথচ বহুজনের অঙ্গকারে আবৃত এক শাসন-শক্তির খেয়ালের ফলে অপরাধী হইলাম, এমন আর ঘটবে না, তাহাতে কি আনন্দ! কেবল আইনের দ্বারা দেশ দাসিত হইতেছে, শাসনকর্তাগণের বেচ্ছায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই, এমন দেশে সভ্যমানবের সাধারণ অধিকার-উপভোগের কি আনন্দ! কেবল হোবসবলের দ্বাবাই এমন নিরাপদ-ভাব ঘাসিতে পারে।

উপসংহার ।

প্রতিনিধি লাভগণ। দীর্ঘকাল আপনাদের বিলম্ব করাইলাম, তজ্জন্ত ক্ষমা করিবেন। এই জাতীয় মহা-সমিতির সভাপতিব আসন জীবনে কেবল একবার-মাত্র অধিকার করিতে পারা যায়, এবং যে দেশকে আমরা সকলে এত ভালবাসি, সেই দেশ সম্বন্ধে আমরা প্রাণের কথা একবার বলিতে পারি। বর্তমান সময় যে তীব্র বন্দ চলিতেছে, তাহাতে কে বলিতে পাবে, আপনাদিগকে আর কত

বলিবার স্বাধীনতা আমাব থাকিবে কি না? কে বলিতে পারে, আগামী বৎসরের মধ্যে আপনাদের নেত্রী-রূপে কাজ করিবার স্বাধীনতা আমাব থাকিবে কি না! আমাব কায় যদি ব্যাহত না হয়, তাহা হইলে আমি আগামী বৎসরের জন্য আপনাদের সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আপনারা আমাকে আপনাদের সভানেত্রীর পদে বরণ করিয়া আমায় প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন, নতুবা আপনাদের বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হইততদিন, আমাব সহকারী হউন। আপনাবা যে সকল সময়েই আমার সহিত একত্র হইবেন, তাহা হইতে পারে না; আপনাদের সমালোচনায় আমি সন্তুষ্ট হইব না। আমি কেবল এইটুকু প্রার্থনা করি যে, আমার শত্রুগণ যাহা কিছু বলিবে, আপনারা তাহাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেন না—শত্রুগণ যাহা বলিবে তাহাব সকল কথাই উত্তর দিবার আমাব সময় নাই। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না যে, সকল সময়েই আপনাদের তুষ্টিবিধান করিতে পাবিব। আমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, সেবা সম্বন্ধে আমার যাহা আদর্শ, সেই আদর্শেব অনুবর্তনে আমি প্রাণপণে প্রাতির সেবা করিব। সকল সময়েই যে আপনাদের কথা আমি স্বীকার করিব, এবং আপনাদের অনুবর্তন করিব, এমন অঙ্গীকার আমি কবিতে পারি না। নেতার কর্তব্য—পরিচালন করা। নেতা তাহাব সহযোগিতার সহিত সর্বদা পরামর্শ কবিবেন, তাহাদের উপদেশ সকল সময়ে শুনিবেন; কিন্তু সর্বসাধারণের নিকট শ্রব দাখিল যখন তাহাব, তখন খেয় মীমাংসাব অধিকারও তাহাব। সেনাপতির তাহাব সহকারী ও সৈন্যগণ অপেক্ষা অধিক দূরদর্শী না হইলে চলে না। কিন্তু যুদ্ধ যখন চলিতেছে, সে সময় প্রত্যেক গতির হেতু তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারেন না; ফলের দ্বারা তিনি নিশ্চিত বা প্রশংসিত হইবেন। আমি জানি যে, প্রেম ও সেবাব দ্বাৰা আমি ভাবভস্মান, কিন্তু ধর্মের দ্বারা নহি। এই কাৰণে আমি নেতৃত্বের অধিকার কখন দাবী কবি নাই, যুদ্ধের পূর্বোভাগে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছি। এখন আপনাদের কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া আপনারা যে স্থান দিয়াছেন, সেই স্থান গ্রহণ করিলাম, এবং যোগ্যভাবে এই স্থান পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব। নিজের কথা যথেষ্ট বলিলাম; ঐষ্টবর মায়েব কথা বলি।

ভাবচিন্তা স্বাধীন হইয়াছেন, জগতেব জাতি-সমূহের মধ্যে যথার্থ ভূমি দাঁড়াইয়াছেন, তাহাব গুরুত্বাংগন সর্বত্র সম্মানিত, তাহাব অতীত যেমন মহান; বর্তমানও ঠিক তেমনই হইয়াছে, আরও অধিক চব গোববদন ভবিষ্যৎ-নির্মাণেব

জন্ত সাধনা চলিতেছে, এই মহানুষ্ঠান দর্শনের আকাঙ্ক্ষা কি এমন উৎসাহকর নয়।
 যাঁহাব জন্ত পরিশ্রম করা যায়, ক্লেশ ভোগ করা যায়; সমগ্র জীবন উৎসর্গ করা
 যায়, এবং মরিতে পারা যায়? আব্যাগিকতার জন্ত এত অধিক কষ্টসাধনা
 উদ্দীপিত করিতে পারে, এমন দেশ কি আর আছে? সাহিত্যের জন্ত এত
 প্রশংসা উদ্দীপিত করিতে পারে, সংসারসের জন্ত এত ভক্তি উদ্দীপিত করিতে
 পারে, এমন দেশ কি আর আছে? জাতি-সমূহের চির-গৌরবময়ী ভূমণ্ডলী
 আজ ইউরোপের ও আমেরিকার যে সমুদয় জাতি পৃথিবীর নেতৃত্ব করিতেছে,
 এই বাতীর গর্ভে জন্মিয়াই ত তাহারা প্রবাসে যাত্রা করিয়াছিল। কৃষ্ণকেন্দ্রে
 যুদ্ধে জননী খড়্গ ভাঙ্গিয়া-খাইবার পর আমাদের এই ভারতমাতা যত ক্লেশ
 ভোগ করিয়াছেন, এত ক্লেশ কি আর কাহাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে?
 তদবধি এশিয়া ও ইউরোপের জাতি-সমূহ তাহার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া
 প্রবাহে যত বহিয়া গিয়াছে, তাহার নগরী-সমূহ অশ্রান করিয়াছে, তাহার
 বাজতবর্গেব মুকুট কাড়িয়া লইয়াছে। তাহার জয় করিবার জন্ত আসিয়াছিল
 কিন্তু জয়ঃ এই দেশে থাকিতে গিয়া, এই দেশেব সহিত গিগিগা গেল।
 অবশেষে এঁশ শিল্পী এই সমুদয় সংমিশ্রিত জাতিসমূহেব মধ্য হইতে এক জাতি
 গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই জাতি যে কেবলমাত্র ভাবতের সঙ্গুণসমূহে, সমস্ত
 তাহা নহে, তাহার আত্মভাষিণ যে সকল সঙ্গুণ সস্তার সঙ্গে আনিয়াছিলেন,
 আজ সেই সঙ্গুণবলিই রহিয়াছে, দোষগুলি অপসৃত হইয়াছে, এবং সে সমস্ত
 সঙ্গুণ আজ ভূষণরূপে হইয়াছে।

কত যুগের ইতিহাস মর্ত্যমানবের দৃষ্টিশক্তি অতিক্রম করিয়া প্রসারিত
 জাতীর কত বড় বড় সভ্যজাতিব সহিত একত্র জীবন ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু
 জীবন ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদের উদ্ভব, উন্নতি ও বিনাশ দেখিয়াছেন, সে
 সকল মহাজাতি আজ আর নাই; পৃথিবীর গভীর বক্ষে তাঁহারা সমাহিত
 হইয়াছেন, কেবলমাত্র স্মৃতিমলক পড়িয়া আছে—এই ভারতবর্ষ কত ক্লেশ
 করিয়াছেন, কত বিজয়লাভ করিয়াছেন, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন—সমুদয়
 পরিবর্তনের পরেও অভয় অবস্থায় এই ভারতবর্ষই জগতের জাতিসমূহের মধ্যে
 ক্রুশবিন্দু—এখন তাঁহার ‘গুনরূপানে’ব প্রভাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—ইনি
 অমর, গোববময়, চিরতরুণ,—অচিরে দৃষ্ট হইবে, ভারতবর্ষ উন্নতশিখর, স্বাধীন
 সর্বল, স্বাধীন, এশিয়াব উজ্জল গোবব, পৃথিবীর আলোক ও আশীর্বাদ।

শিবাজী বা মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়।

ঠিক এক শত বৎসর গত হইল, মহারাষ্ট্র দেশে মারাঠা রাজত্বের অবসান হইয়াছে; আর, ১১ বৎসর হইল, গ্র্যান্ট ডাফ মারাঠাদের ইতিহাস লিপ্য-শেষ করেন। এই ১১ বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার ইতিহাসই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে; এবং এত দিন এ দেশের সর্ব ভাবা-উ-ইতিহাসের প্রতিধ্বনিমাত্র শ্রুত হইতেছিল। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, গ্রন্থের প্রতি মারাঠা-দিগের অশ্রদ্ধা পবিস্কৃত হইয়া উঠিতেছে। এই সময়ের মধ্যে ডাফ যাহা জানিতেন না, এমন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। তন্মধ্যে কোনও মহাবাহীর লেখক তাঁহার সেই উচ্চ আসন কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইল নাই। এমন কি, গোবিন্দ স্বধারাম সর্দে শাই নামক বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মারাঠা ঐতিহাসিক তাঁহার নব-প্রকাশিত "মারাঠা রিমাসিং—নবীন আত্মচিত্র" ত ডাফের তালনির্ণয় এবং অনেক ঘটনা-বিবৃতির অন্তর্গত করিয়াছেন।

কারণ, মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে পারসী, বঙ্গ-রাষ্ট্রীয় ও হিন্দী ভাষা জানা প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত লগুণ্ড ইণ্ডিয়া কমিটি বক্ষিত পশ্চিম-ভারতের ইংরাজী কুঠিগুলির প্রাচীন চিঠিপত্রের হস্তলিপির নকল লওয়া আবশ্যিক। এই চারি ভাষার সমস্ত ঐতিহাসিক উপকরণ বাতী মারাঠা-শক্তির অভ্যুদয়ের প্রকৃত ইতিহাস লেখা অসম্ভব। সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণভাষে যে চারিটি রাজত্ব ছিল, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি অত্যন্ত। ১৬৬০-১৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই চারিটি দেশের মাত-প্রতিমাত, অপরূপ পবিস্করণীয় ক্ষি-বিগ্রহে দক্ষিণভাষে ইতিহাস বীজগণিতের পারমিউটেশন-কম্বিনেশনের মত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। নোঙ্গল সম্রাজ্যের, বিজাপুরের, এবং গোমুখার ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে জানা না থাকিলে, মারাঠাদের সত্য ও পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভবপর নহে। এসমস্ত ইতিহাস কেবল পারস্য ভাষায় লিখিত। মহাবাহীর গাথায় লিখিত "বখর" নামক ইতিহাস প্রচলিত আছে। আরও না জানি প্রা-সুগুলির অতিবিস্তৃত ঐতিহাসিক মূল্য কল্পনা করি। কিন্তু সেগুলি অনেক স্থানে অসঙ্গত ও ভ্রান্তজনক। তাহাদের একখানিও শিবাজীর বা শিবাজী-দমনে বচি-ত নহে।

১৬৭৪ খৃঃ অব্দে শিবাজী রাজসিংহাসনে বসেন ; তাহার পূর্বে মারাঠাদিগের কোনও রাজা ছিল না, রাজধানী ছিল না, দৃঢ়সম্মত রাজ্য ছিল না। তাহার স্বভাবের মধ্যে লেখকদিগকে আশ্চর্য্য বিতে পারেন, এমন ধনী লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, পণ্ডিত ও ভাবুকদের বাসের নগরও প্রায় ছিল না। সুতরাং এই সময়ের ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। মহাবাঙ্গীর প্রথম ইতিহাস “সভাসর বন্দন”। উহা শিবাজীর মৃত্যুর ৩৩ বৎসর পরে এবং জন্মের ৬৬ বৎসর পরে (১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। উহা গ্রন্থকার শিবাজীর জনৈক ভৃত্য। তিনি বৃদ্ধ বয়সে উহাতে অর্দ্ধ-বিস্মৃত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে ভ্রম অনিবার্য্য। দ্বিতীয় ইতিহাস “শিবদিক্ষিজয়” শিবাজীর কাব্যস্থ লেখকের পুত্রের রচিত। উহা শিবাজীর জন্মের ৯৯ বৎসর পরে লিখিত হয়। এই গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক উপাদানের বাহ্যিকের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ “বখর” বলিয়া স্বীকৃত। তৃতীয় ইতিহাস “চিত্রগুপ্ত বখর”। ইহা প্রথম বখর হইতে চুরী, ইহা স্বাধীন মূল্য নাই। চতুর্থ ইতিহাস, “চিটানিস বখর”। শিবাজীর ফেরাণীস বংশধরদিগের দ্বারা এই গ্রন্থক ১৮২৬ খৃঃ অব্দে লিখিত হয়। ইহাতে যেমন কতগুলি অস্মৃত গল্প আছে, তেমনি খাঁটি বখরও কিছু কিছু আছে। গ্রন্থকার যে তাহার হস্তগত সমস্ত প্রাচীন কাগজপত্রের যথাযথ ব্যবহার করেন নাই, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডাক্তার হুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার প্রায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর যে সব বখর রচিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক ও অকর্ম্মণ্য। তৎপরে “ভৌমসে বখর”। এই গ্রন্থখানি চুরী করা, এবং অবিদ্যায় গয়ে পরিপূর্ণ। বরোদার ভূতপূর্ব্ব গাইকুবারের ব্যয়ে প্রকাশিত “শিবজীচরিত” বখরখানি একেবারেই অসার। রাণগড় হর্গের পাদদেশে পাচাজ প্রাচীরে একখানি মহাবাঙ্গীর ইতিহাস ছিল। তাহার ইংরাজি অনুবাদ করেই পাদেব ছাপিয়াছেন। ঐ অনুবাদ যে ইংরাজদের আবেগা, ভুল প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহা প্রকাশনাথ ত্রিবেদী তেজস্বী দেখাইয়া দিয়াছেন। ইতিহাস হিসাবেও ইহা বহু মূল্য কম।

কলকাতায় ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রাখিত একখানি কাসী “শিবাজীর ইতিহাস” নামক প্রাচীন হস্তলিপি আনি আমূল ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের “মডারন-রিভিউ” পত্রে প্রকাশিত হয়। এখানি কাসী ভাষায় রচিত হইলেও কোনও মারাঠী মূল গ্রন্থের অনুবাদমাত্র ; সুতরাং এখানেই উহার উৎসে ভ্রম উচিত।

আমি মহাবাহাদ্রী ইতিহাস সম্বন্ধে পাবনার ভাষাতে বৃহৎ পাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত। ইংল্যান্ডে অধ্যয়ন করিয়া "মজারন-রিবিউ" পত্র ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছি। মারাঠা চিহ্নিতাদিতে যে প্রামাণিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আর সবই ডাকের পরে সংগৃহীত। কয়েক জন ত্যাগী মহাবাহাদ্রী ঐতিহাসিকের অকাল চেষ্টার ফলে এইরূপ দশ হাজারেরও অধিক পত্র সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এইগুলি শিবাজীর পূর্ব হইতে পেশোবাদিগের পতন পর্যন্ত কালের ঐতিহাসিক তথ্য পরিপূর্ণ। ঐ সকল পত্র ব্যতীত আরও বহু নতুন পত্র সংগৃহীত হইয়া যুদ্ধের অপেক্ষা করিতেছে। মহাবাহাদ্রী ইতিহাসে সেবকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পারসানিস, রাজবাড়ে ও ধরে, এই তিন জনের কথা উল্লেখ না করিলে এই প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে। (ইহারা অধ্বষণে ও শ্রেণে প্ররাস্ত। রাজবাড়ে যখনই শুনিয়াছেন, কোনও স্থানে প্রাচীন পত্র আছে, তখনই তথ্য বাহিয়া, কোথাও প্রলোভনে, কোথাও বা ভীতি প্রদর্শনে, বা বিনীত প্রার্থনায়, কোথাও বা বচন দিয়া স্বত্বাধিকারী হস্তগত করিয়া সেই পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল পত্রের মধ্যে শিবাজীর ইতিহাস রচনায় ফল বেশ, একদু পত্র পশ্চিমবঙ্গের অধিক নাই (রাজবাড়ে, ৮ম বালুম)। কিন্তু "শিবকাবীন" অত্যন্ত পত্রাদিতে রাজবাড়ে ছয় বালুম পুস্তক পূর্ণ করিয়াছেন। ঐ সকল চিঠিতে ইতিহাসের ঘটনা বা রাজার সংবাদ নাই; এগুলি দানপত্র, এবং অন্যান্য দলীল, মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, কথচারি-নিয়োগ-পত্র, দাখিল ইত্যাদি। বস্তুতঃ সেগুলি ব্যক্তিগত আইনসংক্রান্ত কাগজপত্র, এবং দলীল (Private legal documents)। যদিও এগুলিতে কখন কখন সমাজের চিত্র, শাসনপ্রণালীর দৃশ্য পরিদ্রুত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাতে রাজনীতিক ইতিহাসের উপকরণ নাই। একওয়ার্গ কর্তৃক প্রকাশিত "ঐতিহাসিক গাথার" অর্থাৎ গাথা (ballads) হইতে শিবাজীর জীবনের দুই তিনটি ঘটনা-বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিবাজীর বা শক্তাজীর জীবনকালে কোনও বহু রচিত হয় নাই। শিবাজীর বংশধরগণের রাজত্বকালে শুধু "মহানন্দ বধর" রচিত হয়। ইহাও কাব্য এই যে, শিবাজীর সিংহাসনাধিরোহণের পবই, সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশে শান্তি ভোগ করিয়াছিল; দেশ নিরাপদ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ শান্তি তেব বৎসরের অধিক কাল ছিল না। শিবাজীর মৃত্যুর পরে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া মহারাষ্ট্র উলট-গালট হইয়া পড়ে। সমস্ত নগর ও রাজ্যবাস দিল্লীর হস্তে

হয়। অসংখ্য গ্রাম দখল করা হয়। এ অবস্থার ইতিহাসের উপকরণ রচিত হইতে পারে না; ইতিহাস রচিত হইতে পারে না। মহাবাহু দেশে যে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহা শিবাজীর সমসাময়িক নহে, তাঁহার অভ্যুদয়ের আশী বৎসর পরে।

পারসীক ভাষায় লিখিত ইতিহাসের মূল্য বিচার কবিত্তে গিয়া প্রথমেই দেখি যে, মুসলমান জাতি ইতিহাসের ভক্ত। ইহারা তারিখ সম্বন্ধে বেরূপ মনো-কবিত্বাছেন, হিন্দু ঐতিহাসিকেরা তেমন করেন নাই। মুসলমানি ইতিহাস পাঠে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের কাল-নির্ণয় ও দৈন্তগণের গতিবিধি অতি সুন্দর ও সূচকরূপে নির্দ্বাণ করিতে পারা যায়। ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য-নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সময়সীমার বংশগণ। তাঁহারা অপ্রাপ্তিক ঘটনাসমূহের ক্ষণস্থায়ী কালের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল অনাদি অনন্ত মহাকালের প্রতিই লক্ষ্য রাখিতেন। তাই, হিন্দুর রচিত ফার্সী ইতিহাসেও তারিখের অভাব বা গোলমাল দৃষ্ট হয়।

[ইহার পর বক্তা শিবাজীর যুগসম্বন্ধীয় চারি ভাষায় রচিত উপকরণ-গুলির নাম উল্লেখ করিয়া বিশেষভাবে সমালোচনা কবিলেন।]

শিবাজীর জীবনের সংগ্রাম-ক্ষিপাতের তৎকালীন তিনটি প্রবল মুসলমান শক্তির ইতিহাস সুদক্ষরূপে আলোচনা করিলে পবিত্রকার বুঝা যায় যে, কেন তিনি অমুক অমুক বৎসর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কেন তাঁহার সব চেষ্টা তখন বিফল হইয়াছিল, আর কেন অত্যান্ত বন্দ তিনি সহজে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির কার্যকারণসম্বন্ধ শুধু মুসলমান-ইতিহাস হইতেই বিশুদ্ধরূপে জানা যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শিবাজীর জীবনকালে মুঘল বাদশাহ, বিজাপুরের জুলতান আদিল শাহ, এবং গোলকুণ্ডার জুলতান কুতব শাহ, ইহাদের মধ্যে প্রায় সর্বদাই ঘাতপ্রতিঘাত হইত; সাধারণতঃ ইহারা একবাবদ্বারা ইহারা সমবেত হইয়া শিবাজীকে আক্রমণ করেন, আর তখনই শিবাজীকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। আদিল শাহ ও কুতব শাহ কখনও তুলিতে পারিতেন না যে, মুঘল বাদশাহের স্থায়ী এবং গূঢ় অভিপ্রায়, তাঁহাদের রাজ্য হরণ করা। তাঁহার জানিতেন যে, একমাত্র শিবাজীকেই বাদশাহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই, এবং মুঘল আক্রমণ হইতে একমাত্র শিবাজীই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং শিবাজী বিজাপুর-রাজের বিদ্রোহী প্ররাজ্যাপহাগী প্রজা হইলেও, আদিল শাহ তাঁহার সহিত ১৬৬০-৬১ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া তাহার পৰ হইতে গোপনে সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ থাকেন। ১৬৭৮ এবং ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মুঘলসেনা যোদ্ধাবার বিজাপুর নগর ভীষণভাবে দাখল করে, তখন শিবাজীই আদিল শাহকে অত্যন্ত আবশ্যক সাহায্য করিয়া মুঘলদের চেষ্টা ব্যর্থ করেন, এবং এ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞ আদিল শাহ তাঁহাকে প্রভূত পুরস্কার দেন। সুতরাং শাহের হিন্দু মন্ত্রী মাদন পঞ্চ শিবাজীকে বাৎসরিক এক লক্ষ ছান অর্থাৎ ৬০ লক্ষ টাকা কর দিয়া, গোলকুণ্ডা রাজ্য-রক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন।

একে ত মুঘলদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্য হুইটব-কুগড়া, তাহার উপর দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবেদারের গৃহে কলহ, বিজাপুর রাজসভায় অন্তর্বিবাদ। রাজপুত্র মুবারকম- (সুবেদার) এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতি দিলীর খান মধ্যে মারামিষ-কাটাকাটি সম্বন্ধ। তৎপরবর্তী সুবেদার বাহাদুর বা বিজাপুরের “দক্ষিণী” মন্ত্রী দলের পক্ষ লইলেন, আর তাঁহার সহযোগী দিলীর খান আদিলশাহী পাঠান মন্ত্রী ও সৈন্তের সাহায্য করিতেন।

শিবাজীর অভ্যুদয়ের সময় বিজাপুর রাজ্যের ভ্রতবেগে প্রবলিত হইতে থাকে। সুলতান নাবালক, বা নগ্নপায়ী, মজ্জিহন্তে পুত্তলিকামাত্র। রাণীনা চলিতহীন। সেনাপতিগণ স্বার্থপর; রাজদ্রোহী হইয়া নিজ নিজ শাসিত প্রদেশে নিজের নামে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে ব্যস্ত। বাহুবানীতে কোন মন্ত্রী উজ্জীব হইয়া বাজ্রাব উপরে আধিপত্য করিবেন, এই লইয়া বাবংবার যুদ্ধ, ধন এবং লুট চলিতে থাকে; বিজাপুর সহরের রাস্তা রক্তে প্রাণিত হয়। তখন “বান্দা হইতে প্রজা” পর্যন্ত কেহই দিনে আরামে রুটী খাইতে পাইত না, অগ্নীর হইতে ফকীর পর্যন্ত কেহ নির্ভয়ে রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না (বাসাতীন-ই-সালাতীন।) এই রাজ্য শিবাজীর মত বিদ্রোহী প্রজাকে দমন করিবে!

দাক্ষিণাত্যের তিন মুসলমান শক্তির বিবাদ ও দুর্বলতাই শিবাজীর অভ্যুদানের প্রধান সহায় হয়।

শিবাজীর চব্বিশ বছরার ইতিহাসে বিশেষ বিবেচনাব্যবসায়ী। আমার মতে, যে সব প্রতিভাশালী হিন্দু স্বায়ী প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠিত করিয়াছেন, শিবাজীই তাঁহাদের শেষ দৃষ্টান্ত।

তাঁহার সহিত রণজিৎ সিংহের তুলনা করিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। শিব-

* এ কথা স্মরণ ও বোধের ইংরাজরা পট্টাই জানিতেন; তাঁহাদের কাগজপত্র, ডাক্তার ডায়ারীর ভ্রমবাহিনীতে, এমন কি, আওরঙ্গজেবের চিঠিতে ইহা অকাটা সত্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

নিগের শাসনপ্রণালী অতি অবস্থা ছিল; শিবাজীর ব্যবস্থা দেশের গৌরব ও সুখের কারণ হইয়াছিল। রণক্ষেত্রের সৈন্যসমূহ করাসী সেনাপতিদিগের দ্বারা চালিত হইত; কিন্তু শিবাজীর সৈন্যসমূহ তাঁহার নিজের বুদ্ধিতে আঁঠিত, তাঁহার নিজের আদেশে চালিত। রাজ্যশাসনও তিনি নিজেই করিতেন, বিদেশী সেনাপতির হাতে দিড়েন না। তাঁহার গতি জিনিসেব আর দীর্ঘ ছিল, মূল্যও অতুলনীয়। তাই তিনি অতি মহতী প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন—লিখিতে পড়িতে জানিতেন না; নিজ ক্ষমতা-স্থাপনের পূর্বে কোনও রাজসভা, কোনও বড়সহর, কোনও মহৎ সেনানিবাস দেখিবার, কোনও বিতরণ ও অভিজ্ঞ মন্ত্রী বা সেনাপতির সাহায্যের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই; কেবল স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে সুদৃঢ় রাজ্য-স্থাপন, অশ্রমে সেনাগঠন ও মহৎ পবিজ লোকহিতকর শাসনপ্রণালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণ্য-শিক্ষক দাদাজী শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন নাত। তিনি তাঁহাকে সামান্য বিবরণ-কর্মের জ্ঞান দান করিয়া গোদুর্ভাগিরিতে দক্ষ কবিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-নীতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শিবাজী যে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজের প্রতিভাবলে। তাঁহার উদয়ের পূর্বে মহাবাহু জাতি অল্প-পরমাণুৰ ভ্রাম্য সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ছিল। তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া একটি মহতী জাতির সৃষ্টি করেন। তিনি মুম্বা, বিজাপুর, পোর্তুগীজ ও হাবশী সিদ্ধী, এই সকল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এমন ক্ষমতা আমাদের ইতিহাসে আর কাহারও দেখা যায় নাই। বস্তুতাত্ত্বিক মারাঠা বধরকায় যুদ্ধের সময় শিবাজী কি কি জিনিস রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন—এত হাতী, এতগুলি ঘোড়া, এত রাজার সৈন্য, এত ক্রীত দাসদাসী, এত মণি, এত মুদ্রা, এত জহরৎ, এত কোটী মুদ্রা, এমন কি, কম্বু, হাড়ি, কিঙ্গমিস পেত্রা, সে সবই তাঁহার লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনের উল্লেখ বলা হয় নাই—তাহা মারাঠা জাতির নবীন প্রাণ-দান। সে কথা লিখিয়াছেন ঐতিহাসিক ডাফ সাহেব। শিবাজীর পূর্বে মারাঠাশ্রমেরা পবের ভূত্যাত্র ছিল, পর-রাজ্যের বেতনভোগী সৈন্তনাত। যুদ্ধে নেতৃত্বে কিংবা রাজ্যশাসনে তাহাদের কোনও অধিকার ছিল না। শিবাজী প্রথমে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বুদ্ধার্থে স্বাধীন নেতা হইতে শেখান, পরে রাজ্যশাসনের সর্ববিধ ভার গ্রহণ করান।

শিবাজী দেখাইয়া গিয়াছেন যে, এই জাতি রাজ্য-স্থাপন, এবং জাতি-গঠন

কবিতা পারে। ইহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ। ইহারা সাহিত্য, ধর্ম, গীতা, বাণিজ্য, সমস্ত রক্ষা করিয়া তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে পারে। শিবাজীও মুক্ত-জাহাজ ও বাণিজ্য-পোত উভয়ই ছিল। তদ্বাচ্য তিনি সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, এ জাতি জল-যুদ্ধ ও নৌবাণিজ্য উভয় কার্যেই সমর্থ। তিনি আরও প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, এই জাতির মধ্যে মানবের শাসনক্ষমতা, রাজ্যত, সেনাপতি, এমন কি ছত্রপতি রাজ্য পর্য্যন্ত অঙ্গগ্রহণ করিতে পারেন; হিন্দু-বর্গের জাতীয় জীবন আবার জাগিতে পাবে। হিন্দু-জাতি-মহারহ এখনও মৃত নহে—উহাতে নবায়ুর উদ্ভূত হইয়া, উহা পুনরায় নবীন ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া সমগ্র ভাগ্যের ঢক্ষে এক অন্তিম শোভা ধারণ করিতে পারে। তাঁহার জীবন এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই জগতই শিবাজীর নাম আমাদের দিল্লী এত গৌরবের, আদরের সামগ্রী। *

শ্রীমহনাথ সরকার।

আশার আশা।

ক

[অমরনাথের কথা।]

আমি এক বৎসর পক্ষে বাড়ী বাইতেছিলাম। এম এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর চেষ্টা—ইত্যাদি জুতার প্রয়োজন সবকালে বাড়ী বাই নাই। পুত্রায় বাইতেছিলাম। বাইতে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা উভয়ই ছিল। এক বৎসর পক্ষে—পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া বাড়ী বাই তাহাতে অনিচ্ছা কেন? সে বড় হৃৎস্পর্ষ কথা। সে কথা কহিতে পারি না। বখিরা তাঁহা বুকে ভারের মত চাপিয়া থাকে, বলিলে যেন ভার লাগবে হয়।

আমি শৈশবে মাতৃহীন। মা আমাকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিল। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অতর্কিত মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই পিতা বয়স আমাকে তাঁহার কাছে আনিরাছিলেন, এবং আমাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন। আমাকে কাছে রাখিয়া, আমাকে দিয়া বাবাকে ব্যাপৃত রাখাও সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রৌঢ়ার অভিপ্রেত ছিল। কি জানি, নহিলে—যেখানে পদ্মাশোকে বিচলিত

দিত্ত পুত্র যদি সংসারে বীতশুভ হয়, বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, বা আবার নিবাহ কবে ।

অতঃপরে বয়সে বিপত্নীক পুত্রের বিবাহের কথা কেহ তাঁহার কাছে উপস্থাপিত করিলে ঠাকুরমা আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, “আহা—এই মাওড়া ছেলে তোমাদের কি অপকাব কবিতা ছে যে, তোমরা ইহাব এই শক্ততা সাধিবে ?” কেহ পিতামহীর এই উত্তবে বিশ্বয় প্রকাশ করিলে তিনি বুঝাইয়া দিতেন, “সৎনা আনিয়া দিবার মত শক্ততাসাধন আর কি হইতে পারে ?” তাহাব এই কথায় প্রস্তাবকারীরা নিঃশব্দ হইতেন ; কিন্তু সম্মুখে কিছু না বলিলেও পশ্চাতে তাঁহাবা বলিতেন, “কথাব স্ত্রী দেখ ! যে বয়সে লোকের একবার নিবাহ হয় না—সেই বয়সে ছেলে বিপত্নীক হইল । তাহাব বিবাহের কথা বলিলে বলে, শক্ততা সাধিবে ! এমন মাও ত দেখি গাই—ছেলেকে গৃহী না কনিয়া সম্মানী করিতে চাহে কলিতে কাহারও ত ভাল করিতে নাই !” সেই সব কথা শুনিতে ঠাকুরমা বলিতেন, “তোমাদের ভাল তোমাদের কাছেই থাকুক । আমায় ছেলের বা নাতির ভাল না হয় তোমরা নাই করিলে ।” তিনি জানিতেন, যাহাবা “গায় পড়িয়া”—“বাড়ী বহিয়া” উপদেশ দিতে আইসে, তাহাবা আপনাদের উপদেশ হামুলা বলিয়াই মনে করে, আর সেই “বিমানুস্য” উপদেশ গৃহীত না হইলেই রাগ কবে ।

কিন্তু ঠাকুরমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না । যাহারা তাহাব কথায় বলিয়া গিয়াছিলেন, “ভাল দেখা যাইবে—কি হয়”—তাঁহাদের কথাই ফলিল । বাবাব অর্থ ছিল, স্ত্রুতরাং স্ববিকাচ ভ্রষ্ট চিন্তা ছিল না ; অবসর ছিল, স্ত্রুতবাং কারণ দৃষ্টি নানা ভাবনা ভাবিতাব স্ববোগ ছিল ; যৌবন ছিল, স্ত্রুতবাং আবার নিবাহ কবিবার জন্য পবামর্শের অভাব হয় নাই । তাই বৎসর দুই অপেক্ষার পর পুত্রার “বিবাহ কবি কি না করি” সংশয় “করি”তেই পরিণতি লাভ কবিল । ঠাকুরমা পুত্রের চরিত্র নথদর্পণে দেখিতেন । পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া নীচতাগ্য ত্যাগ করিতেন, এবং আমাকে আরও নিবিড় মেহে বদ্ধ কবিলেন ; কিন্তু পিতৃাব মতের প্রতিবাদ কবিলেন না—পুত্র বিবেচনা করিয়া যে কাজ কবিতেন তাহাতে তিনি আপত্তি কবিতেন কেন ? পুত্র আপনাব ভাল আপনি বুঝিবার দক্ষ পাইয়াছে । তবে তিনি স্থিৰ সঙ্কল্প কবিলেন, আমাব ভার তিনি আব তাহাকেও দিবেন না—বাবাকও নহে ।

যেহে বিবাহের পর লব্ধা বিমাতাকে আবার মাও আমাকে তাঁহাব ছেলে

করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাপ্রাপনের যত চেষ্টা করিতেন, ঠাকুরমা ততই সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেন। বাবা ইহাতে বিবর্তন হইলেও কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। কারণ, তিনি ভেদী এবং একগুঁয়ে হইলেও মার কাটাব বিরুদ্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পিতামহী বাগো পিতৃহীন পুত্রকে শাসনের সঙ্গে স্নেহ ও স্নেহের সঙ্গে শাসন মিশাইয়া এমন ভাবে "মার" করিয়াছিলেন" যে, বড় হইয়া বাবা সব পারিলেও মার কথার বা ক্রুর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেন না। সে বিষয়ে সন্দোচ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল।

আমার সম্বন্ধে ঠাকুরমার এই ব্যবহার কল ভাল হইয়াছিল কি না, তাহার বিচার করিবার অধিকার আমার নাই; কারণ, তিনি যাহা করিয়াছিল, আমার ভালর জন্যই করিয়াছিলেন। তবে, সেই ব্যবস্থায় যে বিনম্রতা হইত আমার ঘনিষ্ঠতা হইতে পায় নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। ঘনিষ্ঠতা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনই মন্দও হইতে পারিত—কারণ, ঘনিষ্ঠতায় মন্দ হইলে অনেক "ঝগড়াট পোহাইতে" হয়, আর বিমাতা বতই কেন ভাল হউন না মানুহের, স্ত্রীর "নাড়ীর টানে"র অভাবে তাঁহার পক্ষে সে সব ঝগড়াট বিবর্তন হওয়া অসম্ভব নহে, পরন্তু স্বাভাবিক।

ঠাকুরমা যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন বিমাতার কোনও ব্যর্থতা আমার প্রতি অপ্রসন্নতার প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে সে অপ্রসন্নতা আমি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম, এমন নহে। কিন্তু বিমাতার প্রথমা কন্যা স্ত্রমতীর বিবাহের পর্ব হইতেই আমি তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। স্ত্রমতীর শ্বশুরের বাড়ী কলিকাতায়—আমি কলিকাতায় থাকিয়া দেখা করি; এই অবস্থার আমার পক্ষে ভগিনীর শ্বশুরালয়ের সহিত একটু ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপনচেষ্টা সামাজিক হিসাবে কর্তব্য—স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু মৃত্যুভ্রাতার এই ভগিনী-স্নেহ স্ত্রমতীর শ্বশুরের নিকট এমনই অদৃষ্ট ও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত যে, তিনি তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস গোপন করিতে পারিতেন না—গোপন করিতেনও না। তাঁহার এই বিশ্বাসের বাতাসে বিমাতার অপ্রসন্নতার বহিঃসন্দোচ-ভঙ্গ-মুগ্ধ হইয়া উজ্জ্বলভাবে আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই আমি বাড়ীতে গভীরতায় কদাইয়া দিয়াছিলাম—পাছে কোনও দিন কোনও কারণে বিমাতার সহিত আমার কথাত্তর হয় ক কোনরূপে উভয়ের মধ্যে মাতাপুত্রভাবের অতীব লোকের কাছে ব্যক্ত হইয়া

সেই দিনে সেই বাড়ীতেই আমি ও ছিলাম। কিছু দিন আগে আমাদের প্রতি
শতাব্দীতে শতাব্দীতে অবশেষে একটি কবর ও মন্দির—নিখিলিনামের একটি
একটি পাহাড়ের উপর যেমন মন্দিরটি উদ্ভূত হইতেছিল। তাহার পূর্বে
যেমন একটি পাহাড়ের উপর যেমন মন্দিরটি উদ্ভূত হইতেছিল। তাহার পূর্বে
যেমন একটি পাহাড়ের উপর যেমন মন্দিরটি উদ্ভূত হইতেছিল। তাহার পূর্বে

পাঠ্য মন্দির যে বাড়ীতেই ছিল, সে বাড়ীর দ্বারা আর কখনোই
কখনোই নিখিলিনামের মন্দিরটি যেমন আমি সম্মুখ করিয়াছিলাম। এখানে
আমরা এই যেমনই সে পূর্বে অবস্থিত ছিল। দুটো পাহাড়, সমস্ত পাহাড়—এক কখনো
এক কখনোই কখনোই, তাহা হইলেই বিপদে আপনাকে অবশেষে অল্পবিধা ভবিষ্যৎ
নাশের জন্যে গ্রামে কেহ হইবে সমস্ত ছিল না। তাহা হইলেই উদার হস্ত তাহার
এক কখনোই বিপদেই হইবে। গ্রামের সব লোক তাহাকে ভাল
পছন্দ করে। তাহাকে তত ভালবাসিত, আমি যে তাহাকে তত ভালবাসিত
কখনোই না—এই দুটিই আমি বিনয় করিত না। পূর্বেই দুটিই পূর্বেই
সে গ্রামের লিখিত ছিল—এই, কত দিন বাড়ী আসে নাই। একই আসে
এইই নদীতে যানি বসে বসে করিত। তাহার ডাক আমাকে চকল
করিত। আর কখনোই কত দিন দেখি নাই। সেই জন্ত বাড়ী হইতেই
কখনোই নাই। এই পাহাড়ের নির্দেশমুসায়ে লইয়া আমি আনন্দ ও
আনন্দ করিয়া এক বসন্ত পবে কলিকাতার মেস হইতে আমায় পল্লীবাগে
কলিকাতার জন্ত বাড়ী করিয়াছিলাম।

২

কিন্তু যে দিগ্গী হোগী বান্দী উদ্ভিলাহ, তাহাতে যেকোন অজ্ঞান ছিল
না। আমার সঙ্গে অনেক দিনের মতোই ছিল। উদ্ভিলাহ বসিলাম।
কিন্তু দিন চাউতি মনোহর পাই হইতে না হইতে কামাটী ওয়ে থালি হইয়া গেল।
একজন যাত্রীই কলিকাতার মিউজিক হাউসে—হাউস ম্যানের বাড়ী
কলিকাতা হইল। কলিকাতার মধ্যে আমি, এক জন প্রৌঢ় ব্যক্তি ও
একজন সত্বেদী এক জন বিচারী। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—পশ্চিমে আকাশের
নিম্নভাগে একখানা মেঘে একজন হইয়াছে—উপরে আকাশে নক্ষত্রদীপ্ত।
কিন্তু নক্ষত্রদীপ্ত হইয়াছে। তাই বেলায় রাত্বেই দুই পক্ষের যে দুই পক্ষ
কলিকাতার কেবল কলিকাতা। তাহা হইতে অবশেষে একটি কাটাও লইয়া কর্তব্য
শেষ করিয়া নিশি হইয়াছে, সেই অগ্নিতে আগ্নেয়াস্ত্র পত্রাঙ্গের মাথা

প্রসারিত কবির। যেন রাঙাটাকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। পূর্বের পার্শ্বে খাতে জল হইতে পচান পাটের বা পচা পাতার দুর্গন্ধ ও দশক দ্বারা দৃষ্টিতে বিরক্ত করিতেছে। আশার প্রৌঢ় সহবাত্রী যেনে এই পথেও তাহা তাঁহার সহগামিনী কিশোরীকে বুঝাইতেছিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছিল, কিশোরীর পক্ষে এ পথ নূতন। কথায় বুঝিলাম, কিশোরী তাঁহার বংশ। তাহার বয়সে সাধারণ বাদ্যলীর মেরের যে সম্বোধন-কৃত্তা দেখা যায়, তাহার অভাবই তাহার দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে। সে পিতাকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিল—নানা কথা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন।

আশার সঙ্গে একটা ঝুড়ীতে প্রতিমার “ডাফের সংক” ছিল। তাহা দেখিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি বুঝি শ্রমায় বাড়ী বাইত-ছেন?”

আমি বলিলাম, “হ্যাঁ।”

তাহার পর তিনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—আজ কাল দেশে পুষ্টি কেমন, দেশে কোন্ কোন্ ফসল হয়, ব্যবসায়ীগণের “বিশ্ব” কিরূপ দেশে শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে কি না?—ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে অদীত পাশ্চাত্য দর্শনের প্রাণ হইলে আমি সে সকলের খেঁচপ খাচর উত্তর দিতে পারিলাম, এবং “ববের কথা” বলে তেমন উত্তর দিতে পারিলাম, এমন নহে। আমার অন্ততম যে কিশোরীর বিষয় জ্ঞানিত ছিল, তাহা তাহার দৃষ্টিতেই প্রকাশ পাইতেছিল। আর সেই বিষয়-বিকাশে আমি কেবলই লজ্জিত হইতেছিলাম।

আমি আমার সহবাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনার কথায় বোধ হইতেছে, আপনি অনেক দিন বাঙ্গালার আইসেন নাই। আমার এ অস্থান সত্য কি?”

উত্তরে তিনি বলিলেন, তিনি-বিশ্ব বংশের বাঙ্গালী ছাড়া—অযোধ্যা তৎকালে সরকারী ডাক্তার ছিলেন; সংপ্রতি পেশন লইয়াছেন। আমি যে দেশে নামির, তাহার আগের বর্ষে ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার বাড়ী বাইতে হয়, কিন্তু বংশ তিনি বাড়ী যান নাই। বাড়ীটিও সংস্কারভাবে জীর্ণ। এক জন দরিদ্র আত্মীয় সেটি চাহিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে গৃহটি লান বাবিলেন। তৎপূর্বে একবার বাড়ী বাইতেছেন—একবার বাড়ীটি দেখিবার জন্যও বটে, আর কথা—আশা—কখনও বাঙ্গালার পল্লী ঘেঁষে নাই, তাহাকে দেখাইবার জন্যও বটে। তবে এই আলোচনার সময় সপ্তাহের অধিক কাল তথায় থাকি

তাহার পব তিনি মনোযোগের সহিত, ইতিহাস, ব্যাপ্তি—সব বিবৃত করিতে লাগিলেন। বয়সের অটনক্যাহেতু আমাকে তাহার “আপনি” বয়সী সম্ভাষণ প্রত্যন্ত স্বাভাবিক নিম্নমে “তোমাকে” নামিয়া আসিল। তিনি নানা কণ্ঠস্ব আত্মকে আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন—আমার ভালবাসা লাভ করিলেন। আমার বাড়ী ট্রেন হইতে অনেকটা দূরে, এবং আমার জলপথে বাড়ী পহুছিতে প্রায় পলাত হইবে ওনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাকিতে আহারের কি হইবে?” আমি বলিলাম, “এখানে আহার করিয়া আসিয়াছি—বাকিতে আব আহার করিব না।” জিজ্ঞাসা তিনি বলিলেন, “সে কি কখনও হয়! তোমাকে বয়সে অনাহার কেন?” তিনি কহিলেন, “উঠ ত, মা আশা, কিছু খাবার বাহির কর।” আমি উঠিয়া একটা বাস্তু খুলিল। তাহাতে নানা রূপ খাবার ছিল। সে একখানা পিচিট হইয়া আমাকে খাবার দিল। আমার সব অপত্তি অগ্রাহ করিয়া আব ব প্রোট সহযোগী আমাকে সে সব খাওয়াইয়া তবে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, “সব খাবার ঘরে প্রস্তুত—প্রায় সবই আশা প্রস্তুত করিয়াছে।”

যদি নিয়ত পবই ট্রেন আমার সহযোগীদের গন্তব্য স্থানে আসিল। সে ট্রেনে ট্রেন চাই মিনিট মাত্র থান। প্রোট ভদ্রলোকটি নামিয়া কুলী ডাকিয়া জিনিস নামাইয়া লইতে না সহিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তিনি ব্যাকুল হইয়া ডাকিলেন—“আশা! আশা!” ততক্ষণে ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে অসহায় কিশোরীর পক্ষে নানা বিপজ্জনক বুঝিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া দ্বার কক করিয়া দিলাম—চীৎকার করিয়া বলিলাম, “আমি আপনার কণ্ঠকে লইয়া গন্তব্য গাড়ীতে ফিরা আসিয়া।” তাহার পব আমি আশার দিকে ফিরিলাম। সে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের পাণ্ডুর ও নগনের দৃষ্টিতে তাহার আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা ব্যস্ত হইতেছিল। তাহাকে বলিলাম, “চলন্ত ট্রেন হইতে নামিবার চেষ্টা করিলে তোমার বিপদ ঘটিল। তুমি ভয় পাইও না; আমি যেরূপ গাড়ীতে তোমাকে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়া তোমার বাবার কাছে দিয়া দাইব।” কথাটা বলিয়াই আমার মনে হইল—কিন্তু আমার সঙ্গে পুজার জিনিস, আনার ও ত বিলাস করা সম্ভব নহে। সঙ্গে টাইমটেবল ছিল; সেখানি খুলিয়া আমি দুই দিকের গাড়ীর মধ্যে রাখিয়া বুঝিলাম, আমাকে যে ট্রেনে নামিতে হইবে, সে ট্রেনে নামিয়া নির্দিষ্ট দিকগামী ট্রেন পনের মিনিট পরেই পাওরা

নামিব, এবং বাড়ী হইতে যে চাকর আসিয়াছে, জিনিসগুলি দিয়া তাহাতে চাষিয়া দাইতে বলিয়া পরের ট্রেপে আশাকে লইয়া কিরিয়া আসিব। আমি আশাকে সে কথা বুঝাইয়া বলিলাম—বলিলাম, তাতা কাল মেয়েদের পক্ষে ট্রেপে গভীরত যেকপ শঙ্কাসম্মূল হইয়াছে, তাহাতে আমি তাহাকে একা দাইতে মিতে পারি না। কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক ঘিনিস--সেগুলি পবদিন সকালে বাড়ী পৌছাইতেই হইবে—সেই ক্ষণ আমি আমার গন্তব্য ঠেশনে সেগুলি দিয়া কিরিয়া আসিব। তখন সে ঠেশনে নামিলেও পরের ট্রেপ পাওয়া দাইবে, তখন গববর্তী ঠেশনে না নামিয়া তথায় নামিলে কোনও অসুবিধা হইবে না। আশা সব শুনিয়া বলিল, “আপনি বাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করুন।” তখনও তাহার মুখে গববর্তী পাওয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়নি—তাহাতেই তাহার মানসিক চাক্ষুণ্যের পবিচর সপ্রকাশ ছিল। কিন্তু তাহার ব্যবহারে বা কথার চাক্ষুণ্য ছিল না। বিশেষ তাহার দৃষ্টিতে ও ব্যবহারে বিশ্বাসের পূর্ণ পবিচর পাওয়া দাইতে ছিল। সেই পাণ্ডগল্য বিশ্বাসসমুজ্জলদৃষ্টি কিশোরীকে দেখিয়া আমার মনে হইল—আমি জীরনে যমলীতে তার কখনও সেরূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি নাই। তাহা সত্য কি আমার মুগ্ধ কল্পনার স্বর্ণবর্ণপ্রেমপন্থষ্ট, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবে তাহার সেই মুখের ছবি আমি আমার চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারি নাই। মাতুষের জীবনে একবারমাত্র এমন ঘটনা ঘটে—সে দিন পরো তাহার বৃদ্ধদের উপর যে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাদে না হইয়া স্থলপট্টই হইয়া উঠে।

৩

দেখিতে দেখিতে ট্রেপ পরবর্তী ঠেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। লঠন-হাত চণনা-নাকে ধূতী-পরগে টুপী-মাথার ঠেশনমাঠার কসটা কামবায় উকি দিয়া আমাদের কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম ছিল। তাহা দেখিয়া তিনি কিশোরীকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি বাবু বেণীমাবদ রায়ের কস্তা—আশা?”

আশা বলিল, “হ্যাঁ।”

“বেণী বাবু টেলিগ্রাক করিয়াছেন, আগের ঠেশনে আপনাদের নামিবায় কথা—আপনি না নামিতে ট্রেপ ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি আপনাকে নামাইয়া লইয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তিনি পরের গাড়ীতে আসিবেন।”

আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম, “পরের গাড়ী কতক্ষণ পরে আসিবে?”

শ্রেশ্ঠমন্ডির আশ্রয় দিতে চাহিত বসিলেন, “পাঁচ বস্তা পাবে।”

দামি নিশান “এতকণ ইনি একা এই অপরিচিত স্থানে থাকিবেন। তা হইতে পারে না।”

একটু লক্ষ্যবশে শ্রেশ্ঠমন্ডির বসিলেন, “কেন?”

দামি বেগে মেয়েবেগে বিপদ ও রেলকর্মচারীদের ব্যবহার সম্বন্ধে বারংবার বর্ণনাদান, তাহাতে শ্রেশ্ঠমন্ডির চাট খেলেন; বসিলেন, “আপনি কি করিতে চান?”

“নিশ্চয়ই দিল্লীর ট্রেন তাহান পূর্বে আনিবে। সেই ট্রেনে ফিবিয়া পাওয়াই উচিত।”

“কিন্তু বেগী বাবু তাহা লেখে নাই।”

তিনি ব্যস্ত হইয়া টেলিগ্রাফ বসিয়াছেন; অত ভাবিবার সময় পান নাই।

“ভাল, তবে উহাকে হইয়া নাহক; দামিরা তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করুন; তিনি তাহা পান। তাহাই কথা বহিবে।”

“আমি এ শ্রেশ্ঠনে নামিতে পারি না।”

“কেন?”

“আমার সঙ্গে এই সব ভিন্দি আমাকে পাঁচ শ্রেশ্ঠন গরুর শ্রেশ্ঠনে পৌছাইয়া দিতেই হইবে। তাহা বনে সে শ্রেশ্ঠন হইতেও ফিবিয়ার ট্রেন ধরা বাইতে, এখন তাহাতে কোনও ক্ষতি হইয়া না।”

শ্রেশ্ঠমন্ডির এক্ষণ মনে কলিতছিলেন, আমি বেগী বাবুর সম্মী, এখন তাহা বনে সে সনেহ ঘটিল। তিনি বসিলেন, “আপনি ইহা ক’রে?”

ঐক এই কথাটাই আমি তাহা দেখি নাই। বাস্তবিক আশার অভিভাবক এই আমার কেনরূপ অধিকার নাই। ছেলেরা অনেক যত্নে তাহা বনে প্রস্তুত করিতে করিতে নহা অধিকার, কল্পনে তাহা পড়িয়া গেলে তাহাদের অক্ষয় দেখি হয়, শ্রেশ্ঠমন্ডির বেব বনে আমার অবস্থা সেইরূপ হইল। আর আমাকে ধন্যত ধাইতে দেখিয়া শ্রেশ্ঠমন্ডির প্রবল হইয়া উঠিলেন; বসিলেন, “আপনি যদি উহা বনে অধিকার না হন, তবে আপনি অপরিচিত অজ্ঞাত-মুগ্ধমণ্ডি যুবক, আপনার সঙ্গে যুবক।” দমন ত কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে।

আমি কোনও উত্তর দিতে না পারি। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বসিলেন, “আর যিনি তাহাই বনে ইহা বনে পিতা ও মাতা করিয়াছেন, তাহাই ত পালন করিতে হইবে।”

“ভগ্ন নিকপায় হইল আমি আশারের বলিলাম, “তুমি অবস্থা সব দেখিতেছ, তোমাকে হয় বিশ্বাস করিয়া পাচ ঘণ্টা এই ষ্টেশনে থাকিবার জন্য নামিতে হইবে, নহে তা আমার সঙ্গে যাইতে হইবে। তুমি কি করিবে—নামিবে।”

আশা দৃঢ়স্বরে বলিল, “না।”

ষ্টেশনমাষ্টারকে হাবি মানিতে হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, আশার আশ্রয় একবার নামিবার জন্য বঝাইয়া বলিবেন; কিন্তু ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব হওয়ার গা, তাহার সঙ্গে যুগড়া করিতে লাগিল। অগত্যা তিনি কামবা হইতে নামিতে নামিতে চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন—“ঘণ্টা—এ—ই—ঘণ্টা।”

উড়িয়া মালী টাঙ্গান লাইনের টুকরায় হাতুড়ী পিটিয়া দিল।

ষ্টেশনমাষ্টার আমাকে গুনাইয়া গুনাইয়া বলিলেন, “আজ কালকাল ছেড়ে কি ভগ্নানক। ভুললোক খানায়সে ঘেমেটার—”

ইচ্ছা হইল নামিয়া দাকতক দিয়া দিই।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

আশা বলিয়া, “আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধার পড়িতে হইল।”

আদি বলিলাম, “তোমার অসুবিধার তুলনায় আমার অসুবিধা সামান্য। জিনিষ লইয়া চাকর নৌকায় চলিয়া যাইবে, স্ত্রুতবঃ বিনিময় মণ্ডিকানে পৌছিবে। তাহার পর আমাকে আসিয়া নৌকা করিয়া বাড়ী যাইতে হইবে। তবে সব সময় ঘাটে ভাড়া নৌকা থাকে না।”

“আপনার পিতামাতা কত উৎকণ্ঠিত হইবেন।”

“সে ভয় নাই। বাবা আমাকে ভালরূপ জানেন। আমার মা নাই।”

আশা একটু দান্তভাবে বলিল, “তবে আপনারও মা নাই।”

“না।”

সে আমার দিকে চাহিল—তাহার দৃষ্টিতে যে সমবেদনাব ভাব ফুটিয়া উঠিয়া, তাহাতে মনে হইল, সমস্তেই হৃদয় ও অন্তর্দর্শন পীড়িত আমাদের দুই জনের মধ্যে একটা মতন বন্ধন স্থাপিত হইল।

আমার গন্তব্য ষ্টেশনে ট্রেন ছিন্ন হইলেই আমি নামিয়া পড়িলাম, এবং আমাকে নামাইয়া লইলাম। বাড়ী হইতে যে চাকর নৌকা লইয়া আসিয়াছিল, সে হাবিক্যান লণ্ডন লইয়া প্লাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছিল। সে আমাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুত আমার কাছে আসিল; কিন্তু আমার সঙ্গে অপরিচিতা নিঃশব্দে

দেখিও হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কবিতাও জ্বলিয়া গেল।
আমি হেঁচকি মারলাম। কান্নাশ্রুত নয়। ঠিকই বুঝলাম।

ট্রে শেফার্ড গেল; পান-চুট-ওগ-নাগিওন চীৎকার থামিল গেল। "আমি
ফাটিকার্মে বেঞ্চে অশাকে বসলাম, তৃতাকে তথায় বাঁধিয়া ফিলায়া যাইব।
এই দুইখানি টিকিট ফিলায়া আনিয়া; তাহার পর অদ্বাদি ভ্রমণে একা হইব।
চেষ্টে বাতব। তাহাকে ফিলায়াম, তুই ফিনিস লইয়া নোনাগা ফিলায়া। আমি
কাল 'ফিলায়া আনিয়া যাইব।" সে আসল ব্যাপার কতটা বুঝিল, এবং কতটা
বুঝিল, তাহাও কতটা বিশ্বাস করিল, বলিতে পারি না। তবে তাহাকে আবণ্ড
একা বার সময় আমার ছিলা না। কারণ, কয় মিনিট পবেই বিশবীতদিকখাতী
গাড়ী আসিয়া পড়িল। কুমীয়া আশাৰ নিদ্রাভ্রুতকণ্ঠে শেফেনেব নাম হাঁকিল,
পান চুট ওগালালা জাবাথ পণ্ডেন নাম হাঁকিল, খাতীরা ডাকাডাকি ইকাইকাই
করিল আমি আশাকে লইয়া এগটা জামবায় উঠিলাম।

তখন আমার ভূতটিব বুদ্ধি নহস। প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বদিল, "তা
নোকা, তাগিয়া গেলে আগনি বাটনে কেনন করিয়া?"

আমি বলিলাম, "সে বনোনাগু আমি করিয়া লইব। তুই ফিনিসগুলা
সংবাদে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যা।"

ট্রেব হইমূল নিশীথ নিফতার রাগে বিকট শুনাইল।

৫

সে শেফেনে আমার সহিত ট্রেবনাগিওনের বচসা হইয়াছিল, তাহার পবেব
শেফন হইতেই আমি বেগী বাবুবে টেলিগাফ করিয়াছিলাম। তিনি শেফনেই
অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমবা ট্রেণ হইতে নামিলেই তিনি ছুটিয়া আমাদের
করে আসিলেন, এবং আশাকে নকোটানিয়া লইলেন। আশাও মধ্যে হর্ষদীপ্তি
দেখিয়া উঠিল; গেল ভালপ্রাপ্তিমিত্ত কুস্তমাস্তৃত উপত্যকায় কুহেলিকাবরণ ছিন্ন
করায়া ববিদের দেখা দিল, তাহাও সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহস। সংগ্রাস হইল।
পিতাপুত্রীৰ মিলনানন্দে আমরা মনে দটম, আমি সে পুত্রগণ পাইলাম, আমায়
কাম্বোজ তুলনায় তাহা অত্যন্ত অধিক।

তাহার পর বেগী বাদু আমাকে প্রণয়সায় প্রাণিত করিয়া দিলেন। তাহার
বাছি আমাকে পণ্ডেন সব ঘটনা প্রাণার বিবৃত করিতে হইল। তিনি ছাৰ বন্ধ
কবি: আশাকে চন্দ্র ট্রে হইতে নামিতে বাধা দেওয়া, শেফনাগিওনের কথায়
তাহাকে নামিতে না দেওয়া—বিষয়ে আমার কাক্ষণ সম্বন্ধন করিয়া আমাকে

সাদুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া সাদৃতঃ এক দিনের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুবোধ কবিত্তে লাগিলেন—হুন্ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, আমার কাছে তাঁহার ও আশাৎ কৃতজ্ঞতার ঘন পোঃ কবিরার সাধ্য তাঁহাদের নাই।

আমি কেন তাঁহার অনুবোধ বক্ষ্য করিতে পারি না, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া আমি তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলিলাম। তিনি সে কথা মানিলেন না—আমার যাইবার ট্রেন না আসা পর্যন্ত তিনি ট্রেনে থাকিবেন। অগত্য আমি বিশ্রামক্ষে যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি যেন সেই ঘরে বসিলেন। তখন বেগী বাবু ট্রেনে যাতায়াতে ছোট বড় নানাক্রম নিপুণ অভিজ্ঞতা বিবৃত করিতে লাগিলেন। একবার ঘুমাইয়া পড়িব, তিনি যে হেঁপে নামিবেন, সে ট্রেন ছাড়াইয়া বাওয়ার কিরূপে ট্রেনে ফিরাইয়া আসিরা হইবে। একবার লাগেজ হারাইয়া তিনি কিরূপ বিস্ত্র হইয়াছিলেন, একবার তেঁকে অঃ সওয়ার্ডসেব অধীন এক জন গমীদারের কহোরার চিকিৎসার জন্য যাইবার সময় তিনি ট্রেন না পাইয়া কিরূপে এত্নে গিয়াছিলেন—সেই সব কথা হইতে ক্রমে পশ্চিমে বেলখোণা, তাহার পূর্বে গতায়াতের অনুবিধা, মেয়ে রেলখোণ উপকার অপকার, সেচেব খালে ও বেলে আয়ের তারতম্য, পতনদে সেচেব খালে জরীদ উন্নতি ও গ্রাম-পতন—এইরূপ নানা কথাঃ তিনি সময় কটাইয়া দিত্তে লাগিলেন। তাহার পর আমার যাইবার বাড়ী আগিলে আবার আশাৎ যত্নবাদ দিয়া বিদায় দিলেন।

বেগী বাবুর অন্তঃপ্র আশীর্বাদ ও প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়া আমি গাড়ী উঠিলাম। আশাৎ দৃষ্টিও প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

৬

ঘাটে নৌকা না পাইয়া অধিকাংশ গর্থ হাটিয়া ও পানিকটা পথ মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া—পথে কলিকাতার চীনের বাদামেব সৈদঃ জাঃ অনুজ্ঞক কচুবীৰ অভাবে মুড়ী-শুড়ে দম্ভোদয় পূর্ণ কবিয়া যেরূপে পূর্বঃ বাড়ী পহুছিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আত্ম-চরিত্রের পৃষ্ঠা পূর্বঃ কবিত্তে তাহাও, মাগ্রে ও প্রশংসাসহকারে পঠিত হইয়া আমার চরিত্রগত, গুণ-পরিচয় সহায়তা করিলে, এমন গিহ্যনৌভাগ্যলাভের কোনও কাহ্ন আমার দ্বারা নহঃ নাই। আমি যে ব্যবসা লইয়াছি, তাহাতে কেবল মক্কেলের সঙ্গে “ফেঃ, বঃী লও বঃ্পে,” সম্বন্ধ। যতঃ সাং সে জরীদ কথা আর বলিয় না।

“হুঁ। তুমি তাহাই বলিছাছ, এবং এত দিন আমিও তাহা গনিয়াছি। কিন্তু আর গনিয়া নিচিন্ত থাকিতে পারিতেছি না।”

ট্রেনের ঘটনার সঙ্গে কি বাবার কথাই কোনও সম্বন্ধ আছে? আমি একটু বিচিন্ত হইলাম। ক্লিফোর্ড কবিরাম, “কেন?”

“তোমার বিবাহের বিষয়ে লোক আমার নিন্দা করিতেছে।”

“মোবের মত ছেলের বিবাহে বিশেষ হইলেও কি লোকনিন্দা হয়?”

“লোকও কোনও ক্ষেত্রে হয়। এ ক্ষেত্রে হইতেছে; কারণ তোমার গর্ভন দিলী নাই। লোক বলিতেছে, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি ক্ষেত্র হইয়াছি।”

ট্রেনের ঘটনার সঙ্গে বাবার কথাই কোনও সম্বন্ধ নাই জানিয়া যেমন নিশ্চিন্ত হইলাম—বাবার কথাই তেমনই ব্যক্তি হইলাম। আমি বলিলাম, “আপনি আশা প্রতি স্বেচ্ছীন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে ত কোনও দিন আশা মনে পায় নাই।”

বাবা বলিলেন, “তোমার মনে স্থান পায় নাই—তাহা আমি জানি। কিন্তু লোকের মনে স্থান পাইয়াছে।”

“আব: হুঁ। বৎসরে আমার পড়া শেষ হইবে। সেই দুই বৎসর আপন অগেঞ্জা ককন।”

বাবা হিব ও দৃঢ় স্ববে বলিলেন, “না।”

আমি একটু ইতস্ততঃ কবিরাম বলিলাম, “আপনি বোধ হয়, আমার বিবাহ-প্রার্থনার অন্ত কালও অনুমান করিতে পারিয়াছেন।”

“গারিয়াছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার মার ব্যবহারে তোমার কঠিন কাব্যের সমর্থক কোনও সংশয় পাইয়াছি কি? তিনি কি আমার পুত্রবধূ প্রতি অসম্মান্যতার কবিতা সাহস করিবেন বলিয়া মনে কর?”

“তালা করি না—কিন্তু অসন্তোষের বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকিলে তালা আত্মপ্রকাশ করিতে কতক্ষণ?”

“তুমি পঞ্চমাবের কিছুই জান না। সংসাবে সব কল্পনার মত হয় না। একটু আরটু কল্পনা গিয়া সকলবেই ঘব করিতে হয়। সকলকেই তাহা ব্যক্তি হইয়াছে, সকলকেই তাহা করিতে হইবে। তোমাকে বিবাহ কবিতা হইবে।”

বাবা ব্যাঙ্গ কবিলে দরশীর মুখলা চিহ্নিতেন। তিনি তাহাই করিতেছিলেন।

আমি বলিলাম, “আপনি আমাকে এ আদেশ করিবেন না।”

“আদেশ আমি করিয়াছি—এখন সে আদেশ নানা না মানা তোমার কাজ।”

পূর্বে বাবা একথা বলিলে আমি অসম্মতি জানাইলে তিনি কখনও বাগ করেন নাই—এবার করিলেন। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব তাহার কারণ নহে। এবার আমি তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তিনি যত্নবৃত্তি প্রতিবাদ সহ্য কবিত্তে পারিতেন না। আরও কারণ, আমার এই প্রতিবাদে বিমাতার নিকট তিনি পরাজিত হইলেন। বিমাতা যখনই আমার প্রতি পিতার অপমানের নোধ রচনা করিবার জন্য ভিত্তিকপে প্রতিপন্ন কবিত্তে চাহিতেন যে, আমি তাঁহার অবাধ্য হইতেছি, তখনই বাবা বলিতেন, আমি কিছুতেই তাঁহার অবাধ্য হইতে পারি না। এবার বিমাতা তাঁহার কথার অকাট্য প্রমাণ পাইলেন।

কিন্তু আমিও বিচলিত হইলাম। যে ক্ষিদ ও একগুঁয়ে ভাব আমি বাবার কাছে হইতে উদ্ভাবিকাচরণে পাইয়াছিলাম, কয় বৎসরের দর্শনালোচনায় তাহা এতীব্রবে শব্দ করিয়া ফেলিতে পারি নাই। আমি বলিলাম, “কিন্তু আপনি কি সব ভাবিয়াও এই আদেশ দিলেন?”

তিনি বলিলেন, “হাঁ, তুমি এ আদেশ পাশন না করিলে আমার সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না।”

আমি বলিলাম, “তবে তাহাই হউক।”

বাবার মুখ গাল হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া এক জন কর্মচারীকে ডাকাইয়া আমার ঘাইবাব জন্য একখানা নৌকা ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন।

আমি সে কক্ষ ত্যাগ করিলাম।

আমি বাগে জিনিষ ফেলিয়া লইয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন সময় অনাথ কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং বদিল, “দাদা, তুমি ভাবিও না। ছয় মাস পরেই আমি তোমার কাছে যাইব।”

আমি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন?”

“এবার আর খেলা কবিব না; যেন করিয়াই হউক, পাশ করিব। তখন ত পড়িতে কলিকাতার যাইতে হইবে। দেখি, আমবা ছই ভাই-ই যাইলে শাবা কেমন কবিয়া স্থির থাকেন।”

তাঁহার কথার প্রভাববিস্তার আমি মুগ্ধ হইলাম।

আমি আমার কইরা ঘাইবাব সময় সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গেল, এবং

আমি বদন নোকার উঠিব, তবু আমাকে প্রধান কবিতা বলিল, “দাদা, ঘাইব না নাই, তাহার হুং অপরিমী ; কিন্তু যে না থাকিতেও মাকে ভক্তি করিতে গাবে না, তাহার হুং আরও অপরিমী।”

আমি অনাথের মুখে যে বেদনার চিহ্ন দেখিলাম, তাহার সদা প্রকৃত মুখে পূর্বে কখনও সে চিহ্ন দেখি নাই।

৭

কলিকাতায় আসিয়া চাকরীর সন্ধান প্রবৃত্ত হইলাম। চাকরী-খানির সংবাদ পাইলেই আবেদন কবিতাম। কিন্তু কোনটি আমার বয়স অল্প বলিয়া, কোনটি বা আমি আইন পরীক্ষা দিব, সুতরাং হারী হইব না বলিয়া, পাইলাম না। প্রথমে চাকরী পাইবার যে প্রবল আশা ছিল, তাহা ক্রমে দুর্বল হইতে লাগিল। দুই মাসের চেষ্টায় একটি চাকরী কুটিল—আমি এক জমীদার-পুত্রের অভিভাবক ও শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। কাজ লঘু—আমার পাঠে কোনরূপ অহুবিধা হইত না।

কিন্তু অধিক দিন এ কাজ করিতে পারিলাম না। অনাথের এবার যে কথা, সেই কাজ। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আনিলাম, এবং দ্বিদি কবিতা বলিল, সে যে অনেক কষ্ট করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে কেবল আমবা দুই ভাই এক সঙ্গে থাকিব বলিয়া ; অতএব আমাকে এ চাকরী ছাড়িয়া ‘মেসে’ ফিরিয়া যাইতেই হইবে। আমার সহিত এই ঘনিষ্ঠতার বান্ধা যে তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, তাহা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কবিতাম। কিন্তু ষণ্ণবাত্যা যেমন সম্মুখে বাহা পড়ে, প্রবল বলে তাহাই চূর্ণ করিয়া দেয়—সে-তেননই তাহার মেহের বলে এব যুক্তি চূর্ণ করিয়া দিল। সে বলিল, “আমার এত কষ্ট করিবার উদ্দেশ্য—না’কে দেখাইব, ষড়্ভয় অপেক্ষা দ্বৈত শক্তিশালী।”

আমি চাকরী ছাড়িয়া ‘মেসে’ আসিয়া আর একটি চাকরী খুঁজিয়া গাইলাম। হুং জুখে দুই ভাই এক সঙ্গে দুই বৎসর কাটাইলাম। হুং প্রথম কারণ, অনাথের অনবিল অহুরাগ। হুং প্রধানতঃ বাবার মৃত্যু। অনাথ এক একবার বাড়ী যাইত, আর, বাবার স্বাস্থ্য লক্ষ্যে যে সংবাদ আনিত, তাহাতে আমার হৃদয় বেদনার ও আশঙ্কার পূর্ণ হইয়া গাইত। তিনি আমাকে তাড়াইয়া স্নেহের বেদনায় পীড়িত হইতেছিলেন—সে বেদনায় তাহাকে সাহনা দিবান—সহানুভূতি দিবার কেহ ছিল না। বৎস মিতার কাছে তিনি সে বেদনা গোপন করিয়া বই প্রায় পাইতেন, এবং সেই প্রয়াসে আপনি আবেগ বেদনা

ভোগ করিতে ন। হয়, যদি তাঁহান কাছে ফিরিয়া যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া ক্ষমা-
লাভের জন্য পাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নহে। তাঁহাব প্রকৃতি
আমাব অপরিচিত ছিল না। আমি ফিরিলেই তিনি আমাকে তাঁহাব
ব্যথিত শিষ্ট বক্ষে লইতে পারিবেন না। বরং আরও কৃত্রিম কাঠামতীর চাপে
সাপনার স্নেহ নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া আরও বেদনা ভোগ করিবেন।
বাবার জন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইলাম।

এই সময়ের মধ্যে বিবাত অনাথের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।
অনাথ দাড়া জবাব দিয়াছিল, “যদি কখনও দাদাকে আনাইয়া তাঁহাব বিবাহ
দিতে পার, তবেই ও কথা মুখে আনিও—নহিলে নহে।” শুনিয়া আমি
বলিয়াছিলাম, “তুমি অমন কপিলে নাবা-বাগ করিবেন।” সে উত্তর দিয়াছিল,
“বাবা বুঝিয়াছেন, আমরা তাঁহাব হেলে। ছেলের উপর রাগ করিবার ফলে
তিনি তোমাকে দিয়া দেখিয়াছেন—আর রাগ কবিতে পারিবেন না।”

বাবার অবস্থার ও অনাথের অবস্থার বিনাতাব শিক্ষা হইতেছিল। এ দিকে
অনাথ-বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল—আমিও আইনের শেষ
পরীক্ষা পার হইলাম। পরীক্ষার আমি সর্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়াছিলাম।
একটি আধ-স্বাধীন বাজো আমার সহকারী দেওয়ানী কাজ জুটিল। সেই সংবাদ
পাইয়া অনাথ বলিল, “দাদা, তুমি নাও—আর আমার জন্য পরকাম নষ্ট করিও
না।” কিন্তু সে আমাব জন্য নাল করিয়াছে, তাহা মনে কবিয়া আমি তাহাকে
ছাড়িয়া যাইত ইত্যন্তঃ কবিতেছিলাম দেখিয়া সে বলিল, “তুমি কি ভাব
কবিতছ, তুমি দুবে থাকিলে আমনের স্নেহের হ্রাস হইবে? সে ভয় কবিও
না। তুমি ত কলিকতায় থাকিতে আর আমি বাড়ী থাকিতাম। তাহাতে
কি স্নেহের হ্রাস হইয়াছিল?”

আমি চাকরী লইলাম। অন্য আমাকে তাহাব ও বাড়ীর সমস্ত সংবাদ
সর্বদা দিত। বাবার সংবাদ আমাব উৎকণ্ঠার অবধি ছিল না।

খ

(অনাথনাথের কথা!)

৮

প্রথমে যাইয়া দাদাকে বাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। আসিতে আর
ইচ্ছা হয় না। জীবনে কখন এমন এক—এমন ফাঁকা বোধ কবি নাই। যেন
আমি জন্মবহন নগর হইতে ভ্রমস্থ মকতুলিতে আসিয়া পড়িয়াছি। বাবার

হিরিমাথের চাকরি আনন্দ কান্না পাইতে লাগিল। এ ভাব নির্বিকারভাবে
সহ্য করিতে পারি, এমন দার্শনিক প্রকৃতি আমার নহে। দাদা যখন নাই,
তখন পড়া আন ফাটা হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং কলেজ
খুলা থাকিলেও একবার-বুঝি আসিবার জন্য বাড়ী রওনা হইলাম।

দাদী আসিয়া দেখিলেন, বাবা বড় অসুস্থ। তাঁহার চিবুকে কণ্ঠি স্থানে
স্ফীতি দেখা দিয়াছে। তাহার বেনামস ও যাতনায় তিনি অস্থির হইয়াছেন।
বাবার ন্যস্তাঙ্গ সন্ধ্যাপণ। একবার তাঁহাকে কঁকড়া বিছায় কামড়াইয়াছিল;
তখনও তাঁহার মুখে যাতনাবাক্য কোনও স্বর স্ফুটে নাই। তেঁকে সে তাঁকে
ঘোবনে। এখন তিনি অতিরিক্ত ঘোবন—বিশেষ দাদার গৃহত্যাগের পর হঠাৎ
তাঁহার শবীর যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এবার যাতনায় তাঁহাকে অস্থির দেখ-
লাম। বাড়ীতে যে ডাক্তার কুইনাইন ও ম্যাগনেসিয়া দিয়া অনেক রোগে
চিকিৎসা চালাইতেন, তাঁহাকে দ্বিষ্টালা করায় তিনি বলিলেন, “ম্যাগনেসিয়া
পারিতোও পারে, বসিয়া থাকিতেও পারে।” থাকিলেও কাটিতে হইবে। “স-
শঙ্কায় জ্বর ছাড়া আর কিছুই নহে।” তাঁহার কথার ভাব—জ্বরও নাই,
জরসাও নাই।

আমি বহুকষ্টে—বহুবাবের চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কৃতিত্ব আমার নাই। পরীক্ষায়
যেমন আপনি খাইয়া সেই খাবার দাবকের সঙ্গে টালিয়া দেয়, দাদা তেমনি
অধিকৃত বিদ্যা আমার যন্তিকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। আমি যে বিদ্যা প্রভ
করিতে পারি নাই—খানিকটা পরীক্ষার সময় উত্তরের কাতার ছড়াইয়া ফেলি।
“আসিয়াছিলাম।” যাহা হউক, প্রথম পরীক্ষার অসাকল্যে আমার একটা বড়
উপকার হইয়াছিল—আপনার বুদ্ধিতে আমার অতিরিক্ত বিশ্বাস জন্মে নাই।
দাদার অবস্থা দেখিয়া আমি সব কথা দাদাকে লিখিলাম। উত্তরে দাদা টেলিগ্রাম
করিলেন, “যেমন করিয়া গাঁব, বাবার কলিকাতায় লইয়া বাইখা চিকিৎসা
করাও—বিসম্ব করিও না।”

দাদার উপদেশানুসারে আমি বাবার কলিকাতায় লইয়া গাইবান্ধা জুজ
করিতে লাগিলাম। মাও আমার সঙ্গে যোগ দিগেন। বাবা সম্মত হইলেন।

কলিকাতার আসিয়া মফস্বদে প্রতীক্ষিত কয়জন বড় ডাক্তারকে ডাকা হইল।
কলিকাতায় যে সাধারণ চিকিৎসকে ও অস্ত্র-চিকিৎসকে প্রভেদ হইয়াছে, তাঁহা
আমরা প্রতীক্ষিত না—ডাক্তার বরকার তাহা আনাইয়া দিলেন। “ইয়া অস-

চিকিৎসাৰ ব্যাধাৰ" বলিয়া তিনি ডিজিট লইয়া মোটেৰে উঠিলেন। তখন
আধাৰ অস্ত্ৰ চিকিৎসক ডাক্তাৰ হৈল। ডাক্তাৰ নৰ্সাধিকাৰী দেখিয়া বলিলেন,
"গ্যাণ্ড কষ্টা কাটিয়া ফেলিয়া গিলেই সব, সায়িয়া যাইবে।" শীৰ্ষকায় নৰ্সাধি-
কাৰী তখন হাঁসপাতাল-তরী মাফাইয়া কাৰ্ষাণ-যুদ্ধেৰ অন্ত বাঙ্গালীৰ ছেলেকৈ
ফেনোপোটেনিয়াৰ পাঠাইতে বস্ত। গ্যাণ্ড কাটিয়া ফেলা হইবে—এটা যেন
দাব্যত হইল, এই ভাৱে তিনি ঢেৰুল ছেলে পাঠানৰ গঢ় কবিয়া-তপায় বাঙ্গালীৰ
ছেলে মৰিলে ডাবতেৰ ডলিৰে কিকপ উজ্জল হইবে বলিয়া, সেদিনেৰ মত
হিন্দাৰ লইলেন। কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰে বাৰায় বিশেষ আপত্তি ছিল। তাই
শানিৰা আৰ এক জন ডাক্তাৰ ডাকাইলাম; যতীন্দ্রবাবু "ইন্ডেক্সনে" বিশেষজ্ঞ
—ফাঁড়েন না, ফুঁড়িয়া ওঁবধ চিয়া চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাহাতেও বাৰায়
আপত্তি থাকায় তিনি বলিয়া গেলেন, দাধাৰণ স্বাস্থ্য ভাল হইলে হয় ত'গ্যাণ্ড
বলিয়া যাইবে। তিনি পশ্চিম স্বাস্থ্যকৰ স্থানে যাইতে বলিলেন—বাঙ্গালীৰ
বাৰিৰে না যাইলে স্বাস্থ্যকৰ স্থান মিলে না, আৰ মফস্সাবাসী বাঙ্গালী বতই ভাল
থাকুক না কেন, সে ম্যাগেৰিয়া পীড়িত—এই দুইটি বিষাস লইয়াই আন্ত কায়
বাঙ্গালী ডাক্তাৰৰা চিকিৎসা করেন—এই দুই বিদ্ভাসেৰ বীজাণু উৎসাহিগেৰ
মস্তিষ্ক দখল কৰিছাই থাকে। এক জন হোমিওপ্যাথ য়েৰোপীৰ ডাক্তাৰ
ডাক্তা হইল। কিন্তু তাহাৰ উপদেশ "চুনাং মং খাও" গুনিয়া বাবা এমল চটয়া
গেলেন যে, তাহাৰ ওঁবধ আৰ হানান হইল না।

বাবা ক্ৰমে বিৰক্ত হইছেলেন বুথিয়া আমি আৰ ডাক্তাৰ না ডাক্তাৰীয়া পশ্চিম-
যাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিলাম। একটা বাড়ী স্থিৰ কবিয়া আশুৰা যাত্ৰা কৰিলাম।

আমি দাদাকে ৫২দিন বাৰায় সংবাদ দিতাম। তিনি আবশ্যক উপদেশ
দিচেন।

বিদেশে আসিবাৰ দশ দিন পৰে এক দিন সকালে বাৰায় একটা গ্যাণ্ডে
অসহনীয় বস্তু হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাৰ বোধ হইতে লাগিল, যেন
তাঁহাৰ স্বাস্থ্যবোধ হইতেছে আমি ছুটয়া ডাক্তাৰ ডাকিতে গৈলাম। স্বাস্থ্যকৰ
স্থানে ডাক্তাৰেৰ ডাক বড় হয় না—তাই সে সব স্থানে ভাল ডাক্তাৰ পাওগা
ছটি। স্থানীয় ডাক্তাৰ আশিষ্ট বলিলেন, আধ বণ্টাৰ মধ্যে অস্ত্ৰোপচাৰ না
হইলে বিপদ অনিবার্য। কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিতে তাঁহাৰ ভয়সা হয় না।
তাঁহাৰ ভয়সা হইকেও আশ্বাস হইত না। আমি চাৰি দিক অন্ধকাৰ দেখিলাম

—জানাবোঁ এটা কদমিকাটা টেলিগ্রাম করিতে পাবি, কিন্তু টেলিগ্রামে জানাব আসে না।

আমি বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় দামাদেব প্রতিবেশী বেণীবাবু ও গুণীলইয়া প্রভাতী চন্দ্র সাবিত্রা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বাবার সংবাদ শ্রবণ করিলেন, “কেদার বাবু কেমন আছেন?”

বেণীবাবু দীর্ঘকাল সবকারী ডাক্তারী করিয়া পেশন করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রচুর ছিল। কিন্তু এখন তিনি আর ডাক্তারী ব্যবসায় করিতেন না, অর্থাৎ টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতেন না। কিন্তু কেহ ডাক্তারিই বিনা পরসায় চিকিৎসা করিতেন—খুব বড় করিয়াই রোগী দেখিতেন। লোকটি অসাধারণ “গল্প”। একবার “আরে মশাই”—শিলা গল্প আরম্ভ করিলে অনেক সময়ের অল্প নিশ্চিন্ত রামনগরের বেগুন ও কয়লাবাদের কক্ষী হইতে থামোয়ার গোহত্যার দাঙ্গা ও পল্লাবেব সেচেব খাল পর্যন্ত এত খবরও তিনি রাখতেন; আর এমন শুছাইয়া গল্প কবিত্তে পাবিতেন যে, শুনিতে “কেবলই আছে হই”। তিনি প্রতিদিন প্রাতে আসিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতেন। লোকটির সংসারে থাকিবার মধ্যে এক মেয়ে। মেয়েটির প্রতি অতিরিক্ত মেহছেতু তিনি আর, বড়, কমিলে, এমন কি, সোরাইটে ও মগধেও তাহার উপযুক্ত বস্ত্রের সন্ধান পাইতেন না। রূপ যদি কুমারীর গুণের মধ্যে হয়, তবে তাঁহার কল্যাণ সে গুণের অভাব নাই। যা ত সেদিন তাহাকে দেখিয়া বিধবা ঠাহরাইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশের উল্লেখ করিতেছিলেন; ভাগ্যক্রমে আমি ইদিত করায় তখন সে ফোলাবার চাবী খুলেন নাই। তাঁহাকে লইয়া সমস্ত সময় এমন বিলাটও ঘটে। আমার কাছে সব কথা শুনিয়া বেণীবাবু আমার সঙ্গে বাবাকে দেখিতে গেলেন, এবং দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, এখনই অল্প করা ছাড়া উপায় নাই। তিনি অল্প কবিত্তে পারেন; আমরা ভবনা করিতে পারিলেই হয়। ভরসা না করিয়া কি করি?

কিন্তু একটা কথা—আমি রক্ত দেখিতে পারি না, ফুটবল খেলিয়া ডানপিটে হইলে কি হয়, ও দৌরলাটুকু জয় করিতে পারি নাই। দ্বার অল্প কথা হইলে শুনিয়া না ও আমার ছোট ভগিনী এমন হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন যে, কাছে কাড়ী থাকিলে লোক ছুটিয়া আসিত—ভাবিত, সে ছুটনাটা ঘটতেও পারিত, তাহা খড়িয়া গিয়াছে।

ব্যাপার বুঝিয়া বেণীবাবু বলিলেন, “আচ্ছা, আমি আমার মেয়েকে আনিতেছি।” সে শুধু আশাতে খুব পটু।

তিনি জল গরম করিতে বসিয়া বাড়ী গেলেন, এবং অস্ত্রের ব্যাগ, আবশ্যক পাত্রাদি ও ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি এবং কতাকে লইয়া আসিলেন।

তিনি আমাকে, মাকে ও আমার ভগিনীকে রোগীর বয় হইতে চলিয়া বাইতে বলিলেন। মার গোলমাল করিতে যেমন উৎসাহ ছিল, মর হইতে বাইতে তেমনই আগ্রহি ছিল। আমি একরূপ জোর করিয়া তাঁহাকে পার্শ্বের দ্বারে লইয়া গেলাম। সে ঘরেও তাঁহার “ওগো! তাই ত গো! কি হবে গো?”—নিবৃত্ত হইল না।

এ দিকে বেণীবাবু কন্ডার সাহায্যে সব আয়োজন করিয়া লইয়া ছুরীখানি হাতে কবিয়া বাবার সঙ্গে কথ্য বলিতে বলিতে এমন নিপুণভাবে অস্ত্রোপচার শেষ করিলেন যে, বাবা প্রথমে টেরও পাইলেন না। তিনি ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া আমাদিগকে ডাকিলেন। রক্ত দেখিয়া মা আবার একবার হৈ চৈ করিলেন। বেণীবাবু ও তাঁহার কন্ডা বাশর শুষ্কতা করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, বেণী বাবু চিকিৎসা ও তাঁহার কন্ডার স্তম্ভস্বর সাহায্য না পাইলে বাবার প্রাণরক্ষা হইত বলিয়া বোধ হয় না।

১০

পর দিন বেণীবাবু বাবার অর্ধেক খুলিয়া আবার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। বাবা তাঁহাকে বলিলেন, “আপনার ঋণ আমি কখনও মোছ করিতে পারিব না।” বেণীবাবু বলিলেন, “সে কি, মহাশয়! এ ত আমাদের কাজ—ইহা করিলে আমাদের গৌরব নাই, না বলিলে পাপ আছে। কর্তব্যবুদ্ধিহীন চিকিৎসক ত চণ্ডাল।” মা বেণীবাবুর কন্ডাকে বলিলেন, “মা, তোমরা না থাকিলে এ যাত্রার কর্তাকে কি আর বাঁচাইতে পারিতাম?”

সেই দিন মধ্যাহ্নে বাবাব কাছে বসিয়া আমি বাবাকে বলিলাম, “বাবা, এখনও একটা গাণ্ডা ফুলিয়া আছে, হয় ত কাটিতে হইবে। আমার অপদারিতা ত দেখিলেন। ভাগ্যক্রমে বেণীবাবু ছিলেন—তাই রক্ষা। আমি বলি, মাদাকে আসিতে টেলিগ্রাফ করি। এমন সময়ে তাঁহার মত বুদ্ধিমান বোকাই পরকারী।

বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মা বলিলেন, “সে কি আসিবে?”

আমি একটু উত্তেজিতস্বরে বলিলাম, “কোনও দিন কি আসিতে বলিয়াছে যে, আমি সন্দেহ করিতেছি, হাদ বাবাব অন্তর্দেহ কথা শুনিবেও আসিবেন না।”

কিন্তু মার দিকে চাহিয়া দেখিয়া, মার চক্ষু ছল ছল করিতেছে। বুঝিগা, এ কথা দাদার নিন্দার্যজ্ঞক নহে—অত্যাশোচিত। না, ঠেকিয়া দাদার স্বভাব অনুভব করিতেছিলেন।

বাবা বলিলেন, “তাহার তিকানা ?”

আমি বলিলাম, “আমি জানি।”

বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “কুই জানিস, কিন্তু আমি তাহার শিঙা—আমি জানি না।” তাহার নয়নের কোণে অশ্রু নেবা-মিল।

আমি টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়া বাবার কাছে আসিয়া বসিলাম—এক কথা বাবাকে বলিলাম। কুই বৎসর আমাদের কুই ভ্রাতার বলিকাভায় এক সপ্তে স্থিতি, দাদার চাকরী-প্রাপ্তি, দাদার সর্বদা আমাদের সংবাদ লওয়া—সব কথা আমি বাবাকে বলিলাম। বাবা কোনও কথা বলিলেন না, আমায় করন্তা আপনার উত্তর করতলযথো ধরিয়া বসে হাসিত করিলেন। তাহার চক্ষু ছাপটরা অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

বাগানায় পরিচিত পদশব্দ শুনিয়া বাবা চক্ষু মুছিলেন। বেণী বাবু ও তাহার কন্যা কিছুকাল পূর্বে বাড়ী গিয়াছিলেন, আমার আসিলেন। না বাবার কাপড় টানিয়া দিলেন।

বেণী বাবু খাবারমিটারে বাবার দেহের তাপ পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে বাবাকে বলিলেন, “আজ অসুখ হয় নাই। পুষ্টা বাহির হইয়া গিয়াছে কি না ? বোম্ব হয় দ্বিতীয় প্রাপ্তটা বসিয়া যাইবে।”

বাবা হাসিয়া বলিলেন, “না বলিলেও আর ভয় নাই। আপনার তপে আমার আত্ম-সঞ্চিত ভয় কাটির গিয়াছে—অপ্রয়োজনে আর আমার ভয় নাই।”

তাহার পর বেণী বাবু নানা গল্প কথিতে লাগিলেন। অধিক দিনসু এইরা ট্রেণে বাতায়তে সময় সময় কিরূপ বিপদ বটে—বুঝাইবার অশ্রু তিনি বলিলেন, একবার—সে শাল প্রায় তিন বৎসরের কথা—তিনি বাড়ী আসিতে মাগনি নাগিয়া মেয়েটিকে না নামাইতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছিল। তাহার পর তিনি ‘বোকা বলিয়া’ কিরূপ টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পাকীর এক ঘন হালী যুবক তাহার উপদেশ না মানিয়া—ট্রেন-মাষ্টারের সঙ্গে বগড়া করিয়া কেমন করিয়া তাহার মেয়েকে ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছিল—সে নিম্নের প্রহরিতা গ্রাহ্যই করে নাই—সব কথা তিনি বিবৃত করিলেন।

আমি বলিয়া উঠিলাম, “সে যে আমার দাদা।”

বেণী বাবু ঘন চমকিয়া উঠিলেন, “আঁ—তোমার দাদা।”

আমি বলিলাম, “হ্যাঁ।”

ঠিক করিয়া একটু শব্দ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, বেণী বাবু কতটা
বাবু বেল্ল ঘাসে গিয়া চাণি-ছিলা—শিলি ঘাসে ঠেকিয়াছিল। বোধ হইল,
তাহার হাড় একটু কাঁপিতেছিল।

বেণী বাবু তখন বাবাবে বলিলেন, “আরে, মশায়—দে আপনার ছেলে-
কি সন্দেহ। তাহার সে উপকার আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। চমৎকার
ছেলে। আপনি বড় ভাব্যবান পুরুষ—বড় ভাগ্য নহিবে, এমন ছেলে পাওয়া
স্বাভাবিক।”

বেণী বাবুর মুখে দারাব প্রকাশ্য আর ধবে না। দাদা এখন কোণার, দি-
করেন, বিবাহিত কি না—বেণী বাবু নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। বেণী বাবুর
এসে দাদা কিছু বিব্রত হইতে লাগিলেন।

এই সময় থাকতে ঈশ্বর বাগদারীরা বেণী বাবুর কতটা পায়ের টেবলে
রাখিলেন। রাখিতে শব্দ হইল। এ পর্যন্ত তিনি জিনিস-লইবার বা রাখিবার
কাজ এমন নিঃশব্দে সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন যে, এ ধরনের আশ্চর্য মনোযোগ
অস্বীকার হইল।

আমার টেলিগ্রাম পাঠাই দাদা রওনা হইয়াছিলেন। তিনি যে ট্রেনে আসি-
লেন, টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। আমি সেই ট্রেনের এক প্রেমে গিয়াছিলাম।
গাড়ী হইতে নামিয়াই দাদা বাবুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,
“বাগা অনেকটা ভাল—আর ভাল নাই।” তাহার পর একটা কুজী ডাকিয়া
ভালবে দাদাব ‘স্ট-কেন’টা দিয়া আমি তাঁহাকে বাড়ী লইয়া চলিলাম।
গথে দাদা বাবুর অত্যন্ত সব সংবাদ লইতে লাগিলেন। আমি সব কথা
বলিলাম—মহলা বেলনা-বুড়ির কথা বলিয়া আমি বেণী বাবুর বাবা অস্বপ্নচাতুর্য
কথা বলিয়া বলিলাম, “বেণী বাবু কে জান, দাদা।” সেই-নাহার মেয়েকে তুমি
দেখে লইয়া গিয়া বাপের কাছে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছিলে।”

দাদা ঘন চমকিত উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কেমন করিয়া
বাসিলি?”

“তিনি সে দিন মোই গয় করিতেছিলেন। আমি তুমি বলিলাম যে

আমার দাদার কীর্তি। মেয়েটিও চমৎকার। জান, বাবা—সে যে বিয়াট
আনি বক্তৃতা দেখিতে পারি না। যার অঙ্গ করা হইবে তুমিই বা ও মনোকার।
কুঁড়িয়া দিলেন। তখন বেণী বাবু তাঁহাকে সেই মেয়েটিকে লইয়া আসিলেন,
তিনিই ত বাবার শুশ্রূষা করিতেছেন। বেণী বাবু চিকিৎসা আর তাঁহার মেয়ের
শুশ্রূষা নহিলে বাবাকে বাঁচাইতে পারিতাম না।”

দাদা কেমন অল্পমনস্কভাবে দ্বিধা করা করিলেন, “মেয়েটি বেণী বাবু
সঙ্গেই ছিল?”

আমি বলিলাম, “হাঁ। তাঁহার ত আশ্রয় বিবাহ হয় নাই। বেণী বাবু
তাঁহার উপযুক্ত পাত্রই পাইতেছেন না।”

দাদার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখ বিবর্ণ হইল। আমি পাঁচ পাত খণ্ডা বিবাহের
উপলক্ষ্য পড়িয়া—“রোমায়ের পোকার মাথাটি পূর্ণ করিয়াছিলাম, আমার
কাছে এ লক্ষণ ভাল বোধ হইল না। তবে কি দার্শনিক দাদাও “রোমায়ের
আক্রমণ হইতে মুক্তি পান নাই?” স্থির করিলাম, দাদাকে লক্ষ্য করিতে
হইব।

দাদা অল্প কথা পাড়িয়া সে কথা চাপা দিলেন। তখন আমি সংবাদে
সব কথা বলিতে লাগিলাম। তাঁহাকে আসিবার যত্ন সংবাদ দিবার যত্নে
বাবাব ব্যবহারের কথায় দাদা অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। দাদা বাবাকে ক
কল্পিয়াসিতেন, তাহা আমার অন্তরে ছিল না। যা বিপদে পড়িয়া তাঁহার
অস্তব সুকিয়াছেন তুমিই দাদা কেন অনেকটা নিশ্চয় হইলেন—তাঁহিলেন,
এবার যার উভয়েব মধ্যে কোনরূপ অসম্ভাববিকাশের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু
দাদা তখনও মার অত্যাচারমণ্ডিত ভাবান্তরের স্বরূপ বৃত্তিতে পড়েন নাই।

আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, দাদার অল্পমনস্ক ভাব কিছুতেই
ছিল না।

১২

কথা কহিতে কহিতে আমবা ছুই ভাই বাগদোয় পৌঁছিয়াছিলাম। বেণী বাবু
সিখন বাবার ব্যাণ্ডেল বদলাইয়া বাসনায় আসিয়া হাত মুইতেছিলেন, দাদাকে
দেখিয়া বলিলেন, “আরে—তুমি। দেখ, ভগবানের খেলা! ফড় বিন পবে
তোমার সঙ্গে দেখা।”

দাদা বাবার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে গল্প বাদ দিলেন, বাবাব অল্প মন
তাঁহার মত চিকিৎসা করিলেন, তাঁহার গণ্য আমার বিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—“বাবা কোন ঘরে, বাবা?”

আমি অসুজনির্দেশ গং দেবদেবী বিলাস। দানী অগ্রসর হয়েছেন। আমি
 তাঁহার শপাভে পশ্চাৎ উলিখিত—বোধ হয় হৃদয়ানও ভেদন তাঁর দ্বাচর্য্য
 স্বরূপের ব্যক্তি পাবে না।

দাদা বাবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘেঁষী বাবুর কণ্ঠা এখন বাগেয়
বন্দ্যমান পর তিনি সমস্তা ভেদে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, পদমবো কিনিয়া
চাহিলেন; দেখিলেন—হাতের দাগ। তাহার মুখ লজ্জায় রক্তাক্ত ধারণ
করিল; তাহার চকুতে হর্ষোজ্জ্বল দৃষ্টি বিকশিত হইল। তাহার পরই তিনি
দুষ্টি নক করিলেন; কিনিয়া তিনি সমস্তা সাজাইতে গন দিলেন। দাদা যেন
বুর্জের মত প্রস্তরপুস্তকের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন—একদৃষ্টে আগার
দিকে চাহিয়া রহিলেন। উভয়েরই এই ভাবান্তর বৃহত্তর অন্য—কিছু সেই
কিছু বৃহত্তর ভাবান্তর দেখিয়া লক্ষণ লক্ষ্যে আবার আর সন্দেহ রহিল না।

মাতা বাবাকে প্রণাম করিলেন। বাবা কোনও কথা বলিলেন না, সম্মুখে
উঠায় হস্তক্ষেপ করতঃ সংজ্ঞাপিত করিয়া জীবনে আত্মীকৃত করিলেন।

মা দামার কুণল ঘিঁজাসা করিবা তাহার পর বলিলেন, “ছই দিনের পথ-
কষ্ট। যাও, হাতে যুগে জন্ম দিয়া আইন। কর্তাকে যে এমন দেখিবে, সে
তরফা আর ছিল না। আর কি বলিব, বেঁটা বাবুর আর ঐ মেয়ের গুলোর
কথা। সে সব গুনিও, এখন একটু হব হও। তুমি আসিলে, আমাদেয়
কত ভয়সা; জনাই শু অনাথের হতাব; আর আমি—আমাকে কি আর
ছিলম ? বা, আমাখ, অমরক চা চরিতা দিলে বা।”

চা পান করিতে করিতে ঘামি নদীকে দিক্‌জানা করিলাম, “দাদা, বৈষ্ণব ব্রহ্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ কি ভোমার বিসাহে বিলম্বের একটা কারণ ?”

আমি জানিতাম, বাবা নিশা যথা বলিবার লোক নহেন—স্বাধীন সনাতন
নহে। বাবাও এ বিষয়ে কোনও নরল উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, “চুপ
ফর। তোর কি লেখনও বড়ি কইবে না?”

আমি বলিলাম, “এ কবরিনে আশির গুণের যে পরিচয় পাইবাহি, তাহাতে
বলিতে পারি, উহাদের অন্য তিন বৎসর কেল, যাহা তিন যুগ অপেক্ষা করিতে
পারি।”

ପାଣି ତା-ମାଲେ ଯକ ଦିଅନ୍ତେ ।

কামি ভাষিগান, কখনও দামার কোনও কাণ্ডে লাগি নাই—এবার মেহজ
কমিশাই উঠে, জামি ।

গ

(বেণী শব্দ কথ্য।)

১০

তাই ত—কি করি ? আশার বিবাহ না হিলে ত আর হিব হইতে পারি-
 ভেছি না। লোকনিষ্ঠা নহে—সে জন্য আশার বড় চিন্তা নাই ; কারণ, আমাদের
 সমাজ সংসার সবই আশাকে লইয়া। কিন্তু তাহাকে সুপাত্রে বিবাহিত
 করিবার পূর্বে যদি আশার ডাক পড়ে, তবে সে ঝড়াইবে কোথায়,
 সেই জন্তই আমি চিন্তিত। লোকে হয় ভাবনে করে, আমি বেদের দার্শনিকতার
 জন্তই তাহার বিবাহ দিয়া দ্রুতমর্কণ হইতে বিণব করিতেছি ; যে কয় দিন
 পারি, তাহাকে কাছে রাখিয়া পুত্র জীবন পূর্ণ রাখিতেছি। কিন্তু সে ত
 আসল কথা নহে। একটা থাকাই বাহার নিয়তি, সে কি অপুত্রের সঙ্গে ফল
 করিয়া গয়ী হইবার চেষ্টা করে ? তাহাই যদি আশার নিয়তি না হইবে,
 তবে গৃহস্থীয় অন্ন বয়সেই শুভ হইবে কেন ? তিনি গিয়াছেন, তাহাই
 গিয়াছেন। আমাকে ও আশাকে রাখিয়া—দীর্ঘকাল যোগ ভোগ না করিয়া,
 যে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তিনি সর্বদাই করিতেন, তিনি সেই মৃত্যুই লাভ
 করিয়াছেন। কিন্তু দশ বৎসর পবেও ত ভিনি সেই মৃত্যুই লাভ করিতে পারি-
 তেন। তাই ত বলিতেছি, ইহাই আমার নিয়তি। আর তাহা না হইলে
 আশা আশার মেয়েই বা হইবে কেন ? বাহাদুর ছেলে হয়, তাহাদের সংসার
 লভ্য বস্তু কমে বাড়িয়া ফলে ফলে পূর্ণ ও সুন্দর হয় ; আর বাহাদুর মেয়ে
 হয়, তাহাদের সংসার ত ওষধির মত অভয়কালমধ্যেই শেষ হইবে। সে
 জন্য আমি নিয়তির সঙ্গে বগড়া করিয়া কি করিব ?

আমি বরাবরই একটু অধিক বয়সে ছেলে মেয়ের বিবাহের পক্ষপাতী।
 সেই জন্যই বাড়ীনা কন্যাকে খেলাধুলি হইতেই বাগানের ঘরে পাঠাই নাই।
 তবে তাহার পব হইতে সুপাত্রের সন্ধানও ত বিরত থাকি নাই। মত
 বটে, প্রথমে কতকগুলো মতামতের কাজ করিতে চেষ্টা করিতাম—বাহাদুর
 করি দিয়া টাকা লয়, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিব না ; বাহাদুর বিবাহের পব
 যথুকে গিলাপের পাঠাইতে চাহে না, তাহাদের ঘরে মেয়ে দিব না
 —ইত্যাদি। কিন্তু বাপালা দেখে মেয়ের বাপের কোনরূপ কোটি তথা
 সাথে না বুঝিয়াই সে সব মত সংহত বা সংহত করিচ্ছি।

সুপাত্রের গড়ানও যে একেবারে পাই নাই, এমন নহে। তবে যে কোন

আজও আমার বিবাহ হয় নাই, তাই আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। হৃদয় গুরু আমি এটি মরণের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কথা কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য, আশা নব কথাই শুনিয়াছিল। যে দিন তাহারা মেয়ে দেখিতে আসিবে, সে দিন কি একটা কাজে আপাকে ডাকিতে বাইরা দেখিলাম, তাহার ঘরে সে নাই—টেবলের উপর তাহার একখানা খাতা খোলা বহিয়াছে। একটা অসাধারণ কোতূহল আমাকে সেই লেখাখ দিকে আকৃষ্ট করিল। আচ্ছ পড়িলাম—

“বাবা আমার বিবাহের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। সামাজিক হিসাবে হইবারই কথা। কিন্তু—কিন্তু যে অমুভূতি পরকে আপনাব করাইয়া মুখে ছাখে, সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে নারীকে পরের আপনাব করে, সে অমুভূতি জীবনে একবারই অনুভব করা যায়। তাহারই উপর ত সংসারের প্রতিষ্ঠা। তাহাতেই ত জীবনের সার্থকতা। সে অমুভূতি লাভ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—মাদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—তাহাই অর্থক্য। জীবনে সে অমুভূতি অনুভব করিয়াছিলাম, যে দিন ট্রেণে বিপন্ন অবস্থার বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম; যে দিন সেই স্থিতি—ধীর—বিনয়ী—দৃঢ়—যুবক বিপন্নকে বিপন্নকৃত করিবার জন্য অগ্রবিধা তুচ্ছ জ্ঞান করিতে—আগনি বিপন্ন হইতেও ভয় করেন নাই। তাহার পর সে দিন যে অমুভূতি অতর্কিত ঘটনার সংঘটনে অকস্মাৎ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা দিনে দিনে বিদীর্ণ না হইয়া বর্ধিত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস—আমার আশা বার্থ্য হইবার নহে। আর যদি তাহা বার্থ্য হইবারই হয়—তবে যেন পিতার ইচ্ছার প্রতিবাদ করিয়া তাহার জয়যুক্তি, কার-প্রদেপের পূর্বে তাহার জন্মস্থানী হস্তিতার মুদ্রা হয়।”

পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। বিশ্বাসের দৃঢ়তার বিষয় হইলাম। কেন যে পিতার প্রস্তাবে আপাকে বিমর্ষ দেখায়, তাহার কারণ জামাব কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে আমার সর্ব্বস্ব। গৃহিণী তাকে শিশু অবস্থার আমাকে দিয়া স্বর্ণে গিয়াছেন। সে তাহার দান—আমার জীবনের স্রবের স্রুতি—আমাদের উভয়ের সর্ব্বস্ব। সে আমার শোকে মাস্তনা—ছাখে জ্বল। সে আমারই বন্ধে পালিত। সে আমার ব্যথিত হৃদয়ে সুখেব প্রবেশ। কিসেব জন্য আমি তাহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে তাহার বিবাহ বিধা তাহার জীবন ভ্রমর করিব? আমি তাহা পাবিব না। সমাজ—সংসার—তাহার হৃথের কুলনাম আমার কাছে সবই তুচ্ছ।

✓ যজ্ঞ—অধ্যাধান ও অগ্নিহোত্র । (১৫০)

যজ্ঞের কথা বলিতে চাহি ; আপনারা অবধান করুন।

আমাদের যে সমাজের চলিত নাম হিন্দু-সমাজ, আমি সেই সমাজকে বেদপন্থী সমাজ বলিব। এই সমাজ বেদের শাসন মানে এবং বেদের আনুগত্য স্বীকার করে। বেদপন্থী সমাজের প্রধান অনুষ্ঠানই যজ্ঞানুষ্ঠান। এই যজ্ঞানুষ্ঠানেই বেদপন্থী সমাজ প্রতিষ্ঠিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের তাৎপর্য না বুঝিলে বেদপন্থী সমাজের ইতিহাসের স্বাধা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝি হইবে না। আমি কয়েকটি প্রশ্নকে সেই তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই বেদপন্থী সমাজে একটু সঙ্গীর্ণতা আছে। গোড়ায় সেটুকু নানিহা নহি। পণ্ডিতেরা অমুমান করেন, আধ্যাত্মিকতার এক শাখা তাহাদের প্রবেশ করিয়া একটা নূতন বিশিষ্ট সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সমাজ-তন্ত্রের নিজস্ব সাহিত্যই ছিল বেদ। সেই সমাজের ধর্মবোধের প্রাথমিক অবস্থায় অমুমান বেদের বিধি-নিষেধ অনুসারেই সম্পাদিত হইত। তাৎপর্য বর্ণের যে সকল আদিম অনাধ্যা অধিবাসী ছিল, তাহারা সকলে এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি নাই। কেহ কেহ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। পণ্ডিতেরা অমুমান করেন, খাঁটি বেদপন্থী আদ্যোবদ্যে আপনাদিগকে বিদ্যা-বলিয়া পরিচয় দিতেন; আর যে সকল অনাধ্যা তাহাদের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে শূদ্র বলা হইত। ফলে, শূদ্রেরা বেদপন্থী সমাজের আশ্রিত হইলেও এই সমাজের সকল অধিকার পায় নাই। খাঁটি বেদপন্থী দ্বিজাতি সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণে বিভক্ত হয়। আচারভেদে এবং বৃত্তিভেদে এই বিভাগের বহুলতা হইয়াছিল। আমি এটাকে একটা খিতাবি নাম মনে করি। বহুতাই যে এই তিনটা বর্ণের মধ্যে সুনির্দিষ্ট বৈধা টান ছিল, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে। বৃত্তিভেদ এবং আচারভেদে এখনও যেমন নানাকরূপ আছে, তখনও হয়ত নানাকরূপ ছিল। তবে খিতাবি দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটা না একটা বর্ণের কোঠায় ফেলা হইত। প্রবর্তী কালে যে সকল ধর্মশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের এই তিনটি মূল বর্ণকে প্রবর্তার বিশাইরা নানা দক্ষ-বর্ণের উৎপত্তি বুঝাইবার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই চেষ্টাও আমার অমুমান কতটুকু সমর্থ হইয়াছিল।

পারে। সে ঘাড়াই হটক, বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই দ্বিজত্ব পরিচয়ে শূদ্র হইতে এবং অনাৰ্য্য স্বেচ্ছাদি হইতে আপনাব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেন। এই স্বাতন্ত্র্যই দ্বিজাতি সমাজের সঙ্গীৰতা। অল্প সমাজের লোক সহজে দ্বিজাতি সমাজে প্রবেশ করিতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের বিশিষ্ট অধিকার লাভ করিতে, পাইত না। একবারেই যে পাইত না, ইহা মনে করিতে পারি না। ইতিহাসে দেখিতে পারি, বহু অনাৰ্য্য এবং বহু স্বেচ্ছা পর্য্যন্ত কালক্রমে দ্বিজাতি-সমাজে প্রবেশ পাইয়াছে এবং দ্বিজাতির সকল অধিকার লাভ করিয়াছে। পঞ্চাস্তরের অনেক খাটি দ্বিজ স্বেচ্ছাক্রমে দ্বিজাতির অধিকার ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আজি তাঁহারা সেই শূদ্রত্ব পীকারেব ঘৃত্ত অমৃতপ্ত এবং পুনরায় দ্বিজত্ব লাভের জন্ত ব্যাকুল। তৎসবেও বলিতে পারা যায়, আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দ্বিজাতি সমাজ অজাত সমাজ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র বহিয়াছে। বেদে অধিকার লইয়াই এই স্বাতন্ত্র্য। যে ব্যক্তি দ্বিজ, সে যে বর্ণের লোকই হউক না, বেদেবা আলোচনায় এবং বেদ-বিহিত কর্মে তাহার যোন আনা অধিকার আছে। যাহারা গোড়া হইতেই শূদ্র বলিয়া গণ্য আছে, অথবা দ্বিজত্ব ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব লইয়াছে, তাহারা এখন বেদপন্থী সমাজের অন্তর্গত থাকিলেও বেদের আলোচনায় এবং বৈদিক কর্মমুঠানে যোন আনা অধিকার পায় নাই।

এখন এই দ্বিজ শব্দটির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাক।

আজ কাল বিদ্যা অর্জনের নামান্তর—লেখা পড়া শেখা। এ কালে প্রচুর পরিমাণে কালি কলম খরচ করিয়া লেখা অভ্যাস করিতে হয় এবং পুঁথি পত্রের সাহায্যে পড়া অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ লিখিতে এবং পড়িতে শিখিলে তবে বিদ্যা লাভ হয়। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। অতএব তখন লেখাও ছিল না, পড়াও ছিল না। লেখা পড়া ছিল না, কিন্তু বিদ্যা ছিল। বিদ্যা লাভের জন্ত লেখা এবং পড়া একান্ত আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের Faculty of Science বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন। লেখা পড়া ব্যতীতও বিদ্যালাভ হইতে পারে। তাবতবর্ষেও এক সময়ে বিদ্যা ছিল এবং বিদ্যা অর্জনের ব্যবস্থাও ছিল। বেদপন্থী সমাজেব সেই অতি প্রাচীন বিদ্যার নামই বেদ। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সেই অতিপ্রাচীন বেদ-বিদ্যা হইতেই এ দেশের প্রায় ব্যবসায়ী বিনা উৎপন্ন হইয়াছে।

অমরনাথকে আমি ভাগ করিয়া জ্ঞানিব ব সবরষ গাই নাই।
যেহুে জ্ঞানিয়াছি, তাহাতেই ব্রহ্মজি, তাহার মত সুপাত কর্ত। সে জ্ঞানীয়ও
বটে। কিন্তু তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। বোধ
নোটবহিত তাহার নাম ও ঠিকানা দিখিয়া লইয়াছিলাম। জগদীশ্বর
সব কাজে যেন হু, আমাবও তেমনই হইয়াছিলাম—বাতী হইতে কিরিবার মত
সেই বহিধানাই তাহারই আদিয়াছিলাম। অমরনাথ বলিয়া তাহার সন্ধান
করিব নিরূপে।

আমি জ্ঞানিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময়—যে
ভগবানের খেলা—কথায় কথায় জ্ঞানিতে পারিয়াছি, সে অমরনাথ জ্ঞান
প্রদেয়ী কেনার বাবু পুত্র। সে এখন বড় চাকরী করিতেছে—অলঙ্কার
বটে। বটন দেখিয়া আমারও বিস্ময়ে জ্ঞানিতেছে—আমার আশাব আশা পূ
হইবে। ভগবান কি তাহার অন্তে কষ্ট দিখিতে পারেন?

কিন্তু আশাব সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও বে নাই, এমন নহে। কেনার বাবু
এখানে আসিয়া বড় পীড়িত হইয়াছিলেন। সহসা প্রত্যাপচারের প্রয়োজন
হইয়াছিল। আমি তাহার চিকিৎসা করিয়াছি—এমনও করিতেছি। আর
তাঁহার পত্নী পুত্র কন্যা শুশ্রূষা-কার্য্যে একরূপে অপরূপ বলিয়া আশাই তাঁহার
শুশ্রূষা করিতেছে। কেনার বাবু ও তাঁহার পত্নী—বিশেষ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র
সে জ্ঞান আমার কাছে এত অনাবশ্যক কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছেন যে, আমার
আশাব হইতেছে—আমি এ বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাঁহার অনিচ্ছা থাকিবে ও
চক্ষু-লজ্জার প্রভাবে সমস্তি দিবেন। সে বড় অভায় হইবে। তাঁহার হস্ত
যনে ফিবে, আমি কোনও না কোনও কারণে কন্যার বিবাহ দিয়া উঠিতে
পারিতেছিলাম না, এখন এই সুযোগে তাহার বিবাহ দিব। তেমন হইলে
আমি আশাব বিবাহ দিতে পারিব না।

কিন্তু আশাব মনের ভাব ও আমার অগোচর নাই। এই বিবাহই এখন
তাঁহার অভিপ্রেত, তখন আমাকে এ চেষ্টা করিতেই হইবে। সুতরাং কেনার
বাবু একটু জ্বর হইলেই—কলা বা পরশ—আমি তাঁহার কাছে প্রত্যায় করিব।
আব সংবাদ পাইয়াছি, অমরনাথও পিতাকে দেখিবার দান্ত আসিতেছে। এখন
আশাব কপাল—আর ভগবানের ইচ্ছা।

যা

(অমরনাথের কথা।)

কত দিন পরে বাবাকে দেখিলাম। যিনি অতিমানে আমাকে দেখিয়া

কবিতা বকে কেবল বেদনার তাই বহিরাছেন—গাথা, গুণ, শাস্তি সব জলাফলি দিয়েছেন, সেই পিতার বকে আবার আমার দান আরি পাইলাম। আর আমার কত আনন্দ!

কিন্তু আনন্দের মধ্যে বিনামে আমার দানও পূর্ণ হইতেছে। সে জন্মদেবী—দৈশনে মাতৃহীন, তাকে অদৃষ্টে মুখ কোণায়? ঘটনার স্রোত যে মিলনক্ষেত্রে পিতাপুত্রের মিলন ঘটিবে, তখন ত কেবল তাহারাই উই জনই নাই! কম বয়সে পূর্ণের মেঘাঙ্ককারে দামিনী দীপ্তিব হস্ত বাহ্যকে দেখিয়াছিলাম—দেখিয়া বাহ্যকে আন ভুলিতে পারি নাট, সেও যে সেই মিলনক্ষেত্রে! বাহ্য দীপ্ত, তাহা গভীর-নচে বুলিলে নিরাণব মাধবায় হতাশার বেদনা সহনীয় হয়; আর কামনার বস্তু সম্মত ও সমুপে থাকিতেও যে হতাশার বেদনা সহ্য কবে, দৈত মিত্র মিলনপাত্র বহন করিব অথচ সে মিলন পান করিতে না পারিগা মরু-ভূমিতে মুহূর্ত্তমাত্র বীড়িত হয়। আমার সেই অবস্থা।

এখন আমি শাধীন; বেণী বাবু কাকে তাঁহার কথায় প্রাণনা করিতে পারি। কিন্তু বারাব শরীরের যে অবস্থা, তাহাতে আর তাঁহার ইচ্ছা বিকল-স্বপ্ন করিয়া তাঁহাকে বেদনা দিতে সাহস টট না। আর আমি—আমিই বা কোন অধিকাংশে আর এক জনকে আমার বার্ষ জীবনের সঙ্গী করিয়া কেবল গুণ ভোগ করাইব? আমার অদৃষ্টে মুখ নাই—আমি কেন অপূর্ণকে ভুগে দিব?

কিন্তু যে কথা এত দিন গোপনে ক্রমে রাখিয়াছি, আনি নী কেমন কবিতা—আমার কোন ব্যবচাবে তাহা অনাথের কাছে প্রাপ্তপ্রাণ কবিতাছে। সে বেদনাপূর্ণ প্রকৃতির লোক, তাহাতে কি আমি যদি সে সেই কথার আলোচনা করিয়া পারিবারিক অশাস্তির নির্বাপনোন্মুখ বহি পুনর্দীপ্ত করে। অম্বারে সব কথা যে বল সম্ভব নহে, সব কান্ন যে ইচ্ছামত করা যায় না, তাহা সে স্বীকার্য কবিতেনে চাহে না। এ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষার ও আশঙ্কার কাবন হইতে দূরে যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু এতদিন পরে বাবার অন্তরে অন্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি—আনিতে না আসিতেই বাইব কেমন করিয়া। তাঁহাকে একটু মুখ না দেখিয়া ত গাইতে গাবি না! আমার কর্তব্য কি? এ অবস্থায় আমি কি করিব?

নাথান বীবনের নত ওক—না; তাহাৰ পৰ পাৰুতা, নদীৰ আঁৰ প্ৰাচ ও
প্ৰবাহ-কুলে শ্যাম শোভা। অনাথ আশিৰা সংবাদ মিল, 'বাবা, ডাকিতেছেন।'
তাহাৰ মুণ্ডে ও চকুতে হাসি ফুটিয়া উঠিভেছিল।

বাবা আমাকে বসিতে ইচ্ছা কৰিগেন। আমি বসিলাম।

বাবা বলিগেন, "অমমনাথ, তোমাৰ কাছে আসাৰ একটা অৱোধ আছে।"
নাথান ক'ৰা শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। আমি কি তাহাৰ এতই পৰ চেষ্টাৰি ?
আমাৰ কান্ধা আমিতে লাগিল; বলিলাম, "আমাকে জ্ঞাপোদ কি, বাবা ?" ১
আদেশ বহুন।"

বাবাৰ মুখ দিব্যকীৰ্ত্ত হইয়া উঠিল। তিনি সন্মুখে কান্ধাৰ হস্ত ধারণ কৰিয়া
বলিগেন, "হী, আদেশ। হস্ত শেষ আদেশ। এ আদেশ তোমাকে পান
কবিত্তেই হইবে।" তাহাৰ পৰ তিনি বলিগেন, "তোমাকে বিবাহ কৰিতে
হইবে।"

আমি শঙ্কিত হইলাম।

বাবা বলিগেন, "বেণী বাবুৰ চিকিৎসায় আর তাহাৰ কন্যাৰ ওজস্বায় আমি
আপাৰ তোমাকে দেখিতে পাইলাম। বেণী বাবুৰ মেয়েৰ সন্মুখে আমি তোমাৰ
বিবাহ দিব। অমন শুণবতী পুত্ৰবধু আমি আর পাইব না। অনাথ আমাক
কাছে এ প্ৰস্তাব কৰিয়াছিল। আমি তোমাকে বিজ্ঞাসা না কৰিয়া বেণী বাবুৰ
কাছে প্ৰস্তাব কৰিতে সাহস—ইতস্ততঃ কৰিতেছিলাম, এজন সময় বেণী বাবুৰ
এই প্ৰস্তাব কৰিয়াছেন। আমি তোমাকে বিজ্ঞাসা না কৰিবাই এককণ বশতি
দিয়াছি।"

বিমাতা বলিগেন, "বাবা, এ কথা তোমাৰ মাসিতেই হইবে।"

আমি আর কি উত্তর দিব ?

অনাথ বাবাৰ শিৰে দাঁড়াইয়া এমন ছট হাসি হাসিতেছিল যে, এ ব্যাপাৰেও
কষ্ট। যে, মুকুটে আমাৰ আঁৰ বিলম্ব হইল না।

বাবা তাহাকে ডাকিয়া বলিগেন, "অনাথ, বা, বেণী বাবুকে—বহাইবে—
খলিয়া আস, আঁৰ কণা পাকা।"

অনাথ ফিৰিয়া আশিগে বাবা তাহাৰ জাতব্যাক্ত জানাইয়া একখানা হলীম
ছিঁড়িয়া ফেলিগেন। অনাথ বলিল, "বাবা, আপনি আপনাৰ উইল ছিঁড়িলেন,
তালই হইল।" মিহিলে আমি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। কেন না, নিৰপকায় পুত্ৰকে
য়েক ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত কৰিবাব অধিকাৰ পিতাৰ নাই।"

বাবা বলিলেন, “তুই ঠিক কথা বলিয়াছিস ।”

১৬

আশাকে বিবাহ করিয়া বাবার ও বেগীবাবুর অভিপ্রায় অনুসারে আনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় আসিয়া গৃহালভী ভারস্তু করিয়াছি ।

এখন বাবা ও বেগীবাবু উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া বিগ্রাম-স্থল ভোগ করিতেছেন । বাবার বৈয়াক্তিক কাজ লনাথ দেখে । আমার সব কাজেও সেই গৃহিণীর মত । বাবাব অস্থানে ও অনাথের ব্যবসাবে বিমাতার যে শিক্ষা হইয়াছিল, তাহার কলে—এক দিন তাহার যে ভাবে আমার জীবন মরুভূমি হইয়া ব দস্তাবনা হইয়াছিল, আশা তাহার ব্যবহারে সে ভাবের আভাসও লক্ষ্য করিতে পারে নাই ।

এখনও আশাব মনে আমার সেই পথযাত্রার কথা হয় । সেই প্রথম মর্দনের কথাও আমবা উভয়েই যেন আনন্দ পাই । কিন্তু ত্রুণে বিপদের সময় অপরিচিত অমরনাথের সহিত সাক্ষাৎই তাহার বিবাহে বিলম্বের কারণ বলিলে, আশা তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলেও, তাহার এমন প্রতিবাদ করিতে থাকে যে, অব্যর্থ ঔষধ ব্যতীত তাহার মূখ বন্ধ করা যায় না ।

উ

(আশাব কথা ।)

১৭

উহার কথা আমার মামুষ ওনে । আমার বিবাহে বিলম্বের অনেক কারণ থাকিতে পারে । উহারই কোন ছিল না ? কিন্তু পুরুষ মানুষের স্বভাবই এই যে, কোনও গিনিসের সব দিক দেখিতে পারে না । প্রমাণ—উনি মুখবন্ধ করিয়া যে ঔষধের কথা বলিয়াছেন—অবস্থাতেই প্রীলোকের মূখ খুলা ও বন্ধ করা উভয়ের পক্ষেই তাহা সম্ভব ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ।

প্রত্যেক বালককে এক সময়ে সেই বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিরংশ অর্জন করিতে হইত। প্রত্যেক বালককে এই গ্রন্থ বিদ্যামাত্র আচার্যের সমীপে থাকিতে হইত। আচার্যের সমীপে যাপ্য নাম উপনয়ন। এই উপনয়ন-যাপ্য এ কালের পাঠশালার ভূক্তি হওয়ার অনুরূপ। কয়েক বৎসর আচার্যের বাড়ীতে বাস করিয়া আচার্যদত্ত বেদ-বিদ্যা গ্রহণ করিয়া আচার্যের অনুমতি লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। এই বাড়ী ফেরার নাম সমাবর্তন। এই সমাবর্তন যাপ্য কতকটা এ কালের পাশের সার্টিফিকেট দিয়া বাড়ী ফেরার অনুরূপ। এই সমাবর্তনের পর অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয় দত্ত সার্টিফিকেট পাওয়ার পর, গৃহী হইবার অধিকার অর্জিত। আমাদের শিক্ষাপ্রাপ্ত এ সম্বন্ধেও একটা ধিঁয়েবি খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখনকার বেদব্যাক্যের নামান্তর ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দের অর্থই বেদব্যাক্য। আচার্যগৃহে যিনি বেদের আলোচনা করিতেন, তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারী যে সকল আচার নিয়ম পালন করিতেন, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য। যে সকল ছাত্র বেদবিদ্যার আলোচনাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, বেদে আলোচনা ছাড়িতে চাহিতেন না, তাঁহারা হয়ত গৃহী হইতেন না। যাবৎজীবন ব্রহ্মচর্য লইয়াই কাটাইতেন। আবার কোনও কোনও ছাত্র বেদেপ জ্ঞানকামের চর্চায় এতটা মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, যে গৃহধর্ম তাঁহাদের বিড়কা অর্জিত। তাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক হইয়া একবাবে সন্ন্যাসী হইয়া পড়িতেন, প্রত্যাগা গ্রহণ করিতেন। এই জীবন ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসী ব্যতীত অধিকাংশ ছাত্রই সমাবর্তনের পর গৃহে ফিবিয়া গৃহস্থ হইতেন। এই গৃহস্থদিগের সমষ্টি লইয়াই সমাজ। যে ব্যক্তি গৃহধর্ম কবে না, লোকালয় হইতে দূরে থাকিয়া চিরকাল বিদ্যাচর্চা করিয়া জ্ঞানচর্চা লইয়াই জীবন কাটায়, সে সমাজের কেহ নহে। সমাজ তাঁহাকে পালন করে বটে, রক্ষা করে বটে, কিন্তু সে সামাজিক নহে।

সমাবর্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার জন্মে। বিবাহ না করিয়া গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না। যে বিবাহ কবে নাই, তাহার গৃহ নাই। স্ত্রী রাখিবেন, গৃহিণী গৃহমুখ্যত্বে। এই বিবাহ অনুষ্ঠানটা কৃত্রিম অনুষ্ঠান। Malthus সাহেবের Population দ্বিগুণ প্রবন্ধ প্রচার হইতে বিবাহ অনুষ্ঠানের উচিত্য লইয়া অনেক ভ্রম হইয়াছে। অনেকে বলিতে অবশ্য করিয়াছিলেন, দবিশের পক্ষে বিবাহ অর্থহীন; আইনের জোরে তাহাদেব বিবাহ বন্ধ করা উচিত। এখনও একশ বৎসর অতিক্রম হয় নাই

হায়রাই মধ্যে হাওয়া ফিরিয়াছে। ইউরোপের উপস্থিত হাদ্যাবাটা খানিয়া
 গেলে হয় ত শোনা হাইবে, যে আইনের জোরে সকলকে বিবাহে বাধ্য করা
 উচিত। অন্ততঃ বাষ্ট্রের কল্যাণার্থ সকলকে বিবাহে বাধ্য করা উচিত। রাষ্ট্রের
 কল্যাণ দেখিয়াই এ কানে ধর্ম্মধর্ম্মের নিরূপণ হয়। বাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বহু
 দেশে প্রত্যেক নালককে বিদ্যালোভে বাধ্য করা হইয়াছে। বাষ্ট্রের কল্যাণের
 জন্য হয় ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাহে বাধ্য করা হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে
 রাষ্ট্রতন্ত্রে এত প্রভু ছিল না। তবে সমাজের কল্যাণ দেখিয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের
 নিরূপণ হইত বটে। আইনের জোরে বাধ্যতা প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষের ধাতুগত
 নহে। তবে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থা কাৰ্য্যতঃ কয়েকটি বিষয়ে এই বাধ্যতা
 প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। যে স্বেচ্ছাক্রমে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী থাকিবে, অথবা
 ব্রহ্মচর্য্যের পবেই সন্ন্যাসী হইবে, সে ত বিবাহ কবিবেই না। আইনের জোরে
 তাহাকে বিবাহে বাধ্য করা এ দেশের সমাজব্যবস্থা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারে
 না। কিন্তু যে গৃহস্থ হইবে, সে বিবাহে কাৰ্য্যতঃ বাধ্য। বিবাহ না কবিলে
 সে বোল আনা সামাজিকতা পাইবে না। বেদ-বিহিত সমুদয় ধর্ম্মকর্ম্ম তাহার
 অধিকার জন্মিলে না। কেনা না, বেদ-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সপত্নীক অমুষ্ঠান করিতে
 হয়। যে পত্নী গ্রহণ করে নাই, মানবের মর্ত্যজীবনের নিয়ামক দেবগণের সহিত
 তাহার কোনও সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। দেবগণ মহুষ্য-প্রদত্ত যজ্ঞভাগের
 অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যাহার পত্নী নাই, সে দেবতাকে যজ্ঞভাগ দিতে
 পারে না। পিতৃগণের সহিতও তাহার মাথামাথি সম্পর্ক ঘটে না। পিতৃগণ
 পুরুষশরম্পবানন্ত পিতৃভোজনো অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। যে ব্যক্তির পত্নী
 নাই, সে বংশধার-রক্ষায় অশক্ত। পিতৃবিচ্ছেদ, তবে পিতৃগণ চোখের জল
 ফেলিতেছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণকে পিতৃ দেয়, সেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে
 অধিকারী। অতএব, যে ব্যক্তি বংশধার-রক্ষা করিতে পারিতেছে না, সে
 পৈত্রিক সম্পত্তিতে পূর্ণ নাত্রায় অধিকার পাইতে পারে না। ফলে অপত্নীক
 ব্যক্তি সামাজিকের পূর্ণ অধিকার পাইতে পারে না। সমাজভুক্ত অস্ত্র-
 যোকের সহিত তাহার যোগ আনা সম্পর্ক ঘটিতে পারে না। সামাজিক
 জীবনের পূর্ণতার জন্য বিবাহ আবশ্যক। জীবনের সংস্কারের জন্য বিবাহ
 আবশ্যক। বিবাহ জীবনের অন্তিম সংস্কার। এই হেতু দ্বিজাতি-সনাত্তে
 সামাজিক গৃহস্থ কাৰ্য্যতঃ বিবাহে বাধ্য।

কিন্তু বনে বাথিবেন যে, আলিয়া-গৃহ হইতে বেদ-বিদ্যা লাভ কবিয়া

সমাবর্তনের পর তবে বিবাহে অধিকার জন্মে। এ কালে পাশ করা ছেলের বিবাহের বাজাবে দর বেগী; সে কালে ছেলে পাশ করিয়া আসিতে না পারিলে বিবাহে অধিকারই পাইত না। আমাদের বর্ষশাস্ত্র প্রাচীন কালে যে ধর্মোত্তরী বাজা করিয়াছিল, এ কালে তাহার বাধাবিধি নাই; তথাপি ব্রাহ্মণের ছেলে গদায় একগাছা পৈতা দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পার না। পৈতা গাছটায় বলিয়া দেয় যে, সে বতই মূর্খ হউক, অন্ততঃ বেদের গায়ত্রী মন্ত্রটি, বেদ-বিস্মার বাহা সার মন্ত্র সেই গায়ত্রী মন্ত্রটি, অভ্যাস করিয়াছে। যদ্যপি করিতে পারি যে, সে কালে শাস্ত্রের বন্ধন এতটা শক্ত আঘাৎ ছিল না। বো-বিদ্যাব অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সমাবর্তনে আচার্য্যের অনুমতি পাইত না এবং সমাবর্তন না হইলে বিবাহ হইত না। অতএব যে একবারে গণ্ডমূর্খ, সে বিবাহ করিতে পাইত না, গৃহী হইতে পারিত না, সমাজে এক রকম অব্যবহার্য্য হইয়া থাকিত। কলে, থিয়োবি অনুসারে বিজ্ঞান-সমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। প্রত্যেক দ্বিজের পক্ষে বিদ্যালভ এইরূপে একান্ত আবশ্যক—compulsory—হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহী পক্ষে বিবাহ—যেমন compulsory, বিদ্যালভও সেইরূপ compulsory. কেন না, মূর্খের বিবাহ নিষিদ্ধ। এ কালে সাধারণ লোকশিক্ষা (mass education) বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু কিরূপে compulsory করা যাইবে, তাহার উপায় হইতেছে না; রাষ্ট্রশক্তিকে এজন্য আহ্বান করা হইতেছে। সে কালে শাস্ত্রকারদের ব্যবহার্য্য বিদ্যালভ compulsory করা হইয়াছিল; বৈদ্যবিত্য লাভে, অর্থাৎ সে কালের উচ্চতম বিদ্যা লাভে, বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিবাহ আটকাইয়া এ কালের বিশ্ববিদ্যালয় এ কালের উচ্চশিক্ষা লাভে সেরূপ বাধ্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন কি না, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় তাহা বিবেচনা করিবেন।

ভাবতবর্ষে এই যে অতি পুরাতন সমাজ, থিয়োবি অনুসারে যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তির স্থান ছিল না, যে সমাজে অশিক্ষিত ব্যক্তি গৃহী বা গৃহপতি হইতে পারিত না, গৃহস্থের অধিকার পাইত না, ধর্মকর্মের অধিকার পাইত না, সমাজ মধ্যে প্রতিভাপ্রায় হইয়া থাকিত, সেই সমাজই বিজ্ঞান-সমাজ। সেই সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনের যে কোনও মূর্খেরই হউক অথবা যে কোনও মিত্রা বর্ণেরই হউক, সেই দ্বিজ। যে একবার নৈসর্গিক মানব হইয়া পাইয়াছে; আব একবার বেদ-বিদ্যা লাভে সংস্কৃত

চইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পুত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম, নতন সামাজিক জন্ম পাইয়াছে, সেই ব্যক্তির দ্বিধা। যে ব্রাহ্মণ অপবের ছেলে পড়ায়, অপবকে ধর্ম কর্ম করায়, সে দ্বিধ। যে কৃত্রিম, রাজকাণ্ড করে বা লড়াই কবে, সে দ্বিধ। আর যে বৈষ্ণব, গুরু চরণ, লাঙ্গল ধরিয়া আপন জমিতে চাষ কবে, বা দোকান রাখে, সেও দ্বিধ। সমুদ্র বেদ-বিদ্যায়, বেদেব ফোল আনা কর্মকাণ্ডে এবং জ্ঞানকাণ্ডে, ইহাদেব সকলেরই ফোল আনা অধিকার জন্মিয়াছে। সেই অধিকাবে কেহ তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। সমাজ-স্থিতিব জ্ঞাত ও লোক-স্থিতিব জ্ঞাত তাহাকে কতকগুলি সামাজিক বিধি মানিয়া চলিতে হইত। কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হইত। এই কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলির সাধারণ নাম যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের তাৎপর্য না বুঝিলে বেদপন্থী দ্বিজাতি-সমাজের নিগূঢ় তথ্য বুঝা যাইবে না। বেদপন্থী সমাজেব জ্ঞানেব ইতিহাস এবং কর্মের ইতিহাস সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। ভাবতবর্ষের ইতিহাসেব যাহা বিশিষ্টতা, তাহা বুঝা যাইবে না। অতএব আমি সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি; আপনারা অবধান নকন; আমি যজ্ঞেব কথা বলিব।

মনে রাখিবেন, সর্বদেশে এবং সর্বকালে মনুষ্য-সমাজ একটা কৃত্রিম যজ্ঞ। সর্বত্রই কতকগুলি কৃত্রিম অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া সমাজ বন্ধনের চেষ্টা হইয়াছে। সমাজ যজ্ঞেব জটিলত কোথাও অধিক, কোথাও অল্প। তদনুসারে এই সকল কৃত্রিম অনুষ্ঠানগুলিরও কোথাও বহুলতা, কোথাও অল্পতা। বহু স্থলে এই সকল অনুষ্ঠানেব তাৎপর্য বুঝা যায় না। এক কালে হয় ত একটা তাৎপর্য ছিল, এখন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাণী অনুসরণ করিয়া এই সকল অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝিবার চেষ্টা করেন। আজ কাল anthropology অর্থাৎ মানববিদ্যা একটা বিজ্ঞানবিদ্যায় দাঁড়াইয়াছে। মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক বাতি অবলম্বনে মানব সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য অন্বেষণ করেন। যেথাঃ দুইটা পথ অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম তুলনামূলক আলোচনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান বর্তমানে প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তুলনায় আলোচনা করিতে হয়। কোণায় সাদৃশ্য কোণায় বৈষম্য আছে, কতটুকু সাদৃশ্য কতটুকু বৈষম্য আছে, তাহার আলোচনা করিতে হয়। এইরূপ আলোচনায় অনেক অনুষ্ঠানের তাৎপর্য বুঝিতে পারা যায়। দ্বিতীয়, ঐতিহাসিক আলোচনা। কোনও একটা সমাজে অতি প্রাচীন কালে কিরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেই দেশের

পুরাতন ইতিবৃত্ত থাকিলে, পুরাতন সাহিত্য থাকিলে, তন্মধ্যে তাহার সম্বন্ধ পাওয়া যায়। যে দেশে ধারাবাহিক সাহিত্য বা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আছে, সে দেশের পুরাতন অল্পতানগুলি কিরূপে ক্রমশঃ বিকৃতি বা পরিণতি দ্বারা কবিতা, তাহা দেখিতে পারিলে অল্পতানগুলির তাৎপর্য বুঝা যায়। দেখা যায়, বর্তমানে যে অল্পতানেব কোনও মানে বুঝা যায় না, এক কালে তাহাব একটি মানে ছিল। বর্তমানে বাহা নিতান্ত উদ্দেশ্যহীন এবং নিবর্থক বসিয়া পড়িয়া হয়, এক কালে তাহার একটি উদ্দেশ্য—একটি অর্থ—ছিল। একটি প্রচলিত প্রবাদ দি। আপনারা শুনিয়া থাকিবেন, ইংরেজেরা বড় দিনের উৎসবে mislence নামক লতা দিয়া ঘর সাজাইয়া থাকেন। অল্প লতায় না সাজাইয়া মিসলেন্সে দিয়া কেন সাজান হয়; এখন তাহার কোনও মানে পাওয়া যায় না। কিন্তু অতীত ইতিহাসে ইহার তাৎপর্য পাওয়া যায়। ইংরেজের দেশে যখন ইংরেজের আবির্ভাব হয় নাই, তখন বৃটনেরা ওকগাছের পূজা করিত। মিসলেন্সে লতা ওক গাছের পর্বগাছ হইয়া আসে। সে কালের বৃটনেরা সেই লতার আলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিত। বড় দিনের সূর্য্য উত্তর মুখে ঘুরিলে নববর্ষের উৎসবে ড্রাইডেন্স দনারোহসহকারে ওক গাছ হইতে সেই লতা কাটিয়া আনিও এবং সন্ধ্যাও কবিতা যজ্ঞমানসিগকে বিতরণ করিত। মিসলেন্সে দবে থাকিলে দবে ধর্ম্ম বীধা থাকিত। মিসলেন্সে সর্বব্যধি-বিনাশক। অতএব, উহা যবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাখা হইত। এখন সে ড্রাইডেন্স নাই, সে বৃটনও নাই; মিসলেন্সেও সাহায্যও কেহ বিশ্বাস করে না। কিন্তু বৃটন দেশ যাহাবা দখল করিয়া যায় কবিতা, প্রাচীন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাহাবা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সেই বিরোধী ইংরেজেরাও এখনও সেই বড় দিনের উৎসবে পরাজিত বৃটনদের সেই পুরাতন প্রথা ত্যাগ করিতে পারে নাই। এখন এই অল্পতান তাৎপর্যহীন; কিন্তু এক কালে উহাব বৃহৎ তাৎপর্য ছিল। ইতিহাস আলোচনার দ্বারা আবিস্কৃত হয়। এই বড় দিনের উৎসবটাই দেখুন না। তুলনামূলক আলোচনা দেখা যায়, বড় দিনের উৎসব সকল জাতির মধ্যেই কোনও না কোনও আকারে বিদ্যমান আছে। সূর্য্য দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে এক দিন উত্তর মুখে ফেরে; অতি অসম্ভাব্য জ্ঞাতিও সেই দিনটাকে লক্ষ্য করে। সেই দিন নীত ঋতুর অবসান হুচনা করে। সমস্ত পৃথিবী মুষ্টি বদলাইবার প্রাণে করে। সে দিনটাকে সকলেরই পক্ষে আনন্দের দিন, উৎসবের দিন। আনন্দ ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে নানা গুণ্য কর্ম্ম করি। পৌষ নাম গুণ্য নাম। পৌষ

মাসে দাম্পত্য পূজা পিঠাপান্নপেষ উৎসব। বীণুখ্রীষ্টের কোন তাবিখে জন্ম হইয়াছিল: কোনও খ্রীষ্টান তাহা জানে না। কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট নূতন ধর্মপ্রচার কবিলেন। মানব জাতির ইতিবৃত্তে একটা নূতন পরিচ্ছেদ প্রবর্তন কবিলেন। খ্রীষ্টানেরা করুণা করিয়া মাইল, ঐ বড় দিনে চবাচর পৃথিবী যখন নব জীবনের উদ্ভব করে, সেই দিনই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্বে বড় দিনের উৎসবে যে উৎসব-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাকেই বিকৃত এবং রূপান্তরিত করিয়া খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে পরিণত করা হইল। যাহার তাৎপর্য্য ছিল এক রূপ, তাহাতে তাৎপর্য্য দেওয়া হইল অন্য রূপ।

এই দৃষ্টান্ত হইতেই বৈজ্ঞানিক রীতির পরিচয় পাইবেন। বর্তমান কালে anthropology বিদ্যাটা খুব বড় বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার মধ্যে যতটা আশ্চর্য্যজনক আছে, ততটা ফল ধবে নাই। এখনও উহার পদে পদে মতবৈধ আর সংশয়। পণ্ডিতে পণ্ডিতে এত মতভেদ, যে কোনও সিদ্ধান্তকে একবারে চাপিয়া ধরা যায় না। তাহাতে হুঃখিত হইবার কোনও কারণ নাই। এ বিদ্যা এখন বিজ্ঞানবিদ্যা। বিজ্ঞানবিদ্যার ইহা দোষও বটে গুণও বটে। কোনও সিদ্ধান্তকে একবারে পাকা করিয়া ধরা বিজ্ঞানবিদ্যার স্বভাব নয়। জ্ঞানের বিস্তারের সহিত প্রত্যেক সিদ্ধান্তকেই পূর্ণতার এবং পরিপত্তির দিকে লইয়া যাওয়াই বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ। বিজ্ঞানবিদ্যা যে পথে চলিতেছে, সেই পথেই তাহাকে চলিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যার পক্ষে নাথ্য পক্ষা বিদ্যাতে অন্তর্নয়। উহা সংশয়ের পথ, দ্বৈধের পথ। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

গোঁড়া খ্রীষ্টানকে যদি বলা যায়, যে তাহাদের বড় দিনের উৎসবের সহিত যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কোনও সম্পর্ক নাই, উহা খ্রীষ্টানের বিশিষ্ট উৎসব নহে, মনুষ্য সাধারণের উৎসব তাহা হইলে তিনি হয় ত চাটয়া ঘাটবেন। তাহাব আশ্চর্য্য বিশ্বাস যে ঐ সময়েই খ্রীষ্টের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাসের জল্পরোধেই তিনি ঐ উৎসব অনুষ্ঠানে বন্দস্ত শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান অর্পণ করিয়াছেন। সেই বিশ্বাসের মূল শিথিল করিয়া দিলে, তাহাব ধর্মজীবনের গ্রন্থিও শিথিল হইয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র প্রমাণ উপস্থিত করিলেও তিনি ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে আঁকড়াইয়া থাকিবেন। কলে মানুষের conductএর উপর, কর্মের উপর, প্রজ্ঞার—Reasonএর—প্রভুত্ব বড় অধিক নহে। সংস্কার এবং বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যজীবনের নিয়ামক। প্রজ্ঞা কল্যাত্রি দেখাইয়া মানুষকে পাসনে আনিতে চায় বটে, সংযত কনিতে চায় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে কৃত-

কার্য হয় না। কারণে বাহির হইয়া মানুষ সচক্ষে প্রজ্ঞাব শাসন মানিতে চায় না। তাহাব সমস্ত অন্তবাস্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিজ্ঞানবিদ্যাবি সহিত বিনিষ্ঠানের যে একটা বিরোধ আছে, যে বিরোধ কখন মিটিবাব নহে, তাহাব মূল এইখানে। সামাজিক মনুষ্যের কক্ষ্যে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এ কথাটাকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। বিজ্ঞানবিদ্যা তাহাই বলুন, মানুষ তাহাব সংস্কারকে এবং বিদ্যাসকে আপনার ধাতুর সহিত, আপনার প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস করিয়া রাখিয়া লয় এবং তদনুসাবে কর্ম করিয়া থাকে। অধিকাংশ সামাজিক অমুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত জানা যায় না। অবৈজ্ঞানিক মানুষ তাহা মানিবাব জন্য বিশেষ ব্যগ্রও নহে। কিন্তু সে প্রত্যেক অমুষ্ঠানের একটা মনগড়া তাৎপর্য্য আরোপ করিয়া সেইটাকেই ঐকড়াইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কল্পনার দোড় নাই, সে অপবের প্রদত্ত অর্থ মানিয়া লইয়া তাহাকেই ঐকড়াইয়া থাকে। তাহাদের কল্পনার দোড় অধিক, তাহাবা নানাক্রমে তাৎপর্য্যের আবোপ করেন এবং ইতর সাধারণে মেই সকল আয়োজিত তাৎপর্য্য গ্রহণ করে।

আর্য্যজ্ঞাতির, যে শাখা ভাবতবর্ষে প্রবেশ করিয়া বেদপন্থী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রধান সামাজিক অমুষ্ঠানই ছিল যজ্ঞ। ইহার মূল অনুসন্ধান কবিত্তে হইলে আবও প্রাচীন কালে যাইতে হয়। ভারতীয় এবং পাবলীয় ধর্ম-গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনার তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তদযোতর অজ্ঞাত জ্ঞাতির মধ্যেও যজ্ঞাচুষ্ঠান কোনও না কোনও প্রকারে বিদ্যায়ান ছিল এবং এখনও আছে, তাহাও আপনাবা জানেন। এ সম্বন্ধে আপনাদের জানা কথা। ইহা লইয়া আমি আপনাদের সম্মত নষ্ট করিব না। ভাবতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে যজ্ঞাচুষ্ঠান কালক্রমে অভ্যস্ত পল্লবিত হইয়া মতান্তর জটিলতা পাইয়াছিল। বহু অমুষ্ঠানের গোণার তাৎপর্য্য লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাৎপর্য্য আরোপ করিবাব যোকেব অভাব ছিল না। কল্পনাশক্তি তে ভাবতবর্ষের লোক কোনও দেশের লোকের নিকট কখন হাবি যানে নাই। আপনাবা বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি মুখ্যতঃ যজ্ঞের বিবরণে পরিপূর্ণ। কোনও বক্তে কি কি অমুষ্ঠান, তাহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ তাহাবা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ছিল একবাদী। তাহাদের কল্পনার দোড় অসীম ছিল। কোনও স্থানেই তাহারা পিছপা হইতেন না। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে আপনাবা দেখিতে পাইবেন, তাহারা অমুষ্ঠানগুলির পর পর বিবরণ দিয়া যাইতেছেন এবং

কোন অল্পাংশের কি অর্থ, কি তাৎপর্য, তাহা অসাড়োচে দিখাইল চিত্তে নির্দেশ
কবিতা বাইরেছেন; অত্যন্ত সৰল ভাবে আগুন মত প্রকাশ কবিতা বাইরেছেন।
তিনি বলিয়া বাইরেছেন; তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বাহির হইতেছে,
তিনি যেন তাহার অন্য আদৌ দানী নহেন। তাহার পক্ষে কোনও যুক্তি
তর্ক আছে কি না উহা বিচারসূচ হইবে কি না, তাহা বিবেচনার তাঁহার
অবসর মাত্র নাই। ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে বলাইতেছেন, তিনি
বলিয়া বাইরেছেন। স্থানে স্থানে দেখা যায়, দুই জন ব্রহ্মবাদী দুই ব্রহ্মের
তাৎপর্য্য দিতেছেন। এক জন অপরের কথা খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও
কোনও পক্ষই কোনরূপ সঙ্কোচ নাই। উভয় পক্ষই আপনাদের কথা সমান
জোরে বলিয়া বাইরেছেন। উভয়ের বাক্যই বেদবাক্য।

বেদ কাহাকে বলে, যদি আপনানা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি
তাঁহার উত্তর দিতে পারিব না। আগ্নেয় শাস্ত্রকাব্যেও ইহার উত্তর দিতে
পাবেন না। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদের দুই ভাগ—মন্ত্র
এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দুই লইয়াই বেদ। নামান্ত্রিকের পক্ষে
মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই তুলাসুলা, উভয়ই বেদবাক্য, উভয়ই নিত্য এবং
অগোচর; কোনও ব্যক্তি বিশেষের মনগড়া বাক্য নহে। ব্যক্তি বিশেষে
উহা প্রচার করিয়াছে মাত্র। বাহানা এই মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ প্রচার করিয়াছেন,
তাঁহাদেরই নাম ঋষি। বেদের মন্ত্রগুলিকে তিন শ্রেণিতে ফেলা হয়—যজুঃ,
সাম এবং ঋক্। ঋক্ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা বাক্য, একালে যাহাকে পদ্য বলে;
ইংরেজিতে verse বলা বাইতে পাবে। যজুঃ মন্ত্রগুলি ছন্দে বাঁধা নহে।
ওগুলি গদ্য মন্ত্র; ইংরেজিতে prose formula বলা হয়। সাম মন্ত্র বলিয়া
পৃথক মন্ত্র নাই। ঋক্ মন্ত্রকে কোনও একটা সুর দিয়া গাইলেই উহা সাম মন্ত্রে
পরিণত হয়। কোনও একটা verse এবং বা পদ্যের ছন্দ বজার রাখিয়া আও-
ড়াইলে হয় ঋক্, আর সুর দিয়া গাইলেই হয় সাম। যজ্ঞিকেরা নিগদ মন্ত্র
এবং গৈর মন্ত্র বলিয়া আর এক শ্রেণির মন্ত্রের উল্লেখ করেন। কিন্তু সেগুলিও
গদ্যময় বাক্য। অতএব তাহাদিগকে যজুঃ মন্ত্রের প্রকাণ্ডভেদ বলিয়া মনে
করা বাইতে পারে। কলে ঋক্ যজুঃ আর সাম এই তিন শ্রেণির মন্ত্র বাতীত
আর চতুর্থ শ্রেণির মন্ত্র নাই। এই তিনই মন্ত্রান্তক বেদবিদ্যাকে ত্রয়ী বিদ্যা
বলে। বেদ তিনখানা না চারিখানা, এই লইয়া একটা তর্ক আছে। আপনাদের
মত মত সত্য ও মিথ্য এই দুই বেদের কথা বলিয়াছেন। একালের

অনেক পণ্ডিতেরা বলেন, ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন বেদই প্রাচীন বেদ। চতুর্থ অথবা বেদকে পববন্তী কালে জোর কবিতা বেদেব মধ্যে ফেলা হইয়াছে। একপ, ভাবে মরিলে উক্তবট ঠিক হয় না। আসল কথা এই যে, বেদের মন্ত্র তিন শ্রেণির, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা চারিখান। বেদমন্ত্রের সংগ্রহের নাম সংহিতা। অধিকাংশ ঋক্ মন্ত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থ সংলিখিত হইয়াছে তাহাই ঋক্ সংহিতা। একরূপ যজ্ঞ ব্যবহারী যজুঃ মন্ত্র সংগ্রহ একত্র করিয়া যজুঃ সংহিতা সংলিখিত হইয়াছে। যে সকল ঋক্ যজুঃ ঋক্ ঋক্ গান করিতে হইত, সেইগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সাম সংহিতা সংলিখিত হইয়াছে। এইরূপে সংলিখিত মন্ত্র ছাড়া আনও কতকগুলি পুস্তিবিদ্য মন্ত্র ছিল। যাহা সাধারণ যজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হইত না। যাহা শাস্ত্রিকগণের প্রভুতি কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সেইগুলিকে একত্র করিয়া অথর্বসংহিতা সংলিখিত হইয়াছে। এই অথর্ব সংহিতারও অধিকাংশ মন্ত্র ঋক্ মন্ত্র। ঋক্, যজুঃ, সাম ছাড়া আর চতুর্থ শ্রেণির মন্ত্র নাই। বেদমন্ত্র তিন শ্রেণির, কিন্তু বেদমন্ত্রের সংহিতা বা collection চারিখান। প্রত্যেক মন্ত্র কোনও না কোনও সময়ে কোনও না কোনও ব্যক্তি কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়ায়, কেন না, কোন ব্যক্তি কোন বেদমন্ত্র বচনা করিয়াছেন, এ কথা বেদপন্থী কিছুতেই বলিতে চাহিবেন না। যিনি যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রে ঋষি। যে মন্ত্রে যে দেবতাকে দক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই মন্ত্রেই সেই দেবতা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মন্ত্রে কোনও না কোনও কর্মে, কোনও না কোনও অমুষ্ঠানে, বিনির্দেশ হইত। যাজ্ঞিকদেব, মতে প্রত্যেক মন্ত্রই কোনও না কোনও কাজে লাগিলে, কোনও না কোনও অমুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইবে। অকেন্দ্র মন্ত্রের কোনও সার্থকতা নাই। অতএব শুধু যজ্ঞের সংহিতা লইয়া, মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থ লইয়া সমাজেব বিশেষ কোনও লাভ নাই। সামাজিকের জন্য বেদমন্ত্রগুলির সার্থকতা দেখাইতে হইলে, এইজন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আবশ্যকতা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখান হইয়াছে, কোন মন্ত্র কোন কর্মে প্রযুক্ত হয়; কখন কি ভাবে প্রযুক্ত হয়; সেই কর্মে সেই মন্ত্রের সার্থকতা কি; অথ-মন্ত্রের প্রয়োগ না হইয়া সেই মন্ত্রেরই প্রয়োগ হইল কেন। এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পাওয়া যায়। যে সকল ব্রাহ্মণ এই সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। তাঁহারাও বেন ভিতরের প্রেরণা বলে মন্ত্রগুলির বিনির্দেশ

এবং মন্ত্রগুলির তাৎপর্য জানিতে পারিয়াছিলেন এবং যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই সমাজের কল্যাণের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ভিতরের প্রেরণা, এই inspiration, সকলের নাই। অতএব মন্ত্র যেমন বেদবাক্য, মন্ত্র-সম্পর্কে যে ব্রাহ্মণ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও বেদবাক্য। অতএব, মন্ত্র-এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় লইয়াই বেদ।

কেনে দাঁড়াইয়াছে এই যে, আমাদের বেদপন্থী সমাজের ভিত্তি এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সুস্বত বেদপন্থী সমাজ ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্যমণ্ডলিক বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং তদনুসারে সমাজের ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যে সকল বিধিনিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, বেদপন্থী সমাজের সমুদয় ধর্মশাস্ত্রের মূল সেইখানে। এমন কি, পণ্ডিত করিয়া বলা হয়, বেদবাক্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থোক্ত বাক্য সত্য: প্রমাণ। উহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের কোনও বাক্যের সহিত যদি সেই বেদবাক্যের বিরোধ থাকে, তাহা হইলে ধর্মশাস্ত্রের সেই সব বাক্য অগ্রাহ্য। আগেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রচারকর্তা ব্রহ্মবাদীদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ ছিল। একই অল্পস্থানের তাৎপর্য গণ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ছিল। অল্পস্থান সম্পর্কে বিধিনিষেধেরও ভিন্নতা ছিল। অথচ প্রত্যেকের উক্তিই বেদবাক্য। এই বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য পরবর্তী পণ্ডিতদিগকে মাথা বামাইতে হইয়াছিল। পরস্পর বিরোধী বিধিনিষেধ বাক্যের কোনরূপ সামঞ্জস্য সাধন না করিলে সামাজিক লোক কোন পথে চলিবে? এই সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বেদবাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিয়া ক্রমশঃ মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্রের একটা বিপুল শাখার স্রষ্টি হইয়াছিল। মীমাংসাদর্শন বলিলে অমর এই দর্শনকেই বুঝি। পরস্পর বিরোধী বেদবাক্যের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য মীমাংসাদর্শন যে সকল rule বা canon প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সমস্ত বেদপন্থী সমাজ তাহা মানিয়া লইয়াছে। আমাদের সমাজে প্রচলিত jurisprudenceএর ভিত্তি পত্তন ঐখানে। কোনও সামাজিক অল্পস্থানে কর্তব্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলেই মীমাংসাদর্শনের দোহাই দিতে হয়, এবং মীমাংসাদর্শনের হৃদয়গুলির প্রয়োগ করিয়া কর্তব্য নির্ণয় করিতে হয়। সকল দেশে সকল সমাজে লোকস্বিকৃতি কতকগুলি স্বতন্ত্র conventionএর উপর স্থাপিত। সামাজিক অল্পস্থান সকলের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি যাহাই হউক, উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কার্যতঃ কতকগুলি convention

১৩) এর উপর, কতকগুলি fictionএর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়িয়াছে।
 সমাজের অধিকাংশ লোকে যাহা মানিয়া লয়, তাহা বিজ্ঞানসম্মত হউক আর
 না হউক, তাহাই সমাজ-ব্যবহার্য্য ভিত্তি। ব্যবহার্য্যাদ্বিবেচনা, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান
 পদ্ধতিতে। এই সকল fictionএর কথা বেশ জানেন। এ বিষয়ে আশা
 বাগ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যজ্ঞের কথায় যিহিয়া আশা রাখ। 'যজ্ঞ' শব্দটা যখন অতি সঙ্গীর্ণ এবং
 যখন অতি ব্যাপক অর্থে ব্যৱহৃত হইত। যজ্ঞিক পদ্ধতিতবা যজ্ঞ শব্দের একটা
 দ্বন্দ্ব দিয়াছেন। দেবতা, উদ্দেশ্যে কোনও দ্রব্য ত্যাগের নাম যজ্ঞ। এখানে
 তিনটি শব্দ পাওয়া যাইতেছে। দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। এই তিনটি
 শব্দেরই সঙ্গীর্ণ পারিভাষিক অর্থ আছে, এবং অত্যন্ত ব্যাপক অর্থও আছে।

আমি যজ্ঞের তাৎপর্য্য অন্বেষণে উপস্থিত হইরাছি। সঙ্গীর্ণ এবং ব্যাপক উভয়
 অর্থই আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমে সঙ্গীর্ণ অর্থই গ্রহণ করিব।
 তার পর ক্রমশঃ ব্যাপক অর্থে আসা যাইবে। সঙ্গীর্ণ অর্থে দেবতা, দ্রব্য ও
 ত্যাগ বলিলে কি বুঝায়, হুলাতঃ তাহা আপনাবা জানেন। যেসে নানা দেবতায়
 উল্লেখ আছে। ইন্দ্র, অশ্বি, সোম, বিষ্ণু, কশ্যপ ইত্যাদি। এই সমস্ত
 দেবতার উদ্দেশ্যে কোনও না কোনও দ্রব্য ত্যাগ করা হইত। ত্যাগ
 কর্ত্তব্য নাম আহুতি। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হইত, তাহা দ্রব্য। নানাবিধ দ্রব্য
 ব্যবহার্য্যে দেওয়া হইত। দুগ্ধ, আত্যা অর্থাৎ যজ্ঞার্থ সংকৃত ঘৃত, চক্ষু বা
 পায়সাদি, হুখ, দই, পুরোডাশ বা রুটি, পশুমাংস, সোমলতার রস, ইত্যাদি। এই
 দ্রব্য-ত্যাগ ক্রমের নামই যাগ। যে গৃহস্থের হিতার্থ যাগ অনুষ্ঠিত হইত, তাহাকে
 যজ্ঞমান। যিনি ষড়যানের হিতার্থে এই যাগ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিতেন, তিনি যাজক
 বা যজ্ঞিক। যাগ কৰ্ম্মের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক করিতে
 হইত। প্রত্যেক কৰ্ম্মেরই নির্দিষ্ট মন্ত্র ছিল। আগেই বলিয়াছি, কৰ্ম্মে অনুষ্ঠিত হইত
 বলিয়াই যজ্ঞের সাধকতা। যে মন্ত্র কোনও কাজে লাগে না, সে মন্ত্র নিরর্থক।
 মন্ত্র তিন প্রণির : ঋক্, যজু, সাম। যে সকল যজ্ঞে এই তিন প্রণির মন্ত্রের
 ব্যবহার ছিল, সেখানে এক জন যাজকে কাজ চলিত না। এতদধিক যাজক
 আবশ্যক হইত। কোনও ঋক্ ঋক্ যজ্ঞ আওড়াইতেন—স্পষ্ট ত্যাগ
 উচ্চারণের। কেহ বা যজুর্মন্ত্র আওড়াইতেন—নিয়ন্ত্রের। কেহ বা সাম মন্ত্র
 গান করিতেন। বড় বড় যজ্ঞে এই তিন প্রণির যাজক বা ঋক্ যাজক
 হইত :—ঋগবেদী, যজুবেদী ও সামবেদী। ঋগবেদী প্রধান যাজকের নাম

ছিল হোতা। ইনি ঋক্ মন্ত্র আওড়াইতেন। হোতা শব্দে আপনারা হোমকারী বুঝিবেন না। হোতা শব্দ আহ্বান শব্দ হেথা হইতে উৎপন্ন। যিনি ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞস্থলে দেবতাব্যে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন, তিনিই হোতা। হোতাকে আহুতি দিতে হইত না। যিনি আগুনে আহুতি দিতেন, তাঁহার নাম অঙ্ঘরী। তিনিই অগ্নিতে হব্য দ্রব্য নিবেদন করিতেন এবং তাঁহাকেই যজ্ঞের উপযোগী হব্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইত। এই সকল কর্মে তাঁহাকে যজুর্মন আওড়াইতে হইত। কাষেই অঙ্ঘরী যজুর্কেদী ধাতি। বড় বড় যজ্ঞে আহ্বানকারী হোতা এবং আহুতিদাতা অঙ্ঘরীর অত্যাশ্রয় সহকারী থাকিতেন। সাম গানের ক্ষুত্র এখান ঋত্বিকের নাম উদগাতা। যজ্ঞনিষেধে তাঁহারও সহকারী আবশ্যক হইত। ঋগ্বেদী যজুর্কেদী এবং সানবেদী এই তিন প্রকার ঋত্বিকের কর্ম পরিদর্শনার্থ, তাঁহাদের ভুলত্রুটি সংশোধনার্থ, আব এক জন প্রধান ঋত্বিক থাকিতেন। তাঁহার নাম ব্রহ্মা। এক হিসাবে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি সকলের কর্ম পরিদর্শন করিবেন। অতএব, তিন বোমাই তাঁহার অভিজ্ঞতা আবশ্যক। তিনি ত্রিদেবজ হইবেন। ব্রহ্মা নামেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের সূচনা হইতেছে। কেন না, সে কালে বেত্বাকোর নামই ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্মব্যব্যব তাৎপর্য্য যাহাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, বেদের সেই অংশের নাম ব্রাহ্মণ। যাহার ব্রহ্মব্যব্যব তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত, তাঁহার নাম ব্রাহ্মণী। দেবপত্নী সমাজে যে বর্ণের লোকের উপর এই ব্রহ্মব্যব্যব রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, সেট বর্ণের নামও ব্রাহ্মণ। অতএব, ঋত্বিকগণের মধ্যে যিনি ত্রিদেবজ এবং শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নাম ব্রহ্ম। যজ্ঞবিশেষে এই ব্রহ্মারও সহকারী আবশ্যক হইত।

সুদূর মাত্রই কার্য এবং প্রত্যেক কর্মেরই কোনও না কোনও ফল পাঠে। সেই ফল ইহলোকেও পাওয়া যায়। পায়ে, পরলোকেও পাওয়া যায়। কোন কর্মের কি ফল, তাহা যুক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহা বিচার করিয়া পাওয়া যায় না। কোন কর্মের কোন ফল, তাহা ব্রহ্মণী ধর্ম্মের দ্বারা নির্দিষ্ট শক্তির দ্বারা inspiration এর দ্বারা জানিতে পারিতেন। যজ্ঞমানেব হিতাধিকার্য্য অর্জিত হইত। সুপত্নীক যজ্ঞমান যজ্ঞের অর্থদান করিতেন; উভয়ে দুয়োদ্যপে ফলভাগী হইতেন। যজ্ঞমানেব পত্নী যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইত না। বেদমন্ত্র যথার্থীতি অভ্যাস করিতে হইলে আচার্য্য দ্বারা বহু বৎসর দান করিতে হইত। কিন্তু

ক্রীলোকের পক্ষে ন্যূনতম আচার্য্য গৃহবাসেই হইবে বা সন্তানানা বা পাতাল
 ক্রীলোকের ক্রমঃ বেদমন্ত্র উচ্চারণেই অধিকার, বাক্ত হইতে হইয়াছিল।
 অতি প্রাচীন কালে দেখিতে পাই, নারীগণেও বেদমন্ত্র প্রচার করিতেছেন,
 নারীগণের মধ্যেও ঋষি আছেন, ব্রহ্মবাদিনী আছেন। এমন কি, আচার্য্য-গৃহে
 উপনীত হইয়া বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিতেছেন,
 এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু এ কালে যেমন licensed residence-এ
 বাস না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধিকার জন্মে না, সেইরূপ
 বিনা উপনয়নে অর্থাৎ বিনা আচার্য্য-গৃহবাসে বেদবিদ্যা শাস্ত্রের সুযোগ না ঘটায়
 ক্রীলোকের ক্রমঃ বেদাভ্যাসে সুযোগ ও বেদের উচ্চারণে অধিকার হারাইয়া
 ছিলেন। বেদমন্ত্রের উচ্চারণ নিত্যস্ত সহজ কথা নহে। যথার্থ উচ্চারণ শিক্ষার
 ক্ষমতা নামে একটা বৈদ্যক্য বিচার্য্যই উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেদের
 ভাষা যখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তখন আচার্য্যের বিনা উপদেশে বেদমন্ত্রের
 যথার্থ উচ্চারণ হইতে পারিত না। আবার যথোচিত উচ্চারিত না হইলে বেদ-
 মন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না। এমন কি, উদ্ভূত ফল হইবারও আশঙ্কা থাকে।
 'ইন্দ্রশত্রে' শব্দের উচ্চারণ ঘোষে কিরূপ ফল বিপর্য্য ঘটাইয়াছিল, সে গম
 আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। যজ্ঞমানের পত্নী যোমন্ত্র উচ্চারণ করিতে না
 পাইলেও বৈদিক ক্রিয়াকর্মে ভীহার পূর্বা অধিকার ছিল। কেন না, পত্নী
 উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না; পত্নীকেও কবেকটী অনুষ্ঠান করিতে
 হইত; এবং যজ্ঞমান-পত্নীও যজ্ঞফলো সমান ভাগ পাইতেন।

যজ্ঞের মধ্যে কতকগুলি নিত্য—কতকগুলি কাম্য। কাম্যকর্ম হেচ্ছাধীন।
 যিনি বিশেষ কোনও ফল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি তদানুযায়ী কাম্যকর্ম
 করিবেন; না করিলে কোনও হানি নাই। কিন্তু নিত্যকর্ম অবশ্য কর্তব্য;
 না করিলে প্রত্যাবার ঘটে। কিন্তু সেই নিত্যকর্ম সম্পাদনের জন্য কোনরূপ
 রাজস্বের ব্যবস্থা ছিল না। সম্রাটের হা ত নিন্দা হইত; সমাজে পণ্ডিত্য
 হইত কি না, তাহা বণিতে পারি না। এ দেশের সমাজবিধি কাহারোও
 জোর করিয়া কোনও কাজ করাইতে চাহে না। নিত্যকর্ম না করিলে
 যে পাপ, কর্মকাণ্ডী তার ফল ভোগ করিবে। অজ্ঞেব তাহাতে গা
 আসে কি?

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী আচার্য্যের বাড়ীতে বাস করিতেন। আচার্য্যের
 বাড়ীতে অগ্নি থাকিত। উহা আচার্য্যের নিজস্ব অগ্নি; ব্রহ্মচারী পণ্ডিত

সন্ধ্যার সময় আচার্যের সেই অন্তিতে একখানি কাঠ ফেলিয়া দিতেন। 'ইহা ই
তাহার সমিৎ হোম। যজ্ঞীয় কাঠের টুকরায় নাম সমিৎ। আচার্যগৃহে
বেদাধ্যায়ন শেষ হইলে সমাবর্তনের পূর্বে অথবা সমাবর্তনের পরে অগ্নি স্থাপন
করিতে হইত। পত্নী-গ্রহণ কালে এই অগ্নিতেই লাজ-হোমাদি সম্পন্ন করিতে
হইত। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত অগ্নি।
গৃহস্থাস্রমের সমুদায় স্মার্তকর্ম অর্থাৎ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এই গৃহ্য অগ্নিতেই
সম্পাদিত হইত।

এই পাকযজ্ঞ শব্দটির মানে বুঝা দণ্ডকাষ। এখনও গৃহস্থের ঘরে বাগ্ন রক্ত কিছু
না কিছু অমুদ্রিত হইয়া থাকে। শ্রামাশ্রম প্রভৃতি তান্ত্রিক পুজার হোমের অনুষ্ঠান
হয়। এই হোম তান্ত্রিক হোম; ইহা বৈদিক যজ্ঞ নহে। হয়ত ইহা বৈদিক
যজ্ঞের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কিন্তু এই তান্ত্রিক হোম ব্যতীত বৈদিক যজ্ঞ
কিছু না কিছু আজিও প্রচলিত আছে। উপনয়ন বিবাহাদি সংক্রান্ত দ্রব্য করিতে
হয়। ব্রহ্মোৎসর্গাদি ব্যাপারে যজ্ঞ করিতে হয়। যজ্ঞপ্রতিষ্ঠা জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি
পূর্বকর্মে যজ্ঞ করিতে হয়। এ সকল যজ্ঞ বৈদিক অনুষ্ঠান। বৈদিক অনুষ্ঠানের
মধ্যে এগুলির নাম গৃহ্যকর্ম বা স্মার্তকর্ম। এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণির বৈদিক
কর্ম ছিল; সেগুলির নাম শ্রৌতকর্ম। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ,
শাজস্রম প্রভৃতি যজ্ঞের নাম আপনাবা ওনিয়া থাকিবেন। এই সকল যজ্ঞ
শ্রৌতযজ্ঞ। শ্রৌতকর্ম উপদেশের ক্ষত্ব এক প্রহ শাস্ত্র আছে, সেইগুলি
শ্রৌতশাস্ত্র। আব গৃহ্যকর্ম উপদেশের ক্ষত্ব আর এক প্রহ শাস্ত্র আছে,
সেইগুলি গৃহ্যশাস্ত্র। গৃহ্যশাস্ত্রে ঊশদিষ্ট গৃহ্যকর্মের অনুষ্ঠান এখনও আমরা
করিয়া থাকি; এখনও উহা সমাজে চলিত আছে। কিন্তু শ্রৌতযজ্ঞের উপদিষ্ট
শ্রৌতকর্মের অধিকাংশই এখন নুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের নাম
মাত্র অবশিষ্ট আছে। খুব সম্ভব, বৌদ্ধবিপ্লব এজন্ত দায়ী। বৌদ্ধবিপ্লবের সময়ে
বড় বড় ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বড় বড় বৈজ্ঞ হোষ্ঠা, বৈদিক কর্ম ছাড়িয়া দিলেন অর্থবা
তাহাতে শ্রদ্ধা হারাইলেন। অনেকে গুরুগৃহে উপনয়নের পব বেদাধ্যায়ন ত্যাগ
করিলেন; অর্থাৎ পৈতা ফেলিয়া দিয়া দ্রোণায় শূদ্রাচার অবলম্বন করিলেন।
আগে বলিয়াছি, বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেকে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির জন্য হুংগিত, ও
গুনবার দ্বিজত্ব পাইবার জন্য সচেষ্ট; তাহাদের পূর্বপুরুষেরাই তাহাদের এই
শূদ্রত্বের জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। রাজকতা ব্যাসসায়ী ব্রাহ্মণের জীবিকা লোপের
উপক্রম হইল। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বাহাবা বড় লোকের হবে রাজকতা অবস্থা

দীর্ঘিকা লাভ কবিত, তাহাদের পর লোপের উৎক্রম হইল। আচর্য্যমতে
বহু বৎসর বাস করিয়া বেদের কর্মকাণ্ড অভ্যাসের প্রয়োজন থাকিল না।
বহু বৎসর কবিতা বোধ্যাস বা ব্রহ্মচর্য্য, পূর্বে যাহা অবশ্য কর্তব্য ছিল,
প্রয়োজনেব অভাবে তাহা ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। উপনয়ন এবং
সমাবর্তন কর্মের নাম মাত্র থাকিল; সাধকতা থাকিল না। কণে অতিক্রম
যজ্ঞকেব অভাবে জটিল শ্রীত অমুষ্ঠানগুলির অপ্রচলিত দেখা এক্ষণেই
চ্যুত হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদপন্থী ব্রাহ্মণ বেদকে একবারে ত্যাগ করিতে
পারিলেন না; অন্ততঃ গৃহ্য অমুষ্ঠানগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।
অগ্নিহোত্র অগ্নিষ্টোমাদি শ্রীত যজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কুশাণ্ডবার্ণ
গৃহ্য বাগ এখনও এখনকার দ্বিজাতি সমাজে চমিত আছে।

গৃহ্য অগ্নির কথা বলিতেছিলাম। এই অগ্নিতে বাবতীয় গৃহ্য বর্ম্ম কথার
বাবতীয় গৃহ্যব্রহ্মোক্ত কর্মের নির্বাহ হয়। গৃহ্য অগ্নি সম্বন্ধে আর আরও কথা
বলিবার দরকার নাই। যজ্ঞবল্ক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শ্রীচ
অগ্নির কথা এবং শ্রীচ অগ্নিতে সম্পাদ্য-শ্রীচ যজ্ঞের কথা ভাব করিয়া
বুঝিতে হইবে। এই জ্ঞান আপনাদের ধৈর্য্য তিকা কবিত্তেছি।

এই শ্রীচ অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ কাণ্ড।
গৃহস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ জন্ত এই শ্রীচ অগ্নির আবশ্যকতা। ব্রহ্ম
শ্রীচ অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। যিনি অববাহিত, তাহান শ্রীচ অগ্নি
স্থাপনে অধিকার নাই। বিবাহের পর গৃহস্থের নাম হইত গৃহপতি। বাড়ীর
মধ্যে কোনও স্থানে অগ্নিশালা বা অগ্ন্যাগার স্থায়ীভাবে নির্মিত হইত। গৃহপতি
গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগার মধ্যে যথাবিধি শ্রীচ অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই তত্ত্ব
প্রতিষ্ঠা কর্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধের। সংক্ষেপে উহা বিবরণ
দিতেছি।

আপনামা তিন অগ্নির নাম শুনিয়াছেন। গার্হপত্য, আহবনীয এবং
দক্ষিণাগ্নি। এই তিন অগ্নিই শ্রীচ অগ্নি। অগ্নিশালায় চতুর্দিকে বেদি নির্মাণ
করিয়া তাহাব তিন দিকে তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদির পশ্চিমে গার্হপত্যের
স্থান, বেদির পূর্বে দিকে আহবনীয়ের স্থান, এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নির স্থান।
মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নির্মিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্দিকাব
আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার, দক্ষিণাগ্নির স্থান অঙ্কুরাকার। তিনের
ক্ষেত্রফল বা area সমান। এক হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রস্থ, ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য।

গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির অগ্নি, উহা গৃহপতির প্রতিনিধি স্বরূপ। এই অগ্নিকে গৃহের কর্তা বলা যায়তে পারে। আব্রাহামের অগ্নি দেবতামিগের অগ্নি; উহাতেই দেবতাদের উদ্দেশে যাবতীয় প্রবোধ আহতি হয়। আহতি হয় বলিয়াই নাম আহবানীয়। দেবতাবা পূর্বে বিকের-অবিবানী, দেবতাদেব রাজা ইত্য পূর্বে দিকের অধিপতি। অ. জিও যামরা পূর্বে যুগে বসিয়া দেবতাদের পূজা করি। এইজন্য আব্রাহামের স্থান পূর্বে দিকে। দক্ষিণ দিক পিতৃগণের। পিতৃগণের রাজা যম দক্ষিণ দিকের অধিপতি। দক্ষিণাংশিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট প্রবোধ দেওয়া হয়। অগ্ন্যাধান কর্যের পূর্বে দিনে দেহশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত এবং বুদ্ধি প্রাক্কানি মাদলিহ কার্য কবির যজ্ঞমান কর্ষেব জন্ত প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্য নামক ঋষিক বিহিত স্থান হইতে আগুন আনিয়া গার্হপত্যেব স্থানে রাখিয়া দেন। সন্ধ্যাকালে গৃহস্থ ওঠাহার গাঙ্গী অগ্নিশালায় প্রবেশ কবির্য্য সেই থানেই রাখিবান করেন। এমন এক কাহা ছিল, যখন কাঠে কাঠে বসিয়া আগুন করিতে হইত। যজ্ঞবল্লভ সেই প্রাচীন প্রথা পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহাকে বসে survival in culture; সামাজিক অল্পটানে বিশেষতঃ সামাজিক ধর্ম্যকার্য অল্পটানে কোনও যেনেই লোকে প্রাচীন প্রথা সহজে ত্যাগ করিতে চাহে না। পুরাতনের মোহ কাটাইতে চায় না। শমীক্কের পর্বগাছারূপে যে অশ্বখ গাছ জন্মে, উহাও কাঠ বসিবে মহজে আগুন জন্মে। ঐ কাঠে দুই থানি অরনি প্রস্তুত হয়। অরনিবর অগ্নিশালাতেই রাজির মত রক্ষিত হয়। গার্হপত্যে যে আগুন রাখা হইয়াছিল, তাহাতে সমিৎ অগাৎ কাঠখণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া জ্বলাইয়া রাখিতে হয়। যজ্ঞমান রাজি জাগিয়া উঠা জ্বলাইয়া রাখেন। প্রাতঃকালে অধ্বর্য্য সেই অগ্নি নিবাইয়া দেন। স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে অরনি পূর্বের দ্বারা নূতন আগুন উৎপাদন করিতে হয়। এই কর্মের নাম অগ্নিমহন। অগ্নিমহনের পূর্বে একটি ঘোড়া আনিয়া রাখিতে হয়। যজ্ঞমান একখানি অরনি ধরিয়া বসেন। দ্বিতীয় অরনি দ্বারা প্রথমে তাঁহার পত্নী, পরে অধ্বর্য্য, অগ্নি উৎপাদন করেন। মাতার শাপরায় গণবেশের ঘুটা রাখিয়া তাহাতেই সেই মহনোৎপন্ন অগ্নি গ্রহণ করা হয়। যজ্ঞমান উহাতে ফু দিয়া জ্বলাইয়া দেন। অধ্বর্য্য সেই আগুনে দ্বিতীয় কাঠ জ্বলাইয়া গার্হপত্যে রাখেন। ব্রহ্মা নামক ঋষিক সেই সময়ে সাম গান করেন। গার্হপত্যের অগ্নি জ্বলা অধ্বর্য্য আহবানীয় স্থানে চলেন। ঘোড়াটি আগে আগে চলে। যজ্ঞমান চলেন ঘোড়ার পশ্চাতে। ব্রহ্মা সাম পাউড়ে থাকেন। আহবানীশেব স্থানে একটি পা রাখিয়া ঘোড়াটি পশ্চিম মখে

দাঁড়াইয়া থাকে । ঘোড়ার সেই পায়ে সেই অগ্নি স্পর্শ করাইয়া অধ্বায্য সেই আগুন আহবনীরে রাখিয়া দেন । ব্রহ্মা তখন আবাব শাস্ত্র গান করেন । এইরূপে গার্হপত্য এবং আহবনীর অগ্নিবাহাগন হইলে অধ্বায্য পুনরায় গার্হপত্য হইতে আগুন লইয়া দক্ষিণাগ্নির কাছে রাখিয়া দেন । এইরূপে তিন অগ্নি বাগনের পর ব্রহ্মা তিন কালে তিনটি সাধুগান করেন । তৎপরে সকলে অগ্নি আদ্যনিক করিয়া ঘোড়াটিকে হাড়িয়া দেন । তৎপরে পূর্ণাহুতি হোম । গার্হপত্যের মাগুনে খানিকটা বি গরম করা হয় । অধ্বায্য সুহু নামক কাঠের হালি হাঙ্গা সেই বি লইয়া আহবনীরের পাশে বসিয়া বজ্রমস্তক পড়িয়া আহবনীর অগ্নিতে বহাহুতি দেন । যজ্ঞমান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকেন । ইহাই হইল পূর্ণাহুতি । এই পূর্ণাহুতিতেই অধ্যায়ান কর্ম সমাপ্ত হয় । অধ্যায়ানব পদ ভয়েক দিন যজ্ঞমান ব্রহ্মচর্যের নিরম অবলম্বন করিয়া থাকেন । গার্হপত্যের আগুন দিবারাশি অগ্নিতে থাকে । উহাকে নিবাহিতে দেওয়া হয় না । উহা নিবাহিলে প্রত্যাবার ঘটে । আহবনীর এবং দক্ষিণাগ্নি দিবারাজি জলে না, আবৃত্তক মস্ত গার্হপত্য হইতে আগুন আনিয়া ঐ দুই অগ্নি জ্বালান হয়, এবং হোমাত দেবতাগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে বাগ হয় ।

এই অধ্যায়ান কর্ম যজ্ঞমানের দ্বীপনে অতি প্রধান কর্ম । অধ্যায়ানের পর তাহার বিশেষণ হয় আহিতাশি । সাহিতাশি গৃহস্থ বোল আলা বৃহস্পতি । অধ্যায়ানের পর তিনি বাবতীয় শ্রোত কর্মে, বাবতীয় দেবগণের এবং পিতৃগণের আধিকার লাভ করেন । দেবগণ এবং পিতৃগণ অলক্ষ্য ভাবে মানুষকে মর্ত্য-জীবনের নিয়ামক, উত্থাপ্ত ফলদাতা । আগেই বলিয়াছি, দেবগণ মানুষকে দত্ত হন্যভোজনের দ্বারা অপেক্ষা করিতেছেন । পিতৃগণ স্বধাতোজদেব প্রায়সী । দেবগণের নিকট এবং পিতৃগণের নিকট মানুষের স্বর্ণ আছে, সেই স্বর্ণ মোচন করিয়া তা দিয়া যাইতে গািলে নানব জীবন অসম্পূর্ণ থাকে । অতএব জীবনের সম্পূর্ণতা বিধানের জন্ত দেবগণের এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিতেই হইবে । অতএব, গৃহস্থের পক্ষে আহিতাশি হওয়া আবশ্যক । সাধারণতঃ অগ্নির দ্বারা দেবগণের এবং পিতৃগণের প্রাপ পৌছাইয়া দেওয়া হয় । অগ্নি বিহীন একজন দেবতা এবং তিনি দেবগণের পুৰোহিত । গৃহস্থ সংহিতাব প্রথম একটাই স্বপণ করিবেন, অগ্নি দীপ্তে পুৰোহিত্য, যজ্ঞ দেবম অগ্নিদম, গোভাব রত্নব্রাহ্মণ । অগ্নি দেবগণের পুরোহিত, তিনিই হোতা নামক পবিত্র অর্থব্য তিনিই দেবগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞরূপে ডাকিয়া আনেন ; তিনিই দেবগণের

মুখ : তাঁহাব মুখে স্বৰ্ণ দমন করিবে দেবগণকে বেড়াইয়া। তিনিই
হব্যবহ; দেবগণের ছত্র হব্য বহন করিবা লইয়া যান। গার্হপত্য অগ্নি
বস্তুঃ এক পক্ষে গৃহস্থ্য, অন্য পক্ষে দেবগণের মধ্যবর্তী। তিনিই গৃহস্থ্যগণ
এক যক্ষম কর্ত্তা এবং তত্তাউত রাত্তা। অতএব গার্হপত্য; অগ্নিকে সম্বোধে যক্ষ
কবিত্তে হইবে।

যানবতস্থলিৎ গণ্ডিতেরা এখান বলিবেন, অগ্নিব মাহাত্ম্য দেবতা দেব-
পত্নী সমাজের একচেটিয়া নহ; অন্ত্যস্ত দেশে ও অন্ত্যস্ত সমাজেও অগ্নির
দেবতা স্বীকৃত হয়। অগ্নিমুখেই দে দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা
অমুমান করিবার প্রচুর কারণ আছে। দেবতার স্বম্বপরাবী, তাহা
স্বা স্বর গ্রহণ করিতে পারেন না। কোনও উপায়ে তাহা হইলে তাহা
বুনে বাপে বায়ুতে পরিণত হয়। এইরূপে স্বম্বতা পাইলে উহা দেবতাদের স্বম্ব
দেহের উপযোগী হয়। দেবতার উর্জলোকে বাস করেন। অগ্নিশিখা যত নতঃ
উর্জমুখী, উহা যখন এবং বাস্পরূপে উর্জমুখে উঠিয়া দেবতাদের আশ্রয়
দিগকে পৌছাইয়া দেয়। বিশেষতঃ, আশ্রয়তীর মধ্যে অগ্নিব মাহাত্ম্য বিশেষ
বলাবৎ ছিল। পণ্ডিতেরা হয় ত বলিবেন, আশ্রয়তীর এক কালে শীতপ্রধান দেশের
অগ্নিমানী ছিলেন; সেইজন্য তাহাদের নিকট অগ্নিব এত মাহাত্ম্য। যাহা গঙ্গাধর
শিল্পক মহাশয় হয় ত বলিবেন, এই অগ্নিমাহাত্ম্য আশ্রয়তীর সুসংস্কৃত
দেশেরই সমর্থন করিতেছে। যেখানে ছয় ঘাস খদিয়া সাজি সেইখানে
কাতনের সমাদর এবং চক্ষিৎ ঘটা অগ্নির আলিঙ্গা বাগব বিশেষ ব্যবস্থা না
কবিলে চলিবে কেন? কাপ্তীয় সমাজের তীরে বহু প্রদেশে কেবোদীন ভেলের
মাহাত্ম্য আছে। তুর্কি হইতে সর্বদা কেবোদীনীর রাপ উল্লত হয় এবং
আপনা হইতে জগিয় উঠে। সে দেশের লোকের পক্ষে অগ্নিপূজা
স্বাভাবিক। এখনও বেই দেশে অগ্নিব মন্দির দেখা যায়। গাহাবা মনে
কবেন, আশ্রয়তীর এক কালে যখন অগ্নির যত্ন কবিতেন, তাহাবা এই কল্পনামে
পুনী হইবেন। গ্রীক এবং রোমানের আশ্রয়তীর জ্ঞাতি ছিল; তাহাদের মধ্যেও
অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল, তাহা আপনাবা জানেন। প্রাচীন গ্রীকদের অগ্নি-
দেবতার নাম Hestia প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে ঘরে অগ্নিশিখা থাকিত;
সেখানে অগ্নি রক্ষিত হইতেন ও পূজা পাইতেন। গ্রীকেরা যখন নির্দেশ
দেশ ছাড়িয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাইতেন, তখন আপন
গৃহস্থিত অগ্নি সঙ্গে লইয়া বাইতেন। এইরূপে উপনিবেশের সহিত মাহাত্ম্যের

মধ্যপাক হইত। গ্রীকদের মধ্যে যিনি Vesta, রোমীদের মধ্যে তাঁহার নাম Vesta; Vesta দেবতা বোন নগরের ধোমেব বাহুব রক্ষাকর্ত্রী ছিলেন। সাধারণ স্থানে তিনি পূজা পাইতেন। কয়েক জন কুসারী অগ্নিরসম্বন্ধে নিষ্পত্তি হইতেন। তাঁহাদের কোমার ধর্ম পালন করিতে হইত। তাঁহাদের কতগুলি বিশেষ অধিকার ছিল। সর্বসাধারণের নিষ্পত্তি তাঁহারা বিশেষ সম্মান পাইতেন। পাবস্ত্রবাসী ইরাণীদের কথা বলা অন্যতর। প্রাচীন ইরাণী সমাজের মহিমা প্রাচীন বেদগায়ী সমাজের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা আশ্রমের মতই মজারুষ্ঠান করিতেন, ইহা আপনাতা সকলেই জানেন।

অধ্যায়ের অন্তর্গত একটি ঘোড়া দরবার হইত, ইহা বলিবাছি। এই ঘোড়াটি তাৎপর্য কি, বলা কঠিন। মানবজীবন পণ্ডিতের ইহার তাৎপর্য বাহির করিবেন, তা জানি না। শুনিতে পাই, ঘোড়ার সহিত অগ্নি জাতির একটি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। অগ্নিজাতি নাকি প্রথমে বুনা ঘোড়াকে গোয় মানিয়া, মানুষের ব্যবহার্য্য করিয়াছিলেন, domesticate করিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার ক্যাস্পীয় এবং আশান সাগরের তীরবর্তী steppes সমীতে এখন ঘাস হয়। এখনও হর, পূর্বে আরও হইত।

সেই সমি অশ্বপালনের পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। আশ্বগণ ঘোড়ার চড়িয়া দিগ্বিদ্যে বাহির হইয়াছিলেন। ইউরোপে এবং অন্তর্গত দেশে তাঁহারা পুণ্যে ঘোড়া আনদানি করেন। তাবতবর্ষে তাঁহারা অশ্বগোহী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, মনে করা বাইতে পারে। তাঁহাদের গায়েব জীবনের আরম্ভকাল প্রথম অশ্বগোহী হইত। এই অশ্বগোহী ঘোড়া আনিতে হইত। আমার এই অনুমান আপনাতা হইত। হইতে হইত। ইহা নিশ্চয়ই একটি survival. অধ্যায়ের, ঘোড়ার উপস্থিতি একটি ক্রি, সাক্ষ্যতা আতি পূর্বে ছিল। পরবর্তী কালে তাহারা তাৎপর্য্য বোকে ভুলিয়া গেল, বিব্র প্রপাটা থাকিয়া গেল। পুৰাতন বৈদিক সাহিত্যে অশ্বের সহিত ঘোড়ার জুগুপা বহু হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যাবডোমেন তাঁহার Vedic mythologyতে বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; আপনাতা দেখিতে পাইবেন। অশ্ব বেদগায়ী সমাজের অতি প্রাচীন দেবতা। তিনি ত সাত ঘোড়ার বর্ণে চড়িয়া দিগ্বিদ্যী বীণপুঙ্কবের মত আকাশপথে ভ্রমণ করেন। তিনি নিশ্চয়ই ঘোড়া। অশ্বের অশ্বরূপ বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। একবার অশ্বের সহিত তাঁহার জামাতা অশ্বের বগড়া হইয়াছিল। ছায়া এবং সংস্কারবটিক।

গল্প আপনাবা জ্ঞানেন। সূর্য্য নেখানে অধর্ম্মই পরিঘাছিলেন। বাজবক্ষ্য
কবির চপল্যাব সম্বন্ধে ইহা সূর্য্য যখন ঋষিকে নূতন যজুর্বেদ দান করিয়াছিলেন,
তখনও তিনি বাজী বা অধর্ম্মে ঋষিকে দেখা দিয়াছিলেন। অগ্ন্যধান কথ্যে
যেটাটি প্রথমে পূর্ব্ব মুখে চলে, তাহার পব আহবনীয়ে উপস্থিত ইহা পশ্চিম
মুখে দাঁড়ায়, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। অনুমান করা যাইতে পারে
যে, এই যোড়া সেখানে সূর্য্যেরই কল্পিত প্রতিনিধি, এক যোড়াটির বাতারা
সূর্য্যেরই বৈদিক আবর্তনসূচক। এই অনুমানটাও আমি ছাড়িয়া দিলাম,
আপনাবা ইচ্ছা হয় লইবেন।

অগ্ন্যধানের পব আহবনীর অগ্নিতে প্রতি দিন অগ্নিহোত্র বাগ কবিত্তে
হইত। এই অগ্নিহোত্র বাগ নিত্যকর্ম্ম। ইহা না কবিলেই নয়। আহবনীর
অগ্নিতে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত।
প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয়ে এবং সন্ধ্যায় অগ্নির উদয়ে আহুতি দিতে হইত।
ইহাই অগ্নিহোত্র। সূর্য্য এবং অগ্নি উভয়েই জ্যোতিঃরূপ। যেন একই
দেবতার দুই মুর্ত্তিভেদ। অগ্নি স্বল গৃহীণী সোক, এবং সূর্য্যের স্বল
হ্যালোক। এই দুই দেবতাকে আহুতি দিলে সকল দেবতাকেই এক রকম
তুষ্ট করা হয়। কেন না, সকল দেবতাই জ্যোতিঃরূপ। এইরূপে সূর্য্যের
সহিত অগ্নির সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অগ্ন্যধান অনুষ্ঠানে যোড়ার গারে
অগ্নি স্পর্শ করিয়া সেই অগ্নির প্রতিষ্ঠার মূল এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অগ্নিহোত্রের কণা বর্ণিতে চাহি। আহুতিগণি গৃহস্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় তি
প্রাতে প্রোত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র সম্পাদন করেন। ইহা গৃহস্থের নিম্নের
কাজ। অশক্ত পক্ষে প্রতিনিধি দ্বারা চলিতে পারে। গুজ, ভাতা, ভাগিনেয়,
জামাতা প্রভৃতি প্রতিনিধি হইতে পারে। অধ্বর্য্য দ্বারাও চলিতে পারে।
স্বয়ং আহুতি দিলে যে ফল প্রতিনিধি দ্বারা দিলে ফল তাব চেয়ে অল্প।
অগ্নিহোত্র সম্পাদনের জন্য গৃহস্থ ঘবে একটা গাভী থাকিত, তাহার নাম অগ্নি-
হোত্রী গাভী। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় সেই গাভীকে দুধ লইয়া মাটির নালসাদু
রাখিয়া গাধপতের আগুনে তপ্ত করিতে হয়। আহুতির জন্য দুইখানি কাঠের
হাতা দরকার। একখানি ছোট হাতা, তাহার নাম ক্রব। একখানি বড় হাতা,
তাহার নাম অগ্নিহোত্রহবনী। নালসাদু দুধ ক্রব দ্বারা চাষি বান্ধে অথবা
পাঁচ বারে লইয়া অগ্নিহোত্র হবনীতে ঢালিতে হয় এবং সেই অগ্নিহোত্র হবনী
দুধ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে গাভী সহিত গৃহস্থ অগ্নি-

শালার প্রবেশ করিয়া গার্হপত্য হইতে প্রস্তুত অগ্নি লইয়া আহবনীৰ অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি জ্বলাইয়া দেন। পবে গার্হপত্যের আগুনে দুধ জল দিয়া সে দুধ যথাবিধি স্রবদ্বারা অগ্নিহোত্র হবনীতে গ্রহণ করেন। তাব পর আহবনীৰ অগ্নিতে একখানি সন্নিং বা কাঠ ফেলিয়া দেন। সে কাঠ জলিয়া উঠিলে অগ্নিহোত্র হবনীৰ দুধ আহবনীৰ অগ্নিতে দুই বাস আহতি দেন। প্রথম আহতি অগ্নিব উদ্ভিষ্ট। উহার মন্ত্র ভূত্বং স্বঃ শুঃ অগ্নিজ্যোতিঃ জ্যোতিবয়িঃ স্বাহ। দ্বিতীয় আহতির দেবতা প্রজাপতি। প্রজাপতিকে ধ্যান করিয়া বিনা মন্ত্রে আহতি দিতে হয়। সমস্ত দুধ আহতি দিতে নাই। একটু হবিশেষ কাগে থাকে। আহতিদাতা তাহা ভক্ষণ করেন। আহবনীয়ে আহতি হইলে গার্হপত্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতে আহতি দিতে হয়। এবাব অগ্নিহোত্র হবনীৰ দরকাব হয় না। ছোট হাতাখানি দিয়া মালসা হঠতে কিঞ্চিৎ দুধ লইয়া জলন্ত অগ্নিতে ফোঁত হয়। গার্হপত্যে প্রথম আহতিব দেবতা অগ্নি গৃহপতি; দ্বিতীয় আহতিব দেবতা প্রজাপতি। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথমাহতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি; দ্বিতীয় আহতির দেবতা প্রজাপতি। প্রত্যেক আহতি জলন্ত সন্নিংব উপর অর্পণ করিতে হয়। আহতিদানের পর হবিশেষ ভক্ষণ করিয়া প্রত্যেক অগ্নিতে তিন তিনটি সন্নিং ফেলিয়া এবং তিন তিনটি উপস্থান করিয়া গৃহস্থ অগ্নিমালা হইতে বাহির হইয়া আসেন। এই হইল সায়াংকালের অগ্নিহোত্র। প্রাতঃকালের অগ্নিহোত্রের বিধি সায়াংকালেরই মত; কেবল দেবতা অগ্নির বদলে সূর্য। আহতির মন্ত্র ভূত্বং স্বঃ শুঃ সূর্যোজ্যোতিঃ জ্যোতিঃ স্বঃ স্বাহ। সম্ভাব অনুষ্ঠান সূর্য্য অন্ত গেলে অনুষ্ঠেয়। প্রাতঃকালের অনুষ্ঠান কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পর, কাহারও মতে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে কর্তব্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনেক বিতণ্ডা পর সূর্য্যোদয়েব পরেই অগ্নিহোত্রের সমর্থন কবিয়াছেন।

অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম। ইহা না করিলেই নয়। গৃহস্থ-প্রবাসে থাকিলেও তাহার প্রতিনিধি ইহা সম্পাদন করিবেন। এমন কি, বিপদীক গৃহস্থেরও অগ্নিহোত্র কবিত্তে হইবে কি না, তাহা নইয়া তর্ক আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। পতীর মৃত্যুব পর অগ্নিহোত্র নষ্ট হয়। সেখানে অগ্নিহোত্রের কি ব্যবস্থা হইবে, এই প্রশ্ন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তুলিয়াছেন। উত্তরে বলিতেছেন, গৃহস্থ যদি পুনরায় বিবাহ না করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্রপোত্র বা দৌহিত্যকে অনুমতি দিতে পারেন; সে অনুমতি পাইয়া তাহাবাই অগ্নিহোত্র চালাইবেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ আর এক স্থানে প্রশ্ন করিতেছেন,

বিপত্রীক ব্যক্তি অগ্নিহোত্র আহরণ করিবে কি করিবে না? উক্তবে বলিতেছেন, আহরণ করিবে। কেন না, ঋণ পরিহারের জন্য বাগ করিবে, এই ঐতি-বচন রহিয়াছে। আপনাতঃ সেই ঐতি বাস্তব উনিয়া থাকিবেন। জ্ঞানমানো বৈ ব্রাহ্মণঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ ভাস্ততে। ব্রহ্মচর্যেণ ঋণিত্যো যজ্ঞেন দেবেত্যো প্রজ্ঞয়া পিতৃত্যঃ এষ বা অনূণো যঃ পুত্ৰী যজ্ঞা ব্রহ্মচারী। অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ জন্ম নাম্বই তিনটা ঋণে আবদ্ধ হয়। ধর্মিগণের ঋণ ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বৈদ্যাক্ষনের দ্বারা, দেবগণের ঋণ যজ্ঞের দ্বারা, পিতৃগণের ঋণ পুত্রোৎপাদনের দ্বারা শোধ করিতে হয়। এইরূপে যাহার পুত্র আছে, যে যজ্ঞ করবে এবং যে ব্রহ্মচারী, সে ঋণমুক্ত হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নেই দেব-ঋণ মোচনের জন্য অত্যাবশ্যক।

অগ্নিহোত্র যজ্ঞ নিত্য কর্তব্য; না করিলেই নয়। অতএব ইহা সকলের পক্ষে স্পন্দ্য হওয়া উচিত। ইহাতে অধিক সময় লাগে না। অধিক সবজ্ঞান বা ব্যাবধান আবশ্যক হয় না। যৎকিঞ্চিৎ দুধ থাকিলেই আহুতির কাজ চলিয়া যায়। যদি কোনও কারণে দুধ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটু দধি বা দুটি চাউল বা অল্প কিছু আহুতি দিগেও তলে। যদি কোনও দ্রব্যই না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও অগ্নিহোত্র বর্জন চলিবে না। অহং শ্রদ্ধাং জুহোমি—আমি শ্রদ্ধাই আহুতি দিতেছি, এই মন্ত্রে দক্ষ বলিয়া শ্রদ্ধা হোম করিবে। এই শ্রদ্ধাহোমে ঋণাত্মক ভাবনা হোম বা মানসিক অগ্নিহোত্র। ঐতরের ব্রাহ্মণ এক স্থানে বলিতেছেন, শ্রদ্ধাই যজ্ঞমানের পত্নী স্বরূপ এবং সত্যই যজ্ঞমান স্বরূপ। শ্রদ্ধা এবং সত্য একযোগে নিগূন হয়। মানসিক অগ্নিহোত্রে শ্রদ্ধা এবং সত্য এই দুইয়ের সাহায্যে স্বর্গলোক জয় করা হয়। শ্রদ্ধাহোমে কোনও পার্থিব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। কোনরূপ দক্ষিণাও দিতে হয় না। ঐতরের ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, শ্রদ্ধাহোমে মনুষ্যগণ, দেবগণ, এমন কি সমুদ্রের লাগতিক দ্রব্যই, দক্ষিণাস্বরূপ। শ্রদ্ধাকালে শ্রদ্ধাহোমে যজ্ঞমান মনুষ্যগণকে দেবতার হস্তে দক্ষিণারূপে অর্পণ করেন। মনুষ্যের তখন নিষ্কির হইয়া দেবগণের অধীন হইয়া পড়ে। আর প্রত্যেকালে শ্রদ্ধাহোমে যজ্ঞমান দেবগণকেই দক্ষিণারূপে মনুষ্যের হস্তে অর্পণ করেন, তাই দেবতাবা দিনের বেলায় মনুষ্যের অধীন হইয়া মনুষ্যের হিতসাধন করেন।

ব্রহ্মবাদীদের এই উক্তি হইতে আপনাবা অগ্নিহোত্রে নাহাওয়া কতকটা বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিশীল্য অগ্নি অত্যন্ত গভীর সহিত বন্ধ করিতে হইত এবং সেই অগ্নি যাহাতে নষ্ট বা অশুচি না হইতে পারে, তৎসমস্ত বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

কোনরূপে অশুচি ঘটলে তদনুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। একবারে দুই হইয়া গেলে পুনরায় মৃতন কবিতা অগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতে হইত। অধ্যাপন সমু-
 চ্চানেন কথা আগে বলিয়াছি। অগ্নির পুনরাধান অল্পটুকুও তদনুকরণ। বানন-
 তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা এই অগ্নি-ভক্তির মূল অন্বেষণ করিতে দিরা হয় ত
 মিলিবেন যে, এই অল্পটুকু মানুষের আদিগত সমস্ত অবস্থার পরিচয় দেয় নাত।
 যে কারণে মহাজ্ঞে অগ্নি উৎপাদনের উপায় ছিল না, তখন গর্ভদা বাতীৰ মধ্যে
 আগুন রাখিবাব জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না করিতে চলিত না। এখনও আমাদের
 পল্লীগাঁও ঘেণানে দেবীশাহীএর বাসী এখনও প্রবেশ লাভ করে নাই, সেখানে
 আগুন রাখিবাব জন্য দালদা আগুনের প্রথা আছে। মানুষের অন্তর্ভুক্ত তত্ত্ব য
 এইরূপে অগ্নিরূপটি প্রত্যেক গৃহস্থের religious duty করা হইয়াছিল।
 মৃত্যু বা হঠাৎ আগুনের দরকার হইলে আগুন পাওয়া বাহিবে কিরূপে? অধ্যাপন
 এবং অগ্নিহোত্র অল্পটুকুই মূল এইরূপ হইতে পারে। তাহাতে লজিত বা
 ছাঁড়িত হইবাব কোনও প্রয়োজন নাই। মানুষ নিজে বানন হইতে উৎপন্ন
 হইয়াছে, ইহাতে যদি মানুষের লক্ষ্যের বিষয় না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত মানুষের
 ধর্মোপস্থানও যদি অসম্ভব মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে লক্ষ্যের কারণ
 দেখি না। বেদপন্থী সমাজের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, সে সময়ে বেদপন্থী
 মানুষ অদৃষ্ট ছিল না, ইহা নিশ্চয়। সে সময়ের অল্পটুকুও গৌড়ান
 তাৎপর্য্য বাহাই হইত, তৎকালে অল্পটুকু তাৎপর্য্য আবোপিত হইয়াছিল, এবং
 তৎকালে যে তাৎপর্য্য দেওয়া হইত, তাহাই সে দাগের সামগ্রিক এবং গার্হপত্য
 হৌবনের নিমিত্ত ছিল। অগ্নিহোত্র অল্পটুকুই সে কালের লোকের যে
 দেখিতেন, তাহার পরিচয় আগুনরা পাইলেন। আপনারা দেখিলেন, এই
 গৃহস্থিত অগ্নি যেন সান্ত গৃহস্থালীর একটা symbol। এই অগ্নিকে অবলম্বন
 করিয়া গৃহস্থালী হইত ছিল। তিন অগ্নির মধ্যে গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতি
 প্রতিনিধি বসত। এক পক্ষে গৃহস্থ এবং অল্প পক্ষে দেবগণ এবং দ্বিত্যপক্ষের
 মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করেন। গার্হপত্যের অগ্নি তুলিয়াই আহবনীশ এবং
 দক্ষিণারি জালা হয়। আহবনীশ অগ্নি দেবগণের মুখ এবং দক্ষিণারি পিতৃগণের
 মুখ। এই মুখ দ্বারা তাঁহারা গৃহস্থের নিকট আপনাদের প্রার্থা গ্রহণ করেন,
 এবং তদ্বিনিময়ে গৃহস্থের কল্যাণসাধনে তৎপর থাকেন। বেদপন্থী সমাজের
 প্রতিটি মতে সমাজ কতকগুলি গৃহের সমষ্টি মাত্র। গৃহটাই সমাজের unit।
 আর যিনি গৃহস্থ, তিনি সেই গৃহের সামগ্রিক রক্ষাকর্তা মাত্র। গৃহস্থের পার্থিব

জীবন দিন করেকের জন্ত। তিনি সেই কয়েকটা দিন আপনাব কর্তব্য পালন করিয়া চলিয়া যান, পুত্র পৌত্রাদির উপর গৃহরক্ষার ভার পড়ে। গৃহটাই হারী; গৃহস্থ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে গৃহহালীষ ধারা রক্ষা করেন। গৃহস্থে যে ধনসম্পত্তি, তাহা তিনি দেবগণের বা পিতৃগণের প্রসারে ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার নিম্নস্থ নহে। তিনি তাহাব বক্ষাকর্তা মাত্র। পিতৃপিতামহ হইতে তিনি তাহা পাইয়াছেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিকে তাহাব অধিকার ছাড়িয়া দিতে তিনি বাধ্য আছেন। সেই ধনসম্পত্তি নষ্ট করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কেন না, তিনি উহাব রক্ষাকর্তা মাত্র। সেই পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের জীবনে তিনি ভোগ করেন বলিয়াই তিনি অন্ততঃ পিতা পিতামহ প্রপিতামহ এই তিন পুরুষকে পিণ্ডদান করেন, এবং আপনাব জীবনান্তে পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র এই তিন পুরুষের মিফট গিণ্ডের দাবী করেন। এই দক্ষিণায়িত্রে পিণ্ডপিতৃঘট অন্তর্গত হয়। এইরূপে এই অগ্নির সাহায্যে গৃহেব অবিচ্ছিন্ন ধাবা বক্ষিত হইয়া থাকে। এই হিসাবে দেখিলে এই অগ্নিহোত্র অল্পুষ্ঠানকে গৃহস্থের পক্ষে কেবল ব্যক্তিগত বর্মানুষ্ঠান বলিয়া সঙ্গীর্ণ ভাবে লগনা বাইতে পারে না। এই অগ্নিহোত্র অল্পুষ্ঠান প্রকৃত পক্ষে সামাজিক অল্পুষ্ঠানে পবিণত হয়। অগ্নির দাবাই গৃহস্থের সহিত সমাজের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অগ্নি রক্ষা করেন বলিয়াই তিনি ধনসম্পত্তি ভোগে অধিকারী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারী বলিয়াই সমাজের অন্তর্গত গৃহস্থেব সহিত তাঁহার আদান প্রদানের সম্বন্ধ। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য পায়, এবং তাঁহাকে সাহায্য দেয়। এইরূপে রাষ্ট্রেব সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ঘটে। অগ্নিহোত্র অল্পুষ্ঠানেব এই symbolic তাৎপর্য থাকাতাই ইহা গৃহস্থ জীবনের প্রধান অল্পুষ্ঠান এবং সর্বপ্রধান নিত্যকর্ম বলিয়া গণ্য হইত, তাহাতে সংশয়ের হেতু দেখি না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সকল প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পারিব না। ধর্মশাস্ত্রে আমাব তত্তটুকু বিজ্ঞা নাই। স্বধর্মজনের সম্মুখে সেই কয়েকটি প্রশ্ন আমি উপস্থিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। আচার্য্য গৃহে বিধিগাম্য করিবার ঘবে না কিবিলে গৃহস্থের অধিকার জন্মিত না এবং পত্নী গ্রহণে অধিকার জন্মিত না, ইহা নিশ্চয়। পত্নী গ্রহণ না করিলে অগ্ন্যধানে অধিকার জন্মিত না, এবং অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতকর্মে অধিকার জন্মিত না। কিন্তু বিবাহ করিলেই অগ্ন্যধান করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম ছিল কি? পিতা বর্তমানে পুত্র ঘরে ফিবিয়া বিবাহ করিবেন। বিবাহের পর তিনি

আপনার ঋণ অধ্যয়নে বাধ্য ছিলেন কি না? যদি ঘর বাস, যে পুত্রও পিতৃগৃহে থাকিয়া নিজের ঋণ পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে একই গৃহস্থে একাধিক অগ্নিশালা প্রয়োজন হয়। একই গৃহে একাধিক অগ্নিশালা থাকিতে পারিত কি না? তাহা সম্ভব হইলে আমি উপরে যে থিয়োরি দিলাম, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যাত ঘটে। হইতে পারে, বিবাহিত পুত্রের পিতা বর্তমানে স্বতন্ত্র অধ্যয়নকে কোনও প্রয়োজন ছিল না। স্বতন্ত্র পিতা বর্তমানে তাঁহাকে কোনও প্রোত বন্দী করিতে হইত না। যদি না কোনও কর্তৃ করিতে হইত, তাহা পিতার অনুমতি লইয়া পিতার অগ্নিতেই সম্পাদন করিতে পারিতেন। পুত্র পিতার প্রতিনিধিরূপে পিতার অগ্নিতে অগ্নিহোত্র করিবেন, পিতা প্রবাসে থাকিলে অগ্নিহোত্র বিষয়ে তাঁহার প্রতিনিধি করিবেন, এরূপ বধন স্পষ্ট বিধান আছে। তখন মনে করা যাইতে পারে, পুত্র বিবাহিত হইলেও তাঁহার পক্ষে পৃথক্ অগ্নি স্থাপন না করিতেও চলিতে পারিত। তাহার পক্ষে পৃথক্ শ্রোতৃকর্তৃ না করিলেও চলিতে পারিত। আরও নিতাস্থ হই যদি তিনি পৃথক্ অগ্নি স্থাপন করিয়া তাহাতে পৃথক্ভাবে শ্রোতৃ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ গৃহে পৃথক্ গৃহস্থালী পাতিতেন। সেইখানে অগ্নিশালা নির্মাণ করিয়া আপনার ঋণ অগ্নি স্থাপনা করিতেন। পিতা বর্তমানে পিতৃগৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এতদ্বারা পৃথক্ গৃহস্থালী পাতা সে কালে প্রথা ছিল কি না, এবং ঐ প্রথা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল কি না, তাহা আমি জানি না। হিন্দু আইনে বাহা বা পাবনীয়, তাহার এ প্রবেশ উত্তর দিবে। বর্তমান কালে আমাদের সমাজে একান্তবস্তী প্রথা প্রচলিত আছে। যে কালের কথা আমি কহিতেছি, সে কালে এরূপ একান্তবস্তী গৃহস্থালী কিম্বা প্রচলিত ছিল, সে প্রশ্ন এই সঙ্গে উপস্থিত হয়। পিতা বর্তমানে পুত্রগণ তাঁহার অধীন হইয়া তাঁহার সমীপেই বাস করিবেন এবং তাঁহার অধীন থাকিবেন; পিতার দেহাত্মের পর তাঁহা ইচ্ছা করিলে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেক পুত্রকে গৃহস্থালী স্থাপন করিতে পারেন; একান্তবস্তী পরিবারের ইহাই নিয়ম। আপনার patriarchal family—পিতৃগৃহস্থালী—কথা জানেন। এই প্রথারতে গৃহপতি পিতাই পুত্রগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। পুত্রগণ তাঁহার ভৃত্যগণ; সর্বতোভাবে অধীন ভূত নাক। পিতা ইচ্ছা করিলে পুত্রদের বধ ও পর্যন্ত দিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন সমাজে পিতার এতটুকু ক্ষমতা বোধ করি ছিল না। পুত্র অস্মিতাময়

পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাহার একটা ভাবী স্বৰ্গ জন্মিত। খিত্ত সেই স্বৰ্গে
তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিতেন না। কেন না, পৈত্রিক সম্পত্তি তাহার
নিজস্ব নহে, ইহা সেই গৃহের সম্পত্তি; তিনি তাহার বক্ষাকর্তা—Trustee—
মাত্র। কাঁধেই পুত্রগণের উপর পিতার ক্ষমতা; সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। একপ
স্বপ্নে পিতা বর্তমানে পুত্র কতটা স্বাধীনতা পাইতেন, ইহা অনুসন্ধানের বিষয়।
পিতা বর্তমানে পুত্রকে ভাবে গৃহস্থালী পাতিয়া পুত্রকে ভাবে অধ্যাপন করিয়া
শ্রোতৃকর্তৃক অনুষ্ঠানে পুত্রের স্বাধীনতা কত দূর ছিল, তাহা অনুসন্ধানের
বিষয়। যদি বা পুত্র সেইকপ স্বাধীনতা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পৈত্রিক
দাবাবিকারে কোনরূপ সঙ্কোচ ঘটত কি না, তাহাও অনুসন্ধানের বিষয়।
অমিহোত্র প্রসঙ্গে এই সঙ্কল্প প্রমত্ত আগনা হইতে উপস্থিত হন। আমি এই
দক্ষণ প্রবেশে উত্তর দিতে পারিব না। দর্শনশাস্ত্রব্যবসারী ছই চারি জন পণ্ডিতকে
হিন্দুসিদ্ধান্তে কহিয়াও ভাল উত্তর পাই নাই। আপনাদের লিখিতে প্রস্তুত করিয়া
উপস্থিত করিবা উত্তরের প্রত্যাশার আমি ক্ষান্ত থাকিলাম।

অধ্যাপন এবং অমিহোত্রের বিবরণ দিয়া আজ আমি বিদায় লইলাম।
ইতি বাগ, পণ্ড বাগ এবং সোন বাগ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রোতৃ মন্তব্যের বিবরণ
ইহা পরে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করি। সর্ম্মশেষে যজ্ঞযজ্ঞানের ব্যাপক অর্থ
গ্রহণ করিয়া বদপতীর জীবনের জীবনে ইহার তৎপরতা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভিবেদী।

আলোচনা ।

সদাঙ্গ প্রসঙ্গ—বরপণ-সনজ্ঞা ।

যে কলসাইতে কলসাইতে তিচ্ছ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত (গত কার্ত্তিকের) উপাসনার
একটি দাবাব কথ্য। তাহাতে বরপণ-ব্যাপ্তি প্রতীকারের উপায় নির্দািত হইয়াছে—কন্তা
বিবাহের বধ-নীমা প্রাণে না করা। গত বর্ষের প্রবাসী'র সম্পাদক মহাশয় এই মূল্যবোধের
কাবহ্য কবিগণিতেন, এবং 'গৃহস্থ' পত্রিকায় যথানিয়মে ও যথাসময়ে তাহার কলাকগ
ম্যাদোচিত হইয়াছে। আশাচর্য্য সবগ তাহাই উদ্দেশ্য। আলোচ্য প্রাণে ত্রাক্ষ-বিবাহের
পরিচয় যে পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে, সেই পরিমাণে যজ্ঞের আভ্যন্তর গ্রহণ করা হয় নাই।
ত্রাক্ষ-সমাজের কাছে সমাজব্যাপ্তির আব কোনও প্রতীকারের আশা নাই, এইরূপ
ব্যাপ্তি যে সকল য-ত্রাক্ষের নলে গত-পত্র করে, তাহার আশে ত্রাক্ষ-পুত্রোহিতের

টিকি ধবির টানটানি না কবিতাও যে কোঁও সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হই-
 পায়েন, এবং তাহাই তাঁহাদের উচিত। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ এক মন সমাজকর্তা হিসেবে,
 কিন্তু আজ ভাল ব্রাহ্মণের প্রভু ব্রাহ্মণের অনেক তলাকসিত 'সিফিত' মস্ত্রায় মাদেন না।
 ইহার মস্ত্র সোঁধা কৈ? সে পদ ব্রাহ্মণ বিলেটী ভাগ করিয়াছেন—না বলিয়া, ইহাই বা
 সমস্ত যে তলাকসিত উন্নতিশীল ব্রাহ্মণের কবিতা? জাতি ব্রাহ্মণকে সে পদ ভাগ কাঁড়ে
 নাগ কবিগেছেন। ইহাতির দোহাই দিয়া কায়দেয়া উপাতি ধারণ কবিতা কবিতা ইহাতিছেন,
 'মস্ত্রায়না' 'জলচল' (সংস্কৃত) জাতি হইতেছেন, কৈবর্তের মাথিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণব হইতেছেন,
 হউন। কিন্তু ব্রাহ্মণ অপর হইবেন কোথায়? অপরথা স্থান নাই বসিয়াই, ব্রাহ্মণকে 'দয়া'
 না তারা, 'সাঁড়াই' কোথা? বলিয়া 'ব্রাহ্মণের চতুর্দিকে বেড়া দিতে বাস্তব হইতে হইল।
 এই কারণেই—অর্থাৎ 'অচলায়তনের' মধ্যে নিজেই সংঘট করিয়া ইহাতিছেন ব্রাহ্মণের
 ব্রহ্মপতিকব হইয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মণসমাজের দোষ কতটুকু? জাতি বা মস্ত্রায়বিশেষের
 মতেই অচলকুলে মস্ত্র দিলে, ব্রাহ্মণজাতি সেই বিশিষ্ট জাতির বা মস্ত্রায়বিশেষের
 'অর্থাৎ' কবিতা পাবেন, কিন্তু তাহাতে সমগ্র সমাজের উন্নতিসাধন নহে। সমাজকেই
 এক অর্থাৎ সহিত অপর অর্থাৎ যত দিন বিরোধ থাকিবে, তত দিন হিন্দুসমাজের মস্ত্রায়
 ব্রাহ্মণকে মাথা চাকিয়াই থাকিতে হইবে; না চাকিলে, হস্ত কৈ? 'ব্রাহ্মণ' সময়ে হস্ত পলায়
 কিয়া মস্ত্রকেই শিখা ধরিয়া, আকর্ষণ কবে। আবার পদ 'মস্ত্র', 'ওহে মস্ত্র, আমি দে
 অপরায় করি, তুমিও ত দেই অপরায় কর, তবে তুমি আমার অপরায়ের বিচার করিবে
 কিসে?' ইহার উত্তরে মস্ত্র অবশ্যই বসিতে পারে। 'বাপু হে, আমি তোমাকে তুমি
 অপরায় হইতে পারি, কিন্তু তুমি কি আমার পরামর্শ লইয়া, সেইরূপ কাজ করিবে'
 অপরায় হইয়া? ইহাতে, এক দিকে ব্রাহ্মণজাতির দুর্ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।
 অপর দিকে ব্রাহ্মণের জাতির প্রজাবৃত্তিও পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে
 মস্ত্রায় ব্রাহ্মণের মস্ত্র চাপাইয়া দেওয়া 'ব্রাহ্মণের' 'কর্ম' নহে। ব্রাহ্মণের অবনতিতেই
 ব্রাহ্মণের জাতির, অবনতি ব্রাহ্মণ থাকে, তবে ব্রাহ্মণ যাঁহাতে ব্রাহ্মণের মস্ত্র
 হইতে পারে, সর্বদা সেইরূপ ব্যবস্থা করি ব্রাহ্মণের জাতির কর্তব্য। ব্রাহ্মণের অনেক
 জাতি মন 'আজ ভাল স্ব-অর্থান হইয়া সামাজিক কর্মের অনুষ্ঠান করিবেছেন তবু ন
 কর্মের ফলশাপী তাঁহারা হইবেনই তা। ব্রাহ্মণ সময়ে অচল কথ। পণের কথাকবিতা
 ব্রাহ্মণের জাতির আত্মতা ও মহাত্মত্ব নাই; ব্রাহ্মণজাতিও এ সমস্ত সমাধানে
 কৃতসম্মত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণসমাজের বিধিব্যবস্থাকে উপহাস করা অতি সহজ, কিন্তু তাহা
 দ্বারা উচিত, ব্রাহ্মণসমাজই অস্ত্রম গুপ্তাব—পণপ্রথার উচ্ছেদ।

এবং-কার কস্তাব বিবাহের দম-নীমা বাড়াইবার গুরুপাতি; অর্থাৎ, আমরা বাহা অস্ত্র
 করি, তাহাই তিনি গুরুপাতি কবিতা বলেন। বহু, ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহার পৌরসভা
 শাস্ত্রের কর্তব্য প্রচার করা হয় কেন? 'ভর্তা ব্রহ্মত্ব যৌবনে'—ইহাতি হিন্দুপে পুরাণ,
 হিন্দুপে যৌবনে গুরুপাতি বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন? এবং-কার বলেন, যবতীকে বিবাহ
 না একি যৌবনে ভর্তা (ভাড়া) কি করিয়া রক্ষা করিবে? 'এই তাই অর্থকবিতা

এই মোশের এমন অর্থও পাওয়া যায় যে, মনু বিবাহিতা যুগলকে পিতার বা পিতৃপুত্র বন্ধনের
 গৃহে-বাঁইতে নিবেদন করিয়াছেন ; বাইলে, তাহার সঙ্গে তাহার স্বামীকে সপ্তম মৈত্রিকের
 বেশে-বাঁইতে হইবে। ইহাতে এমন অর্থও পাওয়া যায় যে, যুগল ভাষার মত তাঁহা করিয়া
 এক-মুহূর্তও তাহার স্বামী অস্তিত্ব থাকিতে পারে না ; যেহেতু, তখন যে তাহার ভাব্য-বন্ধন
 হেতু দৃষ্টিতে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু আমরা মনু-ব্যাক্যের এইরূপ হাত-গড়া অর্থের
 পক্ষপাতী নহি। আমরা সাধারণ জানে ঐ লোকের এইরূপ অর্থট বৃদ্ধি যে, মনু নারীকে
 বাল্যে পিতার, যৌবনে ভ্রাতার ও নারীকে পুত্রের শরণাপন্ন থাকিবারই ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু
 এ ব্যবস্থা নারীর স্বাতন্ত্র্যের যত্নের, নিবাহের বহু-সীমাবদ্ধিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।
 তাহার পর মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত 'উৎকৃষ্টাশ্রমির পাশ...পতিম্।' মোকটও, কস্তার
 নিবাহের বহু-সীমা বাড়াইবার চেষ্টা নহে। ইহাতে বুঝায় না যে, দুই-শ টাকার এ-এ
 পান-করা ছাত্র স্বধবা নারীর বরণ্যকে জানাই করিতে না পারিলে, কস্তাকে আনয়ন অবি-
 গ্রাহিতা রাখিতে হইবে। ইহাতে মনু অপারের কস্তা সম্পন্ন করিতে নিবেদন করিয়াছেন, উপযুক্ত
 পাত্র না পাইলেই কস্তাকে অকালে ভাসাইয়া না দিয়া আনয়ন অবিবাহিতা রাখিতে পারা যায়,
 এইরূপ ব্যবস্থাই দিয়াছেন। শ্রুতীয় ব্যবস্থার শাস্ত্রকারগণের মধ্যে যেখানে যতভেদ আছে, শাস্ত্র-গণ
 সেখানে মনুর মতই অনুসরণ করিতে বলেন। শ্রুতি অনুসরণ মনুর মতের আদানই স্বাধীন
 করিয়াছেন। স্বতন্ত্র কস্তার বিবাহ-বরণ নব্বড়ে মনুর ব্যবস্থাই হিন্দুসমাজের গ্রাহ্য। 'তাপি
 ...পতিম্।' অর্থাৎ, উপযুক্ত পাত্র না পাইয়াও অস্ত্রই যদি অবিবাহিতা অবস্থায় কস্তা-ভৃত্যতী
 হয়, তবে তিন বৎসরের মধ্যে কস্তার বিবাহ দিবে না। ইহাতে পাছই বুঝা যায়, মনুর
 মতে, যুগুমতী হইবার পূর্বেই কস্তাসম্পন্ন বিধে। তাহার পর প্রকৃত কস্তার বলিয়াছেন,—
 'কস্তার পিতামাতার ইচ্ছা হয় বিবাহ দিবেন, ইচ্ছা না হয় না দিবেন। পিতার যখন সমর্থ ও সম্মতি
 হইবে; মনোমত পাত্র চুটিবে, তখন কস্তার বিবাহ হইবে।' কিন্তু কোনও সংহিতাকার তা
 এমন ব্যবস্থা দেন নাই। পাত্র-সহায় মনোমত হইবে? পিতার? তাহা হইলে পিতা-পাত্রের
 ক্ষত্র গোত্রই নিশ্চিত হইবে, মাতার আর্গিও বিধি ও কস্তার অষ্টটি 'রূপ' দেখের কেন?
 একটা দিক দেখিলে হাকারে পাঁচটি প্রত্যও মনোমত তবে কি না সন্দেহ; অথচ নব্বড়ে
 পিতামাতার পিতা না বিবাহিত মনোমত-বন্ধন কোনও উপায় নাই। ইহাও তা 'ভাবনার কথা'।
 দ্বারা হউক, এইপাছই শাস্ত্রকারগণের সহিত প্রকৃততার বিরোধ। এই শাস্ত্রকারের মতেই এখন
 মতিয়া প্রথা কান কস্তার পিতামাতাকে প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বপ্ন করিয়াছেন,—'যে দিন
 না পুত্রের পিতা স্বয়ং-প্রার্থী হইয়া আমার কস্তাকে গৃহের বধূরূপে বরণ করিবে, না তাইয়া থাকিবে
 তত দিন আমি কস্তার বিবাহ দিব না। এড়া বিবাহিতা হউক আর নাই হউক।' এই আশ্রয়
 যদি হিন্দু কস্তার মাতাপিতার কণ্ঠগাচর হয়, তবে আমরা পুত্রের বিবাহে পণ লইব না, এবং
 কস্তা বিবাহে পণ দিব না।—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেই বা তাহাদের বাধা কি? এই
 প্রতিজ্ঞাই মুক্ত, এবং ইহার সহিত হিন্দু শাস্ত্রকার ও ধর্মমতের কোনও বিরোধ নাই।
 কস্তার মাতাপিতা ত পুত্রের মাতাপিতা। যে মাতাপিতা পুত্রের বিবাহে কস্তাভরণ
 মুখা ভাবেন না, তাহার কন্যার বিবাহে তাহার অবস্থা অপার-বরকর্তা গোবিন্দ কেন?

সমাজের এক শ্রেণির জৌন যাকি কেহনা কন্যাকর্তা, এবং স্বপন্ন দেবদত্ত জৌন যাকি কেহনা কন্যাকর্তা হইতেন, তেবে কতকটা পদ দিয়া কন্যার বিবাহ দিব না বলিত।—আমরা প্রভিন্সী কন্যা—
যকফাদিগণ আশার হাই বিতে পারিতেন; কিন্তু যিনি বাহিরে গাধা, তিনিই যাকি কেহনা
সমাজের বর্তমান অবস্থা ইহা। এই কারণেই গণ-সমস্যা উঠিল হইয়াছে।

পদ-সমস্যা: জটিল হইবার আরও কারণ—সমাজে যখনবনের অজ্ঞাতার। অধিকাংশ যাকি কেহনা
যকফাদিগণ কন্যাকর্তাকে বলেন, 'সে কি মহাশয়, সমাজেই দুই হামান। এত এত টাকার
অনুক হানের অমুক বাবু পাঁচ হাজার দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু যিনি ইহাতেই ইমানের বিবাহ
দিতে অন্বত।' এই ভাবেই কথা কিনি। কন্যাকর্তাকে নগদ দিয়া পিঠাতে হয়।
যিনি গহরদানের মুঠা দেখিয়া অমানবদনে দশ হাজার মুঠা বিক্রয়কে উপাধিকার
পারেন, তিনি তাহার কন্যার বিবাহে পণবসপ দুই পাঁচ হাজার টাকা অগ্রহণে দিতে গাধা।
কিন্তু তাহার নাম কতিয়া কন্যার অগ্রহণে প্রতিবেশীদের দিকে চাহেন না, ইহাই তাহাদের
নিঃস্বার্থ দানের শক্তি কোনও ধর্মের না থাকিতে পারে। তিনি তাহার কন্যা ও জামাতাকে
প্রচুর ধন দিতে পারেন; কিন্তু সমাজে পারের নারীর-দর বাড়াইবার তাহার কোনও অধিকার
নাই। বিবাহের পরেও তিনি কন্যা ও জামাতাকে অপার হাতি ও দোনার বাড়ি দিতে
পারেন।

আর একটা কথা—কন্যাকর্তার সাধারণতঃ উচ্চ বিকেই। দুটিপাক করেন। প্রাচীন
একটি হেলে এম-এ গাধা করিলে (সে হেলে অসুকারি হইলেও) তাহাকে অনেকই উপাধিকার
পাত্র বোধ করেন, এবং তাহাকে জামাই করিবার জন্য মনেকই দ্বাবে বাড়ান। তখন পাথের
সিঁতার পোয়াবারো। বিবাহের বেন অবস্থা, তিনি তেমনই ঘরে বৈবাহিক নগদ হাণন কতিয়া
কতিয়া হইলে, পণের কথা কিনি বোধ হয়, ভ্রাস হয়। প্রথম কার 'ভাবব' কতিয়া এ কথা
জানেন নাই। তাহার শেষ কথা এই,—পুত্র ও কন্যার সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা সমান না
নমান বলিয়া মানিরা না লভরা হইবে, ততকণ কন্যাকে অর্থ দিয়া গরের পাশেই নিঃস্বার্থ
করিবার জন্য বাস্তব হইবার দরকার নাই। পুত্র ও কন্যার সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা সমান
হইলে পণপ্রণয় বৈধবতায় হ্রাস হইতে পারে; কিন্তু সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা সমান করিলে
গেলে সামাজিক অধিকারটাও সমান করা আবশ্যক। ইহা কি 'ভাবিবার কথা মতো' সামাজিক
অধিকার সমান করিতে গেলে হিন্দু সমাজকে নুতন করিয়া গড়িতে, কইবে, এবং তাহাতে সমাজ
বৈবসমোর সৃষ্টি হইবে। তখন নারীসমাজে তেমনই পুত্রসমাজকে বলিবে, 'তোমরা যেমন
পরিচিত কাম করিয়াও গড়িত হও না, আমরাও তেমনই তোমাদেরই মত চলিবার দরকার
গড়িত। হইব না।' পুত্র ও কন্যার বলিতে কথা হইবে—তাঁহারা কাম, সামাজিক
মূল্য ও মর্যাদা উভয়েই তখন সমান। সামাজিক মূল্য ও মর্যাদা দুই দিকটারই কথা
বলিবার, দুই দিকের দিকে চাহিতে হইলে সংসম ও সমাজিক কথা বলিতে হয়। বর্তমান
কালে সংসমের নাম শুনিলে 'শিক্ষিত' নব্যবর্গ আংগিক উঠেন। তাঁহর সংশিখা এ বিষয়
আশান্ত: উহা থাকিলে বা নাগিলে সত্য নাই। স্বাধীন স্বরূপের নাম হইতে নারী ব্যক্তি
জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত সমস্ত বিবাহি আল কাল-টারি পাঁচ হটাৎ বিদ্যক গব্য রূপে

পূর্ব-শিকিইয়েছে, কিন্তু এখনে তাতা মরা ছুপাশে হুজুরের চক্কী এই দৃশ্যে ও মশিকার
অভ্যন্তরে বরণ-সমস্তা আনন্দের ঘাটে চাপিযে, মধ্যবিত্ত হিন্দুগৃহস্থকে পরিভ্রাষি ডাক
চাউতে হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । নব্বয়ের অভাব, সমস্বয়ের অভাব,
মানিক্যের অভাব আছে বলিয়াই কন্যাকে ঘোঁরনে পতিসম্বলভোগ করিতে না দিলে,
জাহাজে রাখা আছে । সমাজে বিধবা নারীদের জন্য (জোব কবিতাও) ব্রহ্মচর্যা পালনের যে
ব্যবস্থা আছে, কুমারী কন্যাদের জন্য সে ব্যবস্থা নাই । এবং-কার এইখানে অবিন্যাসিত
শ্রমকর্মের নম্রী বোগাইয়াছেন । কিন্তু সে নম্রী আমবা মুখে শুনিব, না—কানে দেব্রিব ।

শতকরা ৯৯ জন যুবী সজ্জন (হইয়া) (এবং) সংপথে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস কবে।—
হুজুরমাজ । অমুনানে ইছাও বল বাইতে পারে, শতকরা ৯৯ জন-যুবী সংপথে থাকে
নাই বান্ অমুনান মতা, তাহা নির্দ্বাণ করিতে হইলে ‘কমিশন’ বনাইতে হয় । তাহার
পূর্ব-প্রবন্ধ-কার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—‘প্রাচীন কালে বেশী বয়সে বিবাহ ব্যবস্থা ছিল,
তাহা হইলে (সেখানে) কি সব বয়স কুমারী গৃহভ্রমণ বিসর্জন দিতেন ?’ কোন কালের
কথা ? যে কালে ব্রহ্মচারী গৃহস্থকে হাশিকা লাভ করিয়া জতি, নহেই ত্যাগী ও
সাময়ী হইতেন, এখানে সেইরূপ শিকার বান্ধা আছে কি ? কোথায় নেকালের গৃহকর্ম-
পট্টয়া নারী, যার এ কাণের কষ্টবাবুধ নবদলপতা মেয়ে । সেকালের ব্যবস্থা হইতে
গেলে সেকালের অবস্থাও ভাবিতে হয় । প্রবন্ধ-কার ‘মাবাব জিজ্ঞাসা কবিয়াছেন,—‘কোন
(এবং) ‘অধিকাংশ সমাজ সমাজে ও সমাজ দেশে কুমারীরা বেশী বয়সে বিবাহ করেন । তাঁদের
মধ্যে তাহাদের সব কুমারী এই অপরাধে অপরাধী ?’ ‘অধিকাংশ সমাজ সমাজ ও সমাজ দেশের
সব কুমারীরা সমাজে আদর্শে আদর্শ পরিচয় নাই, তাঁহাদের চরিত্রগত বোধভূমির বিচার করাও
অসম্ভব মনে করি । নারীর বিবাহের বয়স-নীমা বাড়াইয়াই কোন্ কোন সমাজ এবং কোন
কোন সমাজ উন্নত হইয়াছে, জানি না । কিন্তু নারীর বিবাহের বয়স-নীমা কবিতাও সমাজ-
এবং-কবিতা থাকিতে পারে, তাহাও দৃষ্টান্ত—এই হিন্দুসমাজ । হিন্দু সমাজ ভুক্ত ব্রাহ্মণদি
ভুক্ত শ্রেণীর জাতিগুলির কদাই বলিতেছি । হিন্দু সমাজ-ভুক্ত বাগী, ডোয়, মেথর প্রভৃতি অনেক
অন্যত্র জাতি নারীর বিবাহের বয়স-নীমা গ্রহণ কবে না, এবং হিন্দু সমাজের কন্যা অনেক-
জাতিদের নারী-সমাজ বহন করে । বাহা হউক, পূর্ববর্তী কোনও কোনও উত্তর জাতি যেমন
এখনো মান না, পৃথিবীর অনেক অন্তর্গত জাতিও তেমনি এ ব্যবস্থা মানে না, এবং হিন্দু-
সমাজ প্রাথমিক অবস্থায় এ ব্যবস্থা মানিত না । ঘোঁষ ব্যবস্থার নহে, অবস্থার । অবস্থার
পরিবর্তনে ব্যবস্থারও পরিবর্তন আবশ্যক ; বিহব ব্যবস্থার ঘোঁষ না থাকিলে, অবস্থারই পরিবর্তন
অবশ্যক । আচরিত ব্যবস্থাই সামাজিক আদর্শের মাপকাঠি, অবস্থা নহে ।

আমি একটা কথা,—প্রবন্ধ-কারের কল্পবোধে কথাকর্তার ঘর প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন,
একটি পূর্ণার্থী হইয়া তাঁহাদের কন্যাগণকে বরণে পাঠিবার জন্য তিন দিন পর্যন্ত
(সেখানে) বরণপন্ন হইবেন, তিন দিন পর্যন্ত তাঁহারা কন্যার বিবাহ দিবেন না, তবে
বরণপন্ন হই বা আশ্রমস্থান-রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না । কেন, কন্যাকর্তারা
তাঁহাদের মতই তাঁহাদের দ্বায়ন্ত না হইলে, তাঁহারা পুত্রের বিবাহ দিবেন না । অজ্ঞানবুদ্ধির

জগৎ বিবাহের ব্যবস্থা না থাকিলে চলে, কিন্তু সমাজ-রক্ষার জন্য কন্যার বিবাহ বা কন্যাকর্তার বিবাহ না থাকা স্থির থাকিবে? বংশাণুপ, নিষেধ ও পিতৃপুত্রের পিতৃশ্রোণ, বা ছেলে বিগড়াইবার আশংকা যেমন স্বকর্তব্যের আছে, তেমনই মেয়ে বিগড়াইয়া কলে কালী পতিবার আশঙ্কা কন্যাকর্তারই আছে। আবার, এই উভয় রকমের আশঙ্কা একই ব্যক্তির আছে; যেহেতু, যিনি কন্যার পিতা, তিনিই পুত্রের পিতা।

পণ-সমন্যাস সমাধান করিতে শিয়া প্রবন্ধ-কাবের মত কোনও কোনও আশ্রয়শীল লেখক দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে আহ্বান করেন, কিন্তু ধারণা মাতাপিতার মতের প্রতিফলন কাম করিতে হিন্দু যুবকবৃন্দকে নিষেধ করি। ইহাতে মূল ফলিবার কোনও আশা নাই। কারণ, যৌবন সংস্কারের বাধা/ভাঙ্গিয়া উঠে ফল গতিতে স্বাভাবিকই বহিষ্ঠে চাহে, বর্জমান আদর্শের শিক্ষা সে গতিতে বাধা দেয় না। বর্জমান শিক্ষা-যন্ত্রের করণ করিয়া হাল ছাড়িয়া দেয়, সংযোজ্য বপন করে না, যুবকে গৃহী হইতে শিক্ষা দেয় না। এ কথা এ দেশের ভ্রূতভোগী চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই। সুতরাং বর্জমান আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মুক্তিলাভা স্বীকার করিতে, পণপ্রথার তাগে বাহাই থাকুক, 'অন্তনের খেলাটা' জমকিয়া উঠিবে।

যাহা হউক, প্রবন্ধ-কাবের মূল উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু বরণণ উঠিয়া যটিক, এমন প্রথাও কামনা করি না; কারণ, তাহা অসম্ভব। আমাদেয় প্রথাও, বরকর্তা/কন্যাকর্তার মঙ্গলিত বৃদ্ধি বরণণের দাবী করেন। কিন্তু, বরণণের দাবীও ভারটা বরকর্তার হাত দিয়া নিশ্চিত থাকিলে এই সমাজবিসংব দমিত হইবে না। দেশের সবচেয়ে চেষ্টা ব্যতীত পণপ্রথায় কঠোরতা-ভ্রাসের কোনও সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে দলই বা একযোগে বাজ কয়িবে না কেন? সকলেরই দশা যে এক। আজ যিনি বরকর্তা সাক্ষি পাতি পেটে ঢেঁকুর তুলিতেছেন, কাল কন্যাপণে তাঁহারই আগ ওঠাপত হইবে, ইহা ভাবিয়া দল সিলিমা ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের কন্যাবাহিনী সোনাচ চেষ্টা করিলে এই সমাজব্যবস্থার প্রতিকার কথিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক সাধারণ প্রজ্ঞার নিকট হইতে দেশে বাজনার উপ টাকায় ঢাতি যান শরীয় 'ধরতা' আদায়, কনিবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহার আর্থনিক চেষ্টা সমগ্র বরণণের কবাকি অবশ্যই হাস হইতে পারে। বাজনা দেশে ক্ষমতামালী হিন্দু কন্যাদাতার অভাব নাই, কিন্তু সমাজের উন্নতিকল্পে কেহই কিছুই করেন না। দেশের কতকগুলি নেতা বা বরকর্তা জুটাইছেন, শুনিতে পাই। সাংবাদিক সমাজ সমাধানের ক্ষম যদি তাঁহারা অগ্রসর না হন, তবে দেশের বর্তমান জামনে কতদিন তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন, তাহাও ভাবিবার কথা।

শেষ কথা এই,—দেশের সময়েত চেষ্টা ব্যতীত পণ-প্রথার কঠোরতা-ভ্রাসের সম্ভাবনা নাই। হিন্দুসমাজভূত-মাত্যক জাতি যদি কোনও দিন দেশে সিলিমা পাত্রে বরণমধ্যাদা একটা পরিমাণ ধাৰ্য্য করেন, তবে সেই দিন পণের কবাকিতে কন্যাকর্তাও আর বিরক্ত হইতে হইবে না। বরণমধ্যাদার পরিমাণ স্থির হইলে, এম-এ পান করা এবং ছাত্রপুস্তকাদি কন্যার উভয় পাত্রকেই এক দরে ছাড়িতে হইবে; নরিয়ে পুত্র যে দরে বিকাশ, ধনী পুত্রকেও সেই দরে বিকসিত হইবে। পাত্রে মধ্যাদার কথা না ভাবিয়া দেশের মধ্যাদার কথার ভাবিতে হইবে। পাত্র উত্তমিকিত বনিবাই যদি বরকর্তা বরণণের পরিমাণ সীমিত করেন

তবে কবিরাতে নৈমি পাণ্ডের উপাধি অর্ধ তাহার গিতা ও যন্ত্র সম্বন্ধেই গাইবেন না কেন, প্রত্যেক সনাতন দেশেই সে বৈশ্বক স্বাধীনতা করিবেন। এমীর কুল ও শীল দেখিয়া পণ্ডিতের ঘর হইতে কত! জ্ঞানের ক্ষমিতে নীচেই হইলে এ সমস্যার অতি শীঘ্র সমাধান হয়। গল্প-উপাখ্যান বা কবিতা-রচনার পণ্ডিতের কন্যা অসমর্থ হইতে পারে, উল্লা গাইবার ও হাঁটরা খাইবার অভ্যাস তাহার না থাকিতে পারে; কিন্তু অগৃহিণী হইবার বোগড়া তাহার আছে।

ঐকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ।

প্রবাসী।—মাথ। 'যত বার দীপ জ্বালাতে যায় নিজে মাথ দিয়ে বার' ভবিষ্যৎ বৈদ্য 'বারো হাত কীড়কের হেরো হাত বীচি' মনে পড়ে, চিত্রিতার আদর্শভাবিত। যে কবিতার যে ভরণে এটির নামকরণ হইয়াছে, তাহাতে দীপের একটা নগণ্য আছে। ঘনিষ্ঠে অবশ্য তাহার ভিত্তি নাই। ইহার উদ্দেশ্যও ঠিক বুঝা যায় না। চিত্রিতার বেশ sublimeকে ridiculous করিয়াছেন। মাসীর প্রবীণ, এমন কি, ইলেকট্রিক দীপ নির্ভরণে এমন ভাবটা নষ্ট হ'ল। জগতে যত দীপ নিভিলে যে ভাবের উদ্ভব নষ্ট, চিত্রিতার হস্ততন্ত্রী নিশ্চয়ই সে ভাবের অভিব্যক্তি নহে—সবীজনাথের 'পরিব্রাজক-প্রমত্ত' প্রত্যেক বান্দালীক—প্রত্যেক হারতবাসীর খবর পাঠ্য।—ইউরোপও এই অবস্থায় উপভুক্ত হইতে পারে। আশা করি, ইহা ভাবায়িত হইয়া প্রতীচীতে স্থায়ী দিবে—ভাবভরণে বর্তমান ভালে অস্তিত্ব এমন এক জন 'গেণ্ডক' মাথক ও মানবতার পুষ্কোতিত আছে,—বিনি এই পক্ষ-বর্ণের যুগে ঘোষণা কবিত্তে গারেন—'আমরা আঁদ এই মুক্ত্যনেষ্টবিত্ত গণিতের কাছ হইতে বাধীনতা ভিক্ষা কবিবার লজ্জা ছুটাইয়া দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এই মুমূর্ষু আমাগিকে কি দিতে পারে? পূর্বে এক রকমের রাষ্ট্রতন্ত্র ছিল তাহার বদলে আর-একরকমের রাষ্ট্রতন্ত্র? কিন্তু অসম্ভব কি কোনো নৃত্যকবি বা জিনি একের হাত হইতে অন্যের হাতে তুলিয়া দিতে পারে? মাসীর যে-কোনো সভ্যম্পদ লয় তাহা মনের ভিতরেই চায়, বাহিরে না। শিক্ষার দানে আমরা বাধীন হইব না—কিছুতেই না। বাধীনতা অন্তরের সামগ্রী। ইরোপ কেন আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না? যেহেতু তাহার নিজের মন মুক্তি পায় নাই। তার শোভের যত কোথার? যে-হাত চিহ্ন সে কোন সভ্যবশ্ত দিতে পারে মোটে তার সে-হাতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—সত্য করিয়া তার দিবার সাধাই নাই—সে যে রিপূর্ব্বমাস। যে মুক্তি সেই মুক্তি মান করে।' সবীজনাথ প্রতীচী নৃত্যতার আবরণ মুক্ত করিয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছেন—তাহাই তাহার সত্য রূপ। 'সবীজনাথ তাহার হের ও হের, দুই রূপই নিরনন্দ দুইতে দেখিয়াছেন; এবং 'চোখ ভাঙল দিবা' দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এই সভ্যতার সংঘর্ষে যে বিবর্ত রূপে উপস্থিত হইয়াছে, নানা কারণের সম্মুখে তাহা ঢাকা থাকে; কিন্তু দৃষ্টি করিলে সে কৃত্রিমতার স্থান ছিন্ন হইয়াছে। সবীজনাথ লিখিয়াছেন,—'আমাদের

নিজের ব্যথা হইতে মুক্তি পাই আত্ম এমন একটা গ্রন্থ সজ্জা করিয়াছেন। পূর্ণ কাল
 নিস্তার করিতেছে যা শোধন করিতে পারে শামন করিতে পারে, কিন্তু আর মধ্যে সেই
 অধ্যাত্মিক শক্তি নাই যে-শক্তিতে মানুষের মধ্যে মানুষকে, মিসারিরা দেখে, যে সত্য তাই প্রত্যক্ষ
 সহিত বাস্তব হইতে সামান্যের মাঝার উপর-উপগ্রহ বর্ষ কত অর্থ হইতেছে একটা
 কুজ্জতা উপভোগ্যে দানী করিতে থাকে; অর্থাৎ বাহ্য কালের সঙ্গে আর কোন না-না-না
 এতিমানের সঙ্গে হৃদয়ের মূল্য চাহিয়া বসে। ইতিপূর্বে এ দেশের কবি কোনও দাঁড়া
 কথটা এমন স্পষ্টভাবে এমন আন্তরিকতার সহিত বলিতে পারেন নাই। এই যে 'মাঝার
 উপর উপকার বর্ষ', কোনও জাতি ইহাতে হারা-শক্তিতে পারে না। তাদের বিশেষত্ব
 ছিল, কিন্তু যে দানে সময় নাই; তাহার প্রতিদানে জগতের মূল্য হিসাবে কাপট্য, তিন পাঁচ
 কিছু বিতে পারে না। বর্ষক এই মূল্যে বাহ্যিককে বাহ্য হইয়া দিতে হয়, যে প্রতিক্রিয়া-
 উৎস ও কাপট্যের কীভাস না হইয়া থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রথমতঃ এই
 প্রোভার কথটা বলিয়া দিয়া জাতির কুজ্জতার অধিকারী হইয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ, ইতিপূর্বে।
 —যখন জাতি, মাঝার সর্বভূতবৎ মধ্যে সর্বভূতব্যাক্ত উপলব্ধি করিলেন, তখনই ভৌ-
 তিক হইতে বিরোধের পোড়া ফটা পড়িল। যখন এবং 'তিনি [নাথ] বাহ্যিকের বাহ্য'
 ভারতের তপস্যালয় অধ্যাত্মিক সম্পদেই, অর্থাৎ গম্যমানের সমস্ত প্রাণের
 এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'মাঝার'
 'পশ্চিমের বিশালতার নিয়ম জাতির মধ্যকে অগ্রস্ত করি-করিয়া, অশ্রুত করিতে পারেন'
 এই শিক্ষা যে আদেশিকা দ্বারা, তার ভিত্তি অন্য জাতির প্রতি যাবতীয় প্রাণের
 উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য এই শিক্ষা লগ্নের পোষনেই পৌছিয়াছে, যে ইহা-নই
 মানুষ-অন্য-বোনের মানসকে ছলে বলে তেলিয়া পৃথিবীর সমস্ত স্বেচ্ছাকৃত বিচ্ছেদ
 করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে উদ্ভাস করিয়া তুলিতেছে। এই যে প্রত্যক্ষ
 ব্যর্থক স্বাক্ষর ও স্বার্থপরতার চর্চা, এই যে মানুষকে সত্য করিয়া দেখিবার ক্ষমতা ইহা
 করিয়া বিকৃত কবিবার চেষ্টা, ইহা আর বিলিতি নয় এবং আর আর পদার্থের সঙ্গে তার
 আসিয়া পৌছিয়াছে। কলে, একদিন যে আত্মিকতার সমস্ত-হৃদিশক্তি ইহা-নিজে
 করিয়াছে এবং সমস্ত অর্থবোধের বোঝা অন্য জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে ব্যর্থতার
 বাহ্য ইহাদের নিজের গৃহপ্রচারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। 'পৃথিবীর বর্তমান দৈব-
 অবস্থার কারণ—ইউরোপীয়েরা স্বজাতিকেই সব চেয়ে দৃঢ় বলিয়া মানিতে শিখিয়াছে
 'কিন্তু 'পরের সম্বন্ধে বিবেচনা' করিতে না শিখিলে 'কোণ জাতির চিরদিন সুখিয়া ঘাট না
 আত্ম তাই এমন দিন আসিয়াছে যখন পশ্চিমের মানুষ নিজের দ্বারা নশেই যে করিয়া
 বুঝিতেছে স্বাভাবিকতা বলিতে কি বুঝায়।' রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—'যুগের যখন কঠিন
 সঙ্কটে পড়ে তখন বিধাতার রাগে এত দুঃখ কেন পড়ে তা জানা যে ভাবির বুন পায় না।
 কিন্তু পৃথিবীর অন্য অংশের লোকেরাই বা কেন দুঃখ এবং অগম্য ভোগ করে সে কথা
 বিবাতাকে কিবা নিরন্তরে ভেমন জোবের সঙ্গে এক প্রাণ বিজ্ঞানী করে না। তা হইলে
 এই সর্বজন-সত্যের তার জাল করিয়াই 'না' দরকার ছিল—যে যদুপায় জিনিষ পোতা এবং

দেখা দেটা সত্য মামুষকে চুইয়াই বিবাক করিতেছে। সেটাকে এখন কেহ থাকেই বা
 প্রমাণিত প্রতিবে প্রতিষ্ঠা কর তবু শীঘ্রই হোক বিলম্বই হোক তার আঘাত একদিন
 মিষ্টকর বন্ধে আসিয়া পৌঁছে। এই মনুষ্যের উপলক্ষ কি পৰিমাণে সত্য হইয়াছে ইহা
 চুইয়াই সত্যতার বিচার হইবে—নহিলে, তার আমদানি-বিক্রান্তির প্রচুর্য, তার রণচক্রীর
 সৈন্য তার বাদীর ঘোষের বিস্তৃতি, তার রাষ্ট্রনীতির চাতুরী, এ লইয়া বিচার নয়। ইতিহাসের
 এই বিশ্লেষণে আমরা পূর্ক্স দেশের গোকেবা প্রধান মানী। আমাদেরকে অসম্বোধে সত্য বলিতে
 দেইবে, তার কল আমদানি গন্তে যত কঠিন এবং অন্যদের পক্ষে যত অপ্রিয় হউক। আমাদের
 যাকী প্রকৃতির বাকী নয়, তার শাস্তিতে সন্তুষ্ট নাই। আমরা সেই উচ্চ ব্যক্তিতে দাঁড়াই
 নাই যেখানে হইতে দেশ বিশেষ নতনিয়ে আদেশ গ্রহণ করে। আমরা ব্যক্তিগত নীতির
 সেই পদেই দাঁড়ইয়া উপরে দাঁড়াইয়া আছি যে-পথে যুগব্যবস্থার বাহ্য চক্রিৎসে, যে-পথে
 অনেক জাতি প্রত্যাহা উড়াইয়া দিবসপক্ষে ধূলী ছড়াইয়া বাহির হইয়াছে, সর্বা
 গোপন ভারী ভগ্ন নগ এবং জীবন কহাণ হারা শেষ কবিল; কত সাম্রাজ্যের অহঙ্কার এই পৃথিবী
 চক্রাকারে রণচক্রতলে চূর্ণ হইয়া গেল, অল্প তার মন তাবিশেষ ভাড়া ইকবাঙলা কুড়াইয়া
 ঐতিহাসিক উদ্ভাসপাটা করিয়া ছোড়া মিলা মরিতেছে। আমাদের বাকী দেশের বাকী
 নীতির কল যাব বস, একদিন তাহা অন্য এক কলগর্ভেই উঠে ইতিহাসবিধাতার সিংহাসন-
 তলে আসিয়া পৌঁছবে। তারপরে কবি স্মিয় এ সত্য এমন কবিরা আর কেহ উপলক্ষ
 করিতে পারিচ না, নবীজনাগ ভিন্ন আর কেহ বর্ণ-চিত্রে এমন ছবি আঁকিয়া স্মরণ্যর মনে
 এড়াইয়া এমন স্মৃতি কবিতা বিস্তে পারিচ না, নিশ্চয়ই বাঙ্গালী—এ গর্ব করিতে পারে।
 রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ করিয়াছেন,—‘ক্রমাগতই বাসনা-হতাশির হব্য সংগ্রহ করিতে থাকিলে
 এক দিন সম্প্রদায়ী আত্মিকতা না ঘট, থাকতে পারে না। এক দিন আগ্নেয় উত্তীর্ণ যুরোপকে
 তার লুপ্ততা এবং উন্নত বহুবারের নীমা বীষণ দিতে হইবে, তার পরে সে আবিষ্কার করিতে
 পারিলে যে উপকরণই যে সত্য তাহা না অনুভব সত্য।’ রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকতার উপর
 মার্শ্বভৌমিকতার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যেন হেলে ধরিবার আগে কেউটে
 ঘবিতো না হাই!—রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচ্যেই বলিয়াছেন,—‘বড় ক্ষেত্রেই মধ্যে চাঁদা গোপন
 কবিরা প্রাগে চোটে ক্ষেত্রেই মধ্যে বীজ বপন করিতে হয়।’ যে জাতিবিশ্ব ইতিহাসের
 কারকের বাকী মানবের সত্য তাহার ‘কর্তব্যের দায়িত্ব’ বিশেষভাবে তার স্বাভাবিকতার সীমায়
 মধ্যেই সীমিত থাকিবে। আগে জাতিসভা তার পর ‘মানবতা’—ইংগণের কবি, ইউরোপের
 কবি, শক্তিশক্তি কিপলিং অবস্থার পরিতৃপ্ততার দাঁড়াইয়া প্রাচ্য ও প্রতীতির সত্যকে খেঁজা
 জাতিবিশ্ব বোঝা সম্বন্ধে তাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না। কিন্তু
 আমাদের কবি প্রমাণবলে প্রাচ্য ও প্রতীতির বৈদগ্ধ্য উপলক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচ্যকে
 উপলক্ষ দিয়াছেন,—‘সর্বদা অসত্যের যুরোপের মহত্ব স্বীকার করিলে চলিবে না।
 দেশান্তর প্রকৃতিতে কঠোরতা এবং যুদ্ধতার এমন একটি মানবীয় আছে যে, তাহা
 এক দিকে মানবের সমগ্র শক্তিতে যথেষ্ট বাহ্য কবিতা আনে, আরেক দিকে তাহার চিত্তকে
 আত্মবৃত্ত করিয়া নিজেই অস্বপ্নাবে ঘাঁটিত করে না। একদিকে তাহা যুরোপের সন্তানদের

চিত্রে এদন জেগের উদ্বেগ করিয়াছে যে তাহার উদ্যম ও সাহস কোথাও আপন লক্ষ্যে
কোনো সীমা স্বীকার করিতে চায় না, অপর দিকে তাহারে বৃদ্ধি অপ্রমাণ, তাহার
কনোত্তরিত্তে সুখ্যম, তাহারে সকল রচনা পরিমিত এবং তাহার জীবনের লক্ষ্য
মধ্যে বাস্তবতা-বোধের স্ফূর্তি করিয়াছে। তাহার একে-এক বিষয় গুরুত্ব সহ সহ্য
করিতেছে, তাহাকে মাপিয়া ওজন করিয়া দাপ্তর করিতেছে, তাহার প্রতিটি মত
অন্ততঃ যে-একটি ঐক্যত্ব আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ধানযোগে বা তর্কের বলে নয়,
তাহা বাহিরের পদাতির দ্বারা, বৈচিত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া। তাহার নিজের
রাজ্যের উল্লেখিত কবিরা প্রতিটির মহাপ্রতিভাধারের মধ্যে আনিয়া উত্তীর্ণ হইতে
লক্ষ্য হইতে সেই তাহার লক্ষ্যে বসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশে যেমন মূল্যবান, তাহার
উদ্যম ও প্রাণাতিভাও সেইরূপ।—বৈশাখের সন্ধ্যায় চন্দ্রের কবি চিত্র অধিকার
পায়ে না; ইহাতেও আমরা পৌর-পুরুষের কবিতে পাই।—বটিক্রান্তের এই প্রাণের
সর্বাপেক্ষা-বড় কথা এই যে, বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন দুঃখ যদি
মনে আঁকিয়া থাকিত তবে বড় হৃদয়ের মধ্যেই সে কল্যাণিত। প্রাণের জন্ত প্রস্তুত হইতে
পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাতীর আগ্রহের বন্ধন। যে হাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে
পারে। আপনায় দেশকে সামান্য অতি সামান্যই দিতেছি, সেই জন্য আপনায় দেশকে পাই
নাই। বাহিরের এক জন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব, অথবা
যে বলে সে লোক রান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না। আপন জোহানে তুমি দি,
অপমান কবি, অহঙ্কার করি, বন্ধনা কবি, বিশ্বাস করি না, সেই জন্য আপন পন হইয়াছে,
বাহিরের কোনো আকর্ষণ কারণ হইতে নয়।—শ্রীমতী শান্তা দেবীর 'পৌষপার্বণ' নামক
গদ্যটি উপভোগ্য। প্রাণের ছবি, প্রাণীদের ছবি, এবং প্রাণের জীবনের যে সুলভতা ও স্নানতা
এখনও দেখা যায়, তাহার ছবি বেশ কুটিয়াছে। প্রাণের প্রাণের বর্ণনা একটি বাস্তবতা, বর্ণনা
বিষয়গত একটি অনাবশ্যক প্রচণ্ড ও বলবান আগ্রহের একটি প্রতিশ্রুতি আছে।
তৎসঙ্গেও গল্পটি 'নাট্যিক' না হইয়া অত্যন্তের অনুরাগ হইয়াছে। গোপালকর চিত্রটি যেন
ফটোগ্রাফের প্রেতে ধরা পড়িয়াছে। বেশিকি অতি হৃদয়ঙ্গমে তাহার প্রতি যেহ ও সন্দেহের
বহিষ্কার করিয়াছেন; গোপালকর অনাবিল প্রেমে পাঠককে বন্দী করিয়া, তাহার সুলভতা
ও বউদিদির প্রতি প্রেমচিন্তাধারের অন্তর্ভুক্ত শোচনীয় পরিণামের গল্পটি যখন শেষ হইয়া
যায়, তখন মন বিচলিত হয়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ভিন্ন তখন আর কোনো প্রকার
থাকে না। গল্পটির উপসংহার অত্যন্ত সুন্দর।—বেশিকা অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে আভ্যন্তরীণ
গল্পের ক্ষেত্রে আনিয়াছেন। গল্পের অনুরোধে নয়—সে আপনাই অত্যন্ত সুস্থিত
গল্পকে অস্বীকার হইয়াছে। সে যে এই দুটি সুকুমার সময়ের মধ্যে মিলনের কোন
করিবার জন্ত রত্নমণ্ডল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি পরিচয়কালে তাহা আনন্দ
হয় না। এই জন্য উপসংহারটি খতবিস্তৃত ও অপ্রত্যাশিত হইয়াছে, কিন্তু অস্বাভাবিক হয়
নাই। যে সকল ছোট গল্পের শেষ পর্যন্ত না পড়িলেও অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থাপন উপ
হওয়া যায়, 'পৌষপার্বণ' সে শ্রেণীর অন্তর্গত নয়।—শ্রীমতী শান্তা দেবীর

এবং প্রাচীন-তৃতীয় চাপকা, গুরুস্বামী ও ভোগ, এবং অ্যান্টিটেল, সেটো প্রভৃতি গ্রীক মনীষীদের পুরাচনার আদর্শেই সংক্ষিপ্ত পৌরচয় নিয়াছেন।—প্রবচনটি উল্লেখযোগ্য—তথ্যপূর্ণ। শ্রীমদ্বৈক্য হামদারের ‘অভিযানের গান’ কেন ছাপা হইল, বলিতে পারি না। ভাবও নতুন নয়, বচনাতেও কোনও বিশেষত্ব নাই। স্বাভাবিক কি কৃষ্ণপেই তরী ভাসাইয়াছিলেন, পাল ডুলিয়াছিলেন, পেয়া ভাসাইয়া এ পারে হইতে, ও পারে পাড়ী দিয়াছিলেন। হায়! তিনি কি এখন জানিতেন—কত নিরীহ ‘কবির’ তরী ডুবির পথ প্রশস্ত করিগেন। শ্রীমদ্বৈক্য চলে ‘লহু কড়া’ নামক পদ্যে যারা লিখিয়াছেন, তাহা যদ্যে লিখিলে সম্ভবতঃ ‘প্রবাসী’তে ছাপা হইত না; ছাপা হইলেও সত্যতঃ চার পাঁচ লাইনে শেষ হইত। কাজ ভাল বাসাল! সেখ ‘মিষ্টিক’ কবির হুড়াহুড়ি দেখিয়া ঢুকিও পায়, ছুখেও হয় এবং ভয় যে না হয় এমন কথাও বাস্তবে পারি না।—শ্রীমদ্বৈক্য চলে চন্দ্রবর্তী ‘কাজা রামবোহন রায়’ প্রবন্ধের প্রথমটি ইংলিশ ভাষায় হইলেও সেখটা বুঝা যায়। লেখক খুটিয়া লিখিয়াছেন; অল্পের মধ্যে অনেক তথ্য সংগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক’ নামক ক্ষুদ্র পদ্যটিও পুরাতনের প্রতিধ্বনি। ‘কৃত্তিকার’ গতি শক্তিশালী পক্ষেই সম্ভবে। epigrammatic কবিতা সুরচিত, সংহত, কিন্তু প্রাণী ন্যূনতম বাণীর নত না হইলে একবারে বার্থ হয়। শ্রীমদ্বৈক্য চলে—পাধ্যায়ের অনূদিত আঙুরের ‘সত্যমি’ নামক কবিতাটি দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী হইয়াছে।

‘পরসেবানুত পড়নি সেগান, নাবিক একটি দাঁস—

যাহ রে ভাই চলেছে নেপা, সে দেশে আমারও আশ।’

বাংলাকে শুধাইবার সময় হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ‘চন্দ্রাবলম্বনের দূর্ভেদ্য দ্বিগুনসতের’ কথা দ্বিগুণ সাংখ্য-বোধ্য প্রবেশ আমাদেব নত অধিকারীর পক্ষেও ‘দূর্ভেদ্য’ বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর আকর্ষণে সে দ্বিগুনসতের প্রবেশ না করিয়া থাক। যায় না।—বর্ণনের শুধ সাধারণ পাঠকের বাধাগ্রস্ত না হউক, রচনার বিচিত্র ভঙ্গী সকলেরই উপভোগ্য। সে ভঙ্গী দ্বিজেন্দ্রবাবুর নিজস্ব—অতুলনীয়। উপমাগুলি স্বতন্ত্রভাবেও উপভোগ্য করিবার উপযুক্ত। ‘অন্যোক্তনাথ চলে’ একটি উপমা—

‘বায়স দৌকর মারে নৈবেদ্যের পরে

সজন হস্তি হইয় পাণ্ডিত্যের করে।’

অগত্যা যদি ইহার উপর বলকের ‘প্রত্যয় মারি’, তাহা হইলে ‘বায়স’ হইতে পারি। কিন্তু এ বয়সে আর উড়িবার সাধ্য নাই, নাইও নাট। অগত্যা কবিতার বনি—

বায়স দৌকর মারে ‘প্রবাসী’র গান

হাড়গিলে বলে—আনি আছি ‘সামান্য’।’

কমল কবিতা হইল?—অল্পপটল বন্দোপাধ্যায়ের অনূদিত ‘মা’ গল্পটি চলনসই। শ্রীশ্রীপতি-এসন ‘যায সাগী’ হইতে ‘ওপেন আদর্শ’ আদর্শী করিয়াছেন।—ওপেন আদর্শ করিতে থাকার বাধ্য, কিন্তু এ অনুবাদে ওপেন আদর্শ করিতে পারিলাম না। কারণ ‘মা’ না থাকিলে মাগাবাধী হইতে পারে না।—‘পঞ্চশত’ অনেক প্রত্যয় বিষয়ের সমাধে

আছে। 'ভারতের বৃহত্তম কবিতা' ছবিগার। 'লেশের কথা' নবল বাঙ্গালীকে সজ্জিত
বলি। 'বিবিধ প্রবন্ধ' হইতে আমরা 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' উদ্ধৃত করিলাম।

একটি আতপুটীবাগী মূদ্রিত কাগজ আমাদের হাতে আসিয়াছে। পত্রবর্ষে বাঁকীপুরে
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন বেত্রিহাদী কবিতার অর্থ
প্রস্তাব যথেষ্ট নোটিশ বাড়িয়েকও গৃহীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কি কথা হইয়াছে, এ কাগজে
হা হা লিখিত আছে। কাগজটির প্রথম ভাগে একটি চিঠির আকারে লিখিত। দ্বিতীয় ভাগে
কতকগুলি নিয়ম আছে। চিঠিটির ঠিকানা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির। এখান হইতে এই
চিঠি কেন লিখিত হইল জানি না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কি ইহা লিখিতে সম্মতি
দিয়াছেন, বা ইহার অনুমোদন করিয়াছেন? লোকের হঠাৎ তাহাই মনে হইবে। ইহাতে
কোন কৌশল আছে কি? মূদ্রিত কাগজটিতে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত
কবিতার লম্বা গঠিত শাখা-সমিতি দ্বারা প্রদত্ত মূল নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মে মন্দিরের
উদ্দেশ্য লেখা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিষদের উদ্দেশ্যের মিল আছে গোঁব হয়। পাইয়া
সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক না থাকায় উহান উদ্দেশ্য কিবৎ বর্ণিত আছে জানি না। পরিষদ
পরিষদের কাজ দেখিয়া, বোধ হয়, মন্দিরের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর উদ্দেশ্যের সহিত উহা
উদ্দেশ্য অনেক দূরে :—

"স্বদেশের মধ্যে ভাবনিমিত্ত, বিবিধ শব্দের আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গালী দেশ ও বাঙ্গালী
জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং অনুগণের মধ্যে সাহিত্যাদ্বেষ
জ্ঞানের বিস্তার।"

সুতরাং পরিষদের কাজে এই প্রস্তাবিত সম্মিলনের অতিবিলম্বিত হইবার সম্ভাবনা। একটি
উদ্দেশ্যে কোন দেশে একাধিক সমিতি বা সভা থাকিলে বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে, এমন
কথা আমরা বলি না। কিন্তু যখন একটি পুরাতন সভাই জনসাধারণের নিকট হইতে
যথেষ্ট সাহায্য পায় না, তখন কতকটা সেই উদ্দেশ্যে আর একটি সভা করিলে, পুরাতন সভার
আরো কম সাহায্য পাইবার কথা; সুতরাং উভয়ের কিছু সংঘর্ষও অবশ্যস্বাভাবিক। এইরূপে বামক
পুরাতনকেই পুণ্য কবিতার পক্ষপাতী।

যখন বাঁকীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে, বেত্রিহাদী
কবিতার নিমিত্ত হঠাৎ একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় ও উহা গৃহীত হয়, তখন আমরা, নতুন
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলাম ;

"এতদিন সাহিত্যপরিষদের কার্যনির্বাহক সভা, মন্দিরের সাধারণ সমিতি হইতে নির্বাচিত
দশজন সভ্যের সহযোগিতায়, মন্দিরের কার্য সম্পাদন করিতেছিলেন। এই পারিভাসিক
সমিতিতে কি অভ্যাস? উড়াইয়া বেওয়া হইল? পরিষদ, কয়েকদল হইল, বাংলা দেশের
তাহার ঘরিরের সমুদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্যিক সভাসমিতির সহযোগিতালাভের চেষ্টার হৃদয়ত কলি
ছেন। মন্দিরেরও উদ্দেশ্য যখন সমুদ্র বাংলাসাহিত্য-বিষয়ী চেষ্টাকে একদল ও পরস্পর
সহযোগিতাহুই আবদ্ধ করা, তখন সাহিত্যপরিষদের এই চেষ্টাকেই সাহায্যদান প্রদানের
করিলে কি কতি হইত?.....অনিদান, বাঁকীপুরে কতি নিমিত্ত হইবার পক্ষে অনেক এক

ইষ্টি যাগ ও পূর্ণ যাগ।

এই গ্রন্থের শ্রোত রঞ্জন নাম ঈষ্টি যাগ। অহিভাগি গৃহস্থকে প্রত্যেক
সমাবস্থায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ঈষ্টি যাগ করিতে হইত। সমাবস্থায় ঈষ্টি
যোগেব নাম দশ যাগ, আর পূর্ণিমায় ঈষ্টি যোগেব নাম পূর্ণমাস যাগ। ইহু
যজ্ঞেই বিধিবিধান প্রায় একরূপ। অগ্নি কেবল পূর্ণমাস যোগেব বিবহন
দিব। পূর্ণমাস যোগেব অমুষ্ঠানটি জায়ত হইলে যাবতীয় ঈষ্টি যোগের অনুষ্ঠান
করিতে পারা যায়। যজ্ঞিকের ভাব্য পূর্ণমাস যাগ যাবতীয় ঈষ্টি যোগের
প্রকৃতি বা model আর আব ঈষ্টি যাগ তাহার বিবৃতি। পূর্ণমাস
যোগেব বিধি সকল ঈষ্টি যোগেই প্রযোজ্য; কেবল ক্ষেত্রভেদে বিশেষ বিধি
কিছু আছে।

পূর্ণমাস-যাগ প্রত্যেক পূর্ণিমায় সম্পাদ্য। এই যজ্ঞে প্রধান আহুতি দুইটি
প্রথম আহুতি অগ্নিদেবতার উদ্দিষ্ট; দ্বিতীয় আহুতি অগ্নি এবং সোম এই উভয়
দেবতার প্রতি একযোগে উদ্দিষ্ট। যে জন্য আহুতি দেওয়া যায়, তাহার নাম
পুরোডাশ। এই পুরোডাশ যবের অথবা চাউলের কটি মাত্র। বর অথবা
চাউল বাটিয়া আওনে সেকিয়া এই কটি প্রস্তুত হয়। অথবা নানক ধান
থাকিলে এই পুরোডাশ প্রস্তুত করেন। কয়েক মুঠা যব অথবা ত্রীহি চান্দ পইরা
তাহা উথলে রাখিয়া কাড়িতে হয়; তার পব কুলা দ্বারা কাড়িয়া ছুঁড় ও
ফুদ ওড়া পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়; তাহার পব শিলে বাটরা পিটুলা তৈয়ার
হয়। এই পিটুলি আওনে সেকিয়া কটি বা পুরোডাশ তৈয়ার হইবে। সেকিয়ার
অন্ত কয়েক পানি ছোট ছোট মাটির খোলা বা কপাল থাকে। খোলা হালি
চতুর্দশ; কতকগুলি খোলা ভাঙ্গিয়া ও স্বাধিক অর্ধবৃত্তাকার করিয়া সজ্জা
যায়। চতুর্দশ খোলা মাঝে রাখিয়া তাহার চাষিপাশে কোণহীন খোলাও লি
সাজাইয়া বসাইতে হয়; মাঝে যেন ফাঁক না থাকে। অগ্নি উদ্দিষ্ট প্রথম
পুরোডাশের স্তম্ভ আটখানি খোলা এইরূপে সাজাইতে হয়; ইহার নাম
অষ্টকপাল পুরোডাশ। অগ্নি ও সোমের উদ্দিষ্ট দ্বিতীয় পুরোডাশের স্তম্ভ
ত্রয় পানি খোলা সাজাইতে হয়; ইহার নাম একাদশকপাল পুরোডাশ।

গাওঁপত্বের আঙুন খালাঙলি তন্তু করিয়া তাহার উপরে সেই ঘবের বা চাউসের পিটলি ঢাখিয়া দিয়া গাওঁপত্বের অঙ্গারেরই সন্ধিতে হয়। এইরূপে পুরোডাশ তৈরী হইলে তাহাতে ঘি মাখাইবা বেদির উপরে যথাবানো রাখিয়া দিতে হয়। যথাকালে এই পুরোডাশ আহুতি দিতে হইবে। সমুদায় কৰ্ম্ম অধবর্য্য সহজে সম্পাদন করেন। প্রত্যেক কৰ্ম্মের জন্ত নির্দিষ্ট যজুর্মন্ত্র থাকে।

প্রধান যাগের কথা বলিকাম। প্রধান যাগের পূর্বে এবং পরে কৰ্ম্মাদ্বয়রূপে আবেঁ কতকগুলি অপ্রধান যাগ করিতে হয়। কতকগুলি হোমও করিতে হয়। যাগের সহিত হোমনেব পার্গা জাছে। যাগকালে আহুতি দেন অধবর্য্য; কিন্তু মন্ত্র পাঠ কবেন আর এক জন ঋষিক; তাহার নাম হোতা। হোতা দেবতা আহ্বান করিয়া মন্ত্র পাঠ কবেন। মন্ত্রের পর বৌবট দক্ষ-দ্রিচ্চাবণ কবেন, ইহাব নাম বধটকাব। এই বধটকাবের সঙ্গে সঙ্গে অধবর্য্য আহুতির দ্রব্য অর্ঘিতে অর্পণ করেন। তাহাকে কোনও মন্ত্র পড়িতে হয় না। ইহারই নাম দগ। দাব হোম অনেকটা সংক্ষিপ্ত ব্যাপার। ইহাতে হোতায় বরকার হয় না। অধবর্য্য ঋষির পাশে বসিয়া নিজেই যজুর্মন্ত্র পাঠ কবেন; মন্ত্রের পর বাহ উচ্চারণ কবেন। ইহাব নাম স্বাহাকার। স্বাহাকারের সঙ্গে সঙ্গে অর্ঘিতে আহুতি দেন। ইহাই হইল হোম। পূর্ণমাস বজ্জে প্রধান যাগের পূর্বে বা পরে সে দক্ষ অপ্রধান যাগ বা হোম করিতে হইত; ইহাও মন্ত্রে তাহার উল্লেখ করিব।

পূর্ণমাস যাগে চাখি জন ঋষিকের প্রয়োজন হয়। প্রথম অধবর্য্য; পুরোডাশ গ্রহণ করা হইতে আহুতি দান পর্যন্ত সমুদায় কাবই অধবর্য্যর। মুখ্যতঃ যজুর্মন্ত্র নাহামো ইহাকে কাণ্ড করিতে হইত; এইজন্য ইনি যজুর্বেদে অভিজ্ঞ। এই হিসাবে অধবর্য্য ঋষিকগণের মধ্যে প্রধান। তিনি অধবের অর্থাৎ যজ্ঞের যেন দেহ নির্মাণ কবেন। দ্বিতীয় ঋষিকের নাম হোতা। ইনি মন্ত্র পড়িয়া আহুতির পূর্বে দেবতাকে আহ্বান করেন। হোতা শব্দ হেব ধাতু হইতে উৎপন্ন। দেবতাকে আহ্বান করেন বলিয়া ইহাও নাম হোতা। হোতার পাঠ্য অধিকাংশে মন্ত্রই ঋক মন্ত্র। এইজন্য হোতার ঋগ্বেদে বিশেষজ্ঞ হওয়া বরকার। ত্রিষ্ট যাগে দাম গানের প্রয়োজন হয় না। সেজন্য উগাতার বা অস্ত-সামগারী ঋষিকের দরকার হয় না। তৃতীয় ঋষিকের নাম ব্রহ্মা। ইনি অধবর্য্য এবং হোতা উভয়েরই উপরে। উভয়ের কৰ্ম্ম পরিদর্শন কবেন;

কাঠ পুণ্ডর নাম সনিং; তিন খানি সনিধে আহবনীয় অগ্নিকে বেবিয়া বেড়া
 দিতে হয়। এই তিন খানির নাম পরিধি। আর কয়খানি সনিং যোগের
 পূর্বে আগুন জ্বালাইনব জন্ত পৃথক থাকে। আগুন জ্বালানব নাম
 সনিখন। অধবু্য এক একখানি সনিং আহবনীয় অগ্নিতে ফেলিয়া দেন,
 তার হোতা এক একটি ধুক মন্ত পাঠ করেন। অগ্নি সনিকনেব জন্ত প্রযুক্ত
 হয় বালিয়া এই মন্তের নাম সানিধেনী ধুক। (২) কয়েক আঁট মন্তের
 বা কুশেব প্রয়োজন। বেদিব উপরে এই কুশগুলি বিছাইয়া তাহার
 উপর যোগের সবজামগুলি সাফাইয়া রাখিতে হয়। কুশের একটা আঁট
 পৃথক রাখা থাকে, তাহার নাম প্রস্তর। যে হাতার অহতির দ্রব্য
 সেইয়া আহতি দেওয়া হয়, তাহার নাম জুহু। জুহুখানি ঐ প্রস্তরের উপরে
 রাখিতে হয়। ঐ প্রস্তর নিত্য সায্য বস্তু নহে। উহার বিশেষ তাৎপর্য
 আছে, সে কথা পবে বলিব। (৩) পূর্ণদাস যজ্ঞ প্রধান যোগে পুরোডাশ
 আহতি হয়। তাহার পূর্বে এবং পরে অপ্রধান যোগগুলিতে আত্মাহতি হয়।
 যজ্ঞ ব্যবহার্য সংস্কৃত ঘৃতের নাম আত্ম। একটা মাটির মাগনার এই আত্ম
 থাকে, তাহার নাম আত্মাহারী। আত্মাহারী হইতে আত্মাগ্রহণের জন্ত চালি
 খানি কাঠের হাতাব দবকার। একখানি নাম ক্রবা। বেদিব উপর হিবভাবে
 থাকে বালিয়া উহাব নাম ক্রবা। তাজ্জ্বালীষ আজ্য ক্রবতে চালিতে হয় এবং
 যোগের সনয়ে সেই ক্রবা হইতেই আত্ম শব্দ হয়। ক্রবা হইতে আহতির জন্ত
 আত্মাগ্রহণের একখানি ছোট হাতা থাকে; সেখানি নাম ক্রব। আর
 একখানি বড় হাতা থাকে, সেই খানি জুহু। জুহুব নাম আগেই উল্লেখ
 করিয়াছি। জাহ্নবির সময় অধবু্য ছোট ক্রবের দ্বারা ক্রবা হইতে আজ্য
 তুলিয়া লন এবং জুহুতে চালিয়া দেন। চতুর্থ হাতার নাম উপভূং;
 ইহা জুহুব চেয়ে ছোট। যোগের সময় অধবু্য ডান হাতে জুহু এবং
 বাম হাতে উপভূং গ্রহণ করেন। উপভূং খানি জুহুর নীচে থাকে।
 উদ্দেশ্য যে, জুহুস্থিত আহতি দ্রব্য যেন ভূমিতে না পড়ে; দেবাৎ পড়িলে
 যেন উপভূতেই পড়ে। (৪) পুরোডাশ প্রস্তুত কবিবাব জন্ত কতক
 গুলি মূরঞ্জান আবশ্যক। যথা (ক) অগ্নিহোত্রহবনী—ইহাব কথা অগ্নিহোত্র
 পদক্ষেপে বখিয়াছি; ইষ্ট যোগে সেই অগ্নিহোত্রহবনী পুরোডাশার্থ যব বা ধান
 খানিবাশ জন্ত ব্যবহৃত হয়। (খ) উদুৎক মুষল—সেই যব বা ধান উথলে বাঁধিয়া
 মৃদু প্রয়োগে কাঁড়া যায়। (গ) কুশ—ধান কাড়িয়া তুষ পৃথক করিয়া

কল্প আবদ্ধ। (ব) দৃশ্য ও উপল অর্থাৎ শিল ও নোড়া, চাউল বাঁটিবাব
কল্প আবদ্ধ। (চ) শয্যা, একখানা কাঠ; চাউল বাঁটিবাব সময় নীচে
এই কাঠ খানা পাতিলে শিলখানা চালু হয় ও চাউল বাঁটিবাব সুবিধা হয়।
(ছ) কুকাগিন অর্থাৎ ফাল হরিণের চামড়া; চাউল কাঁটিবাব সময় উরুখানার
নীচে ও বাঁটিবাব সময় শিলের নীচে পাতা থাকে।

অধ্বর্যু বেদির উপর কুশ বিছাইয়া ঐ সকল সরঞ্জাম সাজাইয়া ফেলেন। তাঁর
পত্র বাগেব কল্প আহবনীয় অগ্নি ভাল কবিতা জালিতে হয়—ইহাই অগ্নি সন্নিহন;
ইহাও কথা পূর্বেই বলিয়াছি। হোতা এক একটি সানিধেনী বাক পাঠ করেন।
আব অধ্বর্যু এক একখানি সনিধ আহবনীয়েরে ফেলিয়া দেন; আহবনীয়ের
অগ্নি জালিয়া উঠে।

যজ্ঞের সরঞ্জাম সাজান হইয়াছে; পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া বেদির উপরে
যথাস্থানে রাখা হইয়াছে; আহবনীয় অগ্নি জালান হইয়াছে, এখন বাগের
কল্প দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। দেবতাদের আহ্বান হোতা
কাজ। কিন্তু হোতা সাধারণ মানুষ; তাঁহার ডাকে দেবতারা আসিবেন কেন
আগেই বলিয়াছি অগ্নি স্বয়ং দেবগণের হোতা। অগ্নি স্বয়ং ডাকিলে তবে
দেবতারা আসিবেন; অগ্নিকে সেই কণ্ঠে নিযুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু
অগ্নিকেই বা ডাকিলে কে? অধ্বর্যু ডাকিবেন; হোতাও ডাকিবেন।
তাঁহাদের আহ্বানই বা অগ্নি শুনিবেন কেন? প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্য
ছিলেন; অলৌকিক দমতাবলি মনুষ্য ভাবে কবিতা সেই যজ্ঞে তাঁহারা
অগ্নিকে ডাকিতেন; তাঁহাদের ডাক অগ্নি শুনিতেন। যজ্ঞমান যে গোত্রের
অগ্নি রাখেন, সেই গোত্রে পূর্বকালে যে কয়জন মনুষ্যস্রষ্টা ঋষি ছিলেন, তাঁহারা
নিশ্চয়ই আপন আপন মন্ত্রে আপন আপন অগ্নিকে ডাকিতেন। অগ্নি নিশ্চয়ই
তাঁহাদের ডাক শুনিতেন। সেই ঋষিগণের অগ্নির নাম আবেয় অগ্নি বা
ঋষিসম্বন্ধীয় অগ্নি; নামান্তর প্রবর অগ্নি। দেবতা আহ্বানের ক্ষণ উপস্থিত
হোতাকে বরণের নাম প্রবরণ। যজ্ঞমানের নিযুক্ত হোতা মানুষ হোতা মাত্ৰ;
কিন্তু অগ্নি দেবহোতা। মানুষ হোতাকে যেমন পূর্বে বরণ অর্থাৎ প্রবরণ
করিতে হয়, দেব হোতা অগ্নিকেও সেইরূপ প্রবরণ করিতে হয়। যজ্ঞমানে
গোত্রের প্রবর্তক প্রাচীন ঋষিদের দোহাই দিয়া ডাকিলে সেই ঋষিদের অগ্নি
সেই ডাক শুনিতে পারেন। অতএব সেই ঋষিগণের নামান্তর দেব
হোতা অগ্নিকে ডাকিয়া পাবে সেই অগ্নিরই প্রতিনিধি স্বরূপে মান্য হোতাবে

বরণ করা হয়। এইখানে নিয়োগ পাইয়া মাহুৰ হোতা সেই পূৰ্ণ ঋষি-
দ্বাৰায় ঋষিকে আহ্বান করেন এবং সেই ঋষিকেই মন্ত্ৰদ্বারা দেবতা
স্বাক্ষৰনের জন্য অম্বুরোধ করেন। বরণান্তে হোতা বেদির উত্তরে স্বস্থানে
আসন গ্রহণ করেন।

এখন প্রকৃত পক্ষে যাগ আরম্ভ হয়। যাগগুলির নাম একে একে করিব।

(১) প্রবাক যাগ, প্রধান যাগের পূর্বে অম্বুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রবাক।

সাহিত্যের দ্রব্য আত্ম। অঙ্গদ্বারা হুতবোঁদা দ্বারা আশ্রয় হোম করিয়া পরে

প্রবাক যাগ করেন। পাঁচ দেবতার উদ্দেশে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়।

দেবতানেশ্ব নাম শুনিবে আপনারা চক্ষুর উঠবেন। এখনও আমরা

প্রবাক যোগ পরিচয় দিই বটে; কিন্তু এই দেবতাদের নাম একবারে জুলিয়া

শিখিছে। প্রথম দেবতা নমিঃ দ্বিতীয় দেবতা তনুনপাং, অথবা যজ্ঞানেশ্ব

ত্রয়োদশে নরাসংস; তৃতীয় দেবতা ইচ্ছঃ; চতুর্থ দেবতা বর্হিঃ; পঞ্চম দেবতা

স্বাহাকার। (২) পঞ্চ প্রবাকের পর অগ্নির উদ্দেশে একবার এবং সোমের উদ্দেশে

একবার আহুতি, ইহাব নাম আভ্যভাগ দান। (৩) আভ্যভাগ দানের

পর প্রবাক যাগ। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম পুরোডাশ, এবং তৎপরে অগ্নি ও সোমের

উদ্দেশে দ্বিতীয় পুরোডাশ দান। দুইয়ের মাঝে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে

একটি হুতাহুতি দিতে হয়। উপান্তে অর্থাৎ অম্বুস্তম্বে মন্ত্ৰ পাঠ হয় বলিয়া

এই হুতাহুতির নাম উপান্ত যাগ। (৪) তৎপরে বিষ্টকৃত যাগ। পুরোডাশ

দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া আহুতি দিতে হয় না; বানিকটা রাখিতে হয়। ইহারই

কিয়দংশ কাটিয়া গিয়া অগ্নি বিষ্টকৃতের উদ্দেশে দেওয়া হয়। অগ্নি বিষ্টকৃত

যে দেবতার মুক্তি। এই ক্রমে দেবতাটিকে গোকে ত্যাগ করিত। ইহার

ব্যাপক সবলে ভয় করিত। এমন কি, স্পষ্ট করিয়া ইহার নাম উচ্চারণে সবলে

সংকীর্ণ হইত না। উগ্র, জীব, অপদী প্রভৃতি বিশেষণে ইহার স্বভাবের পরিচয়

পাইবেন। ইহাকে খুদী রাখিবাব অস্ত্র কখন কখন শঙ্কর বলা হইত। ফলে,

বেদগীর্হীদের অন্ততঃ দেবতাদের সহিত ইহার পার্থক্য ছিল। ইনি একবার

দেবতাদের সম্মুখোদে স্বয়ং প্রজাপতিকৈ দক্ষ্য করিয়া বাণ ছুড়িয়াছিলেন।

দেবতারা খুদী হইয়া ইহাকে পশুগণের অধিপত্য দিয়াছিলেন। তদবধি ইনি

পশুপতি হইয়াছেন। অতি পূর্বে ইনি যজ্ঞের ভাগ পাইতেন না; জোর

করিয়া যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করেন। তদবধি বিষ্টকৃত যাগের প্রচলন।

বিষ্টকৃত যাগে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহা ক্রমেই অগ্নি বিষ্টকৃত মুক্তিতে

এহিগ করম। এই প্রসঙ্গে দক্ষবজ্র হটিত পৌরোহিত্য উপাধান আপনাদের
নামে আদিবে। (১) ষিষ্টকৃত্ত বাগের পর অম্বুদ্বাজ যোগ। এবান যোগের পূর্বে
যেমন প্রোক্ত, পবে তেমনই অনুযায়। প্রবাস যোগের পাঁচ দেবতা; অম্বাদেব
তিনি দেবতা—দাহি; মরাশংস, এবং পুনরার অগ্নি ষিষ্টকৃত্ত। অগ্নিত্তির
দ্রব্য আদি।

প্রধান-এ অপ্রধান এই সমুদায় যোগের সম্পাদনে-মন্তরুপ্তি সাধারণ বিধি
আছে। আগে বলিয়াছি-অম্বুদ্বাজ যোগকর্তী। হোতা দেবতার আত্মানবাসী
মান। অম্ববনীস অগ্নিতে আহুতি দিয়া যোগ হয়। অম্বুদ্বাজ অম্বন পাতক-
নীয়ের উত্তরে, সেইখানে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। যে যোগে ৩ যোগের পূর্বে
তিনি ডান হাতে জুহু এবং বাম হাতে উপভূজ লইয়া বেদির উত্তর দিকে
চলিয়া আসেন। দক্ষিণে দাঁড়াইয়া তিনি অগ্নীর মাঝে-এদিককে কাদেশ নাম—
“ও প্রবস” অর্থাৎ দেবতারিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুমোদন করণ। অগ্নীর বেদির
উত্তরে একপানি কাঠের জলওয়ার (জলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। এই
ততোস্তাব পানির নাম ক্ষ্য। তিনি উত্তরে বলেন—“মন্ত্র-বোমট” অর্থাৎ অম্বুদ্বাজ
দেবতার। শুনিতেছেন। তখন অম্বুদ্বাজ হোতাকে দেবতার আত্মানে জাগর
দেন। হোতাকে দুইটি মন্ত্র পাড়িতে হয়। একাটের নাম অম্বুদ্বাজ; অন্য
মন্ত্র-মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে অম্বুদ্বাজ করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের নাম
মন্ত্র; এই মন্ত্র কখন ক্ষ্য, কখন-মন্ত্র। ইহাই যোগের মন্ত্র, এইমন্ত্র নাম যোগ।
মনে করুন, যোগের দেবতা অগ্নি। হোতা মন্ত্র পাঠের পূর্বে “বোম্বজামন্ত-জামি
দেবম”—বলিয়া আরম্ভ করেন। এই টুকুর নাম অগ্নি। তৎপরে বাম হস্ত
পাড়িয়া বলেন—“অগ্নে বীহি বোমট”—অগ্নি ইহা তত্ত্ব করুন এবং দেবতার
নিকট বহন করুন। ঐ বোমট উচ্চারণই বহনকার। ঐ বহনকারের দ্বারা
মনে অম্বুদ্বাজ আহুতিব দ্রব্য, অম্বুদ্বাজ হটক আর পুরোডাসই হটক, অগ্নিতে
দিক্ষেপ করেন। যজমান অম্বুদ্বাজকে স্পর্শ করিয়া থাকেন; যজমান অম্বুদ্বাজ
পরে ত্যাগ মন্ত্র বলেন। ইহম্ অগ্নয়ে—ন মন্ত্র—এই দ্রব্য অগ্নিয়ে দেওয়া
উহা আমাণা থাকিল না—ইহাই ত্যাগমন্ত্র। দেবতার উদ্দেশে-দ্রব্য ত্যাগের
নামই যোগ। যজমান এইরূপে দ্রব্য ত্যাগ করিলেন। ত্যাগ মন্ত্র পাঠের
পর অম্বুদ্বাজ অগ্নির দক্ষিণ দিকে আবাব উত্তরে অর্থাৎ পশ্চাতে দক্ষিণ
আগে। এতোক যোগেরই এই সাধারণ বিধি।

একটি মন্ত্র কথা বলিতে দক্ষিণ আছে। ইহা ইচ্ছা দেখে উহা। ইতি বাগ

খাইলে কোনও মজাই সম্পূর্ণ ও নষ্ট হয় না। অগ্নিহোত্র প্রদপে বলিরাছি, সমস্ত ছদ্ম আত্মতা দেওয়া হয় না; একটু শেষ থাকে, তাহা খাইতে হয়। পূর্ণমাস যাগেও সমস্ত পুরোডাশ আত্মতা দেওয়া হয় না। খানিকটা পুরোডাশ রাখিয়া দিতে হয়। যজ্ঞমান এবং যজ্ঞিকেরা উহা ভক্ষণ করেন। এইমুহুর্ত পুরোডাশের শেষ অংশকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করিতে হয়। এক খণ্ডের নাম আশিত; ইহা ব্রহ্মা ভক্ষণ করেন। আর্ষ এক খণ্ডের নাম ষড়্ভবত; এই ষড়্ভবতের নাম আর এফ ষড়্ভ চারি টুকরা করিয়া অক্ষয়ুর্ভ, হোতা ব্রহ্মা ষড়্ভ এই চারি জনে প্রত্যেকেই ভক্ষণ করেন। পুরোডাশের আর্ষ দুই খণ্ড রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল অমুষ্ঠান শেষ হইলে ব্রহ্মা এবং যজ্ঞমান এই দুই ষড়্ভ ভক্ষণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পুরোডাশের কিমদংশ ভুক্ত করা হয়। এই অংশের নাম ইড়া। যজ্ঞমান এবং চারি জন যজ্ঞিক, সকলে মিলিয়া এই ইড়া ভক্ষণ করেন। এই ইড়া-ভক্ষণ একটা বিশিষ্ট ব্যাপার। এখন আমি ইহার সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কিন্তু আপনারা এই ইড়াকে ননে রাখিবেন। এ সম্বন্ধে তনের কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে। ইড়া ভক্ষণের তাৎপর্য্য না বুঝিলে যজ্ঞের তাৎপর্য্য বুঝা হইবে না। এই ইড়ায়ই আবাব একটা অংশ হোতা পৃথিব ভাবে ভক্ষণ করেন। এই অংশের নাম অবাস্তব্য ইড়া। এই হবিশেষ ভক্ষণ অমুষ্ঠান স্থিষ্টকৃত্য যাগের পরে এবং অমুষ্ঠান যাগের পূর্বেই সম্পন্ন হইয়া যায়। কেবল ব্রহ্মা ও যজ্ঞমানের ভাগ যজ্ঞসমাপ্তির ফল বঞ্চিত থাকে।

অমুষ্ঠান যাগের সহিত পূর্ণমাস যজ্ঞের প্রধান অমুষ্ঠানগুলি এক স্বকম সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন সমাপ্তিতে পৌঁছিতে হইবে। প্রস্তর নামক মর্ডমুষ্টিবর্ণ কণা আপনারদের মনে থাকিবে। এক মুষ্টি কুশ বাধিরা বেদির উপর রাখা হইয়াছিল, উহাবই নাম প্রস্তর। কিন্তু এই প্রস্তর কেবল কুণের গোছা নহে। ইহাতে যজ্ঞমানের শরীর কল্পনা করা হয়। অমুষ্ঠান যাগের পূর্বে প্রস্তর আহবনীয়ের আশুনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রস্তর যখন আশুনে পড়িতে থাকে, যজ্ঞমান তখন মনে যাইতেছেন, বসিতে হইবে। প্রস্তর পড়িয়া গেলে বসিতে হইবে, যজ্ঞমান স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সহিত মিশিয়াছেন। প্রস্তর পড়িবার সময় অক্ষয়ুর্ভ অমুষ্ঠান লইয়া হোতা কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম স্তুতবাক। প্রথম পুড়িয়া গেলে আশীর্বাদমুচক আর কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করেন। উহার নাম শংসুবাক। আপনারদের মনে

আকিবে, যজ্ঞেব আরম্ভে তিন খানি সমিং কাষ্ঠ দিয়া আহবনীয় অগ্নিকে ঘেরিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই সমিং করখানির নাম পরিধি। যাহুব হোতা দেব-হোতা অগ্নিকে আহবনীয় স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, আপনাদের মনে আছে। এই পরিধি তিন খানি সেই দেব হোতার পদাধার। এখন এই পরিধি করখানি অগ্নিতে কেলিয়া দেওয়া হয়; দেবহোতা যজ্ঞভাগ হইতে চাপিয়া দান। এই সময়ে অক্ষর্য্য বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে একটু আজ্ঞা দিয়া হোম করেন; ইহা নাম সংস্রব হোম। ইহা যাগ নহে, হোম। এই হোমের সহিতই যজ্ঞমানের পক্ষে অমুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

এতদ্বারা আপনাদের বৈধ্যচ্যুতি হইয়াছে। আমিও এখানে সমাপ্তি দিয়া আপনাদিগকে জব্যাহতি দিতে পারিতাম; কিন্তু রাজ্যকেবা অব্যাহতি দিবেন না। যজ্ঞমানের পক্ষে অমুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। কিন্তু যজ্ঞমানের পক্ষীর পক্ষে এখনও সমাপ্ত হয় নাই। যাগেই বলিয়াছি, গার্হপত্য অগ্নির সহিত যজ্ঞমানের পক্ষীর বিশেষ সম্পর্ক। গার্হপত্যের পাশে তিনি এতদূর বসিয়া আছেন। এ পর্য্যন্ত বত যাগ হইয়াছে, সমস্তই আহবনীয় অগ্নিতে হইয়াছে; গার্হপত্যে কোনও যাগ হয় নাই। এখন ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন জন ঋষিক যজ্ঞমান পক্ষীর নিকটে আসিয়া কয়েকটি অধিষ্ঠি দেন; গার্হপত্য অগ্নিতে আহতি দেন। আনুষ্ঠান প্রভৃতি আত্ম। দেবতা যথাক্রমে সোম, বৃষা, দেবপক্ষীগণ এবং অগ্নি গৃহপতি। অগ্নি গৃহপতি ও গার্হপত্য অগ্নির দেবতা। অগ্নি গৃহপতি যজ্ঞভাগে বঞ্চিত হইলে, গৃহিণী তাহা সহিবেন কেন? আর দেবপক্ষীগণকেও বঞ্চিত হইতে তিনি দিবেন কেন? প্রধান বাগের পরে যেমন হবিশেষ ভক্ষণ হইয়াছিল, গৃহপক্ষীর পক্ষে এই বাগের পূর্বও হবিশেষ ভক্ষণ করিতে হয়। ভক্ষণের পর যজ্ঞবাক পঠিত হয় না রটে, তবে যজ্ঞবাক পাঠ করিতে হয়, এবং সংস্রব হোমও করিতে হয়। যজ্ঞমান-পক্ষীর পক্ষে এই বাগের নাম পক্ষী-সংস্রাব।

দক্ষিণাগ্নি এ পর্য্যন্ত কোন আহতিই পান নাই। অক্ষর্য্য দক্ষিণাগ্নিকে এখন একটু আজ্ঞা হোম করেন। পূর্বোক্ত তৈম্বার করিবার সময় পিটুলিব যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে দানও দেওয়া হয়। দেবহোতার আহবানে যে সকল দেবতা যজ্ঞভাগে পাইবার জন্য আনিয়াছিলেন, তাহার এখনও যজ্ঞভাগ হইতে বান নাই। অক্ষর্য্য কিরিয় আসিয়া তাহাদের সকলের জন্য আহবনীয় অগ্নিতে একটু আগ্নেয় অর্ঘ্য

হবেন। তখন তাঁহারা চক্ৰিা যান। ইহাব নাম সনিষ্ট-যজ্ঞহোম। বেদির উপরে যজ্ঞেৰ সৱজ্জামন্তলি রাখিবর জন্ত যে সকল কুশ বিছান হইয়াছিল, তাঁহাও আহবনীয়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যজ্ঞারম্ভে প্রণীতা নামক জল প্রণয়ন করিয়া যজ্ঞবৎসার জন্ত আহবনীয়ে পূর্ব দিকে বাধা হইয়াছিল; যজ্ঞ সমাপ্ত হইল, এখন সেই জল বেদির উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। পূবোডাশের জন্ত চাউল রাড়িয়া যে তুষ ও ক্ষুদের শুঁড়া অবশিষ্ট ছিল, তাহা রাক্ষসদের প্রাপ্য। ইহাতেই তাহারা খুনী হইবে। রাক্ষসদের উদ্দেশে ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এইভাবে যজ্ঞ সমাপ্ত হইল। যজ্ঞমান এখন দেবদ্ব পাইয়াছেন; এমন কি, বেরগণের মধ্যে পরম দেবতা যে বিষ্ণু, তিনি সেই বিষ্ণুপদের প্রার্থী। আপনারা জানেন; বিষ্ণু ত্রিপাদদ্বারা তিন বোক আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ করিয়া ছিলেন। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য বিষ্ণুর এই ত্রিপাদাত্মকতার মহাত্ম্য বর্ণনায় পূর্ণ। তদনুকরণে যজ্ঞমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব মুখে আহবনীয় পর্যন্ত যজ্ঞস্থল প্রক্রমণ করেন, ইহার নাম বিষ্ণুক্রম-প্রক্রমণ। পূর্ব দিকে দেবতাদের যান; যজ্ঞমান পূর্ব দিকে তাকাইয়া বসেন, আমি ধ্যোতিতে গমন করিয়াছি; ধ্যোতির সহিত আমি নিলিত হইয়াছি পরে যজ্ঞমান স্বর্গের এবং গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া প্রার্থনা করেন, “হে গৃহপতি অগ্নি, আমি যেন তোমা দ্বারা সুগৃহপতি হই”; পুত্রের নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, “আমার এই পুত্র এই বীৰ কর্মকে অমুক্রমে বিত্ত-বিত্ত করুক।” তৎপরে আহবনীয় অগ্নির ঠিকস্থান করিয়া যজ্ঞের পূর্ব দিন যে ভাত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিসর্জন করেন। বিসর্জনের পব যজ্ঞশালায় বাহিরে আসিয়া যজ্ঞমান এবং ব্রহ্মা পূবোডাশের যে ভাগ ওঁহাদের জন্ত বন্দিত ছিল, তাহা ভক্ষণ করেন। পরিশেষে ব্রহ্মা আহবনীয়ে সমিৎ দিয়া পূর্ণমাস ইষ্ট সমাপ্ত করিয়া দেন। যজ্ঞান্তে ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দিতে হয় পূর্ণমাস যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহীর গর্ভে অবশ্য কর্তব্য কর্ম। ধনী দরিদ্র সকলকেই ইহা করিতে হইবে। দক্ষিণা বান্ধনাধ্য হইলে চলিবে না। যজ্ঞের আরম্ভে দক্ষিণাগিতে চারি জন ঋত্বিকের উপযুক্ত ভাত চড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা দক্ষিণাগিতেই পক হয়। এই অন্তই দক্ষিণা; যজ্ঞশেষে ঋত্বিকেরা এই অন্ন ভোজন করেন; ইহাতেই যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হয়।

পূর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ দিলাম। ইহাতেই ইষ্ট বাগ্মিনিসটা কি, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিবেন। এখন পুস্তকভাগের কথা বলিতে চাই। পুস্তকভাগ

নানাবিধ। উহার মধ্যে একটি পশুবাগ অবশ্য কর্তব্য। ইহার নাম নিকট পশুবাক। প্রকি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় এই বাগ কর্তব্য। ক্রমশঃ গতে বৎসরে দুই বার কর্তব্য; উত্তরবাগ এবং দক্ষিণবাগ সংক্রান্তিতে। এই পশুবাগ তন্ত্র যাবতীয় পশুবাগের প্রকৃতি। ইহারই বিবরণ দিলে গম্ভীর পশুবাগেরই মোটামুটি জ্ঞান জন্মিবে।

ইষ্টবাগে চারি জন ঋষি আবশ্যক। অধ্বর্যু, হোতা, ব্রহ্মা এবং অরীষ। পশুবাগে আবে দুই জন আবশ্যক। এক জন অধ্বর্যু সহকারী, তাহার নাম প্রতিপ্রহতা। আর এক জন হোতার সহকারী; তাহার নাম দৈতাবকণ। এই দুই জন ঋষিক মহীয়া পশুবাগ আরম্ভ করিতে হয়। ইষ্ট যামে যজ্ঞের সবধাম রাখিব। জ্ঞাত যে বেদি থাকে, সেই বেদির পশ্চিমে থাকে গার্হপত্য এবং পূর্বে থাকে আহবনীয়। পশুবাগে আবেও একটি বেদি নির্মাণ করিতে হয়। ইহার নাম পশুক বেদি। আহবনীয় অগ্নিও পূর্বে দিকে ওই বেদি নির্মিত হয়। এই পশুক বেদিরও উপরে আবেও একটি ছোট বেদি তুলিতে হয়; তাহার নাম উত্তরবেদি। যজ্ঞশালায় উত্তর দিকে মাটি তুলিয়া সেই মাটিতে উত্তর বেদি গড়া হয়। মাটি তুলিলে যে গর্ত হয়, সে গর্তের নাম চান্দাল। চান্দালের কাছে পশুক বেদির ধূলি আনুজ্ঞান পূর্বক রাখা হয়। ঐ যুপের নাম উৎকর। উত্তর বেদির মধ্যস্থলের নাম নাভি। আহবনীয় চাইতে অগ্নি আনিয়া এই নাভিতে রাখা হয়। নাভিতে সেই অগ্নিতে আবার নূতন অগ্নি নিক্ষেপ করিতে হয়। অবশি বর্গন করিয়া অগ্নিগম্বন দ্বারা এই নূতন অগ্নি উৎপাদন হয়। নাভিতে এই দুই অগ্নি মিশাইলে তদবধি এই অগ্নিই নূতন আহবনীয় রূপে গণ্য হইয়া থাকে। পূর্বাতন আহবনীয় আপনাব মধ্যারা হাবাইয়া তদবধি গার্হপত্যের কাজ করে। পশুক বেদির উপরে পশুবাগের উপযুক্ত সবধাম এবং আহুতির দ্রব্য রাখিতে হয়।

পশুবন্ধনের তন্ত্র যুপের দ্বাবকার। এই যুপ কাঠের স্তম্ভমাত্র। অধ্বর্যু প্রথমে ছুতাবের সহিত বাঁধিবে গিয়া গাছের ডাল কাটিয়া আনেন। উহার ডালপালা ছাটিয়া অষ্ট কোণ স্তম্ভ বা খুঁটি প্রস্তুত করা হয়। যুপ অন্যান্য পীত হাত দীর্ঘ হয়; হাতথানেক মাটির নীচে পোতা থাকে। পশুক বেদির পূর্বে দিকে যুপ পোতা হয়। আটকোণা যুপের নর্থায় একটা মুকুট থাকে; তাহার নাম চম্বাল। যুপের গায়ে বি মাখাইতে হয়; এই কর্ণের নাম

যুগল। তাব পর দড়ি ছড়াইতে হয়, এই দড়ির নাম যুগল। বশনাতি
ভিতর একপশু কাঠ পরাইতে হয়, এই কাঠখণ্ডের নাম স্বক। প্রত্যেক কর্ম
অধ্বার্য সম্পাদন করেন, আর হোতা প্রত্যেক কর্মের অল্পকূলে ঋক মন্ত্র
পাঠ করেন। এইরূপে যুগ পশুবন্ধনযোগ্য হয়।

বন্ধনের পূর্বে পশুকে দুই গাছি কুশ দ্বারা স্পর্শ করিতে হয়; ইহাব-
নান উপাকরণ। পশুব দুই শিঙের মাঝে দড়ি বাধিয়া সেই দড়ি যুগের
বশনারি বাধিতে হয়। এইরূপ পশুবন্ধনের নাম পশু নিরোজনা। পশুব
কপালে শি নাধান হয়।

নিরোজনের পর যাগের আয়োজন। যাগের আবিস্ত অনেকটা ইষ্ট যাগের
আরস্তেরই মত। উক্তব বেদিব নভিতে যে নূতন আহবনীয় অগ্নি স্থাপিত
হইয়াছে, সামিধেনী মন্ত্রের সহিত তারিতে সমিৎ এক্ষেপ করিয়া আতন জ্বালান
হয়। পরে সেই আগুনে আবার হোম করিয়া দেবহোতা অগ্নিব বরণ এবং তৎপরে
মাহুব হোতার বরণ ইষ্টিয়াগেই মত। বরণ পাইয়া দেবতারার বজ্রহস্তে আসেন।
এখন প্রধান যাগের পূর্ববর্তী প্রযাজ যাগ। ইষ্টিয়াগে পাঁচটি মাত্র প্রযাজ;
পশুযোগে প্রযাজের সংখ্যা এগারটি। এই এগাব যাগের দেবতাও এগার জন;
ইষ্ট যাগের পাঁচ জন ত আছেনই; তাহাব অতিরিক্ত আবে ছয় জন দেবতা
প্রজ যোগে প্রযাজ আহতি পাইয়া থাকেন। এই এগাব জন দেবতার নাম
যথাক্রমে- (১) সমিৎ, (২) তন্ননাৎ, অথবা নবাংশ (৩) ইড়ঃ (৩)
বহিঃ (৫) চবঃ, (৬) উয়াসানলো, (৭) নৈবো হোতাভো, (৮) ত্রিসঃ
নৈবঃ, (৯) ইড়া, নবম্বতী এবং ভারতী, এই তিন দেবী। ইহার তিনে এক এবং
একেই তিন; এই তিন দেবতার কনা আপনাবা যনে বাধিবেন; ইহাদের
সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে) (৯) হুগী, (১০) বনপতি, (১১)
স্বাধাকাব। প্রত্যেক ওষাজ যাগের পূর্বে নৈত্রাবকণেব আদেশ পাইয়া হোতা
যাজ্য মন্ত্র পাঠ করেন। পশু যাজ প্রযাজ যাগের যাজ্য মন্ত্রের একটি
নিশিষ্টতা আছে। এই যাজ্য মন্ত্রের নাম আগ্রী মন্ত্র। দেবতাকে প্রীত
করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া মন্ত্রব নাম আগ্রী মন্ত্র। যথেষ্ট সংহিতা
মধ্যে অনেকগুলি আগ্রী সূক্ত আছে। প্রত্যেক যাজ্যে ঐ এগাব দেবতার
উদ্দেশ্যে এগাবটি আগ্রী মন্ত্র পাওয়া যায়। এক একটি সূক্ত এক এক
ঋষির প্রচাবিত। কোনও সূক্ত বর্ণিষ্টেব, কোনটি বিধানিত্রব, কোনটি
জনবিশিব ইত্যাদি। যজমান যে ঋষিব গোত্র উৎপন্ন সেই ঋষিব মন্ত্র

তাঁহার আত্মী মন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞমানের পক্ষে প্রত্যেক যাগে যাজ্ঞা মন্ত্র বা আত্মী মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। এখানে প্রযাজ্ঞের মধ্যে প্রথম দশটিতে আহুতিব দ্রব্য 'যাজ্ঞা' শেষ প্রযাজ্ঞে 'যাজ্ঞাহুতি' হয় না। সেখানে পশুব বপা আহুতি দিতে হয়। পেটের উপরে নাভির পাশে যেদেব নাম বপা। এই বপাব দ্বারা অস্তিস প্রযাজ্ঞেব দেবতা। যাহারূতির উদ্দেশে যাগ হয়। কাজেই প্রথম দশ প্রযাজ্ঞে সম্পন্ন করিয়া শেষ প্রযাজ্ঞেব পূর্বেই পশু বধেব আয়োজন করিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পশু বধ কবে, তাহার নাম শমিতা। পশুকে বেদির উত্তরে চাহালের কাছে পশুবধেব স্থান। সেই স্থানের নাম শামিত্র দেশ। সেই স্থানে পশুর অঙ্গ থাকেব জন্তু আঙুন জালিতে হয়। সেই অগ্নির নাম শমিত্রি অগ্নি। একজন ঋত্বিকের নাম অগ্নীং, ইহাকে ইষ্টি যাগেও পাওয়া গিয়াছে। ইনি উল্লুক অর্থাৎ আঙুনের উল্লা জালিয়া পশুর চাবিদিকে ঘুরাইয়া দেন। উদ্দেশ্য এই যে, রাক্ষসেবা পশুকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। রাক্ষসেবা আঙুনকে ভয় করে। এই অগ্নি ভ্রামণ কর্ত্ত্বের নাম পর্যায়িকরণ। এই সময়ে হোতা পশুবধের জন্ত শমিতাকে নিযুক্ত করেন। যে মন্ত্রদ্বারা নিরোগ কথা হয়, তাহার ব্যাখ্যা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি আমার ঐতরেয় ব্রাহ্মণেব বাঙ্গালা অনুবাদ দেখিবেন। মন্ত্র মধ্যে দুই একটা কথা আপনাবেব কৌতুক জন্মাইতে পাবে। মন্ত্র মধ্যে বলা হয়,—এই পশুব বদকর্ত্ত্ব ইহাং মাতা অমুমতি দিক, পিতা অমুমতি দিক, সহোদব ভ্রাতা অমুমতি দিক, ইহার সখা এবং দলস্থিত সন্তাত্ত পশুও অমুমতি দিক। আবার বলা হয়,—ইহার পা উত্তর দিক আশ্রয় করুক; চক্ষু স্বর্ধাকে আশ্রয় করুক, শ্রোত্র বায়ুকে, জীবন অন্তরিক্ষকে, শ্রোত্র দিকৃসকলকে, এবং শবীর পৃথিবীকে আশ্রয় করুক; শেষে বলা হয়,—অহে বদকর্ত্ত্বা, এই পশুকে হনন কর—হনন কর—হনন কর; অপাপ—অপাপ—অপাপ। এই কর্ত্ত্ব যে মুকুত হইল, তাহা আমাদের উপরে অর্পিত হউক। যে চক্কত হইল, তাহা আত্মেব উপরে অর্পিত হউক। মন্ত্র পাঠেব পর অগ্নীং উল্লুক হস্তে যাগে আগে চলেন। শমিতা দাড়ি ধরিয়া পশুকে লইয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ প্রতিপ্রহতা, অধ্বর্যু এবং যজ্ঞমান চলেন। শামিত্র দেশে অর্থাৎ বধস্থানে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ ভূমিতে একগাছি তৃণ ফেলিয়া দেন এবং যজ্ঞমান এবং ঋত্বিক সকলে সেখানে হইতে ফিবিয়া আসিয়া মুখ ফিরাইয়া বসেন, যেন হতা বর্ণ্যটা দেখিতে না।

হয়। বধেব রীতিটি বলিতে না হইলেই ভাল হইত। খান রোধ করিয়া বধ করা হয়। এইরূপ বধেব নাম সংস্থাপন। বধের পর যজমান, যজ্ঞমানেব পত্নী এবং অধ্বর্যু জল ঢালিয়া পত্নীকে ধুইয়া দেন। অধ্বর্যু পেট চিবিয়া বপা বাজিবে করিয়া লন। তাহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা দুই খানা কাঠে সেই বপা এইয়া নামিত্র অগ্নিতে তপ্ত করেন; পরে উক্ত বদিব নাভিস্থিত আহবনীয়া অগ্নির উপরে ধরিয়া থাকেন। অগ্নির উত্তাপে বপা গলিয়া বিন্দু বিন্দু আগুনে পড়িতে থাকে। অধ্বর্যু সঙ্গে সঙ্গে বপার উপর বি ঢালেন। সেই বপার ক্ষিপণশ বধাবিধি অগ্নী মন্ত্র পাঠের পব আগুনে ফেলিয়া অস্তিম প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। বপাব অবশিষ্ট প্রধান যাগেব জন্তু রাখিয়া দেওয়া হয়।

আমি নিরুক্ত পশুবন্ধ নামক অবশ্য কর্তব্য পশুধাগের কথা বলিতেছি। এই যাগেব প্রধান দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। প্রযাজ যাগেব পব অধ্বর্যু তাহাদের উদ্দেশে প্রথমে বপাহতি দেন। বপাহতির পর পুরোডাশ আহতি এবং পশুর অঙ্গ আহতি। পূর্ণাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, সেখানে পুরোডাশই প্রধান আহতি। পশুধাগেব আহতির দ্রব্য পশুর বপা এবং পশুর মাংস। কিন্তু পশুমাংসের সহিত পুরোডাশেব আহতি না দিলে পশুধাগও সম্পন্ন হয় না। ইতি যাগে অধ্বর্যু দেন পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এখানেও সেইরূপ তাহাকে পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বপাহতির পর এক দিকে শামিজায়িতে পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক হইতে থাকে। অত্র দিকে অধ্বর্যু পুরোডাশ যাগ করিতে থাকেন।

পশুর সকল অঙ্গ মেঘ অর্থাৎ আহতিযোগ্য নহে। হৃদয় জিহ্বা প্রভৃতি এগারটি অঙ্গ প্রধান দেবতার আহতি যোগ্য। পশুর রক্ত বাফসেব প্রাপ্য। উহা উৎকবে অর্থাৎ যজ্ঞশালাব বাহিবে আবর্জনা তপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যিনি পশুবধকর্তা শমিতা, তিনিই ছুবি দিয়া পশুর অঙ্গগুলি কাটিয়া লন, এবং তিনিই পশুমাংস হাড়িতে চাপাইয়া জলে সিদ্ধ করেন।

পুরোডাশ আহতি শেষ হইলে শমিতা খবর দেন, পশুর অঙ্গ পাক হইয়াছে। অধ্বর্যু আসিয়া প্রধান দেবতা ইন্দের ও অগ্নির উদ্দেশে পশুর অঙ্গ আহতি দেন। অন্নবাক্যা পাঠ করিলে মৈত্রাবরুণ এবং ষাজ্যা পাঠ করেন হোতা স্বয়ং। পাকের হাড়িতে মাংস সিদ্ধ করিবার সময় খানিকটা চর্কি ভাসিয়া উঠে, সেই চর্কিতে দধি এবং বি মাণাইয় বনস্পতি দেবতার উদ্দেশে এই সময়ে আহতি দিবার প্রথা আছে।

প্রধান বাগের পর যিষ্টকৃত্ত যাগ। আগে বলিয়াছি, ইহা রত্ন বেদবার প্রাপ্য। পশুর করেকটি অঙ্গ একত্র নির্দিষ্ট থাকে।

তৎপরে ইবিশেষ ভক্ষণ। ঋষিকেবা আপন আপন নির্দিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করেন, এবং যজমান এবং ছয় জন ঋষিব একযোগে ইড়া ভক্ষণ করেন। পূর্ণমাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি, এই ইড়া ভক্ষণের একটা গভীর তাৎপর্য আছে; সে তাৎপর্যের কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে; নতুনা যতেন তাৎপর্যই বুঝান হইবে না।

প্রধান যাগ সমাপ্ত হইল। তৎপবে অম্ববাজ। ইষ্টি যাগে অম্ববাজের সংখ্যা তিনটি, কিন্তু পশু যাগে অম্ববাজের সংখ্যা এগারটি। প্রযাজ যেমন এগারটি, অম্ববাজও তেমন এগারটি। প্রযাজের দেবতাদের অধিকাংশই অম্ববাজেরও দেবতা। দিগ্বিশিষ্ট আজ্য দ্বারা এই এগারটি আহুতি দেওয়া হয়। অক্ষয়ী আহুতি যেন, আর তাঁহার সহকারী প্রতিপ্রস্থাতা অম্বত আশ্বিন জম্বিনী পশুমাংস দ্বারা উপবাজ হোম করেন। এই উপবাজ হোম পশু যাগেই আছে, ইষ্টি যাগে নাই। ইহা যাগ নহে, হোম মাত্র। যাগের ও হোমের পার্থক্য আগে বলিয়াছি। যুপের গায়ে বর নামে যে কাষ্ঠ খণ্ড বাঁধা ছিল, তাহা এই সময়ে আশ্বিনে দেওয়া হয়।

ইহার পর পত্নী-সংবাজ। যজমানের পত্নীর পক্ষে ইহা গার্হপত্য অগ্নিতে অমুষ্ঠেয়। আহুতির দ্রব্য পশুর লালু ল। ইহাতেই যাগ সমাপ্ত হইল। হুত-বাক, শংবুবাক প্রভৃতি পাঠ হইতে যজ্ঞমানেব বিষ্কর্ম প্রকটন এবং ব্রত বিসর্জন পর্যন্ত যাগ সমাপ্তিসূচক কর্ম ইষ্টি যাগের মতই। পুনরায় আবশ্যক নহে।

ষাবতীর শ্রোত যজ্ঞকে ইষ্টি যাগ, পশু যাগ এবং সোম যাগ এই তিন প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। সোম যাগের কথা আগামী বায়ে বলিব। ইষ্টি যাগ এবং পশু যাগের দুইটি নমুনা দিলাম। ইহাতেই নিশ্চয়ই আপনাদের দৈর্ঘ্যচ্যুতি হইয়াছে। ইষ্ট যাগের ও পশু যাগের যে নমুনা দিলাম, তাহা শুনিয়া শ্রোতকর্মের উপর আপনাদের প্রকা জন্মিয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদের প্রকা হউক আর না হউক, এক কালে বেদপত্নী সমাজে এই সকল কর্ম পবম প্রকার সহিত অদ্বিষ্ট হইত। আগনারা পহাস করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত অমুষ্ঠানই সম্পূর্ণ irrational; যজ্ঞের প্রজ্ঞা, যজ্ঞের জ্ঞান বিচারবুদ্ধি, কিছুতেই এ সকলের সমর্থন

কথিত পাইব না। যথা হইত পাবে। ইংরেজিতে নাকাকে বিলিঙ্গা বসে, তাহা সত্যভাবে Reasonএর এককার বাহিরে। নত্যা অসত্য সকল সমাজের নোকেই এইরূপ অলঙ্ঘন শঙ্কা রাখে; প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। অন্যএর মত মানবতাবের আলোচনা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তঁহাক মানবপ্রকৃতিব এই ভাষণের আলোচনায় নিবৃত্ত থাকিলে চমিবে না। ইহাকে মানবের চরিত্রতা বলিতে হয়, কিন্তু ইহাণে পাশকিতা বলিতে পারিবেন না। কেন না, মানব মধ্যে এই সকল অন্তর্ধান নাই। পশুব পক্ষ এ চরিত্রতা নাই। কোনও পশু কোনও বিলিঙ্গার ধাব পাবে না। ইহা মানবিকতা বটে, ইহা কখনই পাশকিতা নহে।

দেবত্ব হয় সময়ে একটি, মতেব আজ কাল খুব প্রাচুর্য। ইহাকে Animism বলে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই Animism হইতে বাবতীরা বিলিঙ্গার উৎপত্তি। অন্যহা নোনে সমস্ত পৃথিবীকে দেবতাময় দেখে। সকল জীববস্তু এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। এই সকল দেবতা হন শিবাব্দী ইত্যেও নান্নেষে নতই বগদেগদির অধীন। তাঁহাদেব নত্যা নাকারব দেব অমেক অধিক। অনেক সাগতিক ঘটনা তাঁহারাি পৰিচালনা করেন। নান্নেষে সভ্যত বনেক স্থলে ইহাদেব হাতে। ঐদ্যানিকেরা ওন ব্যাপারকে বহু হিসাবে দেখিতে চাহেন। যথেষ্ট ভিতরে খোলা নার। ইহা নিদিষ্ট নয়মেব হাীন। অবৈজ্ঞানিক অসত্য মানুষ সে সকল বিশ্বাসেব হস্তিই জায়ে না; সে সবই দেবতার খেয়ালে দেখে। ইহাই Animism। বিজ্ঞানবিজ্ঞার উন্নতিব সহিত মানুষে animism হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়। উদাহরণ একবলে হয় না। আপনাব জানেন, সৌর ভগতের এই উপগ্রহ বাধা নিয়মে চলেতেছে। নিউটনের পূর্বে কেপলার এই নিয়ম প্রলিঙ্গ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে কেপলারের স্থান খুব উচ্চ। এমন কি, পূর্বে কেপলার না জন্মিলে নিউটন তাঁহাব কৃতিত্ব দেখাতে পারিতেন বি না সনহ। কিন্তু এ কেন কেপলারও animismএব উপগ্রহ এতদূর পাবেন নাই। এইগুলি নেন এইরূপ ধাধা পথে ঘুরিতাছে, ইহা বুঝিলে দিয়া খোলাব বলিয়া মেলিলো, প্রত্যেক গ্রহএ এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারাি চক্রান্ত করিয়া আপনাদেব জন সেহওভাবে উদ্যত চুরাইতেছেন। ইহাই animism। এই সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাল-কতটুকু শক্তি রাখা জানা নাই।

বহু কন্যাতে নরবলি চলিত আছে; এক কালে হরকত সঙ্গের সম্রাটেরই স্ত্রী; যাহারা নরমাংস উপায়ে বলিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা দেবতাকে সেই উপায়ে মাংস ভোজনের জন্য দিবে, তাহাতে বিশ্বাসি। কিন্তু যাহারা নরমাংস ভোজন কবে না, তাহাদের যাম্যও নরবলি প্রাচীনের দেবা বায়। সিংহী, গ্রীক, বোথান সম্রাটের এককালে নরবলি দিত, তাহা আপনারা জানেন। আইফিজিনিয়ার গরু, বেকথার হুহিতাব গরু, আপনারা জানেন। চিনির প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবা হুসত্য জাতি ছিল; অথচ তাহাদের মধ্যে ঐট ভীষণ প্রথা বহুল ভাবে চলিত ছিল। দেহতাকে দিব্যের জন্ত বড় ব্যবসাসে পছন্দ কর হইত। মোট পুত্রকে পছন্দ করা হইত। পিতার একমাত্র পুত্রকে পছন্দ করা হইত। বোম সাম্রাজ্যের যখন পূর্ব পরাক্রম তখন সম্রাট এলাপোলোস নতুন করিয়া নরবলির প্রচলন করেন। সম্রাটের বড় বড় ব্যবসাসে ছেলে ধরিয়া আনিয়া বলি দেওয়া হইত। যাপানটা ভীষণ এবং লোমহর্ষকর। কিন্তু ইহাব ভিতর কিঞ্চিৎ ধর্মতাবও আছে। দেবতা নরমাংস খাইতে ভালবাসেন, এরূপ তাৎপর্য নরমাংস তাৎপর্য ভাগস্বীকার; যাহা সব চেয়ে সুল্যবান, যাহা সব চেয়ে শ্রিয়, তাহাও ই উৎসর্গ করিতে পারিলে তবেই ত তাৎপর্য স্বীকার হন। আপনারা শুনঃশোপের বৈদিক আখ্যায়িকা শুনিয়া থাকিবেন। ঐতবেয় ব্রাহ্মণে এবং ভৌমীতিকা ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা আছে। ইন্দ্রাকু বংশের রাজা হবির্চক্রেয় শত পত্নী সঙ্গেও পুত্র হয় নাই। তিনি বন্ধনের নিকট মানিক করিলেন, স্বামাকে পুত্র দাও; সেই পুত্রই তোমাকে দিব। বন্ধনন বনে পুত্র জন্মিল। রাজা কিন্তু পুত্র দিতে পারিলেন না; নানা উদ্ভব হাতিব করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিলেন। কয়স হইলে পুত্র বনে পলায়। দেবতার কোষে রাজার উদরী রোগ হইল। পুত্র রোহিত বনের মধ্যে অজীর্গন্ত নামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তাহার তিন পুত্র ছিল। রোহিত মনে করিলেন, অজীর্গন্তের একটি পুত্রের স্ববিধা করিয়া পিতার নিকট পাঠাইয়া দিই। কামার বসলে তাহাকে দিলেই, বন্ধন খুণী হইবেন। ইহাওই বলে নিশ্চয়। তিন পুত্রের মধ্যে মোটকে তাহার বাপ ছাড়িয়া দিল না; বাকি দুই মা ছাড়িল না। অন্তেষে সদ্যম শুনঃশোপকে বোহিত গরিব করিয়া দইবেন। রাজা শুনঃশোপকে পশুকাপে পাইয়া যজ্ঞের আরোজন করিলেন। যজ্ঞের পর্যায়ক্রম পর্যন্ত হইয়া গেল, কিন্তু শুনঃশোপকে বধ করিবেনা। মোকপাত

[illegible]

॥ अथ श्रुत्वा च संज्ञायां भक्तिरिति तत्र विद्मः सक्नु रीतिश्च इत्युक्तमाचार्येण । ५६

৪. অশ্রুত। অশ্রুত মূল্যে - অশ্রুত মূল্যে পাওয়া যায়। ফেরত, শ্রুত

• ୧୦ • କଳାକାରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଗୁଣିତ । ଶତ୍ରୁମୁଖେ ଉଦୟ ବାସିନ୍ଦ୍ର, ଦାସ, ପ୍ରଭୃତି

[illegible][illegible]

১৯৭৬ খ্রিঃ। ৩মিই জুলাই। জন্মসংগ্ৰহে মধ্য দিনা ইতিপর্বেই থাক তল

२. शेष गोपिका, कुमारी तिन धर्म प्रवर्धन नाम अमिठ कहेअन ।

এম বিদ্যালয় 'স্বদেশ' হ'ল তিনি চলে যাবেন তাখিপত্র। এম গাথি বংশের ব'লেন

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

সেই নমস্কারে যে নৃসিং কথ্য হইতেছে, যে নমস্কারে ব্রহ্মসংস্কৃত

[illegible]

কম নম্বর হলেও প্রতিষ্ঠানটি - পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবেদন বৈদিক সাহিত্যের

[illegible]

১৩৬. ১৩৭. ১৩৮. ১৩৯. ১৪০. ১৪১. ১৪২. ১৪৩. ১৪৪. ১৪৫. ১৪৬. ১৪৭. ১৪৮. ১৪৯. ১৫০.

[illegible]

১৯৫২ সাল জুলাই মাসে টি. বি. এল. টি. (বন বিভাগ) পরে রাষ্ট্রনিক উদ্যোগ ন.

[illegible][illegible]

১০। প্রকল্প; বর্ষ ৭৩ মঙ্গল, ১৫ শ্রীতি ধর্ম, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ : ১০/১০/২০

‘‘... ନିକାହିନ, ହିମି ହାଲ ମା. ୧୫; ହିମି ଓ ନାମ ବିବିଧ, ପ୍ରାୟତଃ

उ.० १७२०.। अथ एतत्तु विज्ञाते । अथैतत्तु विज्ञाते प्रतिष्ठा इव न वे.

[illegible][illegible]

२३

সে সব কথা এগন থাক। শুনঃশেপে উপাখ্যানে আপনারা দেখিলেন, রাজপুত্র বোধিত আপনাব বদলে শুনঃশেপকে অর্পণ করিয়া দেবতাকে তুষ্ট করিতে চাহিতেছেন। এইরূপ একের বদলে অন্তকে প্রদান, একের প্রতিনিধিরূপে অতকে প্রদান—ইহাব নাম নিষ্কর—vicarious offering, যজ্ঞভূত। এই নিষ্কর্যেব প্রথা বহু দেশে প্রচলিত আছে। টাইমর সাহেবই নানা দেশ হইতে নানা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম এই নিষ্কর্যেব বিশ্ববাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতি বাবা আদমের পাশে গানী। দেবী পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত sacrifice দানকার। যিহুদীদের মধ্যে না ক্ষমাচার্য পণ্ড বনিব প্রথা প্রচলিত ছিল। জেহোবাব মান্দিবে নহেন, নহেন পণ্ড বনিব হইত। খ্রীষ্ট আসিয়া বনিলেন, পণ্ড বনিব আপ হইলেন নাই। মানুষ আপনাকে দলি না দিলে বিধাতার ক্রোধ নহেন না, নববলি আবশ্যক। কিন্তু বিধাতা ককণাময়; তিনি দেখিলেন, আমি নিষ্কর্য না করিলে মানুষের পবিত্রাণ নাই। অতএব তিনি পুত্রকে মর্ত্যলোকের দান করিলেন। এই পুত্রই খ্রীষ্ট; পিতাপুত্রে কোনও ভেদ নাই; পিতাপুত্র উভয়ে এক। ঈশ্বর এত বড় ছুই নহেন। কিন্তু পিতাও যেমন ঈশ্বর, পুত্রও তেমনি ঈশ্বর। এ এক রকম অচিন্ত্য ভেদাভেদের ব্যাপার। ভেদ নহেন ভেদ নাই, এ হৈমালি মানুষের অধিগম্য নহে। যাহাই হউক, খ্রীষ্ট যাহার দেব ধর্ম্ম অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একাদারে যোল আনা ঈশ্বর এবং যেমন মান্দিব মানুষ; পবিত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র মানুষ। পরিপূর্ণ মানুষ বলিয়াই তিনি সমস্ত মানবজাতির প্রতিনিধি। তিনি আপনাকে দোষাপূর্বক দান করিয়া অর্পণ করিলেন। তাঁহার দ্বারা মানবজাতির পাপ একবারে মুইয়া গেল। নিষ্কর্যেব ব্যাপার। মানুষ আপনাকে অর্পণ করিতে পারিল না; কিন্তু মানুষ হইয়া নিষ্কর্য স্বরূপ মানবজাতির প্রতীকরূপে আত্মোৎসর্গ দ্বারা নতুন চড়িয়া প্রাণ দিলেন। ইহা হইল vicarious sacrifice, ইহা এক রকম বস্ত্র। এই একমাত্র যজ্ঞে মানুষের পাপ মোচন হইয়া গেল। জীবনোৎসর্গ বস্ত্রের আবশ্যকতা থাকিল না; জেহোবা মান্দিবে যাব পণ্ডবনিবও আবশ্যকতা থাকিল না।

দেবগণই সমাজে নন্যুজ্ঞ প্রচলিত ছিল না; তবে নববস্ত্রের দ্বারা দেবগণের তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। একের বদলে অতকে নিষ্কর্যরূপে অর্পণ করা ঘটনাপ্রসঙ্গে, ঐত্তরব ব্রাহ্মণ আখ্যায়িকা দ্বারা তাহা ব্যাখ্যিত হইতেছে। এই দেশে নান্যুজ্ঞ

বলিতেছেন। বরাকানে দেবগণ মন্তব্যকে পশুরূপে আলাভন অর্থাৎ যজ্ঞার্থে বধ করিতে উক্ত হইয়াছিলেন। সেই মনুষ্য হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং আশে প্রবেশ করিল। অথ তখন মেঘা হইল। মেঘা শব্দের অর্থ যজ্ঞযোগ্য, দেবতাকে অর্পণযোগ্য। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সেই মনুষ্যকে দেবতারা বর্জন করিলেন; সেই মনুষ্য তখন কিস্পুরুষ হইল। দেবতারা আশে প্রবেশ করিতে উক্ত হইলেন। সেই অর্থ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল, এবং গরুতে প্রবেশ করিল; তদবধি গরু মেঘা হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দেবতারা বর্জন করিলেন; অর্থ তখন গৌর যুগ হইল। দেবতারা গরুকে আলাভনে উক্ত হইলেন। গরু হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিয়া মেঘে প্রবেশ করিল; তদবধি মেঘ মেঘা হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত গরুকে দেবতারা বর্জন করিলেন; সে গরু গবয় হইল। দেবতারা মেঘের আলাভন উক্ত হইলেন। সেই মেঘ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং ছাগে প্রবেশ করিল। সেই ছাগ মেঘা হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত মেঘকে দেবতারা বর্জন করিলেন; সেই মেঘ উষ্ট্র হইল। যজ্ঞভাগ সেই ছাগে বহুকাল পরিত্যক্ত অবস্থিত ছিল। দেবগণ পশুদ্বয়ে ছাগ, পশু যজ্ঞার্থে শ্রেষ্ঠ দেবতারা ছাগের আলাভনে উক্ত হইলেন। সেই ছাগ হইতে যজ্ঞভাগ পলায়ন করিল এবং পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তদবধি পৃথিবীই মেঘা হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত দেবগণ ছাগকে বর্জন করিলেন; সে শরভ হইল। যজ্ঞভাগ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার এই সকল পশু অমেঘা অর্থাৎ যজ্ঞের অনুপযুক্ত। ইহা অব মনুষ্য তোজন করিল না। দেবতারা পৃথিবীতে প্রবেশ যজ্ঞভাগের অনুদান করিয়াছিলেন। তখন সেই যজ্ঞভাগ ত্রীহি পাত হইল। সেই ত্রীহি পাত হইতে প্রস্তুত পুরোডাশ দান করা হয়। ইহাতে পশু-সামগ্রীতে ফল পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্যেও এই আখ্যায়িকা প্রায় এই আকারেই আছে।

এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ইষ্ট যাগে, এমন কি যজ্ঞযোগ্য এবং সোমযোগ্য পুরোডাশ আহুতি দেওয়া হয়। অধিকাংশ বৈদিক যজ্ঞেই পুরোডাশ আহুতির প্রথা চলিত হইয়াছিল। পশু যোগ্যের আহুতি ক্রমশঃ অস্তিত্ব হইতেছিল। পুরোডাশ ইষ্টযোগ্য পশুযোগ্যের ন্যায়ই আহুত হইত না। পশু যোগ্য বা সোম যোগ্য পুরোডাশও ছিল; কিন্তু পশু যোগ্য নির্দিষ্ট হইবার স্থিতি ছিল।

কয়টি পুণ্ড্র দিতে হইবে, তাহার সংখ্যা বাধা ছিল। নিষ্কট সংখ্যার বৈদিক
দিবার উপায় ছিল না। নিষ্কট পুণ্ড্র সংখ্যা বাধা অবশ্য কর্তব্য হইলেও বসন্তের
মধ্যে একবারের, জোর দুই বায়ের, অধিক কবিতে হইত না, তাহাতেও
একটিব অধিক পুণ্ড্র দরকার হইত না। দেবতার গ্রীতির মত কাম্য বসন্ত
যাহারা পুণ্ড্র বলি দেয়, তাহারা ইচ্ছামত সংখ্যা বাড়াইতে পারে। এ কারণে
দেবী-পূজার গরিব লোকে একটা বলি দেয়; সম্পন্ন লোকে দুই বলি দেয়।
বৈদিক যজ্ঞে কিন্তু ইচ্ছামত পুণ্ড্র সংখ্যা বাড়াইবার উপায় ছিল না। বসন্ত
যনী যোগের কাম্য যজ্ঞে—অবশেষে ধান ও মা চলিত হইয়াছে। ইহাই নিষ্কট
হইতে পারিত; কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের নিত্য যজ্ঞে বহু পুণ্ড্র দরকার হইত না।
বৈদিক যজ্ঞের পুণ্ড্রতার একটা মহামারী হইত, এইরূপ মনে করিবার
সময় হেতু নাই। যে সময়ে পুণ্ড্র বসন্ত লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিতছিল ইহা
মনে করাই দরকার। প্রাচীন প্রথা একবারে ত্যাগ করা যায় না—বিশেষতঃ
প্রাচীনতানে। তখন পুণ্ড্র বহু বাধা হইত, তাহা আরও প্রাচীনতানের
survival মনে করা যাইতে পারে। পুণ্ড্র বসন্তে কটি দেওয়াই তাৎপর্যবাহী
এই। ব্রহ্মবাদীরা বলিতেছেন, পুণ্ড্র মাংসের বদলে কুম্ভারিত মল না চুটাই
দিলেই পুণ্ড্র দেওয়ার ফল হইবে। ইহাই নিষ্কট; পুণ্ড্র পরিবর্তে নিষ্কট
প্রয়োজ্য। জামি যে উপাখ্যান শুনাইলাম, তাহাতে ব্রহ্মবাদীরা
বলিতেছেন, যে তৎকালে যজ্ঞে নরনাশ দেওয়াই প্রথা ছিল; কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা
তাহা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নর পুণ্ড্র বসন্তে ক্রমাগত ধোঁড়া, গরু ভেড়া
ছাপাল, অবশেষে ধান ও মা চলিত হইয়াছে। ইহাই নিষ্কট।

যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে তিনটা পণ্ডিতী মতের উল্লেখ করিয়াছি; সমাধের অঙ্গি
যজ্ঞের তিনটা স্তরে তিনটা মত। প্রথম স্তরে দেবতার আর্পণাদান করিয়া দেবতার
ধোঁড়াক যোগাইরা তাহার গ্রীতিসাধন এবং তাহার নিষেধে আর্পণাদান।
দ্বিতীয় স্তরের উদ্দেশ্য কোনও কিছু অর্পণ করিয়া দেবতার নিকট যত্না নীকাদান।
এখানে দেবতার লাভালাভ দেবার দরকার হয় না। কেবলো নিষেধ।
বাস্তবে অবশ্যে ক্রিমি দিলেও বিশেষ হানি নাই; নিষ্কট রূপে তখন
ক্রিমি দিলেও চলিতে পারে। মাংসের পরিবর্তে কটি দিলেও চলবে। জামি
উক্ত তৃতীয় স্তরে স্বর্গ অর্পণের স্থানে একবারে স্বর্গত্যাগ আদিম
ত্যাগটাই তখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বৈদিক যজ্ঞস্থলানে এই ত্যাগটাই
প্রথম পদ হইয়াছিল দেখা যায়। তাহা এই ত্যাগটাই প্রাচীন দিগ্ভিষম।

প্রতিশ্রুতি গণিতাধা যাই কোনও হুবা ভাগ্যবশে নাহি যজ্ঞ। আমি সোম, ইন্দ্র
প্রভৃতির উদ্দেশে যে কোনও যোগে অঙ্গুষ্ঠা যজ্ঞমানের পক্ষ হইতে আহুতি
দিবোম; যজ্ঞমান তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিতেন এবং আহুতির পব ভাগ্যমন্ত্র
পড়িতেন। ভ্যাংমন্ত্র ইন্দ্র ভাগ্যে—ন মম, ইন্দ্র সোমায়—ন মম, ইন্দ্র ইন্দ্রায়
—ন মম, এইরূপ আকাবেব। ভ্যাংপর্য্য এই যে দেবতাকে সর্ব্বপ দিতে
হইবে; যদি কিছু গিরজনা, তাহাই দিতে হইবে। সর্ব্বতোভাবে আত্ম সমর্পণ
করিতে হইবে। আরেব নিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলিলে না। তবে মানুষ সর্ব্বপ
দিতে পারে না, আত্মসমর্পণ করিতে পারে না; আপনাকে দিতে পারে না;
এই নিজস্বরূপে অল্প কিছু দিতে হয়। এই নিজস্ব ভ্যাংপারের কথা বেদের
দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক স্থানে
জ্যেছে, যে যজ্ঞমান সোমযোগে নীক্ষিত হয়, সে সকল দ্রাব্যতার নিকটেই
আপনাকে আনন্তনে (অর্থাৎ আত্মসমর্পণ) প্রবৃত্ত হয়। সে সকল দ্রাব্যতায়
নিকটেই আপনাব বদলে পণ্ডকে নিজস্ব করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিজস্ব
মন্ত্রটি স্পষ্ট ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ভ্যাংপর্য্য হইল যে, ঐ
যোগে যে পণ্ড দেওয়া মান, সেই পণ্ড যজ্ঞমানেরই প্রতিনিধি।

সোমযোগেই বলিয়াছি হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হয় না।
আগ্নিতে যোগের পব যে চুপ আহুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার ষোড়শ খাইতে
হয়। পূর্ব্বমাস যোগে পূর্ব্বোক্তানের স্ক্রিয়ংশ যোগের পব খাইতে হয়। পণ্ড
যোগেও পণ্ডমান্দ পানিকটা খাইতে হয়। সোম যোগের পূর্বে আমি ও
তোমাকে যে পণ্ড দেওয়া হইত, তাহার মাংস খাওয়া চলিবে কি না, তাহা
সইয়া একটা তর্ক উঠিয়াছিল। সোমের একটা কারণ ছিল। এই পণ্ড
ভোজনেরই প্রতিনিধি; যজ্ঞমান আপনাব বদলে এই পণ্ড দিতেছেন, তাহা
হইলে পণ্ডর মাংস ও নবমাংস, এই নবমাংস খাওয়া উচিত হইবে কি না?
কোনও কোনও ব্রহ্মবাদী এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সেই
আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নিজস্ব যিগোবির সমর্পণ
হইলেও এখানে অগত্য তাঁহাকে অল্প দ্রব্যোবির আগ্নয় দিতে হইয়াছে।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, অধিব ও সোমবে" সাহায্যে ইন্দ্র বৃজ বধ করিয়া
ছিলেন। তিনি বৃজবন্ধের পব চুষ্ট হইয়া অগ্নি ও সোমকে বধ দিয়াছিলেন
যে সোমযোগের পূর্ব্বদিন যে পণ্ড দেওয়া হইবে, তাহা তোমরাই খাইবে; ইহাই
তোমাদের পুরস্কার হইবে। এক নিম্নাঙ্গে নিজস্ব দ্বিত্ববিটা উল্টাইয়া গেল।

পশুর মাংস নয়মান কি না, সেইরূপ খ্রীষ্টানদের মধ্যেও তরু উঠিয়াছিল, যতদূর ঐটি ও মদ খ্রীষ্টের রক্ত ও রক্তে পরিণত হয় কি না? বস্তুতই উহা রক্ত মাংসে পরিণত হয়, তাহা কোনও কেমিষ্ট বলিতে পারিবেন না। অথচ সমস্ত খ্রীষ্টান এক সময়ে একদোণে বলিতেন যে উৎসর্গের পব কটি রুটি থাকে না। হ্যাঁ নদ থাকে না; সত্য সত্যই রক্ত মাংসে পরিণত হয়। ধার্মিক ভক্ত, তাহা বা সত্যই দেখিতে পাইতেন, উৎসর্গ রুটি হইতে রক্তবিন্দু ফারিত হইতেছে। ইহাও কটির এইরূপ রক্ত মাংসে পরিণতির নাম transubstantiation। রোমান এবং গ্রীক চার্চের সকল লোকেরই অর্থাৎ বার আনা খ্রীষ্টান এই বিশ্বাসাবলিতেও এই অলৌকিক পরিণতি ব্যাপারে বিশ্বাস করেন। গুরুকর ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এখনই রাসায়নিক বিশ্লেষণ কবিতা দেখাইবেন। যে রুটিতে মধ্যে কেন্দ্রই starch আছে; উৎসর্গ দ্বারা উহা proteidএ পরিণত হইয়াছে। তাহান শিক্ষাবানীত আমাকেও সেই রূপার গায় দিতে হইবে। অথচ ইউরোপের অধিকাংশ লোক এখনও বিশ্বাস করে, ঐ রুটি আর কটি থাকে না; মদ, গার থাকে না। এই বিশ্বাসে আশ্রিত কবিশে তাহাদের জীবনের প্রতিচ্ছিন্ন হইয়া গাইবে।

আর্য্য বাহুল্যে গল্প নাই। এ বিষয়ে আবার আমাকে আদিত্তে হইল। খ্রীষ্টীয় সময়ে এবং দেবপত্নী সময়ে বজ্রাঘাতানের তাৎপর্ষ্য যে একই রূপে তাহা দেখাইবার দ্বন্দ্বই এ প্রবন্ধ আমি তুলিয়াছি। খ্রীষ্টানের দেবতা হিউসার দেবতারই রূপান্তর; হিউসার দেবতা রক্ত মাংস হই চাহিতেন; তাই খ্রীষ্ট রক্ত মাংস হই দিয়াছিলেন। নদ হইল রক্ত; রুটি হইল মাংস। আমাদের দেশে অধুনিক কালে মহাদেবী রক্তমাংসবলিগ্রিয়া। কিন্তু বৈদিক সেনাভাবা রক্তপিয় ছিলেন না। পশুর রক্ত বাক্যসেরা পাইত; দেবতার। কেবল মাংসেই সমস্ত পাকিতেন। পুরোডাশ বা রুটি মাংসের স্থানীয়। খ্রীষ্টানের রুটি যেমন মাংসহানীর, আমাদের রুটিও তেমনই মাংসহানীর। রক্তটা গেল কোথায়? এতদেব রক্তমাংস তাহার উত্তর দিতেছেন। এতদেব রক্তমাংস বলিতেছেন,—নিঃসঙ্কোচে বলিতেছেন,—এই যে পুরোডাশ রুটি, এতদেব। পশুবই আলম্বন হয়; যে যব বা ধান হইতে পুরোডাশ প্রস্তুত হয় তাহাতে যে কিংকার বা গুড় লাগিয়া থাকে, তাহাই পশুর গোম। যে পশু থাকে, তাহাই পশুর চর্ম। যে রুটি প্রস্তুত হয়, তাহাই মাংস। যে দুগ্ধ ফেলিয়া দেওয়ার হয় তাহাই রক্ত। কুলাদ বাড়িয়া ভ্রূষর এবং ফুলের কণা

বাণিজ্য সেওরা হইত এবং যোগাশয়ে উহা রক্ষাদিগকে দেওরা চাইত, ইহা দুর্গমান বাণ প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এইরূপে বাবুসেরা তাহাদের গোপ্য রক্তের ভাগ পাইত।

আমাদের দেবতার বক্তৃতা চাহিতেন না। ঐষ্টানের যজ্ঞ রক্তের ধনে মাংস দিতে হয়। বৈদিক যজ্ঞে দুই একটা স্থলে সুরাব প্রচলন দেখা যায়। সৌত্রায়নি ষাণে সুরাব প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয় রাজাদের রাজস্বের বহু ভাগে সুরাব প্রচলন দেখা যায়। সাধারণতঃ যজ্ঞে সুরাব চালিত হয়। কিন্তু তখন একটা মাতৃক দ্রব্য চলিত। উহা যোগ্যলভ্য রস। যোগ্যলভ্য রসে এইবার বসিতোঁচাই। আপনায় যোগ্য ধরিত্ত প্রস্তুত থাকুন।

শ্রীরামেন্দ্রজন্মদিবসী।

ব্রাহ্মেশ্বরম্ ও বহুকোটি ।

সময় হিসেবে গাড়ীতে চড়িয়া আসবা অংশন ষ্টেশনে আসিয়া বাসাবাসে ফেরেন। জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গাড়ী-দেবে উঠিল হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা শুইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। সব রাত্রি গাড়ী চুটিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমরা শাহবাগে পৌঁছিয়া পৌঁছিয়া গরিলাম। ঐভাবে নিজাভঙ্গে দেখিতে পাইলাম, বেলগোমের উদ্ভিদ পান্থ নাবিকেলের বাগান। বাসুকায় ভূমির উপর স্থানে স্থানে গাড়ী গাড় চরিতেছে। কচিং দুই একটা লোকালয় অনেকক্ষণ পলে গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া বাসিল। গাড়ী-বাড়িগণকে এখানে আটক করিয়া রাখা হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া জন্মবর্তি দিলে পরে ইহার দক্ষা বাইতে। জন্মবর্তনের নিমিত্তেই কুটীরগুলির মধ্য হইতে বহুসংখ্যক স্ত্রী আমাদের আগে দিলে। কোতুলনের সহিত চাহিয়াছিল। ক্রমে বেলগোমের উদ্ভিদ পান্থ দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল জল দেখা বাইতে লাগিল। অবশেষে ভূমি দেখা হইল। আমরা ষ্টেশন সমুদ্রের উপরে গেলুম। দিগন্তবিস্তৃত বাবেধব সাজ-বেস্তিত একটা দীপের উপর অবস্থিত। পূর্বে ক্ষারভূমি হইতে দীপাবে রাসেশ্বর বাইতে হইত। কিন্তু উদ্ভয়ের মধ্যবর্তী দক্ষা পান্থ সমুদ্রের উপর একটা সেতু নির্মিত হইয়াছে। সেতু

উপর হইবে সমুদ্রের শোভা অসি অক্ষর দেখাইতেছিল। সমুদ্রের গাঢ়াভে
 দিলিগে বায়ে—যত দূর দেখা যায়, নীল জল। জলের উপর ক্ষুদ্র
 ক্ষুদ্র ভবন ভবনস্বরূপ উপর সুরকিন্দণ কীড়া করিতেছিল। দূরে, হায়ে
 হায়ে, সমুদ্রের নীল বর্ণ গাঢ়তর হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপের অবস্থান নির্দেশ
 করিতেছিল। রেনগুরে-সেতুর হস্তগুলির চারি পানে বড় বড় প্রস্তর
 গুপ্ত দিয়া গুপ্তগুলিকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভবনগুলি সেই সকল
 প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিয়া গড়া করিতেছিল। ক্রমে আমবা পর্বপারে
 উপস্থিত হইয়া পশ্চিম দিশে উপস্থিত হইলাম। এখানে গাড়ী সন্ধান পাড়াইরা
 পানরায় চলিতে লাগিল। পানরায় দৈর্ঘ্যই বাসেশ্বর। যে মহাদীর্ঘের নাম
 কজিয়া আমবা ক্ষুদ্র বদদেশ হইতে বাহ্য করিয়াহিন্দান, তথায় উপস্থিত
 হইবার জন্য আমবা ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। উভয় পাশে সন্নিহিত নারিকেল
 বৃক্ষের বাগানের বন্য দিয়া গাড়ী ছুটিতে ছুটিতে যথাসময়ে বাসেশ্বর গেলেন
 উপস্থিত হইল। পূর্বে হইতেই বামাদের পাণ্ডা স্থির ছিল। ট্রেণ হইতে
 হেনিমপত্র নামাইয়া আমবা গাড়ীতে বাসেশ্বরের বসিকান। গাড়ী চলিতে
 লাগিল।

আমাদের পাণ্ডা মহাবাজের বাটা মহাবাট্ট দেশে। কয়েক প্রহর ধরিয়া
 এখানে তহাদের বাস। গুলিলাম, এখানকার অধিকাংশ পাণ্ডাই মহাবাট্ট দেশ
 হইতে আসিয়াছে। কাবণ, দক্ষিণে তহাদের ব্রাহ্মণগণ আদ্য নহে। বাসেশ্বরে
 বহুসংখ্যক পশ্চিম লোক দেখিতে পাউলাম। তাহারা নানা কার্য উপলক্ষে
 এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। আমরা প্রথমে আমাদের পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে
 পরিচালিত এক ধর্মশালার উপস্থিত হইলাম। সেখানে স্নানাদি শেষ করিয়া
 মহাদেবের মন্দির ভিত্তি মন্দির-তত্ত্বাবধানে চলিলাম।

মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রবেশ-পথের উপরে একটি নাতিবৃহৎ গোপুরম।
 তাহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিলে মন্দিরভিত্তবে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান
 দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোকান দোকান শব্দ, বিষ্ণুক, ছবি, কড়ি প্রভৃতি
 বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ। দোকানগুলি ব্যতিক্রম করিয়া আমবা মন্দিরের
 হ্রিগীর্জা বাসেশ্বরগুলির মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বাসেশ্বরের মন্দিরের
 বারান্দাগুলি দেখিবার জিনিস। দুই পাশের হ্রিগীর্জা তন্ত্বেব শ্রেণীর মধ্য দিয়া
 চলিবার পথ। বারান্দা এক দীর্ঘ প্রান্তে পাড়াইরা অপর প্রান্তেব দিকে
 দুইপাশে করিলে নবন হ্রিগীর্জা ক্রমশঃ ছোট হইয়া গেল প্রান্তে অতিশয়

কুজ আশার খাবণ কবিগাছে, এবং ছাদ ও মেঝে নধুবর্তী অবস্থা। তাপ
প্রান্তে গিয়া একটি ক্ষুদ্র রুদ্ধ পরিণত হইয়াছে। শুভ্র শুভির পাত্র ছা-
বাদিব কাজ। সূতরাং তাহার উপরের শিল্প কার্যগুলি বহু স্থান নষ্ট হই-
গিয়াছে। ছাদেব উপর বিচিত্র বর্ণের ছবি। কোথাও শিল্পকার্য ও ছা-
প্রচুবপরিমাণে বিজ্ঞান, কোথাও বা তাহা বিলুপ্তপ্রায়। আমরা চতুর্দিকে
বিস্তৃত বাবাণ্ডার অধিক অংশ অতিক্রম কবিয়া মন্দিরের বিপরীত ভাগে
উপস্থিত হইলাম। এইখানে, অর্থাৎ মন্দিরের পূর্ব ভাগে—প্রধান প্রবেশদ্বার
ইহাব উপস্থিত। পৌপূরম্টিও অতিশয় উচ্চ। এই পূর্ব দ্বারে পানাপান
হইয়া বৃহৎ দ্বার অবস্থিত। একটা—যেট বৃহৎ—যেটির দ্বা দিয়া প্রবে-
কবিয়া গোজা চলিয়া গেলে, মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইদৃ-
দ্বার হইতে পার্শ্বতীর্থ মন্দির পর্যন্ত আব একটা পথ সরাসরানে বিস্তৃত।
মহাদেবের মন্দিরে বাইবার পথে একটা সুবর্ণমণ্ডিত ধ্বজাশূল ও একটা বৃহৎ
বৃক্ষ-গুর্বি দেখিতে পাইলাম। রামেশ্বরের শিবলিঙ্গ দুবে দাঁড়িয়া বসিয়া
হয়। পাণ্ডা ব্যতীত কাহারও নিকটে বাইবার অবিকার নাই। পাণ্ডা
দিগের শিবলিঙ্গের উপর গঙ্গাজল ঢালিবার নিয়ম আছে। পাণ্ডাদের নি-
গঙ্গাজল কিনিতে পাওয়া যায়। এই গঙ্গাজলের মূল্য কিছুপা তাহা দ্বার
কুবাইবার জন্ত ইহা বণা বাইতে পাবে যে, এক গ্রামজলের মূল্য ৩০। ৪০ টা
হইবে। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, এই গঙ্গাজল গঙ্গোত্তীর্ণ হইতে প্রায়
চার পাঁচরুজ ও শুদ্ধ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা
হইলে নাম এইরূপই হইবার কথা। এই বহু মূল্যে ক্রীত গঙ্গাজল খাতীরা
ঢালিতে পারিবে না। পাণ্ডারা ঢালিয়া দিগেন, যাত্রিগণ দুই হইতে দেখি-
নরন সার্বক কবিবে। এখানকার ভারতবিখ্যাত শিবলিঙ্গটি ক্ষুদ্র। এ
প্রধান মন্দিরের উত্তরে কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দির, দক্ষিণে কিঞ্চিদূরে পার্বতী
মন্দির। আমরা যে সন্মুখ গিয়াছিলাম, সেই সমস্ত মন্দিরম্ ক্রান্তান্তরে গংগা
কায়া চলিতেছিল। বহুসংখ্যক কবিকর প্রকৃতবে উপর বিবরণ বৃদ্ধি দ্বা
অবলীলাক্রমে ফুট ইয়া তুলিতেছিল। তাহাদেব পাথর কাটিবার ক্ষমতায়
মিলিত শিল্পে মন্দির ভাস্কর্য মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মন্দিরের দাতার
অতিশয় জনতা।

মহাদেব দর্শন করিয়া আমরা পার্শ্বতীর্থ মন্দিরে চলিলাম। এই মন্দিরে
স্থিত দীর্ঘ প্রাঙ্গণের উপর বহু কক্ষ-প্রাঙ্গণ-নির্মিত স্তম্ভাঙ্কিত বসন

নিরাজমান। পার্শ্বতীর্থ মন্দিরের মধ্যে আসোক ও পাতালের উপকূল
প্রবেশপথ নাই। দর্শনাস্তর আনন্দা ধর্মশালার প্রত্যাবর্তন করিলাম।

অপরান্তে অকারাদি শৈব কবিতা বিস্তার করিতে লাগিলাম। ধর্মশালার
স্ববিস্তৃত প্রাঙ্গণেব চারি দিকে তীর্থযাত্রীদের হুসু কুসু মলগুলি বিস্তৃতভাবে
নিষ্কৃত। ছোট ছোট বাসকবাজকাগ খেলা করিতেছিল। অধিকাংশই
শিষ্টহীন যাত্রী। কিন্তু তাহা স্মৃতিত পঙ্কজ, গুজরাট, বোম্বাই প্রভৃতি
এদেশের লোকও ছিল।

বাস্তবিকের রামতীর্থ, লক্ষণতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি সরোবর আছে। এই
সকল সরোবরে ঘান করিবার নিয়ম। সরোবরেব জল তত নিম্নল নামে।
এতদ্ব্যতীত মন্দিরের মধ্যেই বহুসংখ্যক তীর্থ আছে। আদ্যমধ্যস্থ তীর্থগুলি
সাধারণতঃ এক একটা কূপ; দুই চারিটা গুরুবিশিষ্ট আছে। এই তীর্থের
নাম,—যক্ষতীর্থ, নল, নীল, গায়, গঙ্গা, যমুনা, সবমতী, সাবিত্রী,
পার্বতী ইত্যাদি। এই সকল তীর্থের জল অতি নির্মল ও সুমিষ্ট।
রামধর্মের অধিবাসীগণ এই সকল তীর্থের জল পান করিয়া থাকে।

মন্দিরের পূর্বেও দক্ষিণে—অতিনিকটে সমুদ্র। আনন্দা আশ্রিন নামে গিয়া
ছিলাম। সে সময় দেখিলাম, সমুদ্রের জল প্রবাহিত। দূরে নীল সমুদ্রের
উপব হ্রদ পাশ তুলিয়া দিয়া ছই চারিখানি নৌকা ভাসিতেছে।

মন্দিরের নিকটে শঙ্কবাচার্যের মঠ। ইহা অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার। এক কাল
বোধ হয় ইহা রজ্জ সন্যাসিসমাকুল ছিল। একগণে এখনি শঙ্কবাচার্যের প্রতিষ্ঠিত
গৌতম শিবসিদ্ধ ও কয়েকটা চিত্র মন্ডল লইয়া মঠের অরসংখ্যক সন্ন্যাসী
মঠপ্রতিষ্ঠাতার প্রবিত্ত স্মৃতিচিহ্ন তদা করিতেছেন।

রামধর্ম-প্রাঙ্গণের বাসকবাজ দেখিতে যেন ভুল না হয়। এখান মনোহর
দ্রুপ অতি অস্বাভাবিক গিয়াছে। লোকালয় হইতে বাসকবাজ পথ দিয়া প্রায়
দুই মাইল বাইতে হয়। হালতী একটা উচ্চ ভূমিক উপর অবস্থিত।
এখানে শ্রীবামচন্দ্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির পদচিহ্নের উপর একটা দ্বিতল
মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। দিল্লের উপর আনোহব করিলে চতুর্দিকের
সামুদ্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হয়। নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসমূহ ছাড়ািত বনভূমি।
আগে বনবাসিনের মধ্য হইতে রামধর্মের গোপবর্ম দুইটা সমুদ্রতীরে
মণ্ডলমান। চারি দিকে সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃত নীল জল। নৌকার গমনক্ষীত
ভাঙ্গা পাল। নীল সমুদ্রের গায়ে খেঁচ দিলে জায় দেখা যাইতেছিল।

ধনুকোটা হইতে লক্ষ্মাবাত্রী গ্রামাশেষ ধূসে দক্ষিণ দিকের নিকট-আম
একটু মলিন দেখাইতেছিল। পশ্চিমে সমুদ্রের পান পায়ে ভাব্যতাবেন
ভূমি “ধাবানিবন্ধ-কলঙ্কোষা”র আশ্রয় দোভা পাইতেছিল। বহুকো
সেই নন্দনবনোহর ছবি দেখিলাম। সমস্ত মিনি আকারের উচ্চ
বিচরণ করিয়া স্বর্গদেব রক্তবর্ণ ধারণ কবিয়া পলিমাকাশের গায়ে দি
পড়িতেছিলেন। স্বর্গের যুদ্ধ রন্ধিতে বনভূমির শিবোদেব রন্ধিত
উঠিতেছিল। চারি দিক বধন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আমরা মিনি
সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া আনিলাম।

বাসেশ্বরকায় পদতলে একটা হুম্মানেব বসিয়া আছে। তত্ত্বতা
বাত্রীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া হুম্মানজীর প্রদান ছোলাসিদ্ধ ও মিত্র
করিতেছিলেন। অদূরে একটা কূপের জল পান কবিয়া শরীর মিত্র হইয়া
প্রবাদ এই যে, সীতাদেবীর তৃষ্ণা-নিবারণার্থ ভগবান শ্রীযামচন্দ্র তাঁর
ভূমি-তেদ কবিয়া এই স্মৃষ্টি জল আনয়ন করিয়াছিলেন।

ধনুকোটা তীর্থ বামেশ্বর হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বে
বহুকোটা পর্যন্ত রেল হয় নাই, তখন ধনুকোটা যাত্রা অতি কঠিন ছিল। এ
রেল হইয়াছে। গঙ্গা যাইবার এই প্রধান পথ। এবং ধনুকোটা পর্যন্ত পথটা
শুদ্ধ অনাগানসাধ্য মতে—অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়াছে। বেলা নট
আমরা ট্রেনে উঠিলাম। সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমির প্রায় সফল প্রদেশ হইতে
থাগত বাত্রী দ্বারা গাড়ী পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কয়েক মিনিট তালবোঝ
নিয়া অগ্রসর হইয়া আমরা সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলাম। বামে ও দক্ষিণে
সমুদ্রদেশে—অনতিবিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর দিয়া—বোম্ব চলিয়াছে। সে শো
বর্ণনার অতীত। উভয় পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত নীল জল। হই চারিদিক হুম্মা নো
ক্রকবিকুর স্থান দেখা যাইতেছিল। দীপগুলি গাঢ় বর্ণের প্রসোপেয়, তখন তে
হইতেছিল। বামের সমুদ্র হ্রদের মতো স্থায় স্থির। দক্ষিণে সমুদ্র সে
গর্জন করিতে করিতে ভয়ানক তরঙ্গ তুলিয়া তটভূমিতে আঘাত করিতোহম
বহুশব্দ এই ভাবে চলিয়া আমরা ধনুকোটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। যেখানে
স্থান করিতে হয়, সে স্থান এখন হইতে দেড় মাইল হই মাইল দূরবর্তী। এ
আধ বর্টা পথে একটা ট্রেন ছাড়িল। এই ট্রেন আমাদিগকে ধনুকোটা তীর্থ পথ
গোড়াইয়া দিয়া। ভূমি এখানে শেষ হইয়াছে, এবং বাউন্স ও দক্ষিণে
এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ধনুকোটার ভিতর তরঙ্গভঙ্গ অতি পনোহর

সমুদ্র ও দাবিগণের সমুদ্র বেধানে নিমিত্ত হইয়াছে, সেখানে তবদন্তুগুণি
 : একটাই হইয়া এক শ্রেণীর পক্ষান্তর আন একটা শ্রেণী, এই ভাবে, নীল সমুদ্রের
 জীব শিশুর মতের হৃদয় ভুল শোভা কিরীণ কবিত্তে করিতে বহুদূর পর্যন্ত
 চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্র দর্শক এই স্তন্যব অনন্ত স্থিতির, অসীম-বহু, ভী-
 ত্যাক্তি ও নীলকের ত্রাফ চঞ্চল ক্রীড়ামীলতা—এই সবগুলি মিলিয়া সমুদ্রকে
 পর্যবেদন অভিযান চিত্তাকর্ষক কবে। কিন্তু ষষ্ঠদোস্তী তীর্থে সমুদ্রের যে শোভা
 দোখিয়াছি, আর কোথাও সে হবি দেখি নাই। উজ্জ্বল স্তন্যবিশিষ্ট আকাশ,
 নীল দীপ্তবিস্তৃত সমুদ্র। চারি দিকে নীল জল, কেবল এক খণ্ড সঙ্গীত ভূমি
 এল টি-টী ভীষভূমির সহিত বোণ কবিতা বাঁধিয়াছে। সেই ভূমিখণ্ডের উপর
 বাঁধিয়াছে কত ক্ষুদ্র ও কত তন্ননংখ্যক বলিয়া বোধ হইল। এই বিশাল
 ক্ষুদ্র মধ্যে মনুষ্য কি ক্ষুদ্র!—কত ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, কত ক্ষুদ্র শক্তি, কত অজ্ঞান
 প্রেরণ কত ক্ষণস্থায়ী জীবন! শতাব্দী তাহা জানিয়াও ভুলিয়া যায়, এবং ক্ষুদ্র
 জীবন পরিণাম তাহার ক্ষুদ্র স্বয়ং ক্ষুদ্র ছেদ ও হিংসার পরিপূর্ণ করে। এক
 অক্ষণা বান সে সংসার হইতে আসিয়া এইরূপ স্থলে অয়ক্ষণ দাঁড়ায় তাহা হইলে
 সে তাহার ক্ষুদ্রতা স্বয়ংস্বয় কবিত্তে পারে, এবং যে সকল ক্ষুদ্র চেতন সে জীবন
 অতিবাহিত করে, তাহাদের অনন্ততাও উপলব্ধি কবিত্তে পারে। হে নানব!
 এই ক্ষুদ্র, ক্ষণস্থায়ী সংসার হইতে মন হুলিয়া লও, এবং যিনি এই সৃষ্টির ত্রায়
 নিশাঙ্ক ও স্তন্যব, তেঁাদের নন তাঁহাতে আশ্রয় কব। তাহা হইলে শোক, ভীষণ
 দুঃখ, কষ্ট, সবই উত্তোষিত পদাশ্রয় হইতে চলবিন্দু ত্রায় ঝরিয়া পড়িবে।

মানুষের হইতে আমাদের সঙ্গে পাণ্ডুর পুরোহিত আসিয়াছিলেন। তিনি
 আশ্রয়দাতার সংকল্প কয়েকবার পূর্ব আমলা মান করিলাম। মান কবিত্তা এখন
 দাবিগণ উপর দিয়া রেলপথ-অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটা সাধু
 আশ্রয়দাতার তাঁহাদের আশ্রমে আশ্রয় করিলেন। অদূরে তাঁহাদের
 গার্গছাদিত দ্বারা আশ্রয় দেখে বাইতেছিল। এখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসী
 ভগবদারবনাগ্নি তাহাদের শান্ত ও পবিত্র জীবন অতিবাহিত কবিত্তা থাকেন।
 সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাস ও আনন্দিক ব্যবহারে অসম্মত। আগ্নায়িত হইলাম। তাঁহারা
 প্রাণদ খাইতে দিলেন, এবং তৎ হইতে অনীত স্তন্যব জল দ্বারা আমাদের
 গিপাসা দ্রব করিলেন। আমরা এখন চলিয়া আসিতেছিলাম, তখন একটা
 সন্ন্যাসী একটা স্নোলের উপর বসিয়া অক্ষরগুলি লিখিয়া দিতে অল্পবোধ
 করিলেন। সন্ন্যাসী হুঙ্কার বাজানো ভাষা শিক্ষা কবিত্তার জন্য তাঁহার আগ্রহ

মানব মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবীর কন্দিবেব সখ্যবর্তী দশআয় বসন্তাঙ্গী
প্রদীপ জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিগ্রহদ্বয় দর্শন করিয়া আশ্বাষা মন্ত্রে
হুসমে কিসিয়াম।

পর দিন প্রাতে তাহার রাজপ্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সুবহুঃ শুভ, উজ্জ
হাদ, এবং বড় বড় খিলান-সংযুক্ত রাজপ্রাসাদেব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতে
হয়। এখানে আপাততঃ সরকারী অফিস হইতেছে। কোথাও লেখা আছে—
Registration office; কোথাও লেখা আছে—Sub-collector's Court
একটা সুনন্দ ও সুবহুঃ শবনকক্ষ বিচাৰগৃহে পরিণত হইয়াছে। যে উচ্চতম উপ
উপব পানক পাতিয়া নুপতি শয়ন করিতেন, তাহার উপর হাঙ্গিরেব এতদায়
হইয়াছে; যে চুক্তিত হুম্মাতগে নর্জকীগণ নৃত্য গীত দ্বারা বাজার নিদ্রা আশ্বাস
করিত, সেখানে এতদেব সাক্ষীদিগকে হলক পড়াইয়া ধেরা করা হয়। বি
বিপদেব পরিণাম।

নগরেব কিছু বুবে তেঙ্গাকুলাম নামক ইহং সবেবর। সন্ধ্যাবেবক মধ্যে
একটা দীপের উপর মন্দির, এবং নানাবিধ ফলের বাগান। উৎসাহেব মন্দি
রদ্বয় হইতে সুনন্দেবের ও মীনাক্ষী দেবীর ভোগ-মুর্তি এই পুকারিবীর উপর
নৌবিহার করেন। সেই সময় চারি দিকে প্রদীপ দিয়া সাজান হয়, এবং অনেক
ভক্তদর্শক সমাগত হইয়া আনন্দ করিতে থাকে।

প্রীতিচৈতন্যেব বধন দক্ষিণ-মুখের বা বাহুরাতে আগমন করিয়াছিলেন। ভবন
এক জন বান্ধবতত্ত্ব ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণকে উপবাস
ও হুংখিত দেখিয়া প্রভু হুংখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্রভু কহে বিপ্র কাছে কর উপবাস।
কেন এত দুখে কেন করহ ওঁতাপ।
ত্রিশ কহে যোর জীবনে, নাহি প্রয়োজন।
এমি জনে অবৈশিয়া ছাড়িব জীবন।
তগব্রাতা মহাশাস্ত্রী সীতা চাকরাণী।
রাক্ষস পুর্নিব-ভাবে ইহা কানে গুনি।
এ শবীর মিবারে কহু না ধ্যায়।
এই দুঃখে জেলে ওহ-প্রাণ নাহি বিয়।
এ হুংবনে এ ভাবনা নাহি কর সার।
পুণ্ডিত ব্রহ্ম মনে নাহি করিছ বিচার।

ইন্দর-মেঘমা সীতা জিহবামুর্তি।
প্রকৃত ইতিবৃত্তে যে দেখিতে নাহি প্রতি।
পুর্নিবাহ বারী চাকর না পায় দার।
সীতার অকৃতি যথা হইল দার।
রাবণে আসিত সীতা অন্তরান কৈন।
রাবণে যাবে রাবা সীতা, দারাই।
অথাক্রমে বসন্তে প্রকৃত-মেঘেব
বৈদ-পুণ্ডিতে এই ভাবে নিবহর।
ব্রহ্মান করহ ভ্রাম আবার দার।
পুণ্ডরিপ বুড়াবনা না করিছ মনে।
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিচার।
ভোজন করিল হৈল জীবনের আনন্দ।

তাহার পর মহাপ্রভু সেতুবন্ধে গিয়া কৃষ্ণপুণ্ডাণ ভবন করিলেন।

নেমা ছিল যে, বাবগকে সেখিমা গীত, অদির ৭৭ হইলেন, এবং বাবগ মারা
সীতাকে ধারণ করিলেন। ভবন প্রভৃৎ এত মানস হইল যে, পুরাতন পুথি
এই অংশ বাক্য কবিয়া তাহা প্রাচীন পুথিতে সন্নিবিষ্ট করিলেন, এবং পুথি
সেই অংশ লইয়া দক্ষিণ-পূর্ববর্তে প্রত্যান্তরন কবিয়া বাবগকে বিপ্রকে সেই
অংশ পাঠ কবাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

বেলা তিনটার সময় বাজুবা হট্ট Ceylon Boat-mail এ চড়িলাম।
আজুবা হট্টে ত্রিচিনাপল্লী পথটি গতি স্থল। কখনও দুবে আকাশে গায়ে
খন নীল পর্কতশ্রেণী শোভা পাইতেছে; কখনও বেগলাইনে পাশেই ছোট
ছোট পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া আছে। ঘননিহন্ত তরলতা পর্কতগাত্র
মাথাছ দিত। তাহাৰ মধ্য দিয়া পাহাড়ে উঠিবার পথগুলি কৃষ্ণা বাকিয়া
নিপরে উঠিয়াছে। কোনও ছোট পাহাড়ব দিক মান্থান দিয়া মান পথটি
দিক সোজা ভাবে চলিয়া গিয়াছে,—যেন স্থানান্তর কোঁকড়ান চুলের মধ্য দিয়া
নোমা সিন্তে কাটা হইয়াছে। চারি দিকে পাহাড়ে রোমা অনিত্যতার উপর
নোমাও হই চারিটি ক্ষুদ্র হুট্টর, ওব সেগুলিকে বেগুন কলিয়া মস্তক্রে শোভা
পাইতেছে। এখানে বাহারা দাল হইতে বাকিয়া পথান্ত অতিবাহিত কবে
তোহাদের জীবন কি শান্তিময়। সন্ততার মকম আড়ম্বরের বিনিময়ে এই
শান্তিময় জীবন কত দুব বাঞ্ছনীয় বলিয়া বনে হয়। মনে ত হয়, বিশ্ব দারিদ্র্য ও
অভাবের গীড়নে এখানকার অধিবাসীদের বাস্তবিক জীবন কিরূপ, তাহা কে
বলিতে পারে? এখানকার ভূমি বেশ উর্বর। মস্তক্ষেত্রগুলি সমৃদ্ধিশালী।
মধ্যে মধ্যে ছই চাষিট কৃষকপন্ন দেখা যাইতেছিল। কৃষক ও কৃষকবনগীগণ
ক্ষেত্রে কাজ কবিতেছিল। বাসক-বালিক বা কুটবসংলগ্ন অঙ্গনে খেলা
কবিতেছিল। সূর্যালোক মুক্ত, হৃদয় হইয়া, অবশেষে স্নান হইয়া গেল। সন্ধ্যা
আদিয়া পৃথিবীর উপরেই এই স্তব্ধ বিচিত্র দৃশ্যের উপর তাহান অন্ধকার
বহনিকা ঢানিয়া দিল। আকাশে ছই চারিটি কলিয়া মস্তক হুট্টে লগিয়া।

সন্ধ্যার পর গাড়ী ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনে পহাছিল। ত্রিচিনাপল্লীতে গাড়ী
বল সন্নিষ্ট দাঁড়ায়া। ষ্টেশনে হিন্দুর হোটেল ছিল। আমল সেখানে ভাঙ
গাইলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিতে বাগিয়া।
ত্রিচিনাপল্লী ষ্টেশনে প্রভাত হইল। এখান হইতে মাদ্রাজ মেডু বর্টা পথ।
নেট টমাস মাউন্ট, সৈদাপেট, মরলম প্রভৃতি মাদ্রাজের উপনগরস্থ ষ্টেশনগুলি
অতিক্রম কবিয়া আটটার একট পূর্বে ভানবা মাদ্রাজের অন্তর্গত এগুমার
ষ্টেশনে পহাছিলাম।

রাজ্যের এখনিকার সত্যবদ্র গাড়ী নাই। সবশ্রমিত ফিটন গাড়ী। ইহান কারণ বোধ হয় এই যে, রাজ্যে অববো প্রাপ্য নাই, সুতরাং সেরেবের এক চাবি-নিচ-বন্ধ গাড়ীর প্রয়োজন হয় না। স্থানলোকেবা ফিটন-গাড়ীতে বসিয়া যাতায়াত করেন। এই গাড়ীতে মাল খেঁওয়ার সুবিধা নাই। যাহা হউক, একটা গাড়ী কদিয়া আমবা মীলাপুরস্থ বন্ধব বাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বন্ধব আবার অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া অপবাহে মীলাপুরস্থ শিবমন্দির দেখিতে গেলেন। একটা বৃহৎ বাধান সবেবরের পূর্ব দিকে এই মন্দির অবস্থিত। সবেবরের অপর তিন দিকে সুপ্রশস্ত রক্ষণ ও অট্টালিকা প্রাপ্য। মন্দিরের গোপুরম্ প্রশস্ত অর্ধন ও শিল্পবাস্তিগচিত চমক দেখিয়া আমবা সমুদ্র-অভিমুখে চলিলেন। সমুদ্রের দূরত্ব এতটী মন্দর রাজপথ আছিল; তাহাকে “মেরিনা” বলে। দিগন্তবিহীন নীল হলা ও তপস্ব্যভিহৃত তটভূমি দেখিতে দেখিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই স্মরণীয় পথে আমবা গাড়ী করিয়া ঘাইতেছিল। পূর্বের ধান প্রায়ই মাঠ—কটিং হই একটা গৃহ দেখা যাইতেছে। দুবে হাইফোর্ট, থ্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রাজ্যের মেনে আমবা কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া রাজি গাড়ী চলিল। এলোর ষ্টেশনে প্রত্যাত হইল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে গাড়ী গোদাবরী নদীর উপর উপস্থিত হইল। এই পুল ভ্রাতৃত্ববের মধ্যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবে। সাগরসঙ্গম-সন্নিকটে নদী অতি বিশাল-লম্বা ধান্য করিয়াছে। বিশেষতঃ সে বৎসর চিবায়ান বর্ষার ফলে শবৎকালেও নদী তল প্রায়কালি পারণ করিতে পারে নাই। প্রেরিক বর্ষের বারিরাশিতে গোদাবরী কূলে কূলে পূর্ণিপূর্ণ। তীব্রবিরাজিত বৃক্ষশ্রেণীব-পশ্চাতে নগর মন্দিরভাঙা দিয়া দেপা ঘাইতেছিল। বৃক্ষণ আমবা সে মন্দর দূর উপভোগ করিতে পারিলেন। অবশেষে পুল পার হইয়া গেল। গাড়ী নদীর তিক পার্শ্বেই অবস্থিত গোদাবরী ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ভীষণ জিগণ এইখানে নামিয়া থাকে। কিন্তু ইহার পর্বতী বাজামন্দির বড় ষ্টেশন। তেলেগু দেশের মধ্যে রাজ্যমন্দির একটা প্রধান নগরী। রাজ্য মন্দির ছাড়িয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে গোদাবরী-নদীলপুঠ ‘কেনেল’ (canal) বা খালগুলি দেখা যাইতেছিল। প্রায়ই মধ্যে নৌকা ভাসিতেছিল। তাহার উত্তর পার্শ্বে উচ্চ ভীরের উপর দিয়া লোক চলিতেছিল। ক্ষেত্রে প্রচুর

পরিমাণে শত্রু হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে আমবা জনপদ দেখিতে পাইতেছিলাম।
 বাটে হোফ জন স্নান করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা কক্ষস্থ কুস্ত পূর্ণ কবিতা জন হইয়া
 মৃগদবিক্ষেপে গৃহান্তিমুখে চণ্ডিতছে। সামনকোট জংসন ও টুনি ষ্টেশন পাব
 হইয়া মাড়ে বারটার সময় গাড়ী ওয়াশটোয়াবে উপস্থিত হইল। এইবার বি-এন্-
 দাব আনন্ত হইল। পথ আন শেষ হয় না। গাড়ী এক একবার বড় ষ্টেশনে দাঁড়ায়,
 আবার পূর্ণ বেগে চৌড়ায়। ভাবতবর্ষের পূর্বনীমাস্থিত প্রায় সম্পূর্ণ মৈত্র্যটি
 জননরা অতিক্রম করিতেছিলাম। বেনিন বোত্র তেমন প্রথম ছিল না। গাড়ী
 চানীয়াব মন্য দিয়া বাণ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া আমাদের ক্রান্ত শরীরে
 আঘাত করিতেছিল। উদ্ভূত প্রহতির স্তম্ভের দৃষ্টাবলী তাহাদের প্রাচুর্যে
 আমাদের চক্ষু ও মন অভিভূত করিতেছিল। দুপুব কাটিয়া গেল, বিকাল
 হইল, বিকালও ফুরাইনা গেল। সুর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢালিয়া পড়িলেন।
 গঙ্গার অন্ধকার পৃথিবীর উপর রক্তপূর্ণ আবরণ টানিয়া দিল।

সন্ধ্যার পন গাড়ী বহনগুব ষ্টেশনে পৌঁছিল। প্লাটফর্মের আলো ও
 হৃদয়কে মগ্নে ব্যক্তিগণ সন্তোষে চলাফেরা করিতেছিল। কয়েকটি স্নানজিহ্ন
 হৃদয়লোক ষ্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বহনমপুর্বে গাড়ী অনেকক্ষণ
 দাঁড়ইয়া। তাহার পব হস্ হস্ শব্দ করিতে করিতে অন্ধকারে অগ্রসর
 হইতে গাশিয়া।

এক রাত্রি এক দিন মগ্নে কাটিয়া গেল। ছবিধানত আশাব হয় নাই।
 শরীর ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং অল্প অল্প নিজাকরণ হইতেছিল।
 আমাদের স্থিতি ছিল, খুন্দা মিনিয়া ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া সকালের গাড়ীতে
 পৌঁছিয়া যাইব। রাত্রি প্রায় মাত্রে এগালটাক সময় গাড়ী খুন্দায় দাঁড়িবে। আনরা
 খুন্দার প্রতীক্ষা কবিতা বসিয়াছিলাম। বসিয়া বসিয়া কখন অতর্কিতভাবে
 খুন্দায় পড়িয়াছিলাম, আর একটু হইলেই খুন্দা পাব হইয়া যাইত। ভাগ্যক্রমে
 খুন্দা ষ্টেশনেই আসিয়া উঠিত হইলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রাম-
 গার গিয়া নিছানা পাতিয়া শনন করিলাম।

সকালের দ্বিগে খুবী মত কবিতাম। বেল হইতে উড়ির গ্রামগুলির মধ্যে
 গৃহকর্মানিবত উড়িরা-মন্দিরঃ দৃষ্টগোচর হইতেছিল। তাহারা হৃদয় রংগের
 নগ্নপড় ছোট কবিতা পরিচ্ছন্ন, হাতে ও পায়ে বড় বড় ভারী গহনা রহিয়াছে।
 ষ্টেশনগুলিতে শরীর খুব উড়। গাড়ী ষ্টেশনে আসিলেই তাহারা গাড়ীতে
 হাব পাইবার জন্য ব্যাকুলতায়। ছুটাছুটি কবিতাছিল। অবশেষে আমরা খুবী
 ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছি।